ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-

শ্চেতসস্তিমিরব্যূহবাধকঃ।

স্তোতৃবিজয়তাদ্বিপশ্চিতা-

মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

—✱—

সপ্তদশ বর্ষ—১৩৩১

সম্পাদক—শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী

বার্ষিক মূল্য—২৲ প্রতি সংখ্যা—।৵০

যোরহাট

সারস্বত মঠস্থ "যোগমায়া-যন্ত্র" হইতে

ব্রহ্মচারী শশিভূষণ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচী

—•—

(বর্ণমালানুসারে)

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } বৈশাখ { ১মা সংখ্যা

মঙ্গলাচরণম্

—*—

[ঋগ্বেদ সংহিতা—১।৯।৫]

এষাযুক্ত পরাবতঃ
সূর্য্যস্যোদয়নাদধি।
শতং রথেভিঃ সুভগোষা
ইয়ং বিয়ত্যভি মানুষান্ ।।

যস্যা রুশন্তো অর্চ্চয়ঃ
প্রতিভদ্রা অদৃক্ষত।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং
সুপেশসমুষা দদাতু সুগম্যম্ ।।

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব
উতয়ে জুহূরে ঽবসে মহি।
সা নঃ স্তোমা অভিগৃণীহি
রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ।।

সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা
মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি
সং বাজৈর্বাজিনীবতী।

কত দূরে—নীলিমার কোলে ওই রবির উদয়,
কোথা হতে উষাদেবী রথে যুক্ত করিলেন হয়।
সঙ্গে তাঁর শত রথ—দিব্য জ্যোতিঃ বিতরে কল্যাণ—
ওই হের মানুষের মাঝে তাঁর চিত্র অভিযান।

সুশোভন অর্চ্চি তাঁর দীপিয়াছে নিখিল ভুবন,
দূর হল অকল্যাণ—ভদ্র রূপ কর দরশন।
ঋদ্ধি যাহা জ্যোতির্ম্ময়—বিশ্বজনগণ-বরণীয়,
তাই দিয়ে আমাদের গৃহখানি পূর্ণ করি দিও।

তোমারি উদ্দেশে দেবী পুণ্য-চেতাঃ পূর্ব্ব ঋষিগণ,
করিলেন যজ্ঞ-হোম—যাচিলেন চরণে শরণ;
নতি-ভরা স্তুতি এই ঢালিনু মা চরণে তোমার—
দাও ঋদ্ধি, দিব্য জ্যোতিঃ—দূর কর অজ্ঞান আঁধার।

সৌন্দর্য্য-সারের মণি দাও দেবী ঋদ্ধি সুমহান্—
হবিঃ-শেষ ইড়াভাগ অর্পি মাগো আশিষো সন্তান;
লভি যে সম্পদ, দেবী, বিশ্ব মাঝে নহি হতমান,
বিতর তনয়ে তাহা;—অন্নপূর্ণা, কর অন্ন দান।

নববর্ষে

—॥—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যংবিমলমচলং সর্ব্বদাসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং
তং নমামি ॥

শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে নববর্ষের নবপ্রভাত বিশ্ববাসীর নিকট মধুময় হউক।

আমরা বর্ত্তমানের উপাসক। অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে, ঠিক সেইরূপে আর তাহাকে ফিরাইতে পারিব না, ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা নিহিত রহিয়াছে, তাহাকেও জানি না। অবশ্য অতীতের প্রভাব এবং ভবিষ্যতের আশা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে বটে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান ভিন্ন তাহাদের ভোগ হইবার তো কোনও সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া অতীতের স্মৃতিতে বা ভবিষ্যতের স্বপ্নে যাহারা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহারা বৃথা কালহরণ করিতেছে। শক্তি যে যুগ হইতেই আসুক না কেন, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র এই বর্ত্তমান।

কালের কতটুকু অংশকে বর্ত্তমান বলিব? এ সম্বন্ধে দৃষ্টির ভেদে ব্যবস্থায় ভেদ হইবে। যদি কর্ম্মনিরসন আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে কেবলমাত্র একটী ক্ষণ ছাড়া আমাদের কাছে আর সমস্তই অতীত বা ভবিষ্যতের অন্তর্গত। সেই অণুপরিমাণ বর্ত্তমান ক্ষণটীকে তাহার পূর্ব্বাপর সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধারণা করিতে গেলে মন-বুদ্ধি হার মানিয়া যায়—অভিমানী জীবের অহং-বুদ্ধি চূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মী সাধক বর্ত্তমানকে বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষণে পর্য্যবসিত করিতে চাহিবেন না।

এ ছাড়া আর এক পথ আছে—ব্যাপ্তির পথ। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতেই বর্ত্তমানকে অন্ততঃ কিছু কাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করি। কালের প্রবাহ সমভাবে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মাঝেই উজানে-ভাটাতে দুইটী সীমানির্দ্দেশ করিয়া আমরা বলি—"এইটুকু আমাদের বর্ত্তমান।" ইহাতে কর্ম্ম করিবার জন্য অবকাশ মিলে, কর্ম্মীর শক্তি স্ফুরিত হইবার সুযোগ পায়। কর্ম্মী সাধক বর্ত্তমানকে এই ব্যাপ্তির অর্থেই গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু সাধারণে বর্ত্তমানকে যেমন সঙ্কীর্ণ ভাবে গ্রহণ করে, সাধকের সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। সাধারণের ব্যাপ্তি-বোধ সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ। যতগুলি ব্যাপারকে সাধারণতঃ এক কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করা যায়, তাহা লইয়াই প্রাকৃত মানুষের বর্ত্তমান। ধারণা করিবার ক্ষমতা অনুযায়ী কেহ একটা দিনে, কেহ বা মাসে, কেহ বৎসরে, কেহ বা জীবনের খণ্ডাংশে তাহার বর্ত্তমানকে ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করে।

কিন্তু ধারণাকে তো নির্দ্দিষ্ট সীমার মাঝে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা চলে না। এমন কথা

কেহ বলিতে পারে না যে, আমি যতটুকু ধারণা করিয়াছি, তাহাই চরম, ইহার বাহিরে আর কিছুই নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক জগৎ আছে, মন-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত গণ্ডীকেই চরম বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

তাহা হইলে মানিতে হয়, আপন আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া ধারণাকে ব্যাপ্ত করিবার নিশ্চয়ই একটা পথ আছে। বৈদান্তিক কর্ম্মীকে সেই পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটা কার্য্য কারণ সংঘাতকেই আমরা বর্ত্তমান বলি। কিন্তু সম্পূর্ণ কার্য্য-কারণকে কেহ দেখিতে পায় না। তাই ধারণাশক্তির অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতকেই মানুষ বর্ত্তমান বলিয়া মানিয়া লয়। এইরূপে বর্ত্তমানের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। তাহার খণ্ডতা হইতেই ধারণানুযায়ী অতীত ও ভবিষ্যতের সৃষ্টি হয়। কি করিয়া এই খণ্ড বোধের অতীত হইতে হইবে, ইহাই বিবেচ্য।

বিজ্ঞান প্রথমতঃ কতকগুলি ব্যাপারকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মাঝে কার্য্য-কারণের একটা শৃঙ্খলা আবিষ্কার করে। এইরূপ একটা সাধারণ সূত্র পাইলেই তাহা দ্বারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন বহু ঘটনাকে একটা আইনের অধীনে আনা যায়—তাহাতে বহু ব্যাপারের একটা সুমীমাংসা পাওয়া যায়, কাজকর্ম্মের সুবিধা হয়। কিন্তু তখনও বিজ্ঞানের চেষ্টা থাকে, বিভিন্ন ব্যাপারের সাধারণ সূত্রগুলিকে [illegible] বৃহত্তর কোনও সূত্রের অধীনে আনা যাইতে পারে কি না। এইরূপে সূত্রের [illegible] বর্দ্ধিত করিয়া অবান্তর সূত্রের সংখ্যা যত কমান যাইবে, বিশ্বরহস্যের মীমাংসাও তত সহজ হইয়া আসিবে। পরিশেষে সমস্ত বিশ্বকে একটা সূত্রের অধীনে আনিতে পারিলেই বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি। তখন বলা যাইতে পারে, যাহা জানিবার তাহা জানিলাম—বিশ্বজগৎ আমার মুঠার মধ্যে।

কালকেও এই ভাবে আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। একটা বিশেষ দিনে বিশেষ একটা ঘটনা যদি আমাদের চিত্তকে উত্তেজিত করে, তবে বৈশিষ্ট্যের অভিঘাতে সমস্ত দিনটাই একটা অখণ্ড বর্ত্তমান কাল বলিয়া মনে হইবে। এইরূপে উত্তেজনার মাত্রা চড়াইলে পক্ষ, মাস, বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমানের এলাকায় আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে কে? এমন কোন্ রসের অনুভূতি জীবনে আমরা পাইতে পারি, যাহার বিদ্যুৎচমকে জন্মজন্মান্তর, যুগযুগান্তর আলোকিত হইয়া উঠিবে—অচ্ছিদ্র অনুভূতিতে কালের সত্তা বিলীন হইয়া যাইবে?

এই অনুভূতি সিদ্ধ সম্পদ। এ জন্মে কাহার ভাগ্যে ফুটিয়া উঠিবে, তাহা জানি না। সুতরাং ইহার ভরসাতেও সাধকের বসিয়া থাকিলে চলে না। কর্ম্মের পথ যদি গ্রহণ করিয়া থাক, তবে একটা না একটা কিছু করিতেই হইবে। অন্তর্জ্জগতে এমন একটা অনুশীলনের প্রয়োজন, যাহাতে কালের খণ্ডতা বোধ তিরোহিত হইয়া যায়। আর কাল অখণ্ড হইলেই তাহা বর্ত্তমানের আকারে প্রকাশিত হইবে। কেননা বোধের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে একমাত্র বর্ত্তমানেরই যোগ রহিয়াছে। বোধ যদি নিরবচ্ছিন্ন হয়, তবে কালও কোন বিভাগ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে না। এখন দেখিতে হইবে, নিরবচ্ছিন্ন বোধের উপায় কি?

জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মাঝে তোমার নিজকে যে জড়াইয়া নাও, ইহাদের মাঝে যে পৌর্ব্বাপর্য্য দেখ, ইহাই তোমার খণ্ড কালবোধের নিমিত্ত। দৃশ্যের পৌর্ব্বাপর্য্য যদি দ্রষ্টার মাঝেও সংক্রামিত হয়, তবে দ্রষ্টাও কালের অধীন হইবেন। এই জন্য খণ্ডতা-বোধ দূর করিতে হইলে জগদ্-ব্যাপার হইতে নিজকে পৃথক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জগতের সমস্তই আমার কাছে প্রতিভাসিত হয়, আমার নিজের বিচার-যুক্তিও আমার কাছে প্রতিভাস মাত্র—ইহাদের সকলের নিকট হইতেই নিজকে পৃথক করিয়া প্রতিভা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। এক জায়গায় যেন একটা আলো জ্বলিতেছে—সেই আলোর পরিধির মাঝে যাহাই আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু তাহাতে আলোর কোনও বিকার ঘটিতেছে না। অবশ্য এখানেও আলোক জড় বলিয়া তাহার প্রকাশ নিরপেক্ষ নহে। কিন্তু তোমার মাঝে যে দীপ জ্বলিতেছে—উহা চৈতন্যের দীপ। শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে—সর্ব্বত্রই এই প্রদীপ সমভাবে জ্বলিতেছে—জগতের সৃষ্টি হউক, পরিণাম হউক, প্রলয় হউক—এই দীপশিখা সমভাবে জ্বলিতে থাকিবে।

এইটুকু যদি ধারণা করিতে পার—কেবল ধারণা নয়, যদি বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া ধারণা করিতে পার, তবেই খণ্ড বোধ হইতে নিস্তার পাইবে। তোমার সম্মুখে কি আছে না আছে, তাহার বিচার করিও না—কোনও বস্তুর সঙ্গে নিজকে জড়িত করিও না—কামনার বীজমাত্রও যেন তোমার মাঝে না থাকে—এইটা এরূপ হউক কি ওইরূপ হউক—ইত্যাকার কোনও ইচ্ছাই যেন তোমার মাঝে না জাগে। এইভাবে জগৎ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া—নিজের মন বুদ্ধির খেলা হইতেও বিযুক্ত করিয়া আত্মস্বরূপের—সাক্ষিস্বরূপের ভাবনা কর। এই ভাবনার উত্তেজক কোনও প্রতিপক্ষ থাকিবে না—উহা একরস উপলব্ধিমাত্র হইবে। এইপ্রকার অভ্যাসের ফলেই খণ্ড বোধ দূর হইয়া যাইবে—কালের বন্ধন থাকিবে না—তিন কালই মহাবর্ত্তমানে পর্য্যবসিত হইবে।

এই অভ্যাস কর্ম্মের বাধক হইবে না। যেখানে ফলাকাঙ্ক্ষা, কিম্বা যেখানে ভালমন্দের বিচার, সেইখানেই পৌর্ব্বাপর্য্যবোধে কালবিভাগের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তুমি যখন অপরের কর্ম্মের প্রতি উদাসীন থাক, তখন তাহার সম্বন্ধে বর্ত্তমানের সহিত অতীত কিম্বা ভবিষ্যতের তো কোনও তুলনাই আসে না। তেমনি তোমার কর্ম্মসম্বন্ধেও যদি তুমি উদাসীন থাক—কোনও কামনা দ্বারা যদি তোমার কর্ম্ম পরিচালিত না হয়, তবে উহাও তোমার মাঝে কোনও বোধের বিপর্য্যয় ঘটাইবে না। তখন কর্ম্মমাত্রকেই অনন্ত বিশ্রাম বলিয়া অনুভব করিবে। কামনা হইতে বিযুক্ত হওয়াতে কর্ম্ম তখন মহাশক্তির সংযোগে সৎ হইবে, তাহাতে জগতের হিত ভিন্ন অহিত হইবে না।

আজ জগতে বিক্ষোভের অন্ত নাই। সমস্ত জগৎ যুড়িয়া কেবল একটা অস্বস্তি, একটা চাঞ্চল্য—কর্ম্মের যে কোথায় পরিণতি হইবে, জীবনের যে কি লক্ষ্য, তাহা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে—কেবল ভূতগ্রস্তের মত মানুষ দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই-

ভেছে। এই কর্ম্মচঞ্চলতার মাঝে নৈষ্কর্ম্ম্যের উপনিষদ্ প্রচার হওয়ার বড়ই প্রয়োজন। বড় জোর যাট্ কি সত্তর বৎসর মানুষের আয়ুষ্কাল—ইহার পর সে কোথায় যাইবে, ইহার পূর্ব্বেই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহার কোনও সন্ধানই সে জানে না। অথচ এই অনিশ্চিততার বোঝা মাথায় লইয়াই সে সমাজের হিত করিবে, জগতের হিত করিবে বলিয়া অভিমানে আস্ফালন করিতেছে। তাহার আত্মহিতের চিন্তা কোথায় গেল? নিজের জীবনকে যে মৃত্যুর পরেও একটী নিমেষমাত্র প্রসারিত করিবে, এমন কি শক্তি সে সঞ্চয় করিল? পরবশ হইয়া কেবল জন্ম-মৃত্যুর কবলিত হওয়া ছাড়া কি তাহার আর কোনও গতি নাই? আর যে এমনি করিয়া জন্ম-মৃত্যুর বশ, ইন্দ্রিয়ের দাস, দেহের দাস—সে জগতের কোন্ স্থায়ী হিতই বা করিবে? এই যে জগদ্ধিতের অভিমান লইয়া সে কর্ম্ম করিতেছে—যাট্ বৎসর পর সে একবার আসিয়া কি দেখিয়া যাইবে, তাহার কৃতকর্ম্মের ফলে জগতের কতটুকু হিত হইয়াছে, কিম্বা তাহার দৃষ্টিতে যাহা হিত বলিয়া মনে হইয়াছে, যুগান্তব্যাপী কালের পরীক্ষায় তাহার কি মূল্যই নিরূপিত হইয়াছে?

নবীন বর্ষকে আমরা সাদরে অভিনন্দন করিতেছি! কিন্তু সে যেন আমাদের উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতাইয়া না তোলে। আমাদের এখন আমোদ করিবার সময় নয়—এক্ষণে ধীর স্থির ভাবে বিচার করিয়া পথ চলিতে হইবে। মহৎ কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে—সে কর্ত্তব্য পর-প্রবোধন নয়—আত্মপ্রবোধন; জগদ্ধিত নয়—আত্মহিত। আপনাকে চিনিলে, আপনাকে উন্নত করিতে পারিলে, তাহাতেই জগতের প্রকৃত হিত হইবে। আমরা অপরের হিত করি বা অহিত করি—সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। একটা গলিত শব যদি গ্রামের মধ্যে পড়িয়া থাকে, তবে আপনা হইতেই সে বায়ুকে দূষিত করিয়া মড়ক উপস্থিত করিবে—তাহার জন্য তাহাকে সাধ্য সাধনা করিতে হইবে না। আবার দেবারতিতে ধূপের গন্ধও আপনা হইতেই সৌরভে বায়ুমণ্ডলকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে—স্তুতি মিনতির অপেক্ষা রাখে না। তোমার স্বভাবই বলবান—উহাতেই জগতের হিত কিম্বা অহিত হইবে। সুতরাং স্বভাবকে উদ্বুদ্ধ করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরপদে শান্তচিত্তে কর্ম্মপথে অগ্রসর হও—ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করিবে—আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ওঁ শান্তিঃ!

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

মঙ্গলাচরণ

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।
অজা যে তু তাং জুষমাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্ ॥

—যিনি অজা (জন্মরহিতা), লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণা (রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণযুক্তা) এবং বহু সন্তানের জননী (মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত নিখিলের সৃষ্টিকারিণী), সেই প্রকৃতিকে) নমস্কার।

আবার সেই অজা (প্রকৃতি) যে অজদিগকে (পুরুষদিগকে) সেবা করিতেছেন, সেই অজেরা তাঁহাকে (ভোগকালে) আশ্রয় করিয়া পুনরায় ভোগ সমাপ্তি হইলে (অপবর্গকালে) পরিত্যাগ করিতেছেন;—এই অজ পুরুষদিগকেও নমস্কার।

শাস্ত্রজিজ্ঞাসার ভূমিকা

বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে শাস্ত্র-মর্ম বোঝা যায় না। যে বিশুদ্ধ মার্জ্জিত বুদ্ধির সহায়ে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়, তাহার পারিভাষিক নাম—প্রেক্ষা। শাস্ত্রে তাহার এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

যস্যামুৎপদ্যমানায়ামবিদ্যা নাশমর্হতি।
বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে ॥

—যে বুদ্ধিতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ করা যায়, যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, তাহাকে প্রেক্ষা বলে।

প্রেক্ষা যাঁহার আছে, তিনি প্রেক্ষাবান্, তিনিই শাস্ত্রাধিকারী। প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তির নিকটেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রেক্ষাবান্ যে বিষয় বুঝিতে চাহেন, ব্যাখ্যাতা যদি তাহারই ব্যাখ্যা করেন, তবে প্রেক্ষাবান্ তাঁহার কথায় কান দিবেন। কিন্তু যে বিষয় বুঝিবার জন্য প্রেক্ষাবান্ শ্রোতার কোনও আগ্রহ নাই, তাহা বুঝাইতে গেলে শ্রোতা বক্তাকে উন্মত্ত ভাবিয়া উপেক্ষা করিবেন। তিনি বলিবেন, "ইনি এ সমস্ত কি কথা বলিতেছেন? ইনি তো দেখিতেছি, লৌকিক ব্যবহারও জানেন না, শাস্ত্রযুক্তিতেও অভিজ্ঞ নহেন। ইহার কথা শোনে কে?"

আবার, যে বিষয় জানা থাকিলে পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, প্রেক্ষাবান্ শ্রোতার সেই বিষয় জানিবার জন্যই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

সাংখ্যকারিকাকার জানেন, তিনি যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছেন, তাহার

অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তির পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে। তাই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জাগাইতে তিনি বলিলেন—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা
তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চে-
ন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥

—দুঃখত্রয়ের অভিঘাত আছে বলিয়াই কি করিয়া তাহার অপঘাত হইতে পারে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে। বলিতে পার, দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, সুতরাং শাস্ত্রকারের নিকট নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক; কিন্তু এমন কথা স্বীকার করা যায় না। কেননা লৌকিক উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিও হয় না, আত্যন্তিক নিবৃত্তিও হয় না।

জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ?

যদি জগতে দুঃখ না থাকিত, কিম্বা থাকিলেও কেহ তাহাকে এড়াইয়া যাইবার ইচ্ছা না করিত; অথবা এড়াইবার ইচ্ছা করিলেও, যদি দুঃখ নিত্য বলিয়া কিম্বা তাহার উচ্ছেদের উপায় জানেনা বলিয়া কাহারও পক্ষে দুঃখের উচ্ছেদ অসম্ভব হইত—তবে দুঃখনিবৃত্তির উপায়জ্ঞাপক সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্ববিজ্ঞানের কোনও প্রয়োজনই থাকিত না।

আবার দুঃখ দূর করিবার সম্ভাবনা থাকা-সত্ত্বেও যদি দেখা যাইত, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান হইলেই দুঃখ দূর হয় না, কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া দুঃখ দূর করিবার আরও সহজ উপায় আছে, তাহা হইলেও শাস্ত্র জিজ্ঞাসার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

দুঃখের অস্তিত্বসাধন

কিন্তু দুঃখ যে নাই, এমন কথা বলা যায় না; আবার একথাও বলিতে পারিবে না যে কেহ নিজের দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছা করে না। "তিনটী দুঃখের অভিঘাত জগতে রহিয়াছে" —স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি।

এই তিনটী দুঃখ কি কি ?—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিনটী ধাতুর যদি বৈষম্য উপস্থিত হয়, তবে শরীরে জ্বর, অতিসার প্রভৃতি শারীরিক পীড়া উপস্থিত হয়। এই হইল একপ্রকার আধ্যাত্মিক দুঃখ। আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ কিম্বা বিশেষ কোনও বস্তুর অদর্শনেও মনে দুঃখ উপস্থিত হয়। এই হইল আধ্যাত্মিক মানস দুঃখ।

শারীরিক ও মানসিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক বলা হয় এই জন্য যে, ইহাদের নিবৃত্তির উপায় আন্তরিক অর্থাৎ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপরেই এই সমস্ত উপায় প্রযোজ্য। বাহ্য উপায় দ্বারা যে সমস্ত দুঃখ দূর করিতে হয়, তাহাদিগকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন, ভূত-জগৎকে চারিভাগে ভাগ করা যায়, যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ; সুতরাং এই চারিপ্রকার ভূত হইতে উৎপন্ন আধিভৌতিক দুঃখও চারিপ্রকার। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক
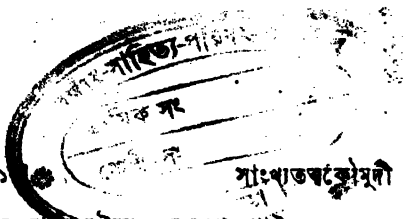
আবার দৈব কারণ হইতে যে দুঃখ পাই, তাহা আধিদৈবিক। যেমন যক্ষ, রাক্ষস বা গ্রহাদির আবেশ হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা আধিদৈবিক। শীতোষ্ণ, বাতবর্ষা, বজ্রপাতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখও আধিদৈবিক।

দুঃখ প্রকৃতির রজোগুণের একটী পরিণাম মাত্র—কেননা দুঃখমাত্রই ক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। ক্ষোভ রজোগুণেরই ধর্ম্ম, কারণ আচার্য্যই অন্যত্র বলিয়াছেন, "উপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ" (কারিকা, ১৩)। আবার এই দুঃখের বেদনা প্রত্যেককেই স্পর্শ করিতেছে। সুতরাং দুঃখ নাই, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

দুঃখনিবৃত্তির প্রয়োজন

জীব দুঃখ এড়াইতে চায় কেন?—দুঃখের অভিঘাত হয় বলিয়া। দুঃখ অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয়, চেতনাশক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধও হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধে দুঃখকে আমরা প্রতিকূল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাই অভিঘাত। অভিঘাত হইতে দুঃখকে প্রতিকূল বলিয়া জানি, সুতরাং তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে চাই। কাজেই প্রমাণিত হইল, দুঃখ আছে, এবং লোকে তাহা এড়াইয়া যাইতেও চায় বটে।

শাস্ত্র-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন

যদিও দুঃখ একেবারে দূর করা যায় না, তথাপি তাহার মাত্রা কমাইতে পারা যায়—এ কথা পরে প্রমাণিত হইবে। যদি দুঃখের মাত্রা কমান সম্ভব হয়, তাহা হইলে যাহা দ্বারা দুঃখের অপঘাত বা নিবৃত্তি সম্ভবপর, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা অনুচিত নহে।

সুতরাং এই পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখিলাম, সাংখ্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পরে উল্লেখ করা যাইবে।

[মূলে ব্যাকরণঘটিত একটী তর্ক আছে। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ"—এই শব্দে তৎপুরুষ সমাস হওয়াতে উত্তরপদের প্রাধান্য ও পূর্ব্বপদের গৌণত্ব সূচিত হইতেছে। দুঃখ শব্দ যদি সমাসের উপসর্জ্জন বলিয়া গৌণ হয়, তবে, "তদপঘাতক" শব্দে যে "তৎ" শব্দটী রহিয়াছে, উহা দ্বারা দুঃখ শব্দের পরামর্শ (গ্রহণ) করা শাব্দবোধের অনুকূল নহে।—উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিতেছেন, আমরা মুখ্যতঃ দুঃখ সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি, সুতরাং দুঃখের কথাটাই সর্ব্বদা আমাদের বুদ্ধিতে জাগিতেছে। এরূপ অবস্থায় তৎ শব্দ দ্বারা সমাসের গৌণাবয়ব দুঃখশব্দের গ্রহণ দুষণীয় হইবে না।]

দুঃখের "অপঘাতক হেতু" অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় যে শাস্ত্রই আমাদিগকে বলিয়া দিবেন, ইহাই আচার্য্যের মনোগত অভিপ্রায়।

শাস্ত্রজিজ্ঞাসায় পূর্ব্বপক্ষ

কিন্তু এই বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন, "সকল কথাই মানিয়া লইলাম। মানিলাম, জগতে ত্রিবিধ দুঃখ আছে; সকলেই যে দুঃখ এড়াইয়া যাইতে চায়, তাহাও স্বীকার করি। দুঃখ এড়াইয়া যাওয়া যে সম্ভব, তাহাও মানি। এমন কি দুঃখ দূর করিবার উপায় যে শাস্ত্রই আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন, তাহাতেও আপত্তি করিব না। কিন্তু [illegible] প্রেক্ষাবান্ [illegible] দুঃখনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন না। কেননা

দুঃখ দূর করিবার তো কত দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় সমুখে পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি ছাড়িয়া তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ে দুঃখ দূর করিতে যাইব কেন? তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কত জন্ম ধরিয়া উহার অভ্যাস করিয়া কত আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাকে কি কেহ সহজ উপায় বলিবে? লোকেও বলে—

অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥"

—ঘরে বসিয়া যদি মধু পাওয়া যায়, তবে পাহাড়ে মধুর খোঁজে যাইব কেন? যাহা চাই, তাহা যদি আপনা হইতেই হইয়া যায়, তবে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার জন্য প্রয়াস করিতে যাইবে?

"দুঃখ দূর করিবার কত শত উপায় রহিয়াছে। সে সমস্ত উপায়ও কত সহজ। শারীরিক দুঃখ দূর করিবার জন্য চিকিৎসকেরা শত শত উপায় বলিয়া দিতেছেন। মানসিক দুঃখ যদি দূর করিতে চাও, তবে মনের মত সুন্দরী স্ত্রী, পান, ভোজন, বস্ত্র, অলঙ্কার, অঙ্গরাগ প্রভৃতি বিষয় জুটাইয়া লও—ইহার চেয়ে সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? যদি আধিভৌতিক দুঃখ দূর করিতে চাও, তবে নীতিশাস্ত্র অভ্যাস করিয়া তাহাতে পারদর্শিতা লাভ কর, নিরুপদ্রব স্থানে বাসস্থান নিরূপণ কর। এই সমস্ত প্রতিকারের উপায়ও তো দুঃসাধ্য নহে। তেমনি আধিদৈবিক দুঃখ দূর করিতে হইলে মণি, মন্ত্র ঔষধাদির ব্যবহার কর, সহজেই দুঃখের প্রতীকার হইবে।

"সুতরাং এমন সব দৃষ্ট উপায় থাকিতে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞানের শরণ লইবার প্রয়োজন কি? কাজেই শাস্ত্রজিজ্ঞাসার কোনও আবশ্যকতাই থাকিতে পারেনা।" এই হইল পূর্ব্বপক্ষীয় তর্ক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ

উত্তরপক্ষী ইহার জবাবে বলিতেছেন, "না, তোমার তর্ক খাটিতে পারে না, কেননা তোমার প্রদর্শিত উপায়ে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিও হয় না, অত্যন্ত নিবৃত্তিও হয় না। অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে দুঃখ যে নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে না। আবার যদিও বা দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তথাপি আবার যে দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, এমন ভরসাও তুমি দিতে পার না। মোট কথা এই—যথাবিধি রসায়ন ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া, কামিনী কাঞ্চন ভোগ করিয়া, নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া বা মন্ত্র আওড়াইয়াও দেখা যায়, আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের নিবৃত্তি হইতেছে না—সুতরাং এই সমস্ত নিবৃত্তি অনৈকান্তিক (অর্থাৎ কখনও হয়, কখনও বা হয় না)। আবার যদিও বা কখনও দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তথাপি আবার দুঃখ আসিয়া জুটিতে আটক নাই—সুতরাং এমন দুঃখনিবৃত্তি অনাত্যন্তিক (অর্থাৎ ইহাতে চিরকালের মত দুঃখ দূর হইয়া যায় না)। কাজেই লৌকিক উপায় যদিও সহজসাধ্য, তথাপি তাহাতে ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। অতএব দুঃখনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসার প্রয়োজনও নিঃশেষিত হইয়া যায় না।"

—০—

শাস্ত্রের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। কিন্তু আচার্য্য প্রথমেই দুঃখের কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুঃখ অমঙ্গলস্বরূপ। সুতরাং ইহাতে মঙ্গলাচরণ হয় কি করিয়া? ইহার উত্তরে বলি, দুঃখ তো আচার্য্যের প্রতিপাদ্য নহে। কি করিয়া দুঃখ দূর হইতে পারে, তিনি সেই অপঘাতক হেতু সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছেন। দুঃখের অপঘাত বা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক। সুতরাং শাস্ত্রের প্রারম্ভে তাহার প্রসঙ্গ দূষণীয় নহে। (১)

প্রেম ও সত্য

যে বেচারী তোমার জন্য খেটে মরছে, তার আত্মাকে খোরাক দাও—তাকে ভালবাসা দাও—দেখবে, দেহের জন্য খোরাক না চেয়েও সে তোমার জন্য খাট্‌ছে। তোমার সেবককে ভালবাস, সেবকও তোমার সেবাকে ভালবাস্‌বে। সেবা যেখানে প্রেমে সঞ্জীবিত, সেখানে সেবার মাঝে কঠিনতা কিছু আছে কি?—না গো, সেবা যে সেখানে খেলার মত মনমাতানো!

কলা (arts) কি? যা আমরা স্পর্শ করি, তারই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে ফুটিয়ে তোলা—তাই হল কলা। স্বর্গ মর্ত্ত্যে এমন কি বস্তু আছে যা সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে?—সে কি প্রেম ছাড়া আর কিছু হতে পারে?

সেবার উপর প্রেমের আলো যখন ঝরে পড়ে, তখনই শ্রম সার্থক, সেখানেই শ্রমজাত শিল্পের উদ্ভব। আজকাল ভারতবর্ষে কলাবিদের মৌলিক কল্পনা, সৌন্দর্য্য-জ্ঞাপক শিল্পকলা—এক কথায় কোনও প্রকার উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্পের নিদর্শন মিলে না কেন? তার কারণই হচ্ছে—শিল্পীর উপর কারো প্রাণের দরদ নাই। যারা কারু, তারা সমাজের বুকে ঠাঁই তো পায়ই নি, অধিকন্তু তাদের বাস্তুভিটাটুকু কামড়ে থাকবার পর্য্যন্ত যো নাই।

শ্রমিককে যে সমাজ ঘৃণা করে, সে সমাজে আছে কেবল পূতিগন্ধ আর ধ্বংস ও মৃত্যুর লীলা—শিল্প সেখানে শ্রমসাধ্য ব্যাপারই বটে। আর শ্রমিক যেখানে ভালবাসা পায়, সেখানে প্রাণের আলো ফুটে ওঠে, শ্রম সেখানে শিল্প হয়ে ওঠে। হে প্রেমের ঠাকুর, আজ কি দেশের এমনই দুর্দ্দশা হয়েছে? প্রেমকে মানুষ এত খানি ভুল বুঝতে পেরেছে যে আজ প্রেমের কথা তুললেই লোকের মনে নির্লজ্জ কামুকতার কথা জাগে—অমরাবতীর সেই দিব্যজ্যোতিঃর কথা তো জাগে না। লোকে কখনও দিব্য প্রেম, ভক্তি ও উপাসনা নিয়ে বড় বড় বুলি

ঝাড়ে, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে দাঁড়ায় গিয়ে কতগুলি সংস্কৃত স্তোত্র আর মন্ত্র আওড়ানোতে —তার মাঝে ভাব থাকা দূরের কথা, যা বলছে, তার অর্থ পর্য্যন্ত বেচারীরা জানে না। এ যেন বিনা বারুদে গুলি ছোঁড়ার মত। চৈতন্যদেবের প্রেমজ্বালাময় হৃদয়সন্তাপের ব্যর্থ অনুকরণ!

কোনও মন্দিরে শুনি, দেশী ভাষায় গান-স্তোত্র হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অতি চমৎকার বাদ্য-ভাণ্ড—কিন্তু হরি হরি! তার মাঝে প্রেমিক হৃদয়ের একটী পুণ্যময় অশ্রুবিন্দুর সাক্ষাৎ মিলবে কি?

তাই ভারতবাসী! নিজকে অধম বলে ভগবানের দাস বলে ভগবানকে ভুলিয়ে তাঁর ভালবাসা লাভ করতে পাববে না। যেমনটী তুমি ভাবছ, ঠিক তেমনটই হবে। কর্ম্মের অলঙ্ঘ্য বিধান অক্ষরে অক্ষরে ফলবে—ও রকম করে যখন ভগবানকে ডাকবে, তখন তোমাকে অধম দাসই হয়ে থাকতে হবে। ওকে তো ভক্তি বলি না.

ভাই গরীব ধনী! অভ্রভেদী মন্দির গড়েছ, তার মাঝে পাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেছ, তাতে তোমার প্রাণের জ্বালা জুড়াবে না। আমি জানি, এখনও তুমি জ্বলছ। তোমার অহঙ্কার হয়ত সে কথা স্বীকার করবে না। ক্ষুধিত নারায়ণের সেবা কর, দেশের বিষ্ণুরূপী শ্রমিকদের পূজা কর। গরীব হিন্দুস্থানী ছেলে-দের শিল্পকলা শিখবার জন্য আমেরিকা পাঠিয়ে দাও—তারা ভারতে ফিরে এসে শত শত সহস্র সহস্র ক্ষুধিত শ্রমিককে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে।

একটা লোক নিজামীর "লয়লা মজনু" পড়ছিল। পড়ে বই থেকে লয়লার ছবিখানা ছিঁড়ে নিয়ে সেটাকে সে বুকে চেপে চুমো খেতে লাগল। কেন? সে জবাব দিল, আমি লয়লার প্রেমে পড়েছি। ওরে খোকা, তার জন্য মজনু বেচারীর ভুলালীকে কেড়ে নিবি? মজনুর মত জলন্ত জীবন্ত প্রেম তোর থাক—কিন্তু ভালবাসবি যাকে, সে এই যুগেরই জীবন্ত মেয়ে হওয়া চাই।

ভারতবাসী ভক্ত! গোপীর মনচোরাকে—শ্রীচৈতন্যের হৃদয়সম্পদকে তোমরা খুব সহ-জেই দখল করে নিতে চাও। কিন্তু তোমা-দের মাঝে কয়জনার গোপীর মত, গৌরাঙ্গ-দেবের মত শুদ্ধ জলন্ত প্রেম রয়েছে? সেই মনমাতানো কুলমজানো গোয়ালার ছেলের প্রেয়সী হবে তখন—যখন চণ্ডালে চোরে পাপী তাপীতে পরিশুদ্ধ প্রেম নিয়ে তাঁকেই দেখবে —কেবল পাথরের মূর্ত্তির মাঝেই তাঁকে আটকে রাখবে না।

ভক্তি কেবল ভিখমাঙ্গা কান্নাকাটী নয়, কেবল নেতি নেতি নয়। ভক্তি হচ্ছে অনির্ব্বচনীয় সাম্যের অবস্থা—উচ্ছল মাধুর্য্যে ভরা দিব্যোন্মাদই ভক্তি। যা কিছু দেখছি, সবের মাঝে সেই সর্ব্বময়কে দেখাই হল ভক্তি। যেখানে চোখ পড়বে, সেখানেই দেখবে 'তুমি।' সব সৌন্দর্য্যমাখা দেখবে. —অথচ জানবে, সে সৌন্দর্য্য তুমিই—তত্ত্বমসি—এই হল ভক্তি।

ভাই তুমি চোর? তুমি নিন্দুক? তুমি দস্যু? ভয় কি? এসো ভাই, কাছে এসো! আমি তোমারই—তুমি আমারই। আমার যা কিছু আমার বলে মনে করছ, খুসী হয়, তার সব তুমি নিয়ে যাও না ভাই! তোমার ইচ্ছা হয়, এই দেহটাকে এক আঘাতে প্রাণহীন করে ফেল—না হয়, তিল তিল করে একে মার! নাও—আমার দেহ

নাও—তোমার যা খুসী, তাই নাও! নাও—আমার নাম যশ নাও, আমার সব নাও! তার পর ফিরে যদি তাকিয়ে দেখ, দেখবে একা আমিই রয়েছি অক্ষত, নির্ব্বিকার! কি আনন্দ, ভাই, কি আনন্দ!

ভাই মুসলমান, তুমি আমাকে বধ করতে পার—কিন্তু আমার প্রাণ তোমার প্রেম পাগল। ভাই খ্রীষ্টান, তুমি হয়ত আমাকে বুঝতে পারছ না—কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবাসি। ভাই পারিয়া, ভাই ধাঙ্গর, তোমার রোগের বীজাণুপূর্ণ দুষ্কার-জনক পল্লীতে কেউ প্রবেশ করবে না—কিন্তু তোমাদের রামকে তোমরা সেখানে দেখতে পাবে।

প্রেমের ভান, মিথ্যা ভাবোচ্ছ্বাস,—এগুলি দিয়ে কেবল ভগবানকে অপমান করা নয় কি? চাই একটা খাঁটী অগ্নিশিখা—থাক্ না কেন তার মাঝে নীচ প্রবৃত্তির ধূমোদ্গার।

গতানুগতিকতা, আচারের অন্ধ আবর্ত্তন, নাম, যশ, লজ্জাভয়ের দাসত্ব—এগুলো কেবল ছাইয়ের মত। যুবকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সত্যের যে অগ্নিশিখা জ্বলছে, এই ছাই-পাঁশে তাদের ঢেকে রেখেছে শুধু—বাইরের চাপে তারা মুষড়ে পড়েছে। এসো সত্য, তুমিই আমার আত্মীয় বন্ধু, প্রিয়, প্রভু—তুমিই আমার আমি!

তুমি রাজা? তুমি আইন? তুমি সমাজ?—বেঁচে থাক! কিন্তু রামের সঙ্গে তোমরা কোনও রফা করতে পারবে না। তোমাদের হাসি, ভ্রূকুটী, আস্ফালন তোমাদেরই থাকুক। সত্য আমার রাজা—লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সম্রাট, রাজাধিরাজের চেয়েও তিনি শক্তিধর।

লোকে বলে পানামা রেলওয়ের প্রত্যেক বাঁধুনীতে একটা করে মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এ কথা সত্য হোক্ বা না হোক্—আমি নিঃসংশয়ে জানি, সত্য মহারাজ যখন বিজয় যাত্রা করেছেন, তখন নরমুণ্ডে গাঁথা পথ দিয়ে তিনি চলেছেন। সত্যের মহিমময় পদ-স্পর্শে যে সমস্ত মস্তক পবিত্র হয়েছে, তারাই ধন্য।

সত্য যেখানে নাই, সেখানে প্রেমও নাই। প্রেম সত্য মহারাজের প্রতিনিধি। আবার এর বিপরীত ব্যবস্থাও সত্য। হয়ত দুই ই এক।

ভগবান বলেছেন, "এই দীপশিখায় কজ্জল-কালিমা রয়েছে, এর চেয়েও বিশুদ্ধ উপহার আমি চাই।" প্রেমিকের দৃষ্টি বড় গভীর—দিব্য জ্যোতিঃতে তা সমুজ্জ্বল। দুটী প্রেমি-কের দৃষ্টি এসে যেখানে মিলেছে, সেখানে স্বর্গের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এ দৃষ্টি আরও গভীর হওয়া প্রয়োজন—অনন্ত বিশ্ব তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে। ওই যে সূর্য্য-সমুজ্জ্বল আঁখিতারা—তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অক্ষদণ্ড হোক্।

হে গিরিনির্ঝরিণী, তোমার আস্ফালনে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হয়ে উঠুক্। হে সমুদ্র, তোমার ভৈরব গর্জ্জনে আকাশ বিক্ষুব্ধ হোক্। হে মৃত্যু, তোমার করাল বদন অট্টহাস্যে ব্যাদান কর। কে তুমি মহাপ্রাণ—পর্ব্বতে-সাগরে, মৃত্যুর গহ্বরে, প্রমথ তাণ্ডবে ছুটে চলেছ?—চিনেছি তোমায়, তুমি প্রেম, তুমি আমার রাজ্যেশ্বর। ঝঞ্ঝার গর্জ্জন, তরঙ্গের আস্ফালন—তোমার প্রমথ-সেনার বাহিনী—হে সত্য, হে নিষ্ঠুর—অনন্ত যুগের বিজয়যাত্রী তুমি!

গালিলীর ধূসর সন্ধ্যায় ভগবান্ দেখলেন, তাঁর ভক্তেরা প্রাণপণে নৌকা বেয়ে দাঁড় টেনে

চলেছে—কেননা বাতাস তখন তাদের প্রতিকূল। কিন্তু যিনি রাজাধিরাজ, যিনি প্রভু—তাঁকে দাঁড় টেনে চলতে হবে কেন? ঝড়ের মাঝেও তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছেন, কেননা তিনি জানেন, জলের উপর দিয়ে যে তিনি হেঁটে চলে যাবেন! কি আনন্দ! আমার প্রেম ঝঞ্ঝার পৃষ্ঠে, তরঙ্গের বুকে উধাও হয়ে চলেছে!

জাপানে তিন শত বছরের পুরাতন সিডার ও পাইন গাছগুলোকে পেঁয়াজের গাছের মত ছুঁটো করে রাখা হয়—বাইরে তাদের মোটেই বাড়তে দেওয়া হয় না। তাদের ছোট ছোট শিকড়গুলো কেটে দেওয়া হয়। মাটীর নীচে শিকড় বেশী দূর সেঁধোতে পারে না—কাজেই আকাশের দিকেও গাছগুলো মাথা উঁচু করে উঠ্‌তে পারে না। তেমনি অস্বাভাবিক শিক্ষকের দোষে মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে যায়।

নির্ব্বোধ নীতিবাগীশ, ধর্ম্মধ্বজীর দল! দূর হও তোমরা এখান থেকে! যুবকদের পথ বাৎলাবার কোনও অধিকার নেই তোমাদের। মানুষের একমাত্র অধিকার হচ্ছে সেবার অধিকার। প্রকৃতিকে যদি স্বচ্ছন্দ ভাবে চলতে দাও, তবে সে কখনো ভুল করবে না। যে বিধি বা ভগবান ক্ষুদ্র আমিবা (amœba) হতে মানুষদেহ পর্য্যন্ত ক্রমে বিকশিত করে তুলেছেন, তাঁর উপর নিশ্চয়ই ভরসা করা চলে।

মানুষ ঈর্ষ্যাবশে যার নাম রেখেছে পশু-প্রবৃত্তি—সেই প্রবৃত্তিই পশুর মাঝে এত নিয়ন্ত্রিত, পরিচ্ছন্ন, সুষ্ঠুভাবে আচরিত হয় কি রূপে? এর সোজা উত্তর হচ্ছে যে, পশুকে "তুমি এই করবে" আর "তুমি এই করবে না" এমন বুলি কেউ বিব্রত করতে যায় না। সেবা ও প্রেমে প্রাণের প্রেরণায় হয়—আদেশে বা বাধ্যবাধকতার জন্য।

ফুল ফুটানো যায় কি করে?—প্রেমের বলে একটা মেয়ে প্রতিকূল জলবায়ুতেও সুন্দর ফুলের বাগান করেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে করলে? সে বলল, আমি ফুল ভালবাসতাম, তাই ফোটাবার উপায় আপনি মনে আসল। প্রেমের মৃদু উত্তাপই প্রাণস্ফুরণের যন্ত্র। এতেই প্রমিকেরা শিল্পী হয়ে উঠে—কাজের মাঝে সৌন্দর্য্য দেখা দেয়।

ভালবাসাকে আসক্তির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না। তোমার স্ত্রী-পুত্র তোমার কাছে স্নেহ প্রেমের আবেষ্টন হয়ে উঠবে কেন? বরং তাদের কেন্দ্র করেই তোমার ভালবাসা জগতের উপর ছড়িয়ে পড়বে। একজন মহানুভব ব্যক্তি বলেছিলেন, "আমার পরিবারকে আমি আমার চেয়ে বেশী ভালবাসি আমার দেশকে আমার পরিবারের চেয়ে বেশী ভালবাসি, আর জগৎকে দেশের চেয়েও বেশী ভালবাসি।"

লাভ্‌লেস যুদ্ধে যাওয়ার সময় লুকাষ্টাকে যে কথাগুলো বলেছিলেন, একটু বদলে নিলেই সে কথাগুলো কি সুন্দর হয়ে দাঁড়ায়—"আমি যদি আমার দেশকে তোমার চেয়ে বেশী না ভালবাসতাম, তবে তোমাকে এত ভালবাসতে পারতাম না।"

খাঁটী ভালবাসা সূর্য্যের মত আপনাকে ছড়িয়ে দেয়। আর মোহ তুষারবৃষ্টির মত আত্মাকে শীতল ও সঙ্কুচিত করে তোলে।

মুসার প্রথম আইনের অর্থই হচ্ছে, প্রেম ছাড়া তোমার আর কোনও উপায় থাকবে না। আর এই প্রেমের ঠাকুরটী এমনি ঈর্ষ্যাপরায়ণ যে, তাঁর রাজসিংহাসনে কাক

এসে যে বসবে, এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না।

একটী স্ত্রীলোক তার একমাত্র ছেলে মরে গিয়েছে বলে দুঃখ করছিল। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি একটী নিগ্রোর ছেলেকে পোষ্যপুত্র নিয়ে আপন ছেলের মত পালতে পারবে? তা করতে রাজী আছ?" সে বললে, "না।" "তা হলে ঠিক ঐ জন্যই তোমার ছেলেটা মরেছে।" আসক্তি সকলকে বাইরে রাখতে যায়, প্রেম সকলকে জড়িয়ে রাখতে চায়; প্রেমের পথেই স্বর্গের দুয়ার উন্মুক্ত পাবে।

লোকে অপরের অকৃতজ্ঞতার কথা বলে। অপরের যা একটু উপকার করেছে, শাইলকের মত তার সুদ কসে নিতে চায় তারা! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ। কেন মিছামিছি ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছ? ভগবানের তো শুধু একখানা হাত নয়। সকল হাতই তাঁর হাত। সকল চোখই তাঁর চোখ, সকল মনই তাঁর মন। যখন লোকের সঙ্গে কারবার করেছ, তখন এই কথাটা কি মনে করে রেখেছিলে যে, তারা যে হাতে নিয়েছে, আবার সেই হাতে ফিরিয়ে দেবে? হয়ত সে দেওয়ার সময় আর এক হাত বের করবে। তাতে তোমার কি? হাতের সঙ্গে তো তোমার কারবার নয়, তোমার কারবার—যার হাত তার সঙ্গে।

বাস্তবিক তোমার কারবার হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে—যে নাম রূপ নিয়ে শত্রু মিত্রের আকারে দেখা দিচ্ছে, তার সঙ্গে নয়। ভগবান্ কখনও পাওনা চুকিয়ে দিতে ভুল করেন না। নিঃস্বার্থ কাজ করলেই ভগবান্ ঋণী হয়ে পড়েন। যে হাতে তিনি নিয়েছেন, সে হাতে হয়ত তিনি ঋণ শোধ করবেন না, কিন্তু আর এক হাতে আবার সুদ সহিতে আসল শোধ করবেন।

আরে চঞ্চলচিত্ত নাস্তিক, অমন ছট্‌ফট্ করছিস্ কেন? তোর প্রেমের আইন ছাড়া জগৎ শাসন করবার অধিকার যে আর কারু নাই।

পৌত্তলিকতা কাকে বলে?

শত্রুমিত্রের নাম রূপকে যদি এমনি বাস্তব ও একান্ত বলে মনে কর, যাতে তার মূল অপৌরুষেয় সত্তার প্রতি তোমার দৃষ্টি না পড়ে, তবে তাকেই বলে পৌত্তলিকতা।

নদী, হ্রদ, বন, পর্ব্বত প্রভৃতি স্বভাবদৃশ্য দেখলে পরে চিত্ত এমন মুগ্ধ, উচ্ছ্বসিত ও আনন্দময় হয়ে ওঠে কেন?—কারণ আমাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব বোধ তখন চলে যায়, যে ধারকরা মুখোস পরে আমরা দলের মাঝে ভিড়ে পড়ি, সে মুখোসটা তখন খসে পড়ে। তরুলতা তখন তাদের সুকোমল মাধুর্য্য দিয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন দূর করে দেয়।

যে প্রাণময় অপৌরুষেয় নিশ্বাসবায়ু বনে বনে তরুপল্লবে সঞ্চরণ করছে, তাকে নরনারীর মাঝে সঞ্চরণ করতে দেখে সংসারকে নন্দনকাননে পরিণত করতে পারেন, তিনিই ধন্য।*

---

* স্বামী রামতীর্থ

বেদান্তসার

—*—

[চতুর্থ খণ্ড —বিবৃতি—অনুবন্ধচতুষ্টয়]

——*——

বিষয়ানুবন্ধ

বেদান্তশাস্ত্রের প্রথম অনুবন্ধ অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুবন্ধ হইতেছে বিষয়। বেদান্তের বিষয় কি, সে সম্বন্ধে মূল নিবন্ধবাক্যটী স্মরণ করিতে হইবে। মূলে আছে—"বিষয়ো জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং—তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাৎ।" এখন এই মূল লক্ষণটীর এক একটী পদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

প্রথমতঃই প্রশ্ন হয়, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যকে শুদ্ধ চৈতন্য বলা হইতেছে কেন?—আগে বুঝি, ঐক্য কাহাকে বলে। মনে কর, এক জায়গায় দুধ, আর এক জায়গায় জল আছে। দুইটী নিশ্চয়ই এক বস্তু নয়। এখন দুইটীকেই যদি এক পাত্রে মিশাইয়া দেওয়া হয়, তবে বলা যাইতে পারে, দুধ আর জলে এক হইয়া গেল। সাধারণতঃ ঐক্য বলিতে আমরা এইরূপে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মিশ্রণই বুঝিয়া থাকি। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যকেও যদি ঠিক এই ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বলিব, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ভিন্ন হইয়াও স্বরূপেই যদি দুইয়ে মিশাইয়া একাকার হইয়া যায়, তবে তাহাই হইল জীব ব্রহ্মের ঐক্য। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই, জীব আর ব্রহ্ম—এই দুইটীর স্বরূপ এত ভিন্ন যে, দুধ-জলের মত দুয়ের মিশিয়া এক হইয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। মিশাইতে হইলে দুইটী হইতে কিছু কিছু বাদ দিয়া একটা সাধারণ ধর্ম্মের উপর উভয়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এবং চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য দেখিয়াই, চৈতন্যের "শুদ্ধ" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

শুদ্ধ চৈতন্য কাহাকে বলে? যাহা সমস্ত ধর্ম্মের অতীত এবং যাহা একরস। সে কেমন বলিতেছি। তুমি জীব, বিচার করিয়া দেখিলে তোমার মাঝে কি কি বস্তু পাই? তুমি চেতন, এই হইল প্রথম কথা। কিন্তু সেই চৈতন্য তোমার বুদ্ধি, মন, দেহ প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং তুমি যে চেতন, শুধু এই কথা বলিলেই তোমার পরিচয় শেষ হয় না। বলিতে হয়, তুমি চেতন, বুদ্ধিমান্, মননশীল, দেহধারী জীব। আরও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইলে তোমার পিছনে আরও কত উপাধি জুড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সকলেরই অদল-বদল হয়—ইহাদের কোনটাই চিরদিন একরকম

থাকে না। তোমার দেহ নাই, অথচ তুমি আছ, মন নাই, বুদ্ধি নাই—অথচ তুমি আছ —এমন কল্পনা করা যায়। কিন্তু আর সব আছে—অথচ তুমি নাই, এমনটী হইতে পারে না। তুমিও নাই—এই কথা জানে কে? সে তো তুমিই, অথবা সেই তো চেতন তুমি বা চৈতন্য। সুতরাং এইরূপে জীবকে বিশ্লেষণ করিয়া পাই চৈতন্য।

ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ বুঝিতে পারি না। তটস্থ লক্ষণ দিয়া বুঝি, তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যাদি। কিন্তু জীবকে যেমন বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম, তেমনি ব্রহ্মকে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম বা উপাধি হইতে মুক্ত চৈতন্য স্বরূপ পাই। এই অংশে তাঁহার সহিত জীবের মিল আছে। তুমিও স্বরূপতঃ চৈতন্য, ব্রহ্মও চৈতন্য। আবার চৈতন্য স্বরূপের বেলায় ছোট বড় নাই —তুমি ছোট চৈতন্য, ব্রহ্ম বড় চৈতন্য, এমন কথা বলা চলে না—কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্ত উপাধি ছাড়িয়া দিলে তবে স্বরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে পারি, উপাধিবর্জ্জিত চৈতন্য নিশ্চয় একরস। এইরূপ চৈতন্যাংশে ঐক্যকে লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যের কথা বলা হইয়াছে।

তুমি আপত্তি করিতে পার, শুদ্ধ চৈতন্যের তো সকল উপাধিই উড়াইয়া দিলে, তবে বিচার করিব কাহাকে লইয়া? কেননা বিচারের পূর্ব্বেও যখন শুদ্ধ চৈতন্য স্বপ্রকাশরূপে স্বয়ং দীপ্ত পাইতেছেন—তখন বিচারের প্রয়োজন? তোমার কথা মানিলাম। কিন্তু তবুও যে শুদ্ধ চৈতন্য স্বপ্রকাশ হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি তো তোমার কল্পনার বস্তু। সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দকে কি তুমি তোমার "তুমি" বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ—তাঁহাকে তোমার স্বরূপ বলিয়া জান কি? নিশ্চয় জান না। সুতরাং তাঁহাকে জানিবার অপেক্ষা যখন রহিয়াছে, তখন বিচারের অপেক্ষাও রহিয়াছে। তাই তাঁহাকে বলা হইতেছে "প্রমেয়" মূলে প্রমেয় অর্থাৎ অবাধিত জ্ঞানের যোগ্য—এই বিশেষণটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই।—

ব্রহ্মবস্তু আর আত্মবস্তু, এই দুইটী বিষয় রহিয়াছে। যদি এই দুইটী বিষয় নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ হইত, তবে তাহাদের লইয়া কেহ বিচার করিতে যাইত না। যাহাকে চিনি না, জানি না—তাহাকে লইয়া কি বিচার করিব? আবার এই দুইটী বিষয় যদি নিতান্ত প্রসিদ্ধও হয়, তবে তাহাদের লইয়া বিচার করা চলে না—কেননা এমন স্থলে বিচারের কোনও সার্থকতা থাকে না। কাজেই বিচার করিতে হইবে তখন, যখন ব্রহ্ম ও আত্মবস্তুকে কোনও একরূপে উদ্দিষ্ট করিয়া যদি তাহাদের ভাবটী যথাযথ নিরূপণ করিতে যাই। এই উপায়ে তাহা করা সম্ভবপর হইতেছে।—

ব্রহ্ম শব্দ বৃদ্ধ্যর্থক বৃংহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ আত্মবান্। ব্রহ্ম বলিতে সাধারণতঃ আমরা এই অর্থই বুঝিয়া থাকি। গত্যর্থক অত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন আত্মা পদে প্রত্যেক জীবে গত বা অনুপ্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মাকেই সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি। এখন যদি এই দুইয়ের ঐক্য বুঝিবার জন্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" —এই মহাবাক্য স্মরণ করি, তাহা হইলে শাব্দবোধদ্বারা দুই বস্তুর মোটামুটী একটা ঐক্য আছে—এই মাত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঐক্য-জ্ঞান কথার কথা মাত্র, ইহাতে দ্বৈত জ্ঞান থাকিয়াই যায়।

আমরা দুইটীকে শুনিয়া এক বলিতেছি—কিন্তু অপরোক্ষভাবে এক বলিয়া অনুভব করিতেছি না। যখন যথার্থ ঐক্যজ্ঞান জন্মিবে, তখন দেখিব, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার হইতে পৃথক, তিনি ইহাদের সাক্ষিস্বরূপ এবং প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন। এই অপরোক্ষ ঐক্যবোধ জন্মাইবার জন্যই বিচারের প্রয়োজন। যে বস্তু সামান্যতঃ যে অর্থে প্রসিদ্ধ, বিচার দ্বারা বিশেষভাবে তাহার অর্থকে অধিগত করাই আমাদের অভিপ্রায়।

শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ

এইরূপ ঐক্যবোধই যে শ্রুতি স্মৃতির তাৎপর্য্য, তাহা নিম্নলিখিত বাক্য হইতে প্রমাণিত হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ—শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—এইখানে আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হইবে এই কথা বলিয়া, শ্রুতি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন,—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এখানে মনন ও নিদিধ্যাসন অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া করিতে হয়। এই জন্য তাহাদিগকে দর্শনরূপ চরম ফলের উপকারক দুইটী অঙ্গ বলা যাইতে পারে। শ্রবণ তাহাদের পূর্ব্ব; উহাতে অপরের অপেক্ষা আছে এবং উহা অনুষ্ঠেয়। শ্রবণ ও মনন দুইটীই বিচারের অঙ্গ।

এই শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ স্মৃতি বলিতেছেন—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো
মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা সততং ধ্যেয়মিতি দর্শনহেতবঃ॥

—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য শ্রুতিবাক্য হইতে আগে শুনিতে হইবে, তারপর অনুকূল তর্ক সহায়ে তাহার মনন করিতে হইবে, মনন করিয়া অর্থ নিশ্চয় হইলে সতত উহা ধ্যান করিতে হইবে। এই হইল ঐক্যদর্শনের হেতু।

একটা আপত্তি হইতে পারে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই যে বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য তাহা কি করিয়া বুঝিব? সাংখ্যকার কপিল প্রকৃতিকেই সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রাধান্যসূচক শ্রুতিবাক্যও খুঁজিলে দুই চারিটা মিলিবে। এইরূপে পরমাণুবাদী বৈশেষিকদর্শনকার কণাদও তাঁহার মতের পরিপোষক শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারেন। অপরাপর দর্শনকারেরাও এই পথ অবলম্বন করিতে পারেন। সুতরাং জীবব্রহ্মের ঐক্যই যে বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য, তাহা স্বীকার করি কি করিয়া?

বেদান্তী এই কথাটী বুঝাইবার জন্য উপক্রমোপসংহার ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ কথা সাধারণ লোকেও স্বীকার করিবে যে, কেহ কোনও একটা বিষয় বুঝাইতে গেলে যেমন গোড়াতে মূল কথা দিয়াই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, তেমনি শেষেও মূল কথা দিয়াই প্রসঙ্গ শেষ করে। মধ্যে অবান্তর অন্যান্য কথা থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ অবান্তর কথাগুলিকেই উক্ত প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না। যে বিষয়ে প্রসঙ্গের সূচনা, সেই বিষয়েই যদি তাহার সমাপ্তি ঘটে, তবে উহাই তাৎপর্য্য। জীবব্রহ্মের ঐক্যসম্বন্ধেও আমরা দেখাইতে পারি, শ্রুতিতে যেমন এই কথা ধরিয়া একটা প্রসঙ্গের উপক্রম হইয়াছে, তেমনি ওই

কথাতেই তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি প্রভৃতির কথা এইরূপ উপক্রম উপসংহার-ন্যায় দ্বারা সমর্থিত হইবে না। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ও প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দুই পাদে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে জীব ব্রহ্মের ঐক্যই যে বেদান্তের বিষয়রূপ দ্বিতীয় অনুবন্ধ তাহা নিরূপিত হইল।

সম্বন্ধানুবন্ধ

সম্বন্ধ হইল তৃতীয় অনুবন্ধ। কিসের সম্বন্ধ?—বিষয়ের সহিত প্রমাণের সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্মের ঐক্য হইল বিষয়। আর তাহার প্রমাণ হইল উপনিষৎ বাক্যসমূহ। এই দুয়ের মাঝে বোধ্য ও বোধকের সম্বন্ধ। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয় বোধ্য, আর উপনিষৎ প্রমাণ সমূহ তাহার বোধক।

এখানে পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন, উপনিষদ্‌বাক্যকে তুমি কি করিয়া ঐক্যের বোধক বল? কিছু বুঝাইতে হইলে শব্দের সাহায্যে বুঝাইতে হয় এবং সে জন্য শব্দের বাচকত্ব ও লক্ষকত্ব দুইটী শক্তি স্বীকার করিতে হয়। তুমি জীবব্রহ্মের ঐক্যকে বলিতেছ বোধ্য; আবার এ কথাও বলিয়াছ, এই ঐক্য সমস্ত ধর্ম্ম বা উপাধির অতীত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শব্দের শক্তি তো সেখানে পৌঁছাইতে পারে না। সুতরাং কি করিয়া উপনিষদ্‌বাক্য ঐক্যের বোধক হইবে?

এই আপত্তির উত্তরে বেদান্তী বলিতেছেন, আচ্ছা, তোমার মনোগত অভিপ্রায়টা কি? জীবব্রহ্মের ঐক্য শব্দবোধ্য নহে—ইহার দুইটী ব্যাখ্যা হইতে পারে। হয় উহা শব্দের বাচ্য নহে, অথবা উহা শব্দের লক্ষ্য নহে। জীবব্রহ্মের ঐক্য যে শব্দ-বাচ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে শব্দদ্বারাই উহা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, ঐক্যের কথা বলিলেই ঐক্যের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়, এমন কথা তো আমরা কোথাও বলি নাই। বরং আমরা ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছি। সুতরাং আমরা যে কথা বলি নাই, তুমি তাহা ধরিয়া আমাদের দোষ দেখাইতেছ। তবে তুমি বলিতে পার, যাহা অসঙ্গ অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের অতীত, তাহাতে শব্দের লক্ষণাশক্তিই বা পৌঁছাইবে কি করিয়া? কিন্তু লক্ষণাসাহায্যে যে কি করিয়া জীবব্রহ্মের ঐক্য বোধগম্য হইতে পারে, তাহা আমরা পরে দেখাইব। (২০)

আত্মশাসন

—*—

একটা অন্যায় করে তার জন্য অনুতাপ হলেই তোমরা মনে কর, অন্যায়ের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করা হল। কিন্তু কতটুকু অনুতাপ তোমরা করতে পার, কেনই বা অনুতাপ কর, তা কি তলিয়ে দেখেছ? অনেক ক্ষেত্রে অনুতাপ দেখা দেয় তখন, যখন অন্যায় ধরা পড়ে যায়। তোমার অন্যায় তুমি যখন করছ, তখন তা গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না, আর যেই অপরের কাছে সেটা প্রকাশ হয়ে গেল, অমনি যদি তা গুরুতর হয়ে উঠে, তবে অমন গুরুত্ববোধের কোনও মূল্যই নেই। আর লোককে মুখ দেখান ভার হবে মনে করে যদি অনুতাপ জন্মে, তবে অমন অনুতাপ হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভাল। ওর চেয়ে যারা অন্যায় করে সমাজের সঙ্গে তাল ঠুকে বেড়ায়, তাদের পৌরুষকেও অন্ততঃ প্রশংসা করব।

কোন্ অনুতাপকে সত্য বলব? অন্যায় করামাত্রই সদ্যঃ সদ্যঃ যে অনুতাপ বুকে তুষের আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তাকেই বলব খাঁটী অনুতাপ। ওই হচ্ছে বিধিদত্ত সাজা। ওতে প্রমাণ হচ্ছে যে, অন্যায়ের গুরুত্ব ঠিক নিরপেক্ষভাবে তুমি বুঝতে পেরেছ, আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করে তোমাকে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হয়নি।

তারপর এ-ও বলি, শুধু কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করেই জীবনটা কাটাতে হবে? আজ মরলেও কি তার ভূতটা পেছনে লেগেই থাকবে? তুমি বলবে, কই, হাজার চেষ্টা করেও তো অনুশোচনার হাত হতে নিস্তার পাই না—ও যে প্রকৃতির আইন। তা হোক, কিন্তু প্রকৃতিরও এ-পিঠ ও-পিঠ আছে—ওপর নীচ আছে। উন্নত প্রকৃতির কাছে নিম্ন প্রকৃতিকে পরাস্ত হতেই হয়—নইলে শুধু প্রকৃতির একটা ধাপ আঁকড়ে পড়ে থাকলে আর কি লাভ হবে? আসলে তোমার মাঝ থেকে অন্যায় দূর করতে হবে, পাপের বংশ নির্ব্বংশ করতে হবে। কিন্তু তার পক্ষে অনুতাপ একটা অন্যতম বিধান বলে ওই একমাত্র বিধান নয়।

অনুতাপ করছ ভালই—চোখের জলে মনের কলুষ ধুয়ে যাক—কিন্তু তার মাঝেও নিজকে জাগিয়ে রাখ্তে হবে। শুধু প্রকৃতির আইন বলে একটা সাজা মেনে নিলেই সেটা সম্পূর্ণ হয় না—তাহলে আবার সেই প্রকৃতির আইনের বলেই ওটা ভুলে যেতেও তোমার বেশীদিন লাগবে না। এমনি করে বার বার অন্যায় করবে, অনুতাপ করবে, আবার তা ভুলে যাবে—তাহলে সংশোধন হবে কবে? তা ছাড়া অনুতাপে যদি চিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কি করে অন্যায়ের সংশোধন হবে, তার কোনও চিন্তা না এসে কেবল বুদ্ধি বিভ্রান্তই হয়ে ওঠে বা শাস্তির বিভীষিকায় প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, তা হলে, যদি কোনও দিক দিয়ে মার্জ্জনার একটা পথ দেখতে পাও, তবে অমনি সমস্তটা প্রাণ ওই দিকে ঝুঁকে পড়বে। নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের পূর্ব্বে যদি অপরাধী ছাড়া পায়, তাহলে সে

কারামোচনটাকে একটা লাভ বলে মনে করে মাত্র—অথচ তাতে তার চরিত্রের কোনও সংশোধন হয় না—তোমারও ঠিক তাই হবে। তুমি নিজের মনের জ্বালা হতে বাঁচবার জন্য ছুটোছুটি করছ তখন—যদি জ্বালা এড়াবার কোনও পথ পাও, তাহলে তো বেঁচেও যাও!

এই জন্যই বলি, অনুতাপ যদি অন্যায়ের স্বাভাবিক শাস্তি হয়, তবে তুমিই তোমাকে সে শাস্তি দাও। অনুতাপ না করে পারছি না, তাই করছি—শুধু এইটুকু হলেই যথেষ্ট হবে না। লোক-জানাজানিতে যে অনুতাপ, তার তো কথাই নাই—নিজের বিবেকের তাড়নাতে যে অনুতাপ উপস্থিত হবে, তাকেও নিজের ন্যায্য পাওনা বলে ভোগ করতে হবে—মনে করতে হবে, "আমি যে কাজ করেছি, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ এই যে গ্লানি উপস্থিত হয়েছে—এ হতে আমি কোনও রকমেই রেহাই পেতে চাই না—আমি পরিপূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে এই শাস্তি ভোগ করতে চাই। এই সাজা যেন মনের মাঝে এমন একটা দাগা দিয়ে যায়, যাতে ভবিষ্যতে কোনও একটা অন্যায় করতে গেলেই এই গ্লানির কথা মনে করে থমকে দাঁড়াতে হয়।"

অন্যায়কারী আমি একটা—আর বিচারক আমি আর একটা—এই পার্থক্য-জ্ঞানটুকু যদি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তবে অনেক দূর এগিয়েছ বলতে হবে। অন্যায় করে প্রায়ই আমরা পরকে বিচারক দাঁড় করাই। যাঁকে বিচারক করছি, তাঁর কাছে যদি সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারি, তা হলে তো কথাই নাই—কেননা তাহলে তো তাঁর বিচারই আমার বিচার হল। কিন্তু যদি তা না পারি, তবে নিজের আমিটাকে শুধু অন্যায়কারীর কোঠায় পুরে রাখলে চলবে না—বিচারক আমাকেই হতে হবে। নিজকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না—একদিকে অন্যায় করব, আর একদিকে অপরকে বিচারক দাঁড় করে নিজের সাফাই গাইতে থাকব—তার চেয়ে নিজেই নির্ম্মম হয়ে নিজের বিচার করব—তবে না আমার সংশোধন হবে।

মোহকে কোনও অবস্থাতেই ভাল বলতে পারি না। তাই শুধু মূঢ়ের মত অনুতাপ ভোগ করলেই যথেষ্ট হবে না। "আমি"কে তার এক প্রান্তে দ্রষ্টার আসনে বসিয়া রাখতেই হবে। তাই বলি, যদি আত্মশুদ্ধির ইচ্ছা থাকে, তবে অনুতাপকে আত্মশাসনরূপে গ্রহণ কর। এ শুধু প্রকৃতির দেওয়া সাজা হবে কেন?—এ সাজা তুমিই তোমাকে দিচ্ছ। কেন দিচ্ছ?—খাদ পুড়িয়ে সোণাকে খাঁটী করবার জন্য। এর পেছনে একটা জ্বলন্ত ইচ্ছার প্রেরণা—একটা সমুজ্জ্বল পরিণাম দৃষ্টি আছেই। তুমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ, কিসের জন্য কি হচ্ছে—কোন কর্ম্মের কি ফল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা দেখে বাসনার হাত হতে ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে যাচ্ছ।

তুমি ভাল কর, কি মন্দ কর—তাতে অপরের লাভ লোকসান হওয়ার চেয়ে তোমার লাভ-লোকসানটাই বেশী হবে। তার একটা প্রমাণ দেখ, তুমি যদি বাস্তবিকই একটা ভাল কাজ কর আর অপরে তাকে মন্দভাবে গ্রহণ করে, তবে তাতে তার বৈষয়িক ক্ষতি হতেও পারে, না-ও হতে পারে; কিন্তু সে সব ঝঞ্ঝাটের দিকে না তাকিয়ে তুমি যদি নিজের প্রতি বিশ্বাসটা অটল রাখতে পার, তবে সে কাজে তোমার

যে ভাল হবে—সে অবধারিত। মন্দ কাজের ফলও তেমনি অপরে বর্ত্তাবে কিনা, সেটা দূরের কথা কিন্তু তোমার উপর যে বর্ত্তাবে—সে নিশ্চয়। কাজেই তোমার ভালমন্দ কাজের জন্য তোমারই ক্ষতি বৃদ্ধি সব চেয়ে বেশী। সুতরাং তোমার লাভ-লোকসান বুঝে তোমাকে শাসন করতে একমাত্র তুমিই পার। আর নিজকে যে সূক্ষ্ম ন্যায়দর্শী বিচারক হয়ে শাসন করতে শিখেছে—পাপ তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না। এই জন্য স্বভাবের বশে শুধু অনুতাপ ভোগ করলেই অন্যায়ের শাস্তি প্রচুর হবে না—তার জন্য আত্মশাসন প্রয়োজন।

—*—

শ্রীনন্দ

—*—
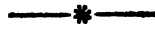
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে—উষার অরুণ-রাগ মুছিয়া গিয়া সবিতার হিরণ কিরণে তরুশীর্ষ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া দেখিলেন—এ কি, নন্দ কোথায়? এই যে কালও তাহারা দেখিয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণের বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র শস্য-গুচ্ছে সোনায় ছাইয়া ছিল, আজ তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! একরাত্রির মাঝে কে এমন করিয়া সমস্ত ধান কাটিয়া আঁটী বাঁধিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে? এ কি একলা মানুষের কাজ? কাল সন্ধ্যায় নন্দ ছাড়া তো আর কেহ এখানে ছিল না। সেই বা আজ কোথায়?

খুঁজিতে খুঁজিতে ক্ষেতের আর এক প্রান্তে সকলে গিয়া দেখিল—কি অপরূপ দৃশ্য!—নন্দ পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, শিথিল হস্ত হইতে কাস্তেখানি খসিয়া পড়িয়াছে—এখনও শরীর হইতে শ্রমজলের চিহ্ন মুছিয়া যায় নাই। কিন্তু চোখে-মুখে এ কি অপূর্ব্ব ভাব! অর্দ্ধনিমীলিত দুইটী নয়নের কোণে শিশিরবিন্দুর মত দুই বিন্দু অশ্রু আসিয়া জমিয়াছে—তাহাতে প্রভাত-কিরণ পড়িয়া হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে—সমস্ত মুখখানিতে একটা আত্মহারা তন্ময়তার দীপ্তি! কে তাঁহাকে দেখিয়া বলিবে, এই কি সেই পারিয়া নন্দ—না সমাধি-আসনে মহাভাবে মগ্ন এ কোন্ যোগিরাজ! নন্দকে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল—কাছে গিয়া কোনও প্রশ্ন করে, এমন সাহসে কাহারও কুলাইল না।

অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, কালিকার রাত্রের ব্যাপার নিশ্চয়ই দেবতার লীলা। যে নন্দকে তিনি এতদিন সামান্য পারিয়া ভৃত্য বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতে-

ছিলেন—তিনি তো সামান্য নহেন—তিনি যে দেবাসুগৃহীত, অসামান্য শক্তিধর মহা-সাধক। তিরুপুন্নুর মন্দিরের পাষাণ-বৃষের স্থানচ্যুতির কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য ভগবানের কি আকুলতা—তাঁহার অলৌকিক মহিমায় কি করিয়া অসম্ভবও সম্ভব হয়—এ সমস্ত কথা তিনি যে পূর্ব্বে না শুনিয়াছেন, তাহা নয়। কিন্তু অবিশ্বাসীর ধর্ম্মই এই, চোখে দেখা ব্যাপারও তাহার স্মরণে থাকে না। অসম্ভব ব্যাপার দেখিলে বা শুনিলে ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে একটা স্তম্ভিত ভাব আসে মাত্র—কিসে যে কি হইল, তাহার সম্যক্ তাৎপর্য্য সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সংসারের আবিলতা আসিয়া আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরে—আর সে যাহা দেখিয়াছিল বা শুনিয়াছিল, প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও তাহার কথা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। ব্রাহ্মণেরও ঠিক এই দশা হইয়াছিল—চোখে দেখিয়াও তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। স্মৃতিহীনতাই অবিশ্বাসের চূড়ান্ত শাস্তি।

কিন্তু আজিকার ব্যাপারে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। পূর্ব্বাপর তাঁহার সমস্ত কথাই স্মরণ হইল—কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা আলোচনা করিয়া ভগবানের ইঙ্গিত যে কোন দিকে লক্ষ্য করিতেছে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, সংসারের পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভক্তির জাহ্নবী ধারা যখন বিশ্বনাথের পানে ছুটিয়া চলে, তখন বালির বাঁধ দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। নন্দকে তাঁহার অভীষ্ট হইতে নিবৃত্ত করিবেন, এমন শক্তি তাঁহার কোথায়? তবে যে তিনি এতদিন বাধা দিয়া আসিয়াছেন, এ-ও সেই বিশ্বম্ভরের ইচ্ছায়। ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য অভক্তকে দিয়া তিনি ভক্তকে পীড়ন করান; তাহাতে ভক্তের ভক্তির দৃঢ়তা জগতের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ তো হয়ই—পীড়নকারী অভক্তও ভক্তের মহিমা দর্শনে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া তরিয়া যায়।

এই সমস্ত কথা ভাবিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া নন্দের পায়ে লুটাইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার স্তব্ধ গম্ভীর ভাব দেখিয়া সে সাহস হইল না। তাঁহার সকল প্রভুত্বের অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—জাতি, কুল, শীল, বিদ্যার বড়াই আর তাঁহার মাঝে নাই তাঁহার সম্মুখে এমন একটা অপরূপ বৃহৎ বস্তু তিনি দেখিতে পাইতেছেন—যাহার কাছে সংসারের সকল গৌরবই তুচ্ছ।

বহুক্ষণ পরে নন্দের ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি যে অপার রসের সায়রে ভাসিতেছিলেন, সেখান হইতে কে যেন তাঁহাকে কূলের দিকে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু তখনও ভাবের ঘোর নয়নে লাগিয়া রহিয়াছে—নন্দ বুঝিতে পারিতেছেন না, তিনি কোথায়, কি করিতে আসিয়াছেন। একবার চক্ষু মেলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেছেন—চোখের সামনে ছায়া-মূর্ত্তির মত জগৎ ভাসিয়া উঠিতেছে, যেন তাহার মাঝে কোথাও বাস্তবতা নাই—সবই যেন কুয়াসায় আবছায়া। আবার তখনই চক্ষু মুদিয়া অনন্ত জ্যোতিঃর সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন। এইরূপে বাহিরে-ভিতরে কয়েকবার আনাগোনা করিয়া পরিশেষে নন্দ সম্পূর্ণ বাহ্য চেতনা ফিরিয়া পাইলেন।

বহির্জ্জগতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দের সমস্ত কথাই স্মরণ হইল। মাঠের দিকে চাহিয়া দেখেন—সকল কাজই শেষ হইয়া গিয়াছে। অদূরে দেখেন, তাঁহার প্রভু ও অন্যান্য সঙ্গীয়েরা সসম্ভ্রম প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া। দেখিয়া আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। নটরাজের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বুকখানা আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, দুই চক্ষু বাহিয়া অজস্র জলধারা বহিতে লাগিল—বিবশ হৃদয়ে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায় প্রভু, প্রস্তরের অন্তস্তলে যে ক্ষুদ্র কীট, সেও তোমার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না—এই অকিঞ্চনকে যে কৃপা করিবে—এ আর আশ্চর্য্য কি? একদিন পরীক্ষার কঠোরতার কথা ভাবিয়া হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তো বুঝিতে পারি নাই—বিপদ ডাকিয়া আনিলে তুমি তো দূরে সরিয়া দাঁড়াও না। তুমি যে দয়াল—তুমি যে দরদীর দরদ বুঝিয়া তাহারই আঁখিজলে আঁখিজল মিশাইয়া কাঁদিয়া আকুল হও। আর অবিশ্বাসী আমরা—বিপদে পড়িয়া তোমাকে দূর ভাবিয়া ডাকিয়া মরি—একবার ভাবিয়া দেখি না, বিপদের মাঝেও যে তুমি বুকে করিয়া রহিয়াছ—বেদনার ভাগ লইতেছ!—তুমি যে আমাকে ডাকিয়াছ, সে কথায় আর তিলেক সন্দেহ করি না—নাহলে অমন করিয়া আমার পথের বাধা সরাইয়া দিবে কে?"

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন—নন্দকে বাহ্য পাইতে দেখিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "প্রভো, তোমার চরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি—এ অধমকে ক্ষমা কর।"

বলিয়াছি, নন্দ দৈন্যের অবতার। আপনার প্রভুকে পদতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া সশঙ্ক হইয়া পিছু হটিয়া গিয়া বলিলেন, "প্রভু, এ কি করিতেছেন। আমি অস্পৃশ্য পারিয়া—এমন করিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছেন কেন? আপনাদের চরণপ্রসাদেই না আমি নটরাজের কৃপা লাভে ধন্য হইয়াছি।"

ব্রাহ্মণ আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আমি অন্ধ—মহা অন্ধ! তোমার মত রত্নকে এতদিন চিনিতে পারি নাই। আজ হইতে আমাদের প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বিপর্য্যয় হইল—এখন তুমিই আমার প্রভু—আমি তোমার দাসানুদাস সেবক মাত্র। মহাকালের পার্ষদ তুমি, আমি তোমার পথরোধ করিব, এমন কি সাধ্য আমার আছে? কিন্তু তবুও এবার যখন তোমাকে চিনিয়াছি, তখন আর তোমাকে সহজে ছাড়িতেছি না। তুমিই যে একা একা আনন্দধামে যাইবে, তাহা হইতেছে না। তুমি আমার গুরু—এ অধমকে তরাইবার ভারও তোমাকে লইতে হইবে।"

নন্দ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "প্রভো, সংসারে আপনার বহু কর্ত্তব্য রহিয়াছে—আপনি উদাসী হইয়া গেলে আপনার সংসার দেখিবে কে?"

ব্রাহ্মণ গদ্গদকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ভাল, তোমার আদেশই আমি শিরোধার্য্য করিলাম। যখন সঙ্গে লইলে না, তখন বুঝিলাম, আমার এখনও কর্ম্ম শেষ হয় নাই। তোমার আদেশেই আমি সংসারে থাকিব, কিন্তু আমি কিরূপে সংসার করিব—আমাকে দয়া করিয়া সেই উপদেশটী দিয়া যাও।"

নন্দ সহসা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "স্ত্রী-পুত্রকে যেমন প্রাণ দিয়া ভালবাস, যেমন প্রাণপণে তাহাদের সেবা কর—তেমনি ভগবানকে ভালবাস, তাঁহার সেবা কর—এই আমার উপদেশ।"

ব্রাহ্মণ মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া বলিলেন, "প্রাণপণে তোমার আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তোমাকে আর কি দেখিতে পাইব না? আবার কবে তুমি এ দাসকে দর্শন দিবে?"

নন্দ আবার তাঁহার সহজ অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া, রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "প্রভো, যে চিদাম্বরমে একবার প্রবেশ করে, সে কি আর ফিরিয়া আসে?" এ কথার তাৎপর্য্য তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই—পরে ইহা প্রকাশ পাইবে।

ব্রাহ্মণ অগত্যা অশ্রুসজল চক্ষে নন্দকে বিদায় দিলেন।

আজ নন্দ পিঞ্জরমুক্ত বনবিহঙ্গের মত স্বাধীনতার আনন্দে ভরপুর। এতদিন সাধনার পর আজ তাঁহার মনসাধ পূর্ণ হইতে চলিল। যে নটরাজের কথা শুনিয়া অবধি তিনি পাগল হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিবেন। এ আনন্দ যে তিনি কোথায় লুকাইয়া রাখিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না।

সূক্ষ্ম তার্কিক এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন, যে নন্দ ভাবের গভীরতায় এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে সর্ব্বত্রই তাঁহার নটরাজকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান, তিনি আবার বিশিষ্ট একস্থানে বিশেষ একটী রূপ দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেন কেন? এ কথার উত্তর ভাবুক দিতে জানেন। স্থূল আর সূক্ষ্মের যে ভেদ, তাহা কাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন? যে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন, স্থূলের মায়া যে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, সেই সাধকই সূক্ষ্মদর্শনের জন্য লালায়িত হইবে, সে জন্য স্থূলকে বর্জ্জন করিতে সে পশ্চাৎপদ হইবে না। আমরা প্রত্যহ স্থূলের উপাসনা করিতেছি, তাই সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রসার করিবার জন্য সূক্ষ্মকে বড় আসন দিই, স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করি। আমরা বলিতে পারি, সূক্ষ্মে যখন পাইলাম, তখন আর স্থূল লইয়া কি করিব?

কিন্তু সত্যের তো স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ নাই—উহা যে অখণ্ড একরস রূপে জগতের সকল অবস্থাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সত্যদর্শী সিদ্ধ দৃষ্টির কাছে স্থূলের মর্য্যাদা আর সূক্ষ্মের মর্য্যাদাতে তারতম্যের কোনও বিচার আসে না। সিদ্ধ ভক্তের কাছে সকলই সত্য—সকলই সুন্দর। নন্দের দেহ, মন, প্রাণ—সমস্তই নটরাজে সমর্পিত। তাই নটরাজকে তিনি যেমন পরিপূর্ণ আবেগে মন দিয়া পাইয়াছেন, তেমনি পরিপূর্ণ আবেগে দেহ-ইন্দ্রিয় দিয়াও পাইতে চাহিতেছেন। তাঁহার মন যেমন প্রিয়তমের সঙ্গ করিয়া তৃপ্তি চাহিতেছে, দেহও তেমনি সার্থকতা খুঁজিতেছে। দুইয়ের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাছে সত্য—দুইয়ের মাঝেই তিনি রসিকের আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন। এই জন্য মনেপ্রাণে বাঞ্ছিতকে পাইয়াও তিনি আকুল হইয়া বলিতেছেন—"তার প্রতি অঙ্গ তরে কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" (ক্রমশঃ)

সেবকের আত্মকথা

বহু সুকৃতিবশতঃ শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয় পাইয়াছি—জানিয়াছি, তাঁহার সেবাই জীবের পরম পুরুষার্থ। তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কি বুঝিয়াছি, আগে তাহাই বলিব।

জগতে দুইটী ধারা—একটী নীচের দিকে নামিয়া ক্রমে জড়ে পরিণত হইতেছে, আর একটী উপরের দিকে উঠিয়া জড় হইতে চৈতন্যময় সত্তায় ফিরিয়া যাইতেছে। দুইটী ধারার মূলে দুইটী শক্তির ক্রিয়া—অবিদ্যাশক্তি ও গুরুশক্তি। অবিদ্যাশক্তিতেই আমাদের সংসার বন্ধন ঘটিতেছে। কিন্তু বন্ধন তো চিরস্থায়ী নয়—তাহা হইলে যে দুঃখের শেষ থাকিত না। যেমন বন্ধন রহিয়াছে, তেমনি বন্ধনমোচনেরও উপায় রহিয়াছে। যে শক্তি ভববন্ধন খণ্ডন করিয়া ঊর্দ্ধদিকে আমাদের ধীকে প্রচোদিত করিতেছে, তাহাই গুরুশক্তি। গুরুশক্তির অধিষ্ঠাতা যিনি, তিনিই জগদ্‌গুরু। তিনি নিত্য সত্য—যুগে যুগে বন্ধনপীড়িতের বন্ধন-মোচন তাঁহার করুণার নিদর্শন।

কিন্তু মুক্তি লাভ করা আর গুরুশক্তি অর্জ্জন করা এক জিনিষ নয়। পরীক্ষায় পাশ করিলেই সকলে শিক্ষকতার যোগ্য হয় না। পাশ-করা পণ্ডিত অনেকেই আছে, কিন্তু অপরকে পাশ করাইতে পারে কয়জন? আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ অনেকেই থাকিতে পারেন, কিন্তু সকলেই গুরুর আসনে বসেন না।

গুরুশক্তি যাঁহার ভিতর ফুটিয়া উঠিবে, তাঁহার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সাধ্য [illegible] নিরালায় ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিয়া তিনি তৃপ্তি পান না—নিখিল মানবের মহামেলায় আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। এই জন্যই বুদ্ধদেব, আচার্য্য শঙ্কর, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতিকে শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও সমাজের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে হইয়াছে। নিজে বিষপান করিয়া জগৎকে তাঁহারা অমৃত বিলাইয়া দিয়াছেন, যুগে যুগে তাঁহাদের প্রেমবিগলিত কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—"যথা আপঃ প্রবতায়ন্তি, যথা মাসা অহর্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণ আযন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—জল যেমন স্বভাবতঃই নিম্নদিকে যায়, মাস যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি, হে ব্রহ্মচারিগণ, তোমরা যে যেখানে আছ—আমার কাছে এস!—আমি তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিব।"

আমারও ছন্দোহারা জীবন যখন সংসারে বিরক্ত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তখন গুরুর এই স্নেহময় আহ্বান বাঁশীর সুরের মত আকুল করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাই তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হৃদয় লুটাইয়া দিয়াছি।

অসৎ হইতে সতের দিকে গুরু আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন—তাঁহার সঙ্কল্পের প্রতিকূল হইবে কে? শুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়াই তিনি তাঁহার কাজ করাইয়া নেন। হীরক এত উজ্জ্বল কেন? সূর্য্যের

আলো যেমন সে আকর্ষণ করিতে পারে, তেমনি আবার ছড়াইয়াও দিতে পারে। আমরাও যদি অন্তরকে হীরকখণ্ডের মত নির্ম্মল ও দৃঢ় করিতে পারি—দেহের আসক্তি, মনের দুর্ব্বলতা, বুদ্ধির জড়তা দূর করিয়া দিতে পারি, তবে গুরুশক্তি আমাদের ভিতর দিয়াও বিচ্ছুরিত হইবে। আমরা তখন হইব তাঁহার "স্বগণ।"

তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া নির্ম্মল হইব—এই তো আমার সাধনা। কিন্তু আবার ভাবি, কিই বা তাঁহাকে সমর্পণ করিব? দেহের দাস আমি, মনের প্রত্যেকটী কামনা আমার কাছে সত্য, মলিন বুদ্ধি অকাজের দিকে টানিয়া লইতেছে—আমার সকল কাজে তো "আমি"ই কর্ত্তা! এই অহমিকার উচ্ছিষ্ট তো তাঁহাকে দিলে চলিবে না।

কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনপথে পা বাড়াইয়াছি। মনে হয়, যেন একটা নূতন জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—এখানে সকলই সুন্দর, আনন্দময়। পূর্ব্বের মত এখন আর সহজ সংস্কারবশে চলি না—পদে পদে বিচার আসে। একদিন প্রয়োজনবশতঃ গভীর রাত্রে একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিতে হইল। চলিতে চলিতে ভয়ে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। ভিতর হইতে অমনি প্রশ্ন জাগিল, কেন ভয়? মরিব বলিয়াই তো? দেহের আসক্তি কি এতই প্রবল যে অজ্ঞাতসারে তাহারই ভাবনা ভাবিতেছি? যেখানে দেহের বিন্দুমাত্র পীড়নের সম্ভাবনা—সেইখানেই সঙ্কোচ, সেইখানেই আতঙ্ক?

জগৎ যাহাতে সুশৃঙ্খল হইয়া চলে, ভগবান্ তাহার জন্য আইন করিয়া দিয়াছেন। মানুষ তাহা জানে। কিন্তু প্রবৃত্তির বশে যে তাহাদিগকে লঙ্ঘন করে, সেই নিজকে পাপী ভাবিয়া সঙ্কুচিত হয়। এই জগতেও তাহার যেমন অশান্তি, পরকালে শাস্তির বিভীষিকাতেও সে তেমনি অস্থির। তাই মৃত্যুভয় তার কাছে বড় ভীষণ। কিন্তু গুরুকৃপায় আমার জীবনে তেমন দুঃসময় তো আসে নাই। তবে মৃত্যুকে ভয় করিব কেন? মৃত্যু যে আমার অমৃতরাজ্যে প্রবেশ করিবার সেতু।

তার পর হইতে এই মিথ্যা সংস্কারকে দূর করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম। রাত্রিকালই ভয়ের সময়, তাই গভীর অন্ধকার রাত্রে বেড়াইতে বাহির হইতাম। যেখানে যেখানে নানা বিভীষিকা দেখিয়া লোক ভয়ে মারা গিয়াছে বলিয়া প্রবাদ, এমন স্থানই আমি বেড়াইতে যাইতাম। এমনি করিয়া ভয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। যেখানেই ভয়ের কোনও কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানেই নিজকে যাচাই করিয়া লইয়াছি। সময় সময় এমন ব্যাপারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি—যেখানে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তখন ভয় দূরের কথা—মৃত্যুর কথা ভাবিয়া আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিত। আমি দেহের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়াছি—যাঁর জিনিষ, তিনিই তাহা আগলাইয়া রাখিতেছেন—তাই বার বার মৃত্যু কাছে আসিয়াও ফিরিয়া যাইতেছে।

আর একদিন, একটী কাজ আমার বিবেকানুযায়ী শুদ্ধ মনেই করিয়াছি—কিন্তু দশজনে তাহার বিপরীত ভাষ্য করিয়া বসিল। ভাষ্যকারীদিগের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। প্রাণে একটা অশান্তি লইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় অন্যমনস্কভাবে একখানা বই খুলিয়া বুদ্ধদেবের একটী

কাহিনী বিবৃত দেখিতে পাইলাম। বুদ্ধদেবের প্রতি আমার ছোটবেলা হইতেই একটা অহেতুক ভালবাসা আছে। তাঁর গভীর মানবপ্রেমের কথা যখনই স্মরণ করি, শ্রদ্ধায় বুক ভরিয়া উঠে। আমি যে কাহিনীটি দেখিতে পাইলাম, তাহা এই—

"দেবদত্ত বুদ্ধদেবের প্রাণনাশের জন্য নানা চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই আশ্চর্য্যভাবে তাহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। অবশেষে একদিন বুদ্ধদেবকে পদদলিত করিবার জন্য দেবদত্ত একটা হাতী চালাইয়া দিল। হাতী আসিতেছে দেখিয়া শিষ্যেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ভগবন্, ওই যে মনুষ্যঘাতক প্রচণ্ড নালাগিরি হস্তী এই পথেই আসিতেছে —প্রভো, সরিয়া যান—সরিয়া যান।' বুদ্ধদেব প্রশান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'আসুক, তোমরা ভয় করিও না।' এই বলিয়া হস্তীর উপর তিনি মৈত্রী ভাবনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনাতে হস্তীর হৃদয় স্পৃষ্ট হইল, সে শুঁড় নামাইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবান্ হস্তীর কুম্ভে দক্ষিণ হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'বৎস, হিংসা ত্যাগ কর—প্রমত্ত হইও না।' হস্তী শুণ্ডদ্বারা বুদ্ধদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকের উপর ছড়াইয়া দিল—দিয়া শান্তভাবে হস্তিশালে ফিরিয়া গেল। সেই হইতে নালাগিরি হস্তী আর কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই।"

গল্পটী পড়িয়া আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া গেল। তাই তো, জগতে কেহই তো ক্রোধের পাত্র নয়, কেহই তো ঘৃণার পাত্র নয়। প্রেম যে আধারে নাই, হিংসা সেখানে শূন্যস্থান পূরণ করিবেই। ভাল মন্দ উভয়কে মানিয়া লইয়া, তাহার অতীত যিনি, সেই ভগবানের দৃষ্টি নিয়াই জগৎকে দেখিতে হইবে। তাঁহার কাছে তো সমস্তই আনন্দ। আমাদের দ্বন্দ্বকোলাহল তাঁহার কাছে শিশুর কাকলি মাত্র।

এই সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে নির্জ্জনে আসিয়া বুদ্ধদেবের প্রেমময় মূর্ত্তির চিন্তা করিতে লাগিলাম। সহসা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে বুক পূরিয়া উঠিল—মনে হইতে লাগিল, এই জগতের প্রতি অণুপরমাণুটীও যেন আমার—আমার! এ তো ভাবুকের প্রলাপ নয়—হৃদয় নিঙড়াইয়া যে এ সত্য লাভ করিয়াছি! কত দিনরাত্র এই ভাবের ঘোরে কাটিয়া গেল। একদিন নির্জ্জনে এই ভাব নিয়া বসিয়া আছি—দুইটা হিংস্র জন্তু আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তাহাদের মাঝে হিংসা কোথায়?—কয়েকবার চোখে চোখে সুগভীর ভালবাসার বিনিময় করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আমি তো অবাক্!

ভাবের আবেশ আর এখন নাই, কিন্তু অহরহঃ অন্তরে তাহার সত্য স্পর্শ অনুভব করিতেছি। তাহার ফলে সংসারের দ্বন্দ্বকোলাহলের মাঝে একটা মন ছেলেখেলা খেলিলেও আর একটা মন সেই আনন্দময় ভাবলোকে চলিয়া যায়।

শ্রীগুরুর কর্ম্মচারী আমি—কর্ম্মের আর কোনও বন্ধন নাই। তবুও সাবধান হইতে হইবে—পরস্পরের মাঝে মতান্তর ঘটুক, কিন্তু মনান্তর যেন না ঘটে, তুচ্ছ বিষয়কে বড় করিয়া বিরোধকে যেন উগ্র করিয়া না তুলি। স্বেচ্ছায় কর্ম্মক্ষম দেহ গ্রহণ করিয়াছি— অনলস কর্ম্মে তাহার সাধ মিটাইয়া দিব; কিন্তু চিত্তকে রাখিব নির্লিপ্ত দ্রষ্টার আসনে।

সেই ভূমি হইতে দেখিব, জগতে ঘৃণা বা হিংসার স্থান নাই—বুঝিব, "আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।"

সমস্ত দ্বৈতবোধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীগুরুর অদ্বৈত একরস সত্তায় যেদিন নিমজ্জিত হইব, সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। একদিন কি বলিতে পারিব না—

"তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন—
জাগ রে সকল দেশ!"

স্বরূপানন্দ-স্মৃতি

—*—

সে আজ প্রায় ৭।৮ বৎসরের কথা। এক দিন তিনি ভাবমুখে আমায় বল্লেন—"তোমাকে আমার জীবনী লিখ্‌তে হবে।" আমি তখন সবেমাত্র ঘর ছেড়ে এসেছি, আশ্রমের ভাব কিছুই পাইনি—তবে পূর্ব্বের জীবন থেকে এ জীবনে একটা সোয়াস্তির ভাব উপলব্ধি করছি। সেটা মহাপুরুষের সঙ্গের প্রভাব। তখন তাঁর ঐ কথার গুরুত্ব বিশেষ করে বুঝিনি।

আজ বাস্তবিকই সে তাগিদ আমার উপরই এসে চেপেছে! তিনি তখন আশ্রমপরিচালক প্রধান সেবক কর্ম্মী; অথচ আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় সকলেরই সেবায় নিয়োজিত। সকলকে আনন্দ দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। কোন একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের—কোন একটা ভাল কাজ করবার অগ্রবর্ত্তী হতে হলে যতখানি অসুবিধা ও উদ্বেগ সইবার প্রয়োজন হয়, তার সবই তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরের আহ্বানে তিনিই প্রথমে সাড়া দিয়েছিলেন—উষার আলোকে প্রথমেই তাঁর চেতনার সঞ্চার হয়েছিল।

"আর্য্যদর্পণের" কাগজ মাথায় করে তখন সাত মাইল পথ অতিক্রম করে প্রায়দিনই সেগুলি ছাপিয়ে আনা-নেওয়া করতে হত। বৃষ্টিবাদলে ভিজে মাথায় মোট করে এক বুক জল পার হয়ে যখন তিনি কার্য্যব্যপদেশে এখানে সেখানে যেতেন, তখন অতিরিক্ত কার্য্যবশে আমাকে কোন কোন দিন সঙ্গে নিতেন। রাস্তায় কেবল অনুভূতির কথা আর অনুভূতির কথা! সে সব বলতে তিনি এতই আগ্রহ প্রকাশ করতেন যে তাঁর কথা শুনা থেকে তাঁর আনন্দোৎফুল্ল সরল প্রাণের ভাবের অভিব্যক্তি উপভোগ করতাম।

কোন কোনও প্রসঙ্গে তাঁর জীবনকথার দু' একটী টীকা টিপ্পনীও থাক্‌তো। সেগুলি

শুনে তখন তার প্রয়োজনীয়তা ততটা উপলব্ধি করিনি, এখন তা করছি; কারণ এখন তা যোড়াতাড়া দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটা কিছু খাড়া করতে পারা যাবে—তা বেশ বুঝতে পারছি।

তিনি বাল্যকালে যূথভ্রষ্ট বৎসের ন্যায় পিতৃ-মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে আকুল প্রাণের ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছেন—কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বুকে টেনে নেয়নি, বরঞ্চ উৎপীড়নের তাড়নায় জর্জ্জরিত করেছে। মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হলেও জগজ্জননীর স্নেহদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হননি। ভগবান তাঁর অভাব আশ্চর্য্যরূপে পূরণ করেছিলেন।

যৌবনকালে আশ্রিতের দায়ে নাকানি-চুবনি খেলেও পরমাশ্রয়ের আশ্রয়ে তাঁর সকল ভার লঘু হয়েছিল।

সারা জীবনটা তাঁর ছিল সাধনা। দুঃখ কষ্টের চাপরে পুড়ে তিনি নিখাদ—খাঁটী হতে পেরেছিলেন। কামনা-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য্য ছিল তাঁর গুরুভক্তি আর অদ্ভুত ছিল তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণতা। গুরুসেবার জন্য মন, প্রাণ, দেহ, বিত্ত ও আপনার বলতে যা কিছু সকলি নিয়োগ করেছিলেন। বিশ্রামহীন কর্ম্মতৎপরতা, সামান্যমাত্র খাদ্যে জীবনধারণ, বিপন্নের সেবা, সমাজে শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর সন্ন্যাসোচিত জীবনকে গৌরবময় করেছে।

তিনি গুরুতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন—আপনার বলে মানুষের যা কিছু থাকতে পারে, সবই তাঁর চরণতলে ঢেলে নিজকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি বলতেন, "ঠাকুর আমার গরল নিয়ে অমৃত দান করেছেন।"

যাও অমৃতের সন্তান সেই অমরবাঞ্ছিত আনন্দলোকে! আমরাও তোমার যাত্রা-পথের অনুবর্ত্তী।

—*—

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সম্বাদ

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ঠিকানা—"নীলাচল কুটীর, স্বর্গদ্বার, পুরী।" তিনি এখন কিছু কাল পুরীতেই অবস্থিতি করিবেন।

—*—

মহোৎসব

আগামী ২৬শে বৈশাখ বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজীর দেহত্যাগ উপলক্ষ্যে মহোৎসব হইবে।

—*—

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

জীবন হবে অনায়াস—স্বচ্ছন্দ। কর্ত্তব্য-বোধ মোটেই থাকবে না। পূর্ণ দমে কাজ করছি—কিন্তু ভিতরে ভিতরে জানছি, আমি কিছুই করছি না—এমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। তবে না শক্তির উন্মেষ হবে। মোট কথা তোমার কাজের চেয়ে তুমি বড়, কাজ তোমার চলার পথে ধূলার মত—এমনিভাবে বীরের মত অনায়াস ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে সংসারে চলতে হবে। বুকটা প্রশস্ত কর—ছোট ছোট কামনা-বাসনায় তাকে কণ্টকিত করে রেখো না। বিদ্রোহীর মত তুমি কামনা করবে কেন? তাঁর কামনাতেই তো এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় চলছে—সেই কামনাই তো তোমারও কামনা—তুমি যে আপ্তকাম, সর্ব্বকাম! অপ্রতিহত বেগে জগৎচক্র ঘুরছে—ঘুরুক; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হচ্ছে না—এইটা অনুভব কর দেখি! লাভ ক্ষতি জয় পরাজয় মান অপমান—এই সব দ্বন্দ্ববাচক বিশেষণের হাত হতে নিজকে নির্ম্মুক্ত করে ফেল। তোমার কাছে একমাত্র সত্য—"অস্তি"—"ভবতি।" আছে—হচ্ছে—এইমাত্র দেখছ, পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে দেখছ—মহাশক্তির মহানন্দময় বিলাস চঞ্চলছন্দে তোমার চোখের সমুখে নৃত্য করছে—এ তো তোমারই বন্ধহীন কামনার নৃত্য। এর মাঝে দুঃখ কোথায়—হাহাকার কোথায়? বুদ্ধি বসে বসে কর্ত্তব্যের ছক আঁকবে—আঁকুক। তার কাজ সে করবে, তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? সে কি তোমার প্রভু, না তুমিই তার প্রভু? তুমি জানছ, তোমার ইচ্ছাতেই সে কর্ত্তব্য-বোধের প্রেরণা পেয়েছে—যেমন করে পারে, সে তার কাজ করুক। তার বোঝা তো তোমার ঘাড়ে সে চাপাতে পারবে না। জগতে অভিনয় হচ্ছে। অপরের দেহ-মনের মত, তোমার দেহ মনও তাঁর একজন অভিনেতা—মহাশক্তি সূত্র ধরে রয়েছেন—তুমি সাক্ষী।—এই সত্য।

*

দিনের পর দিন ক্ষণের পর ক্ষণ বৃথা যাচ্ছে—তার হিসাব না করে সুদূর ভবিষ্যতের পানে তুমি তাকিয়ে আছ—কোন দিন পূর্ণরূপে তাঁর কৃপা পাবে। এ তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা নয় কি? তাঁর সাধনা যে অবিচ্ছেদ হওয়া চাই। এর মাঝে আবেগের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি দেখে হতাশ হয়ো না। দিনের মাঝে একবার মেঘ হয়, আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু ভোর হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, এটুকু বুঝতে কারু বাধে না যে—এটা দিন, রাত্রি নয়। কেননা পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি হলেও আলোকের বিচ্ছেদ তো কোথায়ও হয়নি। তাঁকেও এমনি অবিচ্ছেদে ডাকতে হবে। কখনও বা সে ডাকে আকুলতা থাকবে, কখনও বা থাকবে না—তবু ডাকতে হবে। যেমন একটা নিঃশ্বাস আমাদের ফাঁক যায় না, তেমনি ডাকেও

যেন ফাঁক না যায়। ভবিষ্যতের ভরসা ছেড়ে দাও। বর্ত্তমানের মাঝে যতটুকু পাচ্ছ, ততটুকু তাঁর দান বলে মাথায় তুলে নাও। তোমার ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সঙ্গে মিশে যাক্—প্রত্যেক নিমেষে পরিপূর্ণ পাত্রের আস্বাদ গ্রহণ কর—আর সব ভুলে যাও।

*

অন্তরে সাধনসম্পন্ন হতে হলে বাইরের কাজ কর্ম্মেরও তারই অনুকূলে একটা ব্যবস্থা করতে হয়। অন্তরে যে তাঁর সত্তাকে অনুভব করছি, তার সূচন হবে—বাইরের কাজে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা। ব্যাতব্যস্ততা আর বিশৃঙ্খলতা স্নায়ুমণ্ডলীতে যে উত্তেজনা এনে দেয়—তাতে সাধনেও নিরুদ্যম ও শ্রান্তি আসে। যখন হাতে কোনও কাজ থাকবে না, তখনই ধ্যানে বসে যাবে। সাধকজীবনে এক মুহূর্ত্ত ফাঁক দিলে চলবে না। তোমার সমস্তটা জীবনই তো তাঁর সাধনা। কাজ করছ, কর্ম্ম করছ—তাও তাঁর ভাবে বিভোর হয়ে—আবার নির্জ্জনে এসে একটু বসেছ তাও তাঁর ভাবে বিভোর হয়ে। যখন দেখবে, সজন বিজন একাকার হয়ে গিয়েছে—স্মরণ মননের আর বিরাম নাই, তখনই জানবে, ঠিক পথে পা বাড়িয়েছ।

*

একটু আনন্দ ভিতরে জমতে না জমতেই বাইরে তাকে ছড়িয়ে দিতে যেও না। তুমি যখন সাধক, তখন মনে করতে হবে, এ জগতে তুমি আর তোমার ইষ্টদেবতা ছাড়া আর কেউ নাই। তাঁর সঙ্গে যে তোমার মিলন হয়েছে—তার নিশানা এই আনন্দ, সেখানে আবার ভাগ বসাবার জন্য অপরকে ডেকে আনা কেন? আর ডেকে আনলেই বা কি করে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আর তিনি ছাড়া তৃতীয় বস্তুই যদি থাকবে, তবে আর পূর্ণ মিলন হল কোথায়? তাই সাধনায় একটু আনন্দ পেলেই সে তোমার প্রিয়তমেরই স্বরূপ জেনে বুকের মাঝে আরও নিবিড় করে তাকে ধরে রাখ। বাইরে প্রকাশের চেষ্টাকে স্তম্ভিত করে দাও—দেখবে, বাঁধ-আটকা স্রোতের জলের মত আনন্দ যেন আরও ফুলে ফুলে উঠছে—শেষে সে যেন অসহ্য হয়ে উঠছে। আনন্দের বেগে দেহ মন চূর্ণ হয়ে গেলে, তবে বুঝবে তোমার বঁধু এল।

*

দেশের মাঝে বিপ্লব, সমাজের মাঝে নানারকম অত্যাচার, গৃহে গৃহে ব্যভিচার, তবু এর মাঝেই আবার আঁধার রাতের এক একটী তারার মত—নীরবে আপন আনন্দে বিভোর ফুলটীর মত, অনেক মহাপ্রাণ আপন উদার প্রশান্ত ভাবটী অক্ষুণ্ণ রেখে জগৎকে পরমানন্দ দিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং নিত্যকার জ্বালা জঞ্জালের মাঝেও আপন ভাবের আনন্দ-ধারাটী অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। এটী যেমন তোমার নিজের খোরাক, তেমনি অপরের ন্যায্য দাবী। তুমি কারু কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় বঞ্চিত থাকলেও দেবার দাবী থেকে তোমায় কেউ রেহাই দেবে না। জগতের কাছ থেকে আনন্দ পাও আর না পাও, বিষাদের বিষ ছড়িয়ে দেবার অধিকার কিন্তু পাওনি। তাই জগতের কাছে তোমার দায়িত্ব অনেক। সে তোমার কোন ওজর আপত্তি শুনবে না—তার কাজ সে করেই যাবে, তাতে তুমি খুসী হয়ে সায় দাও আর দুঃখ পেয়ে মুখ বাঁকিয়ে বসে থাক, তাতে লাভ লোকসান অন্যের নয়—তোমারই। এই জেনে বোকার মত চোখের উপর রাগ করে মাটীতে ভাত খেতে যেও না। কারু কাছ থেকে কিছু পেলে না বলে জীবনের সার আনন্দকে ছেড়ে বিষাদকে বুকে তুলে নিও না।

———*———

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } **জ্যৈষ্ঠ** { ২য় সংখ্যা

স জনাস ইন্দ্রঃ

—•—

[ঋগ্বেদ সংহিতা—২।২।১]

যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরম্‌
উতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনং ।
সো অর্য্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি
শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য
যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ ।
যুক্তগ্রাব্‌ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ
সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো
যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ ।
যঃ সূর্য্যং য উষসং জজান
যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে

পরেবর উভয়া অমিত্রাঃ।

সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা

নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

রুদ্ররূপ হেরি তাঁর !—"সে কোথায় ?"—তবু যে জিজ্ঞাসে,
"বৃথা স্তুতি !—নাহি ইন্দ্র !"—মোহে অন্ধ হেন স্পর্দ্ধা ভাষে !
দণ্ডধর হের ; তাঁরে—অরি পুষ্টি—করেন হরণ—
ঢাল শ্রদ্ধা পায়ে তাঁর—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ !

ধনীরে বাড়ান তিনি—নির্ধনেরে করেন করুণা—
কীর্ত্তিগাঁথা-মুখরিত ঋত্বিকের পূরাণ কামনা ;—
পাষাণে পিষিয়া সোম যে তাঁহারে করে আপ্যায়ন,
তারে তুষ্ট নিত্য যিনি—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ !

অলঙ্ঘ্য শাসন যাঁর মেনে চলে স্থাবর জঙ্গম—
রথে, গ্রামে সে শাসন—সে শাসনে ধেনু তুরঙ্গম ;
সে শাসনে ফোটে ঊষা—ফোটে বিশ্বে রবির কিরণ—
সলিলের নেতা যিনি—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ !

অধম উত্তম দুই রিপুসেনা নিয়ে প্রহরণ,
উচ্চারিয়া যাঁর নাম পরস্পরে করে আস্ফালন ;
রণমদে মত্ত তারা—এক-ই রথে করি আরোহণ
দোঁহে মিলি ডাকে যারে—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ !
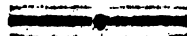
নবীন পথিক

—*—

আজকাল কর্ম্মযোগের যুগ। যোগ হউক আর না হউক, কর্ম্মের দিকে কিন্তু সকলেরই ঝোঁক পড়িয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, ভগবান পাইবার কোন পথটা ভাল?—লোকসঙ্গ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার ধ্যান করিব, এইটাই ভাল, না জগতের কর্ম্মের মাঝে তাঁহাকে পাইব, এইটাই ভাল?—তাহা হইলে অধিকাংশ নবীন পথিক উত্তর দিবেন—"কর্ম্মযোগে তাঁহার সাথে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে"—এইটাই ভাল। আমাদের কিছুতেই আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা বলি—কোনও বিষয়ে গোঁড়ামী করা ভাল নয়। প্রাচীন যুগে সুতীক্ষ্ণ অগস্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তত্ত্বজ্ঞানলাভের কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম না জ্ঞান?" অগস্তি উত্তর করিলেন, "দুইটাই চাই। একটা ডানায় ভর দিয়া পাখী উড়িতে পারে না। তেমনি এই দুইটারও শুধু একটা লইলে চলে না।"

এই কথাটাকে জীবনে বহুরূপে বহুবার প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু বাহির দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার চলে না। কর্ম্মযোগই বল, আর ধ্যানযোগই বল, দেখিতে হইবে, আসল বস্তুর সন্ধান পাইলাম কতটুকু? নহিলে শুধু পথের শ্রেষ্ঠতা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিলে কি হইবে?—পাথেয় চাই, চলিবার শক্তি চাই, গন্তব্য স্থানের প্রতি দৃষ্টি চাই। তুমি প্রবৃত্তিমার্গের জীব, কর্ম্মে প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় বলিয়া তাহার দিকেই হয়ত ঝুঁকিয়া পড়িলে। আবার একজন একটুক জড়-স্বভাব; তাই কর্ম্মের কোলাহল ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই সে শ্রেয়ঃ মনে করিল। কিন্তু উভয়েই কেবল প্রবৃত্তির অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে। বর্ত্তমানে আমি যা আছি, তাই তো আমার চরম পরিণতি নয়। আমাকে আরও আগাইয়া যাইতে হইবে—এখনি পথের মাঝে বসিয়া পড়িলে চলিবে কেন? আর সব রাজ্যে মানুষের বিশ্রামের সময় আছে; তৃপ্তির অধিকার আছে, কেবল এই আধ্যাত্মিক রাজ্যেই কিছু নাই। এখানে যে মনে করিবে, বাস্, এই পর্য্যন্ত—আমার সকলই হইয়া গিয়াছে—সে ঠকিবে। এ পথের শেষ নাই—কেবল চলিতেই হইবে—আনন্দ হইতে গভীরতর আনন্দে—উৎসব হইতে উজ্জ্বলতর উৎসবে!

কিন্তু তবুও মানুষ একটা ইতি চায়। চির জীবনই খুঁজিতে হইবে—এমন কথা একটা বিভীষিকা বটে। খুঁজিতে খুঁজিতে পাইলাম—এমন কল্পনাতে কত তৃপ্তি! তা সত্য কি চিরদিন কেবল খুঁজিবই—পাওয়ার মাঝে কি আর ইতি হইবে না?

হাঁ, ইতি হইবে বই কি! আবার আর একদিক দিয়া ধরিতে গেলে ইতি হইবে না। অভিমানের ইতি হইলেই সব হইল। অহং-বুদ্ধি দিয়া আমরা সবই করি। ভগবানের দিকে চলিতে হইলেও প্রথমতঃ অহংবুদ্ধি

আশ্রয় করিয়াই চলি। তখন চলি পা গণিয়া গণিয়া—কতটুকু পথ রোজ আসিলাম, তাহার হিসাব রাখি, পথের দুই ধারে কি দেখিয়াছি না দেখিয়াছি, তাহা টুকিয়া রাখি। এমনি করিয়া হুঁসিয়ার হইয়া যতদিন চলিবে, ততদিন আর পথের মাঝে কোথায়ও থামিতে দিব না—বলিব, চল, চিরকালই চলিতে হইবে, থামিলে চলিবে না। এই অবস্থায় চলার আর ইতি থাকিবে না। থামিলেই বিপদ। পুকুরে পানা হইয়া জল ঢাকিয়া যায়। মেয়েরা কলসী ভরিতে আসিয়া কলসীর ঢেউ দিয়া পানা সরাইয়া জল পুরিয়া লয়। কিন্তু ঢেউ দেওয়া বন্ধ করিলেই আবার পানাতে আসিয়া জল ঢাকিয়া ফেলিবে। যদি জল চাও, তবে অনবরত পানা সরাইয়া দিতে হইবে—থামিলেই আবার পানাতে আসিয়া ঢাকিয়া যাইবে।

তাই বলি, তোমার হুঁশে অর্থাৎ অভিমানে যতক্ষণ চলিতে হইবে, ততক্ষণ থামিবার নামটাও মুখে আনিও না। কিন্তু শুধু হুঁশে চলা তো নয়, বেহুঁশ হইয়া চলাও আছে। তখন আর আত্মকর্তৃত্ব থাকে না—কে যে টানিয়া লয়, তাহা বুঝিতেও পারি না। এই খানে অভিমানের ইতি। চলিতে চলিতে যেখানে অভিমানের ইতি হইবে, সেই স্থানটাকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে বলে—এই বুঝি অনন্ত কালের জন্য বিশ্রাম। বাস্তবিক সেটা অনন্তকালের বিশ্রাম, কি অনন্তকাল চলা—তাহা বুঝি না। জৈব বুদ্ধির বিচার সেখানে চলে না। তাই লৌকিক দৃষ্টিতে, সেই খানেই ক্ষান্তি। এমন ইতি হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে।

সাধারণতঃ হরিনাম করিতে করিতে ইচ্ছা হয় না। তবু বলিয়া থাকেন, ইচ্ছা হউক, আর না হউক, নাম করিতেই হইবে। শিষ্য যদি ফাঁকিবাজ হয়, তবে দুই দশবার নাম করিয়াই বলিবে, এই তো যথেষ্ট হইল—গুরুর আজ্ঞা তো পালন করিলাম। কিন্তু ফাঁকির ফল গুরু ভোগ করেন না—তাহাকেই করিতে হয়। তবে বুদ্ধিমান শিষ্য বোঝে, যখন জোর করিয়াই নাম করিতে হইতেছে, তখন ভাব থাকুক আর না থাকুক, ছাড়িলে চলিবে না—নাম করিতেই হইবে। নাম করিতে করিতে শেষে নামে পাইয়া বসে—তখন "বদন না ছাড়িতে পারে হরিনাম।" আমরা বলিব, এই তো তাহার নাম করার ইতি হইল। এখন আর তাহার ইচ্ছায় নাম হইতেছে না—নাম হইতেছে নামীর ইচ্ছায়, তখনই সাধনের ইতি। পুকুরের সমস্ত পানা যদি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পার, তবে আর জলে ঢেউ খেলাইয়া পানা সরাইতে হয় না।

তবেই দেখ, যে প্রবর্ত্ত সাধক, তাহার কোনও অবস্থাতেই চুপ করি বসিয়া থাকা চলে না। তার অরক্ষিত দুর্গ, অন্ধকার রাত্রি—কাজেই সব সময় সজাগ থাকিতে হইবে, কি জানি কোন দিক হইতে শত্রুর আক্রমণ হয়। আবার অন্ধকারে শত্রু মিত্রও তো চিনিয়া উঠা দায়। কাজেই খুব হুঁশিয়ার হইয়া পাহারা দেওয়া চাই।

এই তো হইল নিরন্তর সাধনার কথা। এখন প্রশ্ন এই যে, সাধিব কি? অনেক পথই তো দেখিতে পাইতেছি, কোন পথ ধরিয়া চলিব?

সেই কথাই আগে বলিতেছিলাম। যার চিত্তে ইষ্টবস্তুর প্রতি নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, অর্থাৎ নিজের প্রকৃতি বুঝিয়া যে পথ বাছিয়া লইয়াছে, তাহার পক্ষে কোনও ভাবনাই নাই। কিন্তু

বিপদ হয় মধ্যপন্থীদের লইয়া। ইহাদের না এদিক, না ওদিক। তাই দুইদিক বজায় রাখিয়া তাহাদের জন্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি বলবতী, দৃষ্টির প্রসার যতক্ষণ পর্য্যন্ত হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও একটা কিছু লইয়া গোঁড়ামী করিতে নাই। নিজের প্রবৃত্তি ষোল আনা বজায় রহিয়াছে, অথচ আমি নিছক কর্ম্মী, বা নিছক জ্ঞানী —এমন অভিমানে বিপদ আছে। গোঁড়ামী এক বস্তু, আর নিষ্ঠা আর এক বস্তু। গোঁড়া অন্ধ, আর নিষ্ঠাবান বুদ্ধিমান। বুদ্ধি স্থির হইলে পথ চিনিতে পারা যায়। তখন প্রাণ-পণে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিতে হয়। ইহা-কেই বলে নিষ্ঠা।

কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি চঞ্চল, তাহাদের কি উপায় হইবে? তাহাদিগকে সামঞ্জস্যের পথে চলিতে হইবে। দাঁড়ির দুইদিকে দুই পাল্লা, একবার যদি একটা নামে, তবে আর একটা উঠিয়া পড়ে। দুই দিকে ভার সমান না হইলে, ওজন ঠিক হয় না। একটা পাল্লা-তেও ওজন করা চলে না।

আসল কথা, প্রকৃতি অনুযায়ী খোরাক চাই। মিশ্র প্রকৃতির পক্ষে সেই রকম পাঁচমিশালী খোরাকই দরকার। নহিলে এক অঙ্গের পুষ্টি হইবে তো আর এক অঙ্গের পুষ্টি হইবে না। ধর্ম্মের পথে কেবল মাত্র পা দিয়াই, সে তাহার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পার নাই, এমন অবস্থায় যদি কেবল কর্ম্মই করিয়া যাও, তাহার সঙ্গে বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রৎ না রাখ, তাহা হইলে কেবল বহিবাঙ্গুরের দ্বিতীয় সংস্করণ বনিবে মাত্র। আবার যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চ্চা করি-য়াই কাল কাটাইতে চাও, তবে দু'দিনেই অকর্ম্মা জড়ভরত হইয়া যাইবে। কাজেই একদিকে ঝোঁক দেওয়াটাই বিপদ। দুই নৌকায় পা দিয়াই চলিতে হইবে, অথচ শরীরের ভার ঠিক রাখিতে হইবে, যাহাতে পড়িয়া না যাও। তুমি বলিবে, এ তো আচ্ছা বিপদ দেখিতেছি! তা বটে, এ পথ অত সোজা নয়। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

আমাদের দেশে দুইটা কথা চলতি আছে, শিক্ষা আর দীক্ষা। কথায় কথায় দুইটাকে আমরা একত্র জুড়িয়া বলি শিক্ষা-দীক্ষা। কিন্তু দুইটা বিভিন্ন বস্তু। আগে শিক্ষা, তার পর দীক্ষা। আজকালকার ইস্কুল কলে-জেও দেখি, নীচের শ্রেণীগুলিতে অনেক বিষয়ই শিখানো হয়। ছাত্র যতই উপরের দিকে উঠে, ততই বিষয় কমিয়া আসে। শেষে এম্ এ-তে মাত্র একটী বিষয়। এর উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া চিত্তকে প্রশস্ত করা—দৃষ্টিকে উদার করা। আসলে সব বিষয়ের সঙ্গেই সব বিষ-য়ের যোগ আছে। যে রসায়নে এম্ এ দিবে, তাহাকেও নীচের ক্লাসে আঁক কসিতে হই-য়াছে, পদার্থবিদ্যা পড়িতে হইয়াছে, এমন কি ইতিহাস-ভূগোল, সাহিত্য দর্শনও কিছু কিছু পড়িতে হইয়াছে। বড় হইয়া তাহার রুচি গিয়াছে রসায়নের দিকে—কিন্তু ছোট-কালে সে যে অবান্তর বিষয়গুলি পড়িয়াছিল, তাহারা বৃথা যায় নাই। এখন সে দেখে, রসায়নের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে ওগুলোরও প্রয়োজন।

অধ্যাত্ম জগতেও এমনি দুইটা রীতির প্রয়োজন। প্রথমতঃ শিক্ষার সময়ে বহু-বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে—কোন

সামঞ্জস্যের সহিত। তার পর এক বিষয়ে দীক্ষা লইতে হইবে। তখন অনেক কথা যে শিখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া যাইব—কিন্তু শিক্ষার সংস্কার আসিয়া দীক্ষার মন্ত্রকে পুষ্ট করিয়া তুলিবে।

তবে এর মাঝে একটা কথা আছে। বহুমুখী শিক্ষা হইতে হইলে ওস্তাদ শিক্ষকের প্রয়োজন। নহিলে যে সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা কিছুতেই ঘটিবে না—উচ্ছৃঙ্খলতার সব পণ্ড হইয়া যাইবে। আমার রুচি হয়ত আমিই বুঝি না, কেননা জীবনের অভিজ্ঞতা আমার বড় কম। কিন্তু আমার আচার্য্য আমা অপেক্ষা বহুদর্শী, তিনি দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন, বড় হইলে আমি কি হইব। এই বুঝিয়া তিনি আমার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগিবে জানিয়া সকল বিষয়ই বেশ গুছাইয়া তিনি শিখাইবেন; অথচ আমাকে বান্‌চাল হইতেও দিবেন না—আবার গোঁড়া করিয়াও রাখিবেন না! এমনি উদার শিক্ষা হইলে তবে পূর্ণদীক্ষা মিলে।

আজকাল ধর্ম্ম লইয়া বাদ-বিসম্বাদের অন্ত নাই। তার মূলেই হইল এই শিক্ষার অভাব। শিক্ষা না হইতেই দীক্ষার ধূম পড়িয়া যায়, তাহাতে শুধু আচারের অন্ধ অনুবর্ত্তন বা গোঁড়ামীটাই অভ্যস্ত হয়। আবার প্রকৃতি বুঝিয়া সব দিক দেখিয়া শিক্ষা দেয়, এমন আচার্য্যেরও অভাব। শিক্ষার সময় রুচি বয়সে—যখন চিত্তে সংস্কারের দাগ লাগে নাই। কিন্তু এই অবস্থাটাই অনেকের বৃথা কাটিয়া যায়। সমাজে থাকিয়া যুবকেরা কেবল কতকগুলি একচোখা বুলি মাত্র শিখিয়া থাকে। তাহাদের নিজের মাঝেই যে কি শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার কোনও সন্ধান পায় না—অথচ প্রচলিত শিক্ষায় প্রাণের পিপাসাও মিটে না। ঘর ছাড়িয়া ইহারা দলে দলে দীক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়ে বটে—কিন্তু তাহার আগেই কেহ বা কর্ম্মী কেহ বা জ্ঞানী, কেহ বা ভাবুক রূপে পাকিয়া বসিয়া আছে। আপন গোঁ ছাড়াইয়া সত্য বস্তুটী দেখাইবার সুযোগও হয়ত আর তখন নাই। সমাজে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া প্রচারকের সম্মুখে এই এক নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়—শিক্ষার সমস্যা। শিক্ষা খাঁটী না হইলে শুধু দীক্ষায় কি ফল হইবে?

জগতে বহুর লীলা দেখিতে পাইতেছি—ইহা সত্য, ইহার সহিত পরিচয় ঘটাইতে হইবে—ইহাকে শিখিতে হইবে। আবার সেই বহুর অন্তরালে "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—সেই এক বৃক্ষের মত আকাশে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন"—ইহা আরও মর্ম্মান্তিক সত্য। এই মন্ত্রেরই দীক্ষা লইতে হইবে। উদার, সর্ব্বসমঞ্জস শিক্ষা—সেই ভিত্তিতে একের দীক্ষা—এই হইল পথ। আচার্য্য উভয়ত্রই প্রয়োজন।

প্রেমের অধিকার

প্রকৃতির হাত বড় দরাজ—প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ জীব, লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ হেলায় সে নষ্ট করছে। বেশ, তাই হোক্ না। মানও প্রকৃতির মত প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ প্রাণ, অগণিত সম্পদ খেয়াল-খুসীতে উড়িয়ে দিতে পারেন। তারা যাবে কোথায়? যেখানেই থাক না কেন, তারা আমার মাঝেই থাকবে। আমি যখন ভারতে ছিলাম, তখন প্রাচীন ভারতের অতুলসম্পদ আমার বাঁ হাতের মুঠোর মাঝে ছিল। তোমরা বলছ, সে সম্পদের স্রোত বিদেশে বয়ে চলেছে। তাতে কি? আমি জানি, ও কেবল আমার বাঁ হাত থেকে আমার ডানহাতের মুঠোর মাঝে এসেছে। আমিই সাগর—জোয়ার-ভাটা আমার মাঝেই। হিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা পুষে রেখে তোমাদের কল্যাণ নাই। আপন আপন কর্ত্তব্য সবাইকে করে যেতে হবে—প্রেমে। প্রেমে যে জগৎ জয় হয়, ও কেবল ফাঁকা বুলি নয়। কেবল আঁচড়ে কামড়ে এক জায়গায় সব জড় করতে পারলেই দখলী স্বত্ব জন্মে যাবে না। এক টুক্‌রা কর্পূরও তো তুমি মুঠোয় চেপে রেখে বল্‌তে পারবে না—"ওরে, তোকে আমি দখল করেছি—থাক্ তুই এখানে—থাক্—থাক্!" কিন্তু প্রেমে গলে গিয়ে তুমি অনুভব করতে পার, "ওরে জগৎ—তুই আমার—তুই আমার।" আইনের দখল কেবল প্রেমের স্বত্বই জন্মাতে পারে। এ ছাড়া আর যত দখল, সব চুরী-ডাকাতি—ভগবানের আইন ভঙ্গ—স্বার্থপর মানুষ তাতে যতই আইনের দোহাই দিক্ না।

যে দুর্দ্ধর্ষ তৈমুরলঙ্গ নব্বই হাজার নরমুণ্ডের উপর তার পারস্তাধিকারের জয়স্তম্ভ গড়েছিল, হাফিজের উপর তার তলব হল। সে শুনেছিল, হাফিজ তাঁর বিখ্যাত কবিতায় লিখেছেন—"আমার প্রিয়ার মুখে যে কৃষ্ণতিলটী, তার জন্য আমি সমরকন্দ আর বুখারা নগর বখশিস্ করতে পারি।"

তৈমুরলঙ্গ হাফিজকে বল্‌ল, "তুমি কি সেই হাফিজ, যার এতদূর আস্পর্দ্ধা যে তার উপপত্নীর নামে আমার দুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট নগর বিলিয়ে দিতে চায়?" হাফিজ নির্ভীকভাবে উত্তর করলেন, "হাঁ, আমি সেই বটে, এমনি করে সব বিলিয়ে দিতে দিতেই তো আমি ফতুর হয়ে গিয়েছি।"

কিন্তু কবি সত্য কথা বলেননি। কথাটা এই রকম হওয়া উচিত ছিল—"আমি আমার পিয়ারীকে সর্ব্বস্ব দিয়েছি বলে এত বড় সম্পদের অধিকারী হয়েছি যে স্বর্গমর্ত্ত্য তোমাকে বিলিয়ে দিতেও আমার বাধবে না। আর তুমি? অত্যাচারি, রাজ্যের লালসায় তুমি তোমার পা খোঁড়া করেছ, মেজাজটী খোঁড়া করেছ—অথচ এখনও তোমার মরবার মত ভুঁইটুকু পর্য্যন্ত জোটেনি।" মানুষ যত নির্ব্বিবাদে ছাড়তে পারে—তত সে ধনী।

যত কবি, প্রবক্তা, শিল্পবিজ্ঞানের আবিষ্কারক, দর্শনের স্বপ্নে বিভোর যতজন—সবাই প্রেরণা পেয়েছে প্রেম থেকে। কেবল কারু বেলায় প্রেরণার উৎস স্পষ্ট দেখ গিয়েছে, কারু যায়নি। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য,

তুলসীদাস, সেক্সপীয়র, যীশুখৃষ্ট, রামকৃষ্ণ—সবার মাঝে প্রেমের বেদনা যত গভীর হয়েছে, প্রেরণা তত সুস্পষ্ট হয়েছে।

কামগন্ধহীন প্রেম—সে তো আত্মারই জ্যোতিঃ! হায় রে হায়, কত ভীরু প্রবক্তা কোথা হতে যে প্রবচনের প্রেরণা পেয়েছে, তা ভেবে বলতে সাহস করেনি—হয়ত অতটুকু আলোও তারা পায়নি। কি ছিল তাদের প্রেরণার মূল?—প্রেম বা তৎ ত্বম্ অসি—যেখানে দৃষ্টি পড়ছে, সেখানেই তুমি!

গ্রহপিণ্ডের মত মানুষও প্রথমতঃ অসীম উৎসাহে সূর্য্যের দিকে ছুটে চলে। প্রেমের এই প্রকাশে তারা দিব্য প্রেরণায় সঞ্জীবিত প্রবক্তা। কিন্তু কতক্ষণ পরে কেন্দ্রানুগা শক্তির আকর্ষণে, আধ্যাত্মিক ঐক্যতায় তারা সূর্য্য হতে বিমুখ হয়ে কেবল তার চারদিকে ঘুরতে থাকে—সম্প্রদায়ের কক্ষাপথে গোঁড়া হয়ে ঘুরে মরে শুধু। কারু কক্ষাপথ হয়ত সত্যের কেন্দ্র হতে বহু দূরে—কারু বা আরও কাছে। ধর্ম্মরাজ্যে এই সৌরজগতের খেলা দেখতে মাঝের ভারী আমোদ লাগে। কিন্তু পতঙ্গের মত আলোর কাছে (উপ) ছুটে গিয়ে কে সম্পূর্ণরূপে (নি) আত্মবিসর্জ্জন দেবে (সদ্)—তুমি-আমির সকল ভেদ, অধিকারীর সকল দাবী মুছে ফেলে সেই জ্যোতিঃর জ্যোতিঃতে—উপনিষদে—তত্ত্বমসি মহাবাক্যে কে জীবনকে আহুতি দেবে?

সভ্যতার ধুঁইকোঁড় তোমরা, তোমাদের শিল্পবিজ্ঞানের তোয়াজ করতে আমরা কসুর করব না—কিন্তু অত কষ্টে তাদের আমাদের দিকে ঠেলে দিও না। তোমাদের শিল্প-বিজ্ঞান গ্রহ-উপগ্রহের মত প্রেমসূর্য্যের চারদিকেই আবর্ত্তিত হোক।

ভূতত্ত্বে নানা খনিজ দ্রব্য ও প্রস্তরের চর্চ্চা আছে—মানুষ থেকে ওগুলো কত দূরে! উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় খনিজের চেয়ে একটু উঁচু স্তরের জিনিষের আলোচনা আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে কত দূরদূরান্তরের গ্রহনক্ষত্রের কথা রয়েছে। শারীরতত্ত্বে আছে মানুষের হাড়হাড্ডির কথা—বাইরের কঙ্কালটার কথা। মনোবিজ্ঞানে মনের নানা ক্রিয়ার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রেমবিজ্ঞান বলেছে, মানুষ আর প্রকৃতিতে যা সারাৎসার, তারই কথা। এ আবার শিল্পও বটে, বিজ্ঞানও বটে। প্রেম বা ঐক্যবোধরূপ মহাসূর্য্য হতে যে সমস্ত স্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে—তাই হল বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

বেঞ্জামিনের ছেলে যখন ঘুড়ি উড়াচ্ছে, তখন তার পিতা লক্ষ্য করছেন, কি করে ঘুড়ির সূতায় তড়িতের প্রবাহ বইছে। তাঁর শরীর তখন নিষ্পন্দ—শ্বাস বইছে কি না বইছে। যে মাটীর উপর তিনি দাঁড়িয়ে, তা হতে তাঁর পৃথক্ কোনও সত্তা আছে কি? চারদিকে যা কিছু রয়েছে, তার সবার সঙ্গে তিনি একাকার নয় কি? বলতে গেলে, তিনি যেন তখন এক টুকরা পাথরের মত। প্রকৃতির বুকের তালে তালে তাঁর বুক স্পন্দিত হচ্ছে—এমনি করে প্রকৃতির রহস্য তাঁর মাঝে সঞ্চারিত হচ্ছে। প্রমাণ হল, পৃথিবীর বুকে যে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ, তা আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে সমধর্মী। বাইরে যে আলো, সে ভিতরের আলোর সঙ্গেই একাকার।

দুই প্রাণের মাঝে যখন প্রেম বা ঐক্য-বোধের ক্রিয়া হয়, তখন ভেদবুদ্ধি উড়ে যায়। তখন একজনার ভাব আর একজনার মাঝে সঞ্চারিত হয়। একের বুকে যে ঢেউ খেলে, অপরের বুকে তার আঘাত লাগে। তখন সূক্ষ্মদৃষ্টির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়—প্রেমিকের মাঝে তার স্পষ্ট নিদর্শন মিলে।

"যেমন একই সূত্রে নানা মণি গাঁথা, তেমনি আমিই সবার মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।"

তুমি যাকে ভালবাসবে, তাই হবে; ভগবান্‌কে ভালবাসলে ভগবান হবে। মাটীকে ভালবাসলে মাটীই হবে।

আহা, নিজে নিজের বক্ষোরক্ত পান করা—কি সুমধুর, তৃপ্তিভরা, আনন্দময় আস্বাদন! এমন মিষ্টি তো আর কিছুই নয়।

ছোট বড়, ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিৎ—যা কিছু দেখ্‌ছি, প্রেমিকের কাছে তা সেই প্রেমেরই সঙ্কেতলিপি। কি সুন্দর আখর এগুলো—তাদের সবার অর্থই হচ্ছে "আমি।" এ সেই প্রিয়তমেরই ছবি। কত সুন্দর সুন্দর পোষাক—কিন্তু সবই সেই আত্মরূপিণী প্রিয়ার আচ্ছাদন।

ওরে, এ যে সৌন্দর্য্যের পাথার—প্রেমের সাগর! প্রেয়সীর চাঁদপানা মুখ—প্রেমিকের কাছে এ-ও যেমন সুন্দর, তেমনি তার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশপাশ—এও তার কাছে সুন্দর। তেমনি রামের কাছে দিনও সুন্দর, রাতও সুন্দর—মৃত্যুও সুন্দর, জীবনও সুন্দর—রোগও সুন্দর, আরোগ্যও সুন্দর—শত্রুও সুন্দর, মিত্রও সুন্দর।

যার সব চুরী গিয়েছে, তার কি আনন্দ! যার স্ত্রীটী পালিয়ে গিয়েছে—তার কি ভাগ্য; যদি নাকি এক স্ত্রী হারিয়ে সে বিশ্বপ্রিয়ার সন্ধান পায়। মুসলমানেরা বলেন, একবার আব্রাহামের সমুদ্রযাত্রা করবার ইচ্ছা হল। খিজরা এসে তাঁর নৌকার নাবিক হবার প্রার্থনা জানালেন। আব্রাহাম প্রথমতঃ না ভেবে চিন্তেই রাজী হয়েছিলেন; কিন্তু পরে একটু বিচার করে বললেন, "ভাই, আমাকে মাপ কর, মাঝি ছাড়া নৌকায় চড়তেই আমার আনন্দ—প্রেমময় স্বয়ং এসে আমার হাল ধরবেন। তুমি বরুণ, সমুদ্রের রাজা, তুমি যদি আমার মাঝি হও, তবে ভয়ের কোনও কথা নাই বটে; কিন্তু তবু একেবারে নিশ্চিন্ত কি আর হওয়া যায়? অন্ততঃ তোমার ওপর তো তখন নির্ভর করে থাকতে হবে, ভগবানের উপর যে সাক্ষাৎ ভাবে সব ভার ছেড়ে দেন—তা আর হয়ে উঠবে না। তুমি ভগবান আর আমার মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িও না। ভগবানের বুকে মাথা লুটিয়ে দিয়ে যে শান্তি, যে তৃপ্তি—তোমার বুকে মাথা রেখে তা পাব না।"

বিরহী প্রেমিক বলছে, "আকাশের বুক চিরে চমকে ওঠ, বিদ্যুৎ! বজ্র, অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপিয়ে তোল! এসো প্রভঞ্জন, উন-পঞ্চাশৎ মরুতের উন্মত্ত গর্জ্জন নিয়ে!—আমি বলছি, সাধু, সাধু, সাধু! বজ্র, তোমার নির্ঘোষে প্রিয়া আমার মুহূর্ত্তের জন্য চমকে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরেছে!" এ জীবনের পূর্ণপাত্র তিক্ততাও কত মধুর! এই বেদনার দ্রাক্ষা নিপীড়ন করলেই তো ভগবৎ প্রেমের সুধাধারা গলে পড়ে।

পাঠক, কখনও কি নিঃস্বার্থ প্রেমে সব খুইয়েছ তুমি? আত্মহারা হয়েছ কি? না, না—হারা বলছি কেন, আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছ? তা হলে তুমি আমার মনের ভাব বুঝতে পারবে।

প্রেম যেখানে—সেখানে ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই। কঠোর কর্ম্মও মধুময় হয়ে ওঠে—প্রেম যখন তার প্রেরণা জোগায়। স্বার্থপরতা থাকলে অতি-উচ্চপদও শ্রান্তিভরা বিরক্তিতে তিক্ত। তুমি যেখানেই থাক না কেন, প্রেমে তোমার জীবন মধুমাখা হবে। দেহ বাঁচাবার চেষ্টা থেকেই যত দুঃখ, দৈন্য, মনোবেদনা। নরককেও যদি আমি ভালবাসি, তবে তার যন্ত্রণা থাকবে কোথায়? আমাদের যত জালা যন্ত্রণা—সমস্তই সেই প্রিয়তমার নিবিড় আলিঙ্গনে জেগে উঠবার জন্য তাড়না মাত্র। এই যে আঘাত—এ তো তারই দান! প্রেমময় মধুময় হরি তাঁর প্রেম ঢেলে তোমায় জাগিয়ে দিচ্ছেন।

তবে ওঠ—জাগ!*

* স্বামী রামতীর্থ

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ

দুই উপায়ে যে দুঃখ নিবারণ হইতে পারে না, তাহা আমরা দেখিলাম। তাই ক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী আর একটা উপায়ের কথা তুলিবেন। বেদে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি নানা কর্ম্মকলাপের উপদেশ আছে—তাহাদের কোন কোনটা বড় জোর এক বৎসর কাল ধরিয়া করিতে হয়। অবশ্য দীর্ঘসত্রের কথাও বেদে আছে, কিন্তু সে কথা এখানে নাই ধরিলাম। এখন পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য এই, লৌকিক উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি না হইলেও উল্লিখিত বৈদিক উপায়ে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে। শ্রুতিও বলিতেছেন, "স্বর্গ কামো যজেত"—স্বর্গের কামনায় যজ্ঞ করিবে। আচার্য্যেরা স্বর্গের লক্ষণ বলিতেছেন—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

—দুঃখ যাহার সঙ্গে মিশিয়া নাই, যাহা অবিচ্ছিন্ন ও অবিনাশী, ইচ্ছামাত্রই যাহা উপস্থিত হয়, এমন সুখকেই স্বর্গ বলে।

সুতরাং স্বর্গ বিশেষ একপ্রকার সুখ। উহা দুঃখের বিরোধী। এমন কথাও বলিতে পারি, এই স্বর্গরূপ সুখ নিজের শক্তিতে দুঃখকে সমূলে বিনাশ করিতে পারে।

আবার দেখি, স্বর্গসুখের বিনাশও নাই। বেদ একস্থানে বলিতেছেন, "অপাম সোমমমৃতা অভূম—ঋষিরা বলিতেছেন, আমরা

সোম পান করিয়াছি—অমর হইয়াছি।" সোম পান যজ্ঞেই সম্ভব ; যজ্ঞ স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়। সুতরাং ঋষি সোম পান করিয়া অমর হইয়াছেন, ইহাতে বুঝিলাম, তিনি স্বর্গসুখ লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। স্বর্গসুখ যদি নশ্বর হইবে, তবে তাহার প্রাপ্তিতে অমরত্ব লাভ হয় কি করিয়া? সুতরাং বৈদিক উপায়সাধ্য স্বর্গ সুখ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে সক্ষম, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এখন দুঃখনিবৃত্তির বৈদিক উপায় ও সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় (তত্ত্বজ্ঞান)—এই দুইটি পরস্পর তুলনা করিলে দেখিতে পাই—বৈদিক উপায় দ্বারাও ত্রিতাপ দূর হইতে পারে এবং সে সমস্ত উপায় সাধন করিতে এক মুহূর্ত্ত, এক প্রহর, এক অহোরাত্র বা বড় জোর এক বৎসরই লাগিতে পারে। কিন্তু জন্ম জন্ম ধরিয়া কত কষ্ট করিলে তবে বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে বৈদিক উপায়ই তো সুসাধ্য। তবে আর সাংখ্যশাস্ত্রকারের কাছে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে যাইব কেন?

সিদ্ধান্ত কারিকা

এই গেল পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য। সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

> দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ,
> সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ
> তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্,
> ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥

—আনুশ্রবিক উপায়ও দৃষ্ট উপায়ের মত অপর্য্যাপ্ত ; বিশেষতঃ তাহাতে অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয় রহিয়াছে। সুতরাং আনুশ্রবিকের বিপরীত উপায়ই শ্রেয়স্কর, যেহেতু তাহা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞাতার বিবেকজ্ঞান হইতে উৎপন্ন।

বেদের এক নাম অনুশ্রব। কেননা আচার্য্য আবৃত্তি করিয়া যান, আর শিষ্য শুনিয়া তাহা আয়ত্ত করেন, এই জন্য বেদ অনুশ্রব। অথবা বেদ অনাদি কাল হইতে কেবল শোনার উপর চলিয়া আসিতেছে, কেহ তাহা রচনা করে নাই—এই যুক্তিতেও বেদকে অনুশ্রব বলা যায়। অনুশ্রবে অর্থাৎ বেদে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই আনুশ্রবিক। কারিকাকারের উপরিলিখিত উক্তির তাৎপর্য্য এই—দৃষ্ট উপায় যেমন, আনুশ্রবিক উপায়ও তেমন ; দুইটীর একটীকেও দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক উপায় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখানে আনুশ্রবিক কথাটা যদিও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি উহা দ্বারা আচার্য্য শুধু ক্রিয়াকলাপই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহা না হইলে দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে বিবেকজ্ঞানও যে অপর্য্যাপ্ত হইয়া যায়, কেননা উহাও তো আনুশ্রবিক। প্রমাণ স্বরূপ দুইটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া দিতেছি—"আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ প্রকৃতিতো বিবেক্তব্যঃ;" (বৃহদারণ্যক) "ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে" (ছান্দোগ্য)।

বৈদিক উপায় অবিশুদ্ধ

সিদ্ধান্তী আনুশ্রবিক উপায়ে তিনটী ত্রুটী দেখিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন—অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়। প্রথমতঃ অবিশুদ্ধির কথাই বলি।

সোমযাগ প্রভৃতি করিতে হইলে পশুবধ করিতে হয়, শস্য চূর্ণ করিয়া পুরোডাশাদি প্রস্তুত করিতে হয়। উভয় স্থলেই যজমানকে প্রাণ হিংসার পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহাই অবিশুদ্ধি। এই সমস্ত যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন—"উহা স্বল্পসঙ্কর, সপরিহার ও সপ্রত্যবমর্ষ।" আচার্য্যের এই সংক্ষিপ্ত উক্তির তাৎপর্য্য এই—

মনে কর, তুমি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিলে। যজ্ঞের অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর অংশ আছে এবং প্রত্যেক অংশের ভিন্ন ভিন্ন ফলও আছে। সমস্ত ফলগুলি জড়াইয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল। উহার পারিভাষিক নাম হইল—প্রধান অপূর্ব্ব। [যজ্ঞের ফলকে অপূর্ব্ব বলার একটা তাৎপর্য্য আছে। যজ্ঞ স্বর্গের সাধক; কিন্তু কি করিয়া সাধক, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেননা, অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া আমরা এখানে কার্য্য-কারণের ধারা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না। লৌকিক যজ্ঞ হইতে অলৌকিক স্বর্গে পৌঁছিবার জন্যই মাঝখানে এই অপূর্ব্বের কল্পনা। উহা যজ্ঞের ফলস্বরূপ অদৃষ্ট শক্তিবিশেষ। যজ্ঞের প্রত্যেক কর্ম্মেরই এইরূপ অপূর্ব্ব আছে। আবার সমষ্টি যজ্ঞেরও একটা অপূর্ব্ব আছে।] জ্যোতিষ্টোমাদি হইতে উৎপন্ন প্রধানাপূর্ব্ববশতঃ যজমানের স্বর্গ লাভ হইবে। কিন্তু যজ্ঞে পশু হিংসা দ্বারা যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছে, উহার ফলে যে অনর্থ উপস্থিত হইবে, তাহা স্বর্গফলের সঙ্গে মিশ্রিত হইবে। তবে এই শেষোক্ত অপূর্ব্ব তত প্রবল হইবে না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য প্রাণিবধের অপূর্ব্বকে স্বল্পসঙ্কর বলিয়াছেন।

আবার আচার্য্য একথাও বলিতেছেন, পশুহিংসার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহার অনর্থ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। সুতরাং উহা "সুপরিহার" বটে।

কিন্তু যদি ভ্রমবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহা হইলে প্রধান কর্ম্মের ফল যখন ফলিবে, উপরি উক্ত প্রাণিহিংসার অনর্থও তখন ফলিবে। তখন যজমানকে স্বর্গসুখের সহিত এই অনর্থের দুঃখও সহিয়া থাকিতে হইবে। তখন তাঁহার কেমন অবস্থা হইবে? —প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গসুখরূপ সুধা-হ্রদে যেন তিনি তখন অবগাহন করিতেছেন—তবে প্রাণিহিংসা-রূপ সামান্য পাপ করিয়াছেন বলিয়া দুঃখের দুই একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গও আসিয়া গায়ে পড়িতেছে। এইটুকু কি আর সহিয়া থাকা যায় না?—তাই আচার্য্য হিংসার ফলকে "সপ্রত্যবমর্ষ" বা সহিষ্ণুতা যুক্ত বলিলেন।

যাজ্ঞিক হিংসাও অনর্থের হেতু

আর একটা কথা। বেদে আছে—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি—কেনও প্রাণীকেই হিংসা করিবে না।" এটা একটা সাধারণ বিধি। আবার যজ্ঞপ্রসঙ্গে আছে—"অগ্নি-ষোমীয়ং পশুমালভেত—অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবধ করিবে।" এটা একটা বিশেষ বিধি। পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন, বিশেষ বিধানের বলে সাধারণ বিধান উল্টাইয়া যায় না। সুতরাং পশুবধের বিধানই বলবৎ; উহা বেদের বিধি; তবে আমার অনর্থ ঘটিবে কেন?

কিন্তু এমন কথা বলা চলে না। কেননা উভয় বিধির মাঝে এখানে কোথাও বিরোধ নাই; বিরোধ থাকিলে তবে না বলবান বিধি দ্বারা দুর্ব্বল বিধি বাধিত হইবে। দুইটী বিধিতে বিরোধ নাই এই জন্য যে, উহাদের বিষয়ই

ভিন্ন। বেদ যখন "মা হিংস্যাৎ" বলিয়া হিংসা নিষেধ করিলেন, তখন হিংসা করিলে যে অনর্থ উৎপন্ন হইবে, ইহাই জানাইয়া দিলেন; যজ্ঞের বেলায় যে এই নিয়ম খাটিবে না, এমন কথা তো বলিলেন না। আবার যখন বলিলেন, "অগ্নীষোমীয় পশু বধ কর"—তখন যজ্ঞের জন্য পশুবধ করিতে আদেশ দিলেন সত্য, কিন্তু উহা যে অনর্থের হেতু হইবে না, এমন কথা তো বলিলেন না। যদি বেদবাক্যে তাহাই বুঝাইত, তবে বেদ একটা কথা বলিয়া দুইটা তাৎপর্য্য বুঝাইবার দোষে দোষী হইতেন—বেদবিধিতে বাক্যভেদ উপস্থিত হইত। একই প্রাণিহিংসা যে অনর্থের হেতু হইবে, আবার যজ্ঞের উপকারক হইবে—ইহার মাঝে তো বিরোধের কোনও কথা নাই। হিংসাতে যজমানের অনিষ্ট হইবে, কিন্তু যজ্ঞের ইষ্টই হইবে।

বৈদিক কর্ম্মের ফল ক্ষয়াতিশয়যুক্ত

বৈদিক কর্ম্মের একটী দোষ দেখান হইল। আর দুইটী দোষ ক্ষয় এবং অতিশয়। যদিও এই দুইটী দোষ ফলসম্বন্ধী, তথাপি উপায়ে তাহাদিগকে উপচরিত করা হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মের ফল স্বর্গ যে ক্ষয়শীল, ইহা অনুমিত হইতে পারে, কারণ উহার সত্তা থাকিলেও উহা কার্য্য। যাহা কার্য্য, তাহা উৎপত্তি, বিকার, আপ্তি অথবা সংস্কাররূপ পরিণামবিশিষ্ট সুতরাং অনিত্য। এইরূপে স্বর্গাদিও অনিত্য। ইহাই কর্ম্মের ক্ষয় দোষ।

আবার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে কেবলমাত্র স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু বাজপেয় যজ্ঞে স্বারাজ্য লাভ হয়; সুতরাং বাজপেয় জ্যোতিষ্টোম হইতে বড়। যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়াছে, সে বাজপেয়-যজ্ঞকারীর সম্পদ্ দেখিয়া ব্যথিত হইবে, কেননা যে শ্রীহীন, সে পরের শ্রী দেখিয়া দুঃখ পায়, ইহা স্বাভাবিক। ইহাই বৈদিককর্ম্মের "অতিশয়" দোষ।

কর্ম্মজন্য অমরত্ব আপেক্ষিক

"সোমপান করিয়াছি—অমর হইয়াছি"—এই কথায় যে অমরত্বের উল্লেখ রহিয়াছে, উহা দীর্ঘকাল স্থিতি মাত্র বুঝায়। আচার্য্যেরা বলেন, "এক ব্রহ্মাণ্ডের লয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে।" এই জন্যই বেদ বলিতেছেন—

> ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
> ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।
> পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
> বিভ্রাজতে যদ্যতয়ো বিশন্তি॥

—কর্ম্মদ্বারা, পুত্রোৎপাদন দ্বারা বা বিত্তোপার্জ্জন দ্বারা অমর হওয়া যায় না। ঋষিরা একমাত্র ত্যাগদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরমতত্ত্বের সহিত সুখ গুহাতে নিহিত থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছে, একমাত্র যতিরাই তাহাকে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

> কর্ম্মণা মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ
> প্রজাবন্তো দ্রবিণমীহমানাঃ।
> তথাপরে ঋষয়ো যে মনীষিণঃ
> পরং কর্ম্মভ্যো অমৃতত্বমানশুঃ॥

—যে সমস্ত ঋষিরা পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন, ধনোপার্জ্জনে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা কেবল মৃত্যুই লাভ করিয়াছেন। আর যে সমস্ত মনীষী ঋষিরা কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির উপায়

এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়াই কারিকাকার বলিতেছেন, "ইহার বিপরীতই শ্রেয়স্কর; কেননা উহা ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞাতার বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন।" এ কথার তাৎপর্য্য এই—যজ্ঞপ্রভৃতি হইল দুঃখনিবৃত্তির আনুশ্রবিক বা বৈদিক উপায়; উহা অবিশুদ্ধ, অনিত্য ও ফলের তারতম্যবিশিষ্ট। আর ইহার বিপরীত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বিশুদ্ধ—কেননা তাহাতে হিংসাদি পাপের সংস্পর্শ নাই, তাহার ফলও শাশ্বত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রুতিই বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

তত্ত্বজ্ঞান হইতে দুঃখ ধ্বংস হয়, সুতরাং দুঃখধ্বংসও কার্য্য বলিয়া অনিত্য—পূর্ব্বপক্ষী এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্য যদি ভাবাত্মক হয়, তাহা হইলেই এই নিয়ম খাটে। প্রকৃতস্থলে দুঃখনিবৃত্তিরূপ কার্য্য অভাবাত্মক, সুতরাং উহার সম্বন্ধে অনিত্যতার আপত্তি খাটিতে পারে না। বলিতে পার, যে দুঃখ একবার ধ্বংস হইল, তাহা চিরদিনের জন্য গেল, ইহা না হয় মানিলাম; কিন্তু সেইরকমই অপর দুঃখও তো আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাই বা হইবে কি করিয়া? কারণের যদি প্রবৃত্তি না থাকে, তবে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই দুঃখের কারণ প্রবর্ত্তমান থাকে। সুতরাং বিবেকজ্ঞান হইলে দুঃখ চিরদিনের জন্য দূর হইয়া যাইবে। এ সমস্ত কথা আমরা পরে আরও বিস্তার করিয়া বলিব।

কারিকাকারের উক্তির আক্ষরিক অর্থ এই—বৈদিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইতে সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানরূপ উপলব্ধি সম্পূর্ণ পৃথক এবং উহাই শ্রেয়স্কর। অবশ্য যজ্ঞাদি বেদবিহিত বলিয়া ও কিয়ৎপরিমাণে দুঃখনিবৃত্তিকর বলিয়া উৎকৃষ্ট উপায়রূপে গণ্য হইতে পারে বটে। সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানও সেইরূপ একটী উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এই দুইটী উৎকৃষ্ট উপায়ের মধ্যে সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

সত্ত্ব ও পুরুষের পার্থক্য-প্রত্যয় কি করিয়া হয়?—"ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞাতার বিবেকজ্ঞান হইতে।" মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত সমস্তই ব্যক্ত এবং প্রকৃতি অব্যক্ত; পুরুষ জ্ঞাতা। ব্যক্তকে জানিলে তাহার কারণ অব্যক্তকে জানা যায়। আবার ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই অচেতন বলিয়া কোনও চেতনের অপেক্ষা রাখে, সুতরাং তাহারা পরার্থে প্রবৃত্ত। আত্মাই পর। এইরূপে ক্রমানুসারে জ্ঞান হইয়া থাকে।

তাহা হইলে মোট কথা হইল—শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ হইতে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও আত্মতত্ত্বের কথা বিবেক সহকারে শুনিয়া শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর আদর ও সৎকার সহকারে তত্ত্বসমূহ ভাবনা করিলে তাহাদের বিবেকজ্ঞান হইবে। আচার্য্যও অন্যত্র বলিয়াছেন—

"এইরূপ তত্ত্ব অভ্যাস করিলে আমি-আমার বোধ নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়। তখন যে বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার আর বিপর্য্যয় হয় না।" (২)

শিক্ষার লক্ষ্য

—•—

প্রাচীন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল—নিবৃত্তি। এই জন্যই তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থাতে নিয়ম-সংযমের খুবই কড়াকড়ি ছিল। আজকাল আমরা একটু বিলাসী হয়ে পড়েছি। শুধু ত্যাগের বুলিতে আর মুখে রুচি হয় না। তাই তার সঙ্গে একটু ভোগের রসান থাকা চাই। ভোগের কথাটা যদি ভাবের আবরুতে ঢাকতে পারা যায়, তা হলে আরও নিরাপদ। তাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতা বলবেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে—অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। কথাটাতে মন্দ কিছুই নাই; এ ও যে মানবজাতির সার্ব্ব-ভৌম আদর্শ হবার যোগ্য, তাতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু এর মাঝে একটু ভাবের ঘোর লেগে আছে বলেই ভয়, কে তার কেমন অর্থ করবেন। সন্ধ্যার আবছায়াতে "স্থাণু না পুরুষ"—এ ভ্রম পণ্ডিতেরও হয়ে থাকে। তাই এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে কেউ যে প্রবৃত্তির পথ প্রশস্ত করবেন না, এমন কথা বলতে পারি না।

একটু ভাবলেই বুঝি নিবৃত্তির অর্থও যা, অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের অর্থও তা। এর মাঝে একটা উপায়কে প্রকাশ করছে, আর একটা প্রকাশ করছে ফলকে। যদি বলি, নিবৃত্তি অবলম্বন করলেই অন্তরের শক্তি ফুটবে, তা হলে সব গোল মিটে যায়, প্রাচীনে নবীনে দ্বন্দ্ব থাকে না। কিন্তু নবীন বোধ হয় এ কথায় সহজে রাজী হবেন না। কেননা ওই নিবৃত্তি কথাটা বড় শুষ্ক, আকাঠার মত—ওর অর্থটা এত স্পষ্ট যে, ওকে ভাবের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা যায় না। কিন্তু "অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ" কথাটার মাঝে অনেকখানি রস আছে—কেননা ওটা ভাবরাজ্যের বস্তু, ওর বাস্তবতা কতটুকু, তার হিসাব আমরা কোনও দিন করি না। শক্তির বিকাশ তো আমরা অহরহঃই দেখছি। মানুষ কি না করছে? শিল্প বিজ্ঞান-কলাতে তার দিন দিন কত উন্নতিই না হচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে মানুষের শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয়। এ পরিচয় এ জন্মে, এ জগতেই পাচ্ছি। সুতরাং অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ বলতে যদি ঐহিকের পুষ্টি বুঝি, তাতে তো নিতান্ত দোষ হবে না।

নবীন আরও বলবেন, এর মাঝে যদি কেউ আমাদের ভোগলোলুপতার অপবাদ দেয়, তবে তারও ক্ষালনের উপায় আছে। আমরা বলতে পারব, অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, বাইরে তার যতটুকু বিকাশ দেখছি, ততটুকুকেই আমরা শ্রেয়ঃ বলে স্বীকার করছি। কিন্তু তা বলে এ শক্তি যে আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত, এমন কথাও তো আমরা বলছি না। তবে কিনা আধ্যাত্মিকতার মহিমার চেয়ে আধিভৌতিকতার মহিমা যে সুপ্রত্যক্ষ, আমরা সেই কথাই বলছি। আধ্যাত্মিকতার বনিয়াদের উপর আমরা আধিভৌতিকতার মন্দির গড়ব। সর্ব্বত্রই বনিয়াদ যেমন চোখের

আড়ালে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হবে—আধ্যাত্মিকতা অলক্ষ্য থেকে আমাদের শক্তি সঞ্চার করবে, কিন্তু চর্চ্চাটা আমরা আধিভৌতিকতারই করব।

নবীন যুগের এই সমস্ত যুক্তির মাঝে যে দুর্ব্বলতা কোথায়, তা প্রাচীনপন্থীর দীর্ঘদর্শী চোখে সহজেই ধরা পড়ে। স্পষ্টই দেখা যায়, ঐহিকের ভোগ আমাদের মুগ্ধ ও লুব্ধ করছে, অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমরা প্রাচীনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়তেও পারছি না, কেননা ভারতের আর সব গেছে, এখনও কেবল আধ্যাত্মিকতার সুনামটা বজায় আছে মাত্র—অন্ততঃ নিজের কাছে। সুতরাং ভোগের শিক্ষা প্রচলন করাই সঙ্গত বটে, তবে তার উপর এক পোঁছ আধ্যাত্মিকতা থাকা চাই। "শিক্ষা অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ"—সূত্রের এই হল নবীন ভাষ্য।

এখন প্রাচীনের পক্ষ ধরে আমরা দুটো কথা বলতে চাই। প্রাচীন যে বলেছেন, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—নিবৃত্তিকেই শিক্ষার লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ দেশে প্রচার করেছিলেন, তার মাঝে কোথাও অস্পষ্টতা কিছু নাই। তাঁরাও বলেছেন, অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশই প্রয়োজন। কিন্তু তার পথ কি? শক্তির যদি স্বরূপ না দেখতে পাই, তবে কি করে পথ-নির্ব্বাচন করব? শক্তির অনন্ত রূপ—তার কোন্ রূপ যে শাশ্বত, তা কি করে চিনব? ফল কথা, মানুষের শক্তির সীমা কত দূর, তা বুঝে তবে তার পথ নির্দ্দেশ করতে হবে। যদি বুঝে থাকি, জড়রাজ্যের উপর আধিপত্য করাই মনুষ্যশক্তির চরম বিকাশ, তবে তাকে লক্ষ্য করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি দেখি, একটা জীবনের মাঝে মানুষ যতটুকু করতে পারে, ততটুকুতেই তার শক্তির সীমা, তবে এই জীবনটাকেই যাতে সকল রকমে শোভন ও উপাদেয় করা যেতে পারে, তার উপযোগী শিক্ষাই প্রচার করতে হবে।

কিন্তু এই জায়গাতেই প্রাচীনেরা একটা নূতন রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁরা দেখলেন, এই যে স্থূলতঃ প্রত্যক্ষ জড় জগৎ, শুধু এর উপর আধিপত্যই তো মনুষ্যশক্তির চরম সীমা নয়; বা এই একটা জীবনের মাঝেই তো মানুষ চরম পরিণতি লাভ করছে না। মানুষ শুধু জড় জগৎ কেন, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ, অধ্যাত্মজগতের উপর পর্য্যন্ত আধিপত্য করতে পারে—সে যেমন বলতে পারে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্", তেমনি আবার এমনও বলতে পারে—"অহং ব্রহ্মাস্মি!" এই মহাসত্যের বিকাশ তার মাঝে হবে। তার জন্য শুধু একটা জীবনই পর্য্যাপ্ত নয়। এই বৃহৎ ভাব ধারণা করবার জন্য যে অভ্যাসের প্রয়োজন, তার উপযোগী অবকাশও তাকে দিতে হবে। তাই তার জীবন জন্ম-জন্মান্তরে ব্যাপ্ত।

এমনি উদার আদর্শ যদি চোখের সামনে জাগে, শুধু কল্পনায় নয়, এ আদর্শ প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য যদি কারু হয়, তবে সে কি ছোট জিনিষে কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে? যে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্য নিজকে এমনি বিরাটভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর প্রাণ জগৎকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। জগৎ যদি ক্ষুদ্র প্রাকৃত আলোচনায়, ক্ষুদ্র বাসনা-কামনায় তৃপ্ত হয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে, তবে তিনি আকুল ভাবনায় উদাত্তকণ্ঠে তাদের ডেকে বলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

তখন তাঁর চক্ষে শিক্ষার কোন আদর্শ জেগে উঠবে? তিনি দেখবেন—মানুষের অন্তরে ব্রহ্মশক্তি নিহিত রয়েছে—তার বিকাশই পরম পুরুষার্থ; তার পথ—নিবৃত্তি; ভূমৈব সুখং—নাল্পে সুখমস্তি। সুতরাং নিবৃত্তিই শিক্ষার নিয়ামক।

বেদান্তসার

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—অনুবন্ধচতুষ্টয়]

প্রয়োজনানুবন্ধ

এখন চরম অনুবন্ধ প্রয়োজনের কথা। বেদান্ততত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন কি ইহাই বিচার্য্য। মূলে এই অনুবন্ধ সম্বন্ধে বলা হইতেছে—"প্রয়োজনং তু তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ স্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ।" অর্থাৎ উপরি উক্ত জীবব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয় সম্বন্ধে আমাদের যে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি এবং স্বরূপানন্দ লাভই বেদান্তশাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। এক কথায় বলিতে গেলে মোক্ষই বেদান্ত জ্ঞানের লক্ষ্য। অজ্ঞান নিবৃত্তি ও স্বরূপানন্দ লাভ মোক্ষেরই নামান্তর। বিভিন্ন দর্শনে এই মোক্ষের স্বরূপ বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তপ্রতিপাদিত মোক্ষের লক্ষণ সমস্ত মতের সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত দর্শনের মত আলোচনা করিয়া বেদান্তমতের প্রামাণ্য স্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উপরি-উক্ত মোক্ষ-লক্ষণটি পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা দুইটী মতের মাত্র সামান্যতঃ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে আমরা দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছি—প্রথমতঃ দুঃখনিবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ আনন্দলাভ। অবশ্য মোক্ষ অদ্বয় একরস বস্তু। একই নিত্য সত্য বস্তুকে আমরা ইহজগতের নানা ভূমি হইতে দেখি বলিয়া তাহার নানারূপ লক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু অরসমূহ যেমন নাভিতেই সমর্পিত হয়, সেইরূপ সমস্ত লক্ষণ একই সত্তাকে প্রকাশ করিতেছে। তবে দৃষ্টির প্রসার ও সঙ্কীর্ণতা বশতঃ কাহারও লক্ষণ বস্তুকে সমধিক পরিস্ফুট করিতেছে, কাহারও বা করিতেছে না—এই মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত মোক্ষের লক্ষণে জগতের দুইটী অবস্থা সূচিত হইতেছে—প্রথমতঃ দুঃখের প্রতি বিতৃষ্ণা, দ্বিতীয়তঃ আনন্দ লাভের

প্রচেষ্টা। মূলে দুইটী একই বস্তু. কিন্তু তথাপি সাংসারিক পরিস্থিতি অনুসারে মানুষ এক এক সময়ে উহাদের এক একটী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, সে তাহা হইতে অব্যাহতি চাহে। আবার যে সামান্যতঃ সুখ পাইয়াছে. সে আরও সুখের জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা উভয়ে একটি বস্তুই চাহিতেছে, কেবল দৃষ্টি প্রসারিত নহে বলিয়া পরস্পরে লক্ষ্যকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করিতেছে মাত্র।

দার্শনিকদিগের মধ্যেও এইরূপে পরম-পুরুষার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সকল দার্শনিকই নিঃশ্রেয়স চাহেন। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ যাহা হইতে জীবের আর শ্রেয়ঃ কিছুই হইতে পারে না—উহা পরম পুরুষার্থ। কিন্তু জগৎকে যিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন, কিম্বা আত্মস্বরূপকে যিনি যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তিনি নিঃশ্রেয়স বলিতে তদনুযায়ী আদর্শই বুঝিয়াছেন এবং সেইরূপ উপায়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ এমন কথা বলেন নাই যে, আমরা দুঃখ চাই—আনন্দ চাই না, দুঃখই আমাদের পরমপুরুষার্থ। হয় দুঃখনিবৃত্তি, না হয় সুখলাভ—ইহা সকলেরই প্রার্থিত। এই কথা স্বীকার করিয়া আমরা বেদান্ত-প্রতিপাদিত নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ—বৈদান্তিক এই দুইটীকে জড়াইয়া মোক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক ও ভট্টমতাবলম্বী মীমাংসক ইহার এক একটীকে মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সামান্যতঃ এই দুইটী মতের আলোচনা করিয়া উহা হইতে বেদান্তমতের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিব। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে মতের কোনও অনৈক্য নাই। উত্তরকালে উভয় দর্শন পরস্পর মিশিয়া গিয়াছিল—সুতরাং আমরা সেই ভাবেই উহাদের আলোচনা করিব।

গৌতম ন্যায়সূত্রে বলিতেছেন—"দুঃখ-জন্ম প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই —দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু দুঃখ দূর হইবে কি করিয়া? জন্মিলেই দুঃখ আছে, সুতরাং জন্মপ্রবাহ রোধ না করিলে দুঃখ দূর হইবে না। জন্মপ্রবাহ রোধ হয় কি করিয়া? ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টশক্তির প্রেরণাবশতঃই জন্ম হইয়া থাকে—উহাই কর্ম্ম ফল—উহাই জন্মের হেতুভূতা প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির মূল হইল দোষ বা বিষয়ে আসক্তি; আসক্তি না থাকিলে কর্ম্মফলের বন্ধন নাই, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া জন্মও ঘটাইবে না। কিন্তু আসক্তি বা দোষ আসে কোথা হইতে?—মিথ্যাজ্ঞান হইতে। জগতের সমস্ত পদার্থকে যদি আমরা যথাযথভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারি, তবে আর আসক্তি থাকে না। গৌতম এই পদার্থকে ষোড়শ ভাগে ভাগ করিয়া বলিতেছেন, সমস্ত সত্তাই এই ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের তত্ত্ব-জ্ঞান হইলেই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া যাইবে এবং তাহা হইতে যথাক্রমে দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ হইবে। সুতরাং চরমে দেখিতেছি —দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ।

দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই যে মোক্ষ, ইহা মানিতে পারি। কিন্তু কথা হইতেছে— দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে আত্মার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই বিবেচ্য। দুঃখের

আত্যন্তিক নিবৃত্তি আমি কিরূপে অনুভব করিব? ইহা বুঝিতে হইলে আত্মার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। বৈদান্তিক আত্মাকে চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে এক, অবিভাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয়েই আত্মার বহুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ইহারা চৈতন্যকে আত্মার আগন্তুক গুণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং মোক্ষদশাতে আত্মা গুণসংস্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া আকাশবৎ অবস্থান করেন, ইহাই ইঁহাদের মত। অতএব দুঃখনিবৃত্তিকে এই দিক হইতেই দেখিতে হইবে। নৈয়ায়িক যে ভাবে আত্মার স্বরূপ বুঝিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে "দুঃখের নিবৃত্তি" এই অভাবাত্মক লক্ষণ ছাড়া মোক্ষের অন্য কোনও লক্ষণ তিনি করিতে পারেন না। দুঃখ নিত্যানুভূত বস্তু, উহার নিরসন হইলেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। মোক্ষাবস্থায় আত্মায় যখন গুণসংস্পর্শ থাকে না, তখন চৈতন্যও থাকে না—সুতরাং কোনও ভাবাত্মক বস্তুর অনুভূতিও থাকিতে পারে না। অতএব শুদ্ধ দুঃখনিবৃত্তি ছাড়া সুখপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের আনুষঙ্গিক লক্ষণ নৈয়ায়িক স্বীকার করিতে পারেন না।

নৈয়ায়িকের উপরিউক্ত লক্ষণ বিচার হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, ইহার সহিত বৈদান্তিকের বিরোধ কোথায়। প্রথমতঃ বৈদান্তিক আত্মাকে এক বলেন। কিন্তু নৈয়ায়িক পরমাত্মাকে এক বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবাত্মাকে বহু বলেন। বৈদান্তিক জীবব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ ভেদ কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। মোক্ষের লক্ষণ করিতে গেলে বেদান্তীকে এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাই দুঃখনিবৃত্তিকে পরম পুরুষার্থ স্বীকার করিতে তাঁহার আপত্তি নাই; পরম্পরাক্রমে এই দুঃখনিবৃত্তির হেতু যে অজ্ঞাননিবৃত্তি, ইহাও তিনি মানিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত তাঁহাকে এ কথাও বলিতে হইবে, এই অজ্ঞাননিবৃত্তি—"জীবব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয় সম্বন্ধে যে অজ্ঞান, তাহারই নিবৃত্তি।" সুতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তির এই বিশেষণ হইতেই নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকের পার্থক্য সূচিত হইতেছে।

বৈদান্তিকের দ্বিতীয় আপত্তি, চৈতন্যকে আত্মার আগন্তুক গুণ বলা সম্বন্ধে। তাঁহার প্রতিপাদিত মোক্ষলক্ষণে যাহাতে এই মতের আভাস না থাকে সে সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া আনন্দপ্রাপ্তিরূপ ভাববস্তুকেও তিনি মোক্ষের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু এই লক্ষণ দ্বারা ভট্টমতাবলম্বীদিগের লক্ষণেরও নিরসন হয় বলিয়া আমরা উভয় মতের এক স্থানেই বিচার করিব। যে যুক্তিতে ভট্টমত নিরস্ত হয়, নৈয়ায়িকমতও তুল্যযুক্তিতে নিরস্ত হইতে পারে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

ভট্টমতাবলম্বীরা নিঃশেষে দুঃখের নিবৃত্তিকে নিঃশ্রেয়স বলিয়া তো স্বীকার করেনই, অধিকন্তু তাহাকে নিরতিশয় সুখের অভিব্যক্তি বলিয়া থাকেন। এযাবৎ বৈদান্তিকের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও বিরোধ হইতে পারে না। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই সুখাভিব্যক্তি কি উপায়ে সাধ্য? তাহা হইলে ভট্টমতাবলম্বী বলিবেন, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলেই সুখের অভিব্যক্তি হইবে। এই জায়গাতেই বৈদান্তিকের সহিত ইহাদের বিরোধ। বৈদান্তিক চাহেন, নিত্য সুখ। মীমাংসকের স্বর্গসুখ প্রচুর হইলেও উহা কর্ম্মজন্য বলিয়া নিত্য নহে। কর্ম্ম-

মূলে অবিদ্যা বা ভেদদৃষ্টি। কর্ম্ম করিতে হইলেই কর্ত্তা, করণ প্রভৃতির প্রয়োজন—জাতি, বিদ্যা ইত্যাদির অভিমান থাকা প্রয়োজন। যেখানে ভেদদৃষ্টি, সেখানেই সীমা—সেখানেই অনিত্যতা এবং দুঃখ। এই জন্য বৈদান্তিক নিঃশ্রেয়সকে কর্ম্মের ফল বলিতে চাহেন না। সমস্ত ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া যদি এই নিঃশ্রেয়স মিলে, তবে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত চিদানন্দ-স্বভাবই আত্মার স্বরূপ। বৈদান্তিক বলেন, এই স্বরূপের আনন্দলাভই নিঃশ্রেয়স। শুধু দুঃখের নিবৃত্তি ও আনন্দের অভিব্যক্তি হইলেই সব হইয়া গেল না—সে আনন্দ নিত্য হওয়া চাই, স্বরূপানন্দ হওয়া চাই। এই স্থানেই মীমাংসকের সহিত বৈদান্তিকের বিরোধ। এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই আনন্দপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বৈদান্তিক "স্বরূপ" বিশেষণটী দিতেছেন। স্বরূপ বলিতে ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য বুঝায়। আবার নৈয়ায়িক আত্মাকে বহু বলেন, কিন্তু পরমাত্মাকে এক বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং মোক্ষদশায় জীবাত্মার চৈতন্যগুণসংস্পর্শ নিষেধ করিলেও পরমাত্মাকে কখনও অচেতন বলিতে পারেন না, কেননা তাঁহার মতে পরমাত্মা—ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ এবং এক। বৈদান্তিক যদি সমস্ত উপাধি নিরসন করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করেন, তবে কার্য্যতঃ তিনি নৈয়ায়িকের লক্ষিত পরমাত্মা হইতে বিরোধী কোনও তত্ত্ব উপস্থাপিত করিলেন কি? সুতরাং আত্মার ঐক্যের দিক হইতে তাঁহাকে চেতন বলিয়া স্বীকার করাতে নৈয়ায়িকও বৈদান্তিককে দোষী বলিতে পারেন না—উভয়ের মাঝে যে মতের বিরোধ, তাহা শুধু দৃষ্টির পার্থক্য হইতে উৎপন্ন।

বৈদান্তিক আত্মার চৈতন্য স্বরূপ স্বীকার করিলে তাঁহাকে আনন্দরূপও বলিবেন। কেন বলিবেন, তাহা আমরা পরে বুঝাইতেছি। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই—আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াই স্বরূপানন্দ-প্রাপ্তি বৈদান্তিকের মোক্ষ-লক্ষণের অন্তর্গত। নৈয়ায়িক বহু আত্মা স্বীকার করেন, সুতরাং আত্মার ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন। ব্যক্তিত্ব-বোধ থাকিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মোক্ষ যদি দুঃখনিবৃত্তি হয়, তবে আর ব্যক্তিত্ব থাকে না। আবার দৃষ্টজগতে ব্যক্তিত্ব ছাড়া আত্মার স্বরূপ যখন বুঝিতে পারি না, তখন মোক্ষদশায় ব্যক্তিত্ববোধহীন আত্মস্বরূপকে অচেতন বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। এই জন্য নৈয়ায়িকের মোক্ষলক্ষণ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির ঊর্দ্ধে আর কোনও ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। বৈদান্তিক ব্যবহারিক দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে চাহেন—ব্যক্তিত্ব বোধকে তিনি বলেন অবিদ্যা। সুতরাং প্রথম হইতেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল পরম তত্ত্বের দিকে। ব্যক্তির মাঝেও তিনি সেই তত্ত্বকেই অনুস্যূত দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার মোক্ষাবস্থা স্বরূপাবস্থা—ব্যক্তিত্ব বোধরূপ অবিদ্যানিরসন করিলেই স্বরূপাবাপ্তি হইয়া থাকে। ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলেও পরমতত্ত্ব তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যায় না—উভয়ের স্বরূপতঃ ঐক্য তিনি জানেন, সুতরাং পরমতত্ত্বের দিকে চাহিয়াই ব্যক্তির মোক্ষকে তিনি নিত্য, চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপই বলিবেন। এই দৃষ্টির ভেদ লইয়াই নৈয়ায়িক ও মীমাংসকের সহিত বিরোধ। বস্তুতঃ নৈয়ায়িক ও মীমাংসক সত্যকে যে ভূমি হইতে দেখিতেছেন বৈদান্তিক তাহা হইতে উচ্চতর ভূমি হইতে দেখিতেছেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি-

পক্ষে মোক্ষ লক্ষণ আরও ব্যাপক হইয়া উভয়ের লক্ষণকেই কুক্ষিগত করিতেছে।

শ্রুতির প্রমাণ

বেদান্ত বিচার করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, দুঃখনিবৃত্তি বা অজ্ঞাননিবৃত্তি এবং স্বরূপানন্দ লাভই যে তাহার উদ্দেশ্য ইহা বুঝাইবার জন্য দুইটী শ্রুতি প্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে—

(ক) "তরতি শোকমাত্মবিৎ—আত্মবিৎ শোক পার হইয়া যান।" (ছান্দোগ্য ৭, ১, ৩)। আত্মা এখানে ভূমাস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার ঐক্য উপলব্ধিই আত্মজ্ঞান। শোক অর্থে সংসারের দুঃখ। উহা অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যবোধ জন্মিলে দুঃখ ও অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

(খ) "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম এব ভবতি—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।" (মুণ্ডক ৩, ২, ৯)। যিনি ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। ইহাই স্বরূপপ্রাপ্তি—আনন্দপ্রাপ্তি। ব্রহ্ম নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ। যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ রূপে জানেন, তিনিও নিত্য, চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ হন।

শ্রীনন্দ

দার্শনিক বলেন, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের যোগ হইলে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু একটা কথা তাঁহারা ছাড়িয়া গিয়াছেন। জগতে সবাই কি এক রকম দেখে? আজ অতি মধুর প্রাতঃকাল—আলোকে উজ্জ্বল পৃথিবী—বহির্জগতের পানে চাহিয়া প্রেমিকের প্রাণ প্রিয়ের স্মৃতিতে সুধাসিক্ত হইয়া উঠিল; সে দেখিল সব আনন্দময়। আর যে বিরহিণী নিদ্রার অন্ধকারে হৃদয়ের ব্যথা লুকাইয়া বাঁচিয়া ছিল—সে চক্ষু মেলিয়া জগৎকে কেমন দেখিবে? সেই চিরপরিচিত স্থান, সেই চিরপরিচিত মুখ—তবুও তাহার চোখে সকল আলো কালো হইয়া গিয়াছে। কাজেই শুধু বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই তো হয় না—ভাবের অঞ্জন চোখে লাগিলে দার্শনিকের প্রত্যক্ষের মাঝেও যে বিপর্য্যয় হইয়া যায়।

নন্দের চোখে আজ এমনি করিয়া ভাবের অঞ্জন লাগিয়া গিয়াছে। আজিকার সুপ্রভাত তাঁহার জীবনের সুপ্রভাত। আজ জগতের প্রতি অণুপরমাণু তাঁহার কাছে প্রেমময় নটরাজের অমিয়মাধুরী মাখা। যেদিন হইতে তিনি নটরাজের নাম শুনিয়াছেন, সেই দিন হইতে কল্পনায় তাঁহার মনোময় মূর্ত্তি আঁকিয়া ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার একাগ্র চিত্তের ধ্যান-তন্ময়তায় কল্পনার মূর্ত্তি বাস্তব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তবু মিলনে তখন বাধা ছিল—সে বাধা সংসার ও তাহার দায়িত্ব। তবে তিনি জানিতেন, এই সংসারের মাঝেও তাঁহার নটরাজের নৃত্যকুশল চরণের স্পর্শ

অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তবুও দুইটী পিপাসী হৃদয়ের একান্ত নির্জ্জন যে রসোদগার—তাঁহার ভাগ্যে তাহার সম্ভোগ হইয়া উঠে নাই। এই বাঞ্ছিত মিলনের জন্য তাঁহার চিত্ত এতদিন হাহাকার করিয়া ফিরিয়াছে; কিন্তু আজ তাহার অভীষ্ট মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। তাই অসহ্য আনন্দের আবেগে নন্দের চেতনা অভিহত হইয়া বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন—

কোথায় জগৎ? কোথায় তিনি?—কেহ নাই, কিছুই নাই—শুধু এক আদি-অন্তহীন জ্যোতির্ঘন পারাবার, তাহার মাঝে প্রাণের দুর্নিবার চঞ্চলতা অগণিত বীচিভঙ্গে—অজস্র আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছে। এই জ্যোতির্ম্ময় আনন্দের শিহরণই তো তোমাদের নিত্যদৃষ্ট বস্তুজগৎ। অন্ধ তুমি, জড় চক্ষু দিয়া শুধু জড়বস্তুই দেখিতেছ, জড়ের শক্তি জড়ের সৌন্দর্য্যই তোমার চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু এই জড়ের অন্তরালে যে চিন্ময় ভাববিগ্রহের অমরদ্যুতি, তাহা তোমার চোখে পড়িবে কবে?

নটরাজের বিশ্বনৃত্য নন্দের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—তিনি দেখিলেন, নৃত্যের উন্মাদনায় সমগ্র বিশ্ব আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া থাকিবার সাধ্য কাহারও নাই—সুখে দুঃখে, হাসিতে-কান্নায়, জীবনে-মরণে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দুর্নিবার প্রেরণায় সকলকেই ছুটিয়া চলিতে হইতেছে। কাহাকে বল পরিণাম, কাহাকে বল সংসার চক্রের আবর্ত্তন? সকলই যে নৃত্যকুশল নটরাজের আনন্দোচ্ছল রুচিরাঙ্গহার! নটরাজ নাচিতেছেন—মলয়ার সুরভি নিশ্বাস, কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত গর্জ্জনে—গ্রীষ্ম সন্তপ্ত মরু-প্রান্তরের মরীচিকায়, আষাঢ়ে মেঘমন্দ্রের তালে তালে—উষার কম্পিত সৌরকিরণে, তরুপল্লবে মূর্চ্ছিত জ্যোৎস্নার রজতোচ্ছ্বাসে। কোথায় এ নৃত্যের বিরাম? এ নৃত্য বহিঃপ্রকৃতিতে, এ নৃত্য মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে—অনন্ত ভাবের অন্তহীন আন্দোলনে দেহে, মনে, প্রাণে, ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতায়—সেই তো নটরাজেরই নৃত্য, তাঁহারই পুলকারাম উন্মাদনা!

এই নৃত্যের আবেগ আজ নন্দকেই পাইয়া বসিল। নটরাজের চরণস্পর্শে তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণ দুলিয়া উঠিল, নৃত্যের আবেশে মন মাতিয়া উঠিল। আর কে তাঁহাকে থামাইয়া রাখে? আনন্দের আবেগে নন্দ হেলিয়া দুলিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে লাগিলেন—তাঁহার অঙ্গদোলার সাথে সাথে সমস্ত জগৎ যেন ভাবাবেশে দুলিতে লাগিল।

নন্দ চলিয়াছেন—নাচিতে নাচিতে। সে মধুর নৃত্য যাহার চোখে পড়িল, তাহারই প্রাণ নাচিয়া উঠিল, ক্ষণেকের জন্য তাহার মনে হইল—এ সংসারে দুঃখ কোথায়?—অবসাদ কোথায়?—আনন্দ নৃত্য ছাড়া জগতের আর সার্থকতা কি?

বাস্তবিক নৃত্য বড় সহজ সাধনা নয়। ইচ্ছা করিলেই কেহ নাচিতে পারে না। যতক্ষণ আসক্তি মনপ্রাণ জুড়িয়া রহিয়াছে, চিত্ত হইতে কলুষ কালিমা মুছিয়া যায় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৃত্য করিবার অধিকার কাহারও মিলে না। সঙ্কুচিত চিত্ত, আড়ষ্ট দেহ—এই লইয়া তুমি নাচিবে কি?—অঙ্গভঙ্গী করিতে পার মাত্র। ভাব হইতে নৃত্যের জন্ম। আনন্দের আবেশে চিত্ত যখন এলাইয়া পড়ে, প্রাণের

স্রোতে দেহের শিরা উপশিরায় যখন আবেগের জোয়ার খেলিয়া যায়, তখনই নৃত্য সহজ হয়। আজ নন্দের তাহাই হইয়াছে—শুধু তাহাই নয়, তাঁহার নৃত্যের মাঝে এক মহা সঞ্চারক শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—সে নৃত্যমদে জগৎ মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

আবার শুধু নৃত্যই নয়—নন্দের মাঝে কাব্য সরস্বতীরও স্ফূর্তি হইল। যে নন্দ আজন্মকাল শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত, সহসা তাঁহার ভিতরে কোথা হইতে যে কাব্যের জোয়ার ঠেলিয়া উঠিল, তাহা অবিশ্বাসীর কাছে রহস্য বলিয়াই মনে হইবে। বাস্তবিক বাহ্য শিক্ষার উপর আমাদের শ্রদ্ধা এত বেশী যে তাহার সহায়তা ভিন্ন যে চিত্ত কখনও ফুটিতে পারে, এ কথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ কি, তাহা আমরা বুঝিয়াছি কি? শিক্ষায় আত্মার জাগরণ। সে জাগরণ কেবল বাহির হইতে আঘাত করিলেই হয় না। বরং বাহিরের আঘাতে আত্মার সম্মুখে একটা স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয় মাত্র—বস্তুর ছাপ তাহাতে থাকিলেও তাহার বাস্তবতা একান্ত নহে। কিন্তু যে প্রেরণা ভিতর হইতে আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই সার্থক। আত্মার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সৌন্দর্য্য সেই অন্তঃপ্রেরণা বশতঃই স্ফুরিত হয়। যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য বা যে শিল্প তুমি আমি বহু বর্ষব্যাপী সাধনার ফলে কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়া থাকি, অন্তঃপ্রেরণায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা ব্যক্ত হইতে পারে। বাস্তবিক আমাদের লৌকিক শিক্ষানীতিতে যে শক্তির স্ফুরণ হয়, তাহাকে আমাদের আত্মোদ্বোধনের অস্ফুট প্রয়াস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ঐশী শক্তির আবির্ভাব বশতঃ এই স্ফুরণ যে বাহিরের নিমিত্তের অপেক্ষা না রাখিয়াই ঘটিতে পারে, তাহা অসম্ভব কিসে?

নন্দ নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। তাঁহার প্রেমবিগলিত কণ্ঠ হইতে যে সুধাধারা ঝরিয়া পড়িল, তাহাতে বসুধা কৃতার্থা হইয়া গেল। আমরা নিম্নে তাঁহার সঙ্গীতের গদ্যে মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম—পাঠক দেখিবেন, উহাতে ভাবের ব্যঞ্জনা কত গভীর।

নন্দ গাহিতেছেন—"হে নটরাজ, যে অমৃত তুমি আমাকে পান করাইলে, তাহাতে আমার সকল শোক-ভয় দূর হইয়া গেল। তোমার এ অমৃত বিশ্বভুবনে সমভাবে ছড়াইয়া পড়িল। হে দেবতা, এ অমৃত যে তোমারই করুণা, তোমারই সুষমা, আমার হৃদয় মন্থন করিয়া ইহার উদ্ভব—ইহার আশ্রয়ে আমার প্রেম সার্থক। এ কি দিব্য অমৃতময় জ্যোতিঃ, এ কি অমৃত অদীন প্রাণের স্পন্দন—এ কি আনন্দ—এ কি দীপ্তি! তোমার অমৃত স্পর্শে জীবনের সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল—মহান অক্ষোভ্য জ্যোতিঃসমুদ্রে আমি ডুবিয়া গেলাম, মৃত্যু-ভয় হইতে চিরদিনের মত তরিয়া গেলাম—তোমার অমৃতধারা আমার চিত্ত প্লাবিয়া দু'কূল ছাপাইয়া বহিয়া চলিল।—

"নটরাজ, নটরাজ—
নিত্য প্রণতি লহ নটরাজ!
নটরাজ, নটরাজ—
চিত্তবিজয়ী প্রভু নটরাজ।
নটরাজ, নটরাজ—
বিত্ত পরম মম নটরাজ!
নটরাজ, নটরাজ
নর্ত্তনসুন্দর ওগো নটরাজ!"

এমনি করিয়া আনন্দের দিব্য প্রেরণায় সঞ্জীবিত হইয়া ক্রমে নন্দ কোলরুন নদীর

তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নদীটী পার হইলেই তাঁহার অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ মিলিবে। তখন দক্ষিণ দেশে নূতন বর্ষা হইয়া গিয়াছে—নদীতে বান ডাকিয়াছে। কোলরুন নদীর ভৈরব আস্ফালন দেখিয়া নন্দ আরও অধীর হইয়া পড়িলেন। যে দুর্নিবার স্রোতোবেগে উচ্ছল তরঙ্গে তরঙ্গিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, সে বেগ তিনিও যে তাঁহার শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছেন। এই বর্ষাস্ফীত নদীবক্ষে যেমন নটরাজের তাণ্ডব, তেমনি তাণ্ডব তাঁহার হৃদয়ে। উন্মত্ত বেগে নদী কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে?—চিদাম্বরমের শ্রীমন্দিরের পাদমূল ধৌত করিতে!—তিনিও তো সেই পথের পথিক। তবে এ নদী তো তাঁহারই সহযাত্রী,—পথপ্রদর্শক পরম বন্ধু! ইহার তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিয়া নন্দও তাহার প্রিয়তমকে দেখিতে যাইবেন—তাঁহার চিত্তস্রোতেও আজ ইহারই মত অনুরাগে বান ডাকিয়াছে। নন্দ ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িতেছেন—ইচ্ছা হইতেছে, দুরন্ত নর্ত্তনে দেহবন্ধ টুটিয়া এই স্রোতস্বিনীর সঙ্গে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া নটরাজের পানে বহিয়া চলেন।

নন্দ ভাবের আতিশয্যে নদীতীরে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণবর্ণ একজন মাঝিক একখানা নৌকা লইয়া সেখানে উপস্থিত। নন্দ ভাবিলেন, "এই তো আমার নটরাজ—নইলে আমাকে পারে লইয়া যাইবে কে?" অমনি ভাবের আবেশে তিনি গান ধরিলেন—

"হে নটরাজ, যে অমৃত তুমি আস্বাদন করাইলে, তাহাতে আমাকে তোমাতে রূপান্তরিত করিয়াছ। তোমার এই অমৃত পানে বিশ্বনৃত্যে পরাণ মাতিয়া উঠে—জ্ঞানের রাজ্য নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই অমৃতে কাঙ্গালের হৃদয় নিঃশব্দে পূরিয়া উঠে—এই তো বিশ্বের আদি এবং অন্ত। তোমার অমৃত যে চিরদিন সন্ধানীর সন্ধানেই ফিরিতেছে—যে ইহাকে চায় না, সে ইহাকে পায়ও না। এ সুধারসে আমার সকল ক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছে। পরম সঙ্গোপন তোমার অমৃত শুদ্ধচিত্তের পরম সহায়। সে যে প্রেমের গরবে মাখা আনন্দের জ্যোতিঃ। এ অমৃতপানে দুঃখ থাকে না, আসক্তির বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, বিষয়ের ক্ষুধা মিটিয়া যায়। রসিকের সঙ্গে এ অমৃত লুকোচুরী খেলে—প্রেমিক হৃদয়ের গোপন পুরীতে লুকানো এই সুধাপাত্র—এই তো আমার শক্তি, আমার আনন্দ!—

"নটরাজ, নটরাজ—
নিত্য প্রণতি লহ নটরাজ!
নটরাজ, নটরাজ—
চিত্তবিজয়ী প্রভু নটরাজ!
নটরাজ, নটরাজ—
বিত্ত পরম মম নটরাজ!
নটরাজ, নটরাজ—
নর্ত্তনসুন্দর ওগো নটরাজ!"

নাচিতে নাচিতে নন্দ নৌকায় উঠিলেন। এই নৃত্যোন্মাদকে দেখিবার জন্য ততক্ষণে নদীতীরে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। নন্দের অপরূপ নৃত্যগীত তাহাদিগকেও পাগল করিয়া তুলিল—নন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও নাচিতে গাইতে লাগিল। নন্দের সঙ্গে আরও অনেকে নৌকায় উঠিল, নৌকা পূর্ণ হইয়া গেল। মাঝি কাহাকেও বারণ করিল না—নৃত্যরসে তাহারও চিত্ত রসিয়া উঠিয়াছে। ক্রমে তাহার অবশ হস্ত হইতে হাল খসিয়া পড়িল—নৌকার উপর তখন ভক্তমণ্ডলীর উদ্দণ্ড নৃত্য চলিয়াছে—মাঝিও সেই নৃত্যে যোগ দিল। নৃত্যভরে নৌকাও নদীবক্ষে নৃত্য

করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। চারিদিকে তখন নৃত্যের হিল্লোল উঠিয়াছে—নৃত্যশীলা তরঙ্গিণী, নৃত্যরত ভক্তমণ্ডল, পদতলে নৃত্য লীলা তরণী—বক্ষোমাঝে নটরাজের নৃত্যকুশল চরণের স্পর্শ!

ভাসিতে ভাসিতে নৌকা আসিয়া আপনি অপর তীরে লাগিল। নন্দের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে সকলে নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিল। কিন্তু এই ভাবোচ্ছাসের মাঝেও নন্দ তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। মাঝিকে খেয়া-পারের কড়ি তো দিতে হইবে। সঙ্গে সম্বল কিছুই নাই, তবুও একবার মাঝির দিকে চাহিয়া মধুর হাসিয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নটরাজ, পারের কড়ি কি দিব?" মাঝি বিগলিতচিত্তে উত্তর করিল, "প্রভো, তুমিই সাক্ষাৎ নটরাজ—আমি তোমার দাসানুদাস মাত্র। আমি সকল ভুলিয়া শুধু তোমার আনন্দ নৃত্যে মাতিবার অধিকার চাহি—আর কিছু চাহি না।"

অদূরে শ্যামল তরুশীর্ষের অন্তরালে চিদাম্বরমের মন্দিরচূড়া সুনীল আকাশ চিত্রিত হইয়া দেখা দিল। নন্দ ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে নটরাজ, তোমার আদেশে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল নিত্য আবর্ত্তিত হইতেছে, অরূপ আকাশ তোমারই মত অনন্ত দেশে আপনাকে বিস্তার করিয়া সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে—তোমার অসীম বিশ্বরাজ্যে আমার মত কীটাণু-কীটের স্থান কোথায়? তোমার অপার রহস্য-সিন্ধুর একটী বিন্দুর সমানও তো আমি নই—আমার চেয়ে সিন্ধুর বারিবিন্দুও শুচি ও সুন্দর। যে ধূলি সূর্য্যতাপ ও বারিবর্ষণ সমভাবে সহিয়া থাকে, সেও আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হে সন্ন্যাসীর শিরোমণি, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের বিপুল পরিবারে গৃহপতি তুমি, আমার মত অণুর অণুকে যে তুমি দেখিতে পাইলে, ইহাই আশ্চর্য্য! হে প্রভো, তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, আজ যেন জগতের আসক্তি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তোমার মন্দিরে অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করি—আমার দৃষ্টি যেন দিব্য ধামের প্রতি চিরনিবদ্ধ থাকে—বিপ্নবিপত্তির ঝঞ্ঝাবাত যেন আমাকে না টলাইতে পারে।" (ক্রমশঃ)

চিরঞ্জীবী

কর্ম্মে অবসাদ আসে, শ্রান্তি আসে কেন জান? তুমি বদ্ধ বায়ুতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে চলছ বলে। ধর, এই যে চব্বিশ ঘণ্টার দিনটী—তোমার কাছে এর প্রত্যেকটী ঘণ্টা, প্রত্যেকটী মিনিট একেবারে নিরেট, কর্ম্মে অকর্ম্মে বাসনায় কামনায় একেবারে বোঝাই করা। এর মাঝে তুমি শ্বাস ফেলবার, হাঁফ জুড়াবার ঠাঁই রেখেছ কি? একটার পর একটা উদ্বেগ এসে কেবলই তোমাকে ব্যতিব্যস্ত, অপ্রবুদ্ধ করে রাখছে। এমন কি কর্ম্মের শেষে বিশ্রামটুকু পর্য্যন্ত তোমার অপ্রবুদ্ধ জড়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন করে বেদম হয়ে চললে তোমার অবসাদ আসবে না কেন?

নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে হয় না। এইরূপে বালকের প্রেমের আশ্রয়—পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আচার্য্য, গুরু—যে কেহ হইতে পারেন। এইরূপ একটা আশ্রয় এবং আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত করা শিক্ষা-জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

প্রবৃত্তিজয়ের এই তো গেল সার্ব্বভৌম একটা উপায়। কিন্তু জগতে এমন কেহ থাকিতে পারে, যে বিচার ভিন্ন এক পা চলিতে পারে না, সংস্কারবশতঃ একটা কিছু মানিয়া লইতে যে প্রস্তুত নয়। কর্ম্মের মাঝে পাপ-পুণ্যের ভেদ অপরের কাছে সুস্পষ্ট, কিন্তু তাহার দৃষ্টি পড়ে একেবারে মূল কার্য্য-কারণের প্রতি। কারণের প্রেরণায় কার্য্য ঘটিতেছে, ইহাই সে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাকে ভাল বা মন্দ আখ্যা দিয়া রঙ্গীন করিয়া দেখিবার উপযোগী চসমা তাহার চোখে নাই। এমন চিত্ত অনুরাগের স্বাভাবিক মাধুর্য্যে সম্মোহিত না হইতেও পারে। কাহারও অনুরাগ-বিরাগ বা সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িত করিবার প্রয়োজন সে বুঝিতে পারে না—এরূপ আশ্রয়গ্রহণকে একান্ত মনে করিয়াও তাহার চিত্ত তৃপ্ত হয় না। সে চায় সমস্ত গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে—জগতের কোনও কিছুর কাছে বাঁধা পড়িতে সে রাজী নয়।

বুঝিতেই পারা যায়, এমন মানুষ নিজকে ছাড়া আর কাহাকেও একান্তভাবে মানিতে পারে না। অথচ এখনও সে সত্যের সাক্ষাৎ পায় নাই—তাহাকেও সত্যের জন্য প্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিতে হইবে। কিন্তু সে কি-এমন করিয়া লড়িবে?

ভালমন্দের ফলাফলের লোভ বা ভয় দেখাইয়া তাহাকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করা যাইবে না। তাহাকে বিচারের পথ দিয়াই চালাইতে হইবে। বিচারশীল ব্যক্তি ভালমন্দের সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু সত্যাসত্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। কেননা সত্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন বিচার চলিতেই পারে না। বিচারী অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিচারের দৃষ্টিতে কর্ম্মের ভালমন্দ দেখা অনাবশ্যক হইলেও, কর্ম্মের মাঝে সত্য প্রকাশের স্তরভেদ দেখিতেই হইবে। বিচারী বলিতেছে, সকলই সত্য। কিন্তু সেই সত্যও ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভিন্ন। ব্যবহারিক সত্যও আবার দৃষ্টির ভেদে স্তরে স্তরে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে।

এই যে ব্যবহারিক জগতের কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ, ইহা বিচারীকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই দ্বৈতবোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্যও সে উৎসুক। সে এমন একটা শান্ত, নির্ব্বিরোধ ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে, যেখানে জগতের দ্বন্দ্বভাব দ্বারা বিচলিত হইতে হয় না। ভালমন্দের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, তাহা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু মন্দকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ভালকে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তিও তাহার নাই, মন্দকে ভালতে রূপান্তরিত করিবার ইচ্ছাও তাহার নাই। বিচারী সু-র উপাসক নহে—সে চাহে সু-কুর দ্বন্দ্ব হইতে নির্মুক্ত থাকিতে। এমন অবস্থায় প্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিবে সে কোন অস্ত্র লইয়া?

এখানে দেখিতে পাইতেছি, বিচারী ভালমন্দের মাপকাঠিকে অস্বীকার করিলেও জীবনের একটা লক্ষ্যকে স্বীকার করিতেছে। নিজের মাঝেই একটা পরিপূর্ণ আদর্শের

প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুতরাং গ্রহণ ও বর্জ্জন করিবার সূক্ষ্ম প্রেরণা নিশ্চয়ই তাহার মাঝে আছে। এই প্রেরণাকে ধরিয়াই তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। সে চায় পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ তৃপ্তি; সুতরাং যে সত্য শক্তি বা যে আনন্দ অপূর্ণ, তাহা ইন্দ্রিয় মনের লোভনীয় যেমন মায়াবিমবেশেই উপস্থিত হউক না কেন, সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেই। এ ক্ষেত্রে আত্মশক্তিই তাহার সহায় হইবে। আত্মার রসমূর্ত্তির আভাস সে পাইয়াছে, তাঁহার প্রচণ্ড শক্তির সন্ধানও সে পাইয়াছে—সুতরাং সেই শক্তির সহায়তাতেই সে বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করিবে। বিরুদ্ধভাবের নিরসন পূর্ব্বক স্বরূপের মনন অতি প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন সাধনা। গুরু শক্তি আত্মশক্তিতেই সেখানে পরিব্যক্ত—আত্মাই সেখানে গুরু।

এই গেল দ্বিতীয় পথ। তার পর তৃতীয় পথ জ্ঞান। এখানেও অনুশীলন আছে বটে, কিন্তু সংগ্রাম নাই। এখানে সাধকভাবের অভিমান লইয়া নহে, পরন্তু সিদ্ধভাবের অভিমান লইয়া সাধনা। বিবেকী সত্যাসত্যের পার্থক্য অবলম্বন করিয়া সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানী কোনও ভেদদৃষ্টিই স্বীকার করেন না। তাঁহার কাছে সত্য সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ ও অনন্ত; উহাই তাঁহার স্বরূপ। তিনি অতি সহজ আনন্দে এই স্বরূপে অবস্থান করিয়া রহিয়াছেন—কোনও বিরুদ্ধ ভাবের আক্রমণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপের মননকে উত্তেজিত করিবার কোনও প্রয়োজন হইতেছে না। সুতরাং তাঁহার কাছে কোনও দ্বন্দ্ব নাই, কর্ত্তব্য নাই, সংগ্রাম নাই। অভিনয়মঞ্চে দীপের মত তিনি নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার—অথচ সমস্ত অভিনয়ের উদ্ভাসক।

শুদ্ধ এই ভাবের মনন—সমস্ত সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া, এমন কি মোক্ষকামনা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া, অখণ্ড একরসভাবের ধারণা—ইহাও একপ্রকার সাধনা। একপ্রকার বলি এই জন্য যে, স্বরূপতঃ এই ভাবকে সাধন বলা যাইতে পারে না, অথচ জিজ্ঞাসু পুরুষের কাছে এই অবস্থাও লক্ষ্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। ফল কথা, প্রবৃত্তি জগতের অপর প্রান্তে আসন গ্রহণ করিলে প্রবৃত্তির তাড়নার কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না। জ্ঞানী গুণের অধীন নহেন, গুণের পরিচালকও নহেন—তিনি গুণের অতীত। এই গুণাতীত পথই অব্যক্তের পথ। গীতাতে ভগবান ইহাকেই দুঃখকর এবং সাধারণের অসাধ্য বলিয়াছেন। এই পথে উন্নতি-অবনতির পরিমাণ সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না—পড়িবার কোনও প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। মেঘাবসানে সূর্য্যের মত সংস্কারমুক্ত জ্ঞানপ্রভা সহসা চরাচর উদ্ভাসিত করিয়া ফুটিয়া উঠে।

—:*:—

আরণ্যক

—✱—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

"মলং বর্ষ্মসস কৌসজ্জং"—আলস্যই হচ্ছে দেহের ময়লা। তোমার সাধন পথে প্রথম বাধাই হচ্ছে দেহ। এই দেহের সঙ্গে তোমাকে তুমি এক ভেবে নিয়েছ—এর সুখ দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করছে। কাজেই এর মোহ হতে নিস্তার না পেলে কি করে সাধন পথে অগ্রসর হবে? অথচ ভগবান যে তোমাকে জব্দ করবার জন্য এ বোঝাটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, তা তো বলতে পারি না। তাঁর সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। আনন্দ কোথায়?—ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে। যার যার ধর্ম্মানুযায়ী সকলকে চলতে দাও—নিরানন্দ থাকবে না, কেউ কারু বন্ধনও হবে না। দেহেরও একটা ধর্ম্ম আছে। তার ধর্ম্ম অনুযায়ী তাকে চালাও সে তোমার আনন্দের সঞ্চয় ভাণ্ডার হবে। আবার দেহ-ধর্ম্মের বিপরীত পথে চল—বোঝার ভারে নুইয়ে পড়তেই হবে।

দেহের ধর্ম্ম কি?—কর্ম্ম। দেহ প্রাণের আধার। প্রাণ সর্ব্বদাই স্পন্দিত হচ্ছে—কম্পনেই তার আনন্দ। সেই কম্পনের ছন্দে দেহকেও স্পন্দিত করে তুলতে হবে। কোথাও বাড়াবাড়ি করবার প্রয়োজন নাই—ছন্দ অনুযায়ী, পরিমাণ অনুযায়ী দেহকে কর্ম্ম দাও—দেখ সে তোমার আনন্দের বাহন হয় কি না। গীতার কথা স্মরণ কর—যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, কর্ম্মে যুক্ত চেষ্টা, যুক্ত নিদ্রা, যুক্ত জাগরণ—এই মেনে যিনি চলেন, ভগবান্ বলছেন, তাঁর "যোগো ভবতি দুঃখহা।" এখানে যুক্ত বলতে বুঝব পরিমাণ মত, ছন্দোমত; আবার যুক্ত বলতে বুঝব, তাঁর সঙ্গে যুক্ত। এইভাবে দেহকে খাটিয়ে নাও—তার মাঝে আনন্দ উছলে উঠবে। আর আনন্দ যাকে স্পর্শ করেছে, সে তো সোণা হয়ে গিয়েছে। যে দেহ আনন্দের বাহন, সে তুচ্ছ কিসে, বাধা কিসে? সে তো আনন্দময়ের হাতের লীলাকমলটী।

—✱—

গতস্য শোচনা নাস্তি। নিজের জীবনে যা গত হয়ে গেছে তাকে সে অতীতের সুখ-দুঃখকে একটা দীর্ঘ স্বপনের মত নিশাশেষে প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে বিসর্জ্জন দাও। তার পর আজ প্রভাতের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সমুদ্রে স্নাত হয়ে নূতন তপনের রক্তিম আভায় আপনাকে মণ্ডিত কর। আজ থেকে আবার তোমার নূতন জীবন হোক—সারাদিনের কুয়াসা, মেঘ-বৃষ্টির উপর দিয়েও দিনটী কিরণমালীর প্রশান্ত কিরণেক মত আজ আনন্দ উজল হয়ে থাকুক। এইরূপে প্রত্যেকটী দিন কাটিয়ে দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তটী পর্য্যন্ত জগতের হিত-কামনা করতে করতে নূতন লোকে বিহার করবার আয়োজন কোরো।

—✱—

"দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ"। জগৎকে জগৎরূপেই দেখ, তাকে

ক্ষতি নাই, কিন্তু তাকে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলে জানতে হবে। জ্ঞানীর চোখে জগতের এমন একটা তাৎপর্য্য দেখা দেয়, যা অজ্ঞানী কখনও কল্পনাও করতে পারে না। যে পড়্তে জানে না, তার কাছে বইয়ের পাতা কেবল কতগুলি কালীর আঁচড় মাত্র। যে পড়্তে জানে, সে-ও সেই কালীর আঁচড়ই দেখ্ছে বটে, কিন্তু তার কাছে রেখাগুলোর একটা তাৎপর্য্য আছে। বরং রেখাগুলো তার কাছে তুচ্ছ। রেখার সাহায্যে যে ভাব ফুটছে, তাদের আড়ালে যে ভাব রয়েছে, তাই তার কাছে বড়। জ্ঞানীর কাছেও জগৎটা এমন। জগতের নামরূপ আছে, জ্ঞানী তা শুনতে পাচ্ছেন, দেখ্তে পাচ্ছেন—আর দশজনের মতই শুনছেন, দেখছেন—কিন্তু জগতের আসল অর্থ যে ব্রহ্ম, এ ভাবটির ক্ষণিক ব্যতিক্রম তাঁর কাছে হচ্ছে না। এমনি করে জ্ঞানময়ী দৃষ্টিতে জগৎকে ব্রহ্মময় দেখ্তে হবে।

ব্রহ্ম কি ? না সবার উৎস তিনি, সবার মূল তিনি। মূল ধরে জগতের দিকে দৃষ্টি ফেল। শুধু বিকারটাকেই দেখো না, কারণকে দেখ্তে চেষ্টা কর। রূপ দেখে ভাবের আভাস বুঝতে চেষ্টা কর, স্থূল থেকে সূক্ষ্মকে ধারণা করতে শেখ। জগৎকে জড়ের বিকাশ বলে দেখার চেয়ে তাকে প্রাণের বিকাশ বলে দেখা সত্যকার দেখা। তার চেয়ে তাকে বাসনার বিকাশ বলে দেখা আরও বড়। সব চেয়ে বড় তাকে চৈতন্যময় দেখা—শুধু দেখা নয়, তোমার চৈতন্যের সঙ্গে তাকে এক বলে অনুভব করা। এ কথা তোমার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যেমন খাটে, সমস্ত জগতের পক্ষেও তেমনি খাটে। এই হল সত্যদৃষ্টি।

—•—

ধ্যান ধরে শান্ত হয়ে চলব বলে সংকল্প করে কিছু সময় কাটাতে পারলেই সেটুকু দিয়ে তোমার চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যাবে না। সাধারণ চলা ফেরার মাঝেও যখন জগতের সমস্ত বস্তুকে শান্তিরসাপ্লুত দেখবে, নিজের মাঝে আত্মশ্লাঘার বিন্দুমাত্র উদ্রেক হবে না, অথচ প্রতি কর্ম্মে পরিপূর্ণ বীর্য্যের স্ফুরণ অনুভব করবে, তখনই বুঝবে মন শান্ত হয়ে এসেছে। ভগবান্ বলেছেন—যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ যে নিজে কারও দ্বারা উদ্বেজিত না হয়, অন্যকেও উদ্বেজিত না করে, সেই শান্ত সমাহিত জনই আমার ভক্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য

জগদ্গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব এবং অত্রত্য সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি-আশ্রমের ১৭শ বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে ২৪শে বৈশাখ হইতে ২৬শে বৈশাখ পর্য্যন্ত আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মার পূজা, হোম, আরত্রিক, বেদমন্ত্র গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদ্ পাঠ এবং নাম-কীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। যোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও মঠের নিকটবর্ত্তি গ্রামের ভক্তমণ্ডলী উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যজ্ঞান্তে সমাগত ভক্তগণ নির্ম্মাল্য ও যজ্ঞীয় তিলক ধারণ করেন পরে ফল, মূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রসাদ বিতরিত হয়। দরিদ্র নারায়ণ সেবার

ব্যবস্থা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এবার বঙ্গদেশবাসী শিষ্যভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুপাটের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান না করিয়া সেবকগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে কৃপণতা করিয়াছেন।

উৎসবে সাহায্য প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মাইতি ১০৲, শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস ১০৲, শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র পাল ১০৲, সন্দীপবাসী ভক্তগণ ১০৲, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাস গুপ্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত তারানাথ দাস মণ্ডল ১০৲, শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ৮৲, শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন কুণ্ড ৫৲, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দত্ত ৫৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲, শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র সরকার ৩৲, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী ৩৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার কর্ম্মকার ২॥০, শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত ললিত কুমার দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গাঙ্গুলী ২৲, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বসু ২৲, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দাস ২৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি ২৲ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার রায় ২৲, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত তারকদাস চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু ২৲, শ্রীযুক্ত বামাচরণ চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীযুক্ত জানকী মোহন রায় চৌধুরী ২৲ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস নন্দী ১৲, শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত গোলক চন্দ্র শর্ম্মা ১৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ ১৲, শ্রীযুক্ত রস মোহন চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীযুক্তা কাত্যায়নী দেব্যা ১৲, শ্রীযুক্তা তরু বালা গুপ্ত ১৲, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ নিয়োগী ১৲, শ্রীযুক্ত হরিনাথ কর ১৲, শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র পুততুণ্ড ১৲, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় ১৲, শ্রীযুক্ত শশী কুমার দাস গুপ্ত ১৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ সিংহ ১৲, শ্রীযুক্ত মুকুন্দ চন্দ্র সিংহ ১৲, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশ্বর ডাকুয়া ১৲, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দলই ১৲, শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র দাস ১৲, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দে ১৲, শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত ভৈরব চন্দ্র হাজরা ১৲, শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত পশুপতি দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ ঘোষ ॥০ শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার দাস ॥০, শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র মোদক ॥০, শ্রীযুক্ত হরিধন গাঙ্গুলী ॥০, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস ॥০, শ্রীযুক্তা [illegible] দেব্যা ॥০, শ্রীযুক্তা উমা সুন্দরী দেব্যা ॥০,।

ওঁ তৎ সৎ
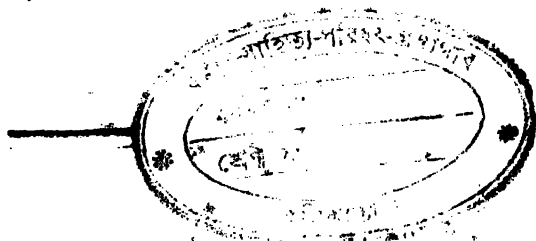
(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } আষাঢ় { ৩য় সংখ্যা

শক্রাভিজ্ঞানম্

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।২।১·]
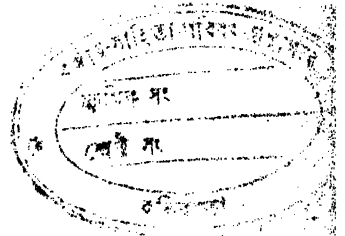
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো
যং যুধ্যমানা অহসে হবন্তে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব
যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানান্
অমন্যমানান্ ছর্ব্বা জঘান।
যঃ শর্দ্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং
যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে
শুষ্মাচ্চিদস্য পর্ব্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহু-
র্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥

যঃ সুন্বন্তমবতি যঃ পচন্তং
যঃ শংসন্তং যঃ শশমান ঊতী।
যস্য ব্রহ্ম বর্দ্ধনং যস্য সোমো
যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ॥

তাঁরে ছেড়ে রণজয় আকিঞ্চন করে কোন্ জন?—
সমর-সঙ্কটে যাঁরে ত্রাণহেতু করে আবাহন,
যাঁহার প্রতিমা মানি চরাচর এ বিশ্ব ভুবন,
অচ্যুতের চ্যুতিকারী—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

কত শত মহাপাপী আছে হেন—ইন্দ্রে নাহি মানে—
রুদ্র রোষে বজ্রধর তাহাদের শিরে বজ্র হানে।—
স্পর্দ্ধিতেরে সিদ্ধি নাহি যে দেবতা দেন কদাচন,
দস্যুরে নাশেন যিনি—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

দ্যুলোক প্রণমে তাঁরে—এই পৃথ্বী লোটে তাঁর পায়;—
তাঁরি বীর্য্যে হীনগর্ব্ব—কাঁপে ভয়ে পর্ব্বতের কায়।—
বজ্রবাহু, দৃঢ়কায়—সোমরস করি আস্বাদন—
বজ্রধারী ভয়ঙ্কর—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

যজ্ঞহবিঃ করে পাক, সোমরস করে অভিষব—
স্তুতি গাহি দেয় প্রীতি—তারে রক্ষা করেন বাসব।—
স্তোত্রে যাঁর বাড়ে তেজ, সোমপানে যাঁর আপ্যায়ন—
এই অন্ন যাঁর তরে—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

পরিবাদের প্রতিবাদ

জীবন যুদ্ধে জয় কার? প্রেমের। যে সমস্ত সম্প্রদায় হৃদয়ে এক, বুদ্ধিতে সুসমঞ্জস, যাদের কাছে কর্ম্ম প্রেমের সেবা—তারা মুষ্টিমেয় হলেও তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আর যাদের শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করছে, তাদের পরাজয় হবেই।

সংগ্রাম তিন রকম—(১) অসমানের সঙ্গে, (২) সমানে সমানে, (৩) প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রভৃতির দরুণ আপনাদের মাঝে লড়াই করে শক্তি ক্ষয় না করে যদি মিলে-মিশে থাকতে পারা যায়, অর্থাৎ সমানে সমানে যদি সখ্য হয়, তবে অসমানের সঙ্গে যুদ্ধে জয় হবেই।

আর অসমান বা বিরুদ্ধভাবের সঙ্গে লড়াই না করে যদি সংপ্রেম ব্যবহার করা যায়, তবে প্রকৃতি সংগ্রামে জয় লাভ অনিবার্য্য, ভূত সমূহের উপর আধিপত্য করা তখন সহজ। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার অর্থই হচ্ছে, "আমিই যে সকলের নিয়ন্তা"—এই ভাবটী স্থূল জগতে ধারণা করা।

কেউ যদি সমালোচনা করতে যায়, তবে মনে হতে পারে, তার মাঝে যেন একটা আক্রমণ করবার ভাব রয়েছে, কিন্তু আসলে সমালোচক কিন্তু আত্মরক্ষা করবার জন্যই ব্যস্ত। কারু একটা কু অভ্যাস দূর করতে হলে তার সকল রকম কুফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে খুব কড়া সমালোচনা করা দরকার। যদি দেখি, একজন একটা বদভ্যাস ছাড়তে পারছে না, তবে পাছে তার সঙ্গগুণে আমাদের মাঝেও সে ভাব সংক্রামিত হয়, এই ভয়ে আমরা তার ছায়াটী মাড়াতে চাই না। পুরোণো একটা অভ্যাস ছাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে নূতন একটা অভ্যাস গড়ে উঠবে, একটা নূতন দৃষ্টি খুলে যাবে। জগতের উন্নতি হওয়া যতদিন অবধারিত থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত সমালোচনা আর তুলনার প্রবৃত্তিও থাকবে। এই সমালোচনা-বুদ্ধি বা তুলনা-বুদ্ধিকে মন্দ বলা যায় না—একে দূর করাও সম্ভব নয়—কিন্তু এই বুদ্ধিতে যে বিষ আছে, যাতে উভয়পক্ষের মাঝে একটা ব্যক্তিত্ব-বোধ জেগে ওঠে, সেইটাই হল যত নষ্টের গোড়া। আমাদের মাঝে যে তুচ্ছ আমিত্বের খুঁতটুকু রয়েছে, তাতেই তো পাপের সৃষ্টি। দূর করে দাও ওই আমির জঞ্জাল! তাহলে আমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে—বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে, দার্শনিকের প্রশান্তি নিয়ে, আমরা তখন জগতের দিকে তাকাতে পারব। রাসায়নিক বা উদ্ভিদবিদ্ যেমন নির্ব্বিকার থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটা রাসায়নিক দ্রব্য বা উদ্ভিদ দেখতে পারেন—যার পরীক্ষা চলছে, তার সঙ্গে ঘুলিয়ে যাবার কোনও রকম সম্ভাবনা যেমন তাঁদের নাই, তেমনি করে আমাদের জগৎকে দেখতে হবে। সূর্য্যের মত সাক্ষী থেকে সবাইকে দেখতে হবে—কাঁটায়-গোলাপে, বনে-উপবনে—নর-নারী, জীব-জন্তু, গাছ-পালা—সবার উপর আলো ঢেলে দিতে হবে।

প্রেমের রাজ্য হতে বাঁচতে হলে কেবল মাত্র স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলা প্রয়োজন। রাজনীতির খিটিমিটির হাত হতে বাঁচতে হলেও তেমনি আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলতে হবে। তার সূত্র হচ্ছে—তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।

ত্যাগ অভ্যস্ত হলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাও সোজা, দুঃখে কষ্টে থাকাও সোজা। "যজ্ঞে অকল্যাণ দূর হয়"—এ কথা প্রাচীন যুগেও যেমন খাটত, এখনকার যুগেও তেমনি খাটবে—তবে কি না এখন আর আগেকার মত যজ্ঞে কেবল নির্দ্দোষ প্রাণীগুলিকে বধ করলে চলবে না—আমাদের সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতিকে প্রেমের বেদীতে বলি দিতে হবে—তাতেই স্বর্গ এই পৃথিবীতে নেমে আসবে।

সমালোচনা আসে ভারকেন্দ্র সমান রাখতে। গাছ-পালা ছেঁটে দিলে আরও ঝাঁকড়া হয়ে ওঠে। সমালোচনাও তেমনি ভগবানের কলম-ছাঁটা বিধান—ওতে আমরা আরও সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠি। সমালোচনার কাঁচিতে যখন কাটা পড়, তখন তোমার মাঝে কোন্ ভাবের লীলা চলে, একবার পরখ করে দেখো তো! নিশ্চয়ই তখন নীচভাবের দিকে মনটা ঝুঁকে পড়তে থাকে—আর ঠিক এইখানেই সাবধান হয়ে যেতে হবে। একটা আঁকাবাঁকা সমুদ্রের খাড়ির মাঝে ডুবো পাহাড়ের উপর দিয়ে স্রোতের বেগে যার নৌকা ভেসে চলেছে, তাকে অবস্থা বুঝে কতখানি হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে বল দেখি! একবার পাহাড়ে নৌকা ঠেকলেই তাকে হুড়্মুড়্ করে উঠে পড়তে হবে। এই ধাক্কাটার যদি কোনও সার্থকতাই না থাকত, তাহলে এটা তো তার খেয়ালেই আসত না। যাকে আমরা দুঃখ বলি, তা বাস্তবিক ভাবী বিপদেরই সঙ্কেত। সত্যের পথে চলতে হলে মানুষের এমন আঘাত পাওয়াই প্রয়োজন।

শত্রুর কাছ থেকেই হোক, আর মিত্রের কাছ থেকেই হোক, সমালোচনার আঘাত পেলেই বুঝতে হবে—এই দুঃস্বপ্ন তোমার বুকে চেপেছে, তুমি "আত্মস্বরূপে" ব্রহ্মস্বরূপে জাগবে বলে। জাগলে পরে দুঃস্বপ্ন থাকে কোথায়?—তখন মনে হয়, স্বপ্ন তো কোনও কালেই সত্য ছিল না। প্রেমের আইন যখন নিজেদের হুকুম করে নিই, তখন সব ক্ষতিই পরম লাভ হয়ে ওঠে।

কিন্তু 'সর্ব্বময়ের' সঙ্গে যখন আমরা এক হয়ে গিয়েছি, তখন কোনও বঞ্চকেরই তো সাধ্য নাই যে আমাদের বঞ্চিত করে। ঘর আঁধার থাকলেই চোর সেঁধোয়। যার মাঝে যথার্থ নেতৃত্বশক্তি রয়েছে, সে কখনো এমন অভিযোগ করবে না যে, যারা তার সাহায্য করতে এসেছিল, তারা সব বোকা, তার চেলারা বিশ্বাসঘাতক, মানুষজাতটাই অকৃতজ্ঞ বা সাধারণ লোকে কখনও গুণীর গুণ বুঝে না ইত্যাদি। এই যে জীবনের খেলা সুরু হয়েছে, তার মাঝে এই সমস্তই রয়েছে। হতাশায় বা পরাজয়ের দুঃখে তাদের সামনে মুসড়ে না পড়াই হচ্ছে শক্তির পরিচয়। শুধু নিষ্প্রয়োজন সংঘর্ষে চিত্তের যে শক্তি ক্ষয় হয়, তা হতে যদি বাঁচতে পার, তবে জগতে কোন্ কাজটা তোমার পছন্দমত সমাধা হবে না?

হে প্রেম, হে আনন্দময় অমৃতময় প্রেম, যুগ যুগ ধরে তুমি আমার সঙ্গে একি লুকো-

চুরি খেলছ। কখনও বা তুমি শত্রুর অন্তরালে, কখনও বা মিত্রের অন্তরালে লুকোচ্ছ—কখনও বা সমালোচনায়, কখনও বা প্রশংসায় গা ঢাকা দিচ্ছ। এই দেখি, তুমি আনন্দে, তুমি গর্ব্বে—আবার এই দেখি তুমি অবসাদে, তুমি বেদনায়; আবার মুহূর্ত্ত পরেই দেখি জীবনের নিদারুণ সমস্যায় লাভ ক্ষতির হিসাবের ধূলিজালে কোথায় তুমি লুকিয়ে পড়েছ, স্মৃতির আড়াল হয়ে গিয়েছ। ওগো প্রেম, এমনি করে লুকোচুরীই তুমি খেলছ!

জীবনে পরীক্ষার সংঘর্ষ—আঘাত, প্রতিঘাত, হাসি, আনন্দ, দীর্ঘশ্বাসের বিচিত্র সমাবেশে এক আশ্চর্য্য রসায়নপ্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে—এক অত্যাশ্চর্য্য বৈদ্যুতী শক্তিতে সব পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে, সমস্ত আসক্তির আকর্ষণ বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভালবাসা, ঘৃণা, আসক্তি, বিরাগ, ভাবনা—এই সমস্ত মনোবৃত্তির খাদ থেকে আমার হৃদয় কন্দর হতে নব্য রসায়ন কি আবিষ্কার করেছে?—এক অনন্ত গৌরবের রেডিয়াম খণ্ড*; এ আশ্চর্য্য কাহিনী নয় কি? হে প্রেম, হে আনন্দনিলয় প্রেম, এমনি করে যুগ যুগ ধরে তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলছ।

আমার হৃদয়ের রেডিয়াম হতে যে রঞ্জন রশ্মির(*) ছটা বেরিয়েছে, তাতে সমস্ত বস্তু সব দিক হতে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। এ কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞান!—হে প্রেম, হে আনন্দ-নিকষিত হেম, তুমি যুগ যুগ ধরে এ কি লুকোচুরী খেলছ আমার সঙ্গে?

এই যে তীব্র সমালোচনা—এ ধাঁকুনীও বটে, আবার ঠেকনাও বটে। তুমি শত্রু? তুমি মিত্র?—না গো, অস্বচ্ছ আবরণের অন্তরালে আর নিজকে গোপন রাখতে পারছ না তুমি—তোমার সব রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তুমি যে সাত রাজার ধন মাণিক—হে আত্মা, হে অকলঙ্ক রেডিয়াম, তোমার তীব্র জ্যোতিঃতে যে সকল আবরণ ইন্ধনের মত ভস্ম হয়ে যাবে। তোমাকে কৌটায় পুরে রাখবে কে? তুমি কি থলেতে থাকবে, না বাক্সে, না তোরঙ্গে? মিথ্যার সমস্ত স্তূপ সাবাড় যে তুমি পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। হে সত্য, হে জ্যোতির্ম্ময় রেডিয়াম, হে সর্ব্ব গ্রাসী আত্মা, হে প্রেম, হে শান্তিময় চির ক্ষেম, যুগ যুগ ধরে তুমি এমনি করেই আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে এসেছ?**

* ফরাসী দেশের মাদাম ক্যুরির আবিষ্কৃত এক অত্যাশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থ। এক টন পিচ্-ব্লেণ্ড নামক খনিজ পদার্থ হইতে এক কণিকা মাত্র রেডিয়াম পাওয়া যায়। ইহার তাপ ও আলো বিকিরণ করিবার শক্তি বিস্ময়কর। এরূপ তেজস্কর পদার্থ ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যপিণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়াম আছে বলিয়া মনে করেন—এবং ইহার সাহায্যে জড়-জগতের উপাদান-রহস্য উদ্ভেদ করিবেন বলিয়া আশা করেন।

(*) জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক রোণ্ট্‌জেন দ্বারা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত আলোকরশ্মি। সাধারণ আলোকের পক্ষে যাহা অস্বচ্ছ, এমন বস্তুকে ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থকে আলোকিত করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ধাতু, অস্থি, মাংস ইত্যাদি আবরণের অন্তরালস্থিত বস্তুর আলোক চিত্র উঠাইতে পারা যায়।

** স্বামী রামতীর্থ

মনোলয়

—•—

(নিবৃত্তিমার্গ)

আত্মা স্বপ্রকাশ ও জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহা হইতে সততই জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। নির্ম্মল আকাশে মেঘোদয়ে যেমন পৃথিবীর কতকাংশ তমসাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ অন্তরে কোন প্রকার কুভাবের উদয় হইলে, জীব আত্ম-সান্নিধ্য-তেজ হইতে বিযুক্ত হয়। অন্তরে হীন ভাবের উদয়ে আত্মবিস্মরণ হয় এবং এই আত্মবিস্মরণে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহার ঘনীভূত সমষ্টিই মন নামে অভিহিত। এই মনই মানবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। মন স্বভাব-চঞ্চল, চিন্তাই তাহার ধর্ম্ম। বিষয় হইতে বিষয়ান্তর লইয়াই সে ব্যস্ত। কোন এক বিষয়ে মন বহুক্ষণ সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ইহাই মনের বিশেষত্ব। বিষয়াভিলাষ ও সংকল্পবিকল্পরূপ বৃত্তি-বিশিষ্ট মন অশুদ্ধ; এবং বিষয়-বাসনাবিমুক্ত প্রশান্ত মন শুদ্ধ।

জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা, যোগ, ভক্তি, পূজা অর্চ্চনা যাহা কিছু করি না কেন, তৎ-সমস্তই এই চঞ্চল মনকে স্থির করিবার জন্য। একবার মনঃস্থৈর্য্য হইলে পরে শুদ্ধাশুদ্ধ অবস্থার অতীত "অমনীভাব" সিদ্ধ হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা মনে বহির্জ্জগতের যে অনুভূতি হইতেছে, সেই অনুভূতি হইতে মনে বাসনা জাগিতেছে, পুনরায় সেই বাসনা কার্য্যে পরিণত হইতেছে অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা মন স্থূল সংস্পর্শজাত বিষয়রস ভোগ করিতেছে। কিন্তু ভোগে যে সুখের উদয় হইতেছে, তাহা ক্ষণিক ও খণ্ডিত সুখ মাত্র। তজ্জন্য মন তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া পুনরায় সুখেচ্ছায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। প্রকৃত সুখ কি এবং কোথায় অবস্থিত, তাহা না জানিয়া ইন্দ্রিয়পরিচালিত হইয়া ভ্রান্ত হইতেছে। ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্য করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এই উচ্ছৃঙ্খল মনকে বাধা প্রদান না করায় মানব কোন্ অনন্তকাল হইতে নীরবে এক দুঃখের বোঝা মস্তকে ধরিয়া ইহলোকে ও পরলোকে কেবলই ছুটাছুটি করিতেছে। পুনঃ পুনঃ জননীজঠরে আগমন করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ভূমিষ্ঠ হইয়া এক ধারাবাহিক দুঃখ সহিয়া মৃত্যুর পর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকের কর্ম্মের প্রতিঘাত সহিয়া আসা যাওয়া করিতেছে। এই আসা যাওয়ার ভিতর কি কোনও উদ্দেশ্যই নাই?—উদ্দেশ্য আছে।

নানাযোনিশতং গত্বা শেতেসৌ বাসনাবশাৎ।
বিমোক্ষাৎ সঞ্চরত্যেব মৎস্যঃ কূলদ্বয়ং যথা॥
ততঃ কালবশাদেব হ্যাত্মজ্ঞানবিবেকতঃ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থানাৎ স্থানান্তরং ক্রমাৎ॥

—মৎস্য যেমন নিজের মুক্তির জন্য নদীর উভয় কূলে বিচরণ করে, সেইরূপ জীব স্বীয় মুক্তির জন্য ইহলোক ও পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। অতঃপর কালক্রমে আত্ম-বিবেক-জ্ঞান বলে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অজ্ঞ মানব জানিতে চাহে না যে কেন

এত আসা-যাওয়া—এই ভবের হাটে আসিয়া বিচার-হীন গতানুগতিকভাবে কেনই বা সে জীবন যাপন করে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নেশার ঘোরে পথহারা হইয়া আপন গৃহ না জানিয়া এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া নেশা ছুটিলে আবার স্বগৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ নেশার ঘোরে ছুটিতে ছুটিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন এক সুকৃতির ফলে জীবনে এমন সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়—যে সুযোগকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলে অশেষ কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়।

"সৎকর্ম্মপরিপাকতো বহুনাম্ জন্মনামন্তে নৃণাং মোক্ষেচ্ছা জায়তে। তদা সদ্‌গুরুমাশ্রিত্য চিরকালসেবয়া বন্ধাৎ মোক্ষং কশ্চিৎ প্রয়াতি।"

—সৎকর্ম্মের পরিপাকবশতঃ বহুজন্মের অবসানে মনুষ্যের মোক্ষলাভের ইচ্ছা জন্মে। তখন সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেবা দ্বারা কোন ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।

অধিকারিভেদে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনায় বল যাহার যত অধিক, তাহার নিকট শ্রীভগবান্ তদুপযুক্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন। সাধক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হইবেন।

"গৃহীত্বা মম মন্ত্রাণি সদ্‌গুরোঃ সুসমাহিতঃ।
কায়েন মনসা বাচা মামেব হি সমাশ্রয়েৎ॥"

—মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বাক্য মন ও শরীর দ্বারা আমারই আশ্রিত হইবে।" এখান হইতেই সাধকের মনঃস্থৈর্য্যের আরম্ভ। এক্ষণে সাধকের দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি এবং ইহা সার্ব্বভৌম প্রয়োজনীয়তা কিনা, তাহা বুঝিতে হইবে। দীক্ষা অধিকারিভেদে। উত্তম অধিকারীর দীক্ষার প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহারা সর্ব্বত্রই ঈশ্বরসত্তা অনুভব করিবার শক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন। তবে এতাদৃশ ব্যক্তি অতীব বিরল। এতদ্ব্যতীত মধ্যম ও অধম অধিকারীর পক্ষে গুরুদীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আত্মা নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ, তিনি মানবের হৃদয়কন্দরে গুপ্ত ভাবে আছেন। সিদ্ধগুরুর স্বরকম্পনে, ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে সেই নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ যেন বিকারগ্রস্ত হইয়া মন্ত্রমূর্ত্তিতে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় দান করেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ পরিচিত কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হয়, তদ্রূপ তিনি সিদ্ধগুরুর চিরপরিচিত মন্ত্রের ঝঙ্কারে জাগ্রৎ হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু সিদ্ধগুরু ব্যতীত মন্ত্রের স্বরকম্পনও হয় না —ঝঙ্কারও উত্থিত হয় না; কাজেই কোনও ফলোদয়ও হয় না।

জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে এবং ঝটিকাবেগে তরী ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া কর্ণধার যেরূপ মহাবৃক্ষে তরী দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করে, তদ্রূপ মানব সংসারের মহা অনর্থের কবল হইতে নিস্তার পাইতে সিদ্ধগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অধিকারিভেদে গুরু পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া আছেন। যিনি যে প্রকার পুঁজিপাটা সঙ্গে আনিয়াছেন—তাঁহার তদুপযুক্ত গুরু সময় হইলেই মিলিবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"পত্নী, গুরু, ভর্ত্তা, শুভাশুভ ফল, মন্ত্র, শিষ্য, পুত্র ইত্যাদি দৈবনিবন্ধক্রমে লব্ধ হয়।"

গুরুদীক্ষা ব্যতীত মানবের ধর্ম্মকার্য্য সবই বিফল। তাহার কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। তাহার ধ্যান-ধারণা, পূজা অর্চ্চনা সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।

গুরুকরণ সম্বন্ধে কাহারও কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। তবে যিনি নিজে শক্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন, শিষ্যে শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁহাকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদজ্ঞান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, এতদ্ব্যতীত অন্যকে গুরু করিলে পারমার্থিক কিছুই লাভ হইবে না—যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।"

অর্থাৎ আচার্য্যের সহিত আমাকে (ভগবানকে) অভেদ জানিবে।

অন্যত্র শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"আমি গুরু সেবা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, গৃহস্থ-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অথবা যতিধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ হই না।"

"গুরু কৃপা হইলেই পুরুষ শান্তিপূর্ণ হয়।"

কিন্তু গুরুকে মানুষজ্ঞানে সমস্তই বিফল হইবে। কারণ গুরু আত্মশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া স্বরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন—প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই, জীর্ণবাসের ন্যায় এই আপাতদৃশ্য স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। এতাদৃশ ব্যক্তির সহিত ভগবান অভেদ। তজ্জন্য গুরু সেবা অর্থই ভগবৎ সেবা। তবে যাঁহারা সাধারণ গৃহস্থের নিকট বা পিতৃ-পিতামহের গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধ-পুরুষকে উপগুরু বা শিক্ষাগুরুরূপে আশ্রয় করিতে পারেন—শাস্ত্রে সে ব্যবস্থাও আছে। —"গুরোঃ গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।"

দীক্ষার পর হইতেই গুরুর দায়িত্ব আরম্ভ হয়। গুরুর দায়িত্ব বড়ই ভীষণ। বোধ হয় এরূপ দায়িত্ব জগতে আর কাহারও নাই। তিনি শিষ্যকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় লইয়া যাইবার জন্য দায়ী হন। অতএব সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে যত্ন করিবে। সিদ্ধগুরুর নিকট দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, উচ্চ অধিকারী হইলে মন্ত্রের ঝঙ্কার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র হৃদয়াভ্যন্তরে ইষ্টমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম সূর্য্যোদয়ে তমের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। এই প্রকারে অনেক মহাশক্তিসম্পন্ন জীবন্মুক্ত সিদ্ধমহাপুরুষ পাপী তাপীকেও শিষ্যত্বে বরণ করিয়া পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাঁহারা প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত শিষ্যের কল্যাণার্থে তাহাদের ভিতর নিজশক্তি সঞ্চার করেন এবং যখন সময় হয়, তখন শিষ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। যে আকর্ষণে গোপী-বৃন্দ স্বামী পুত্র, গৃহদ্বার আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া অশন-বসন ভুলিয়া গিয়া পরমপুরুষের সহিত মিলিয়াছিলেন—যে আকর্ষণে যমুনা উজান বহিয়াছিল—সেই আকর্ষণে আকুল হইয়া শিষ্যও শ্রীগুরুর পানে ছুটিয়া যান এবং সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া তদেকচিত্ত হইয়া তাঁহাতেই লীন হইয়া যান।

গুরুকৃপাই আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। তাঁহার কৃপা অবিরতই শিষ্যদের উপর বর্ষিত হইতেছে। তবে বর্ষাবারি যেমন পঙ্কজে বিশ্রান্তি লাভ করে, তদ্রূপ শিষ্যের গুরুকৃপা আকর্ষণের শক্তি থাকা চাই। গুরুর মন বুঝিয়া নিতান্ত ক্রীতদাসের ন্যায় প্রফুল্লমনে তাঁহার সেবার দ্বারা কৃপা আকর্ষণ করা যায়। যাঁহারা গুরুসেবা করিবার ভাগ্য

করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের ধ্যানধারণার কিছুরই প্রয়োজন নাই। সময় হইলে গুরু শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাতে এরূপ শক্তি সঞ্চারিত করেন, যাহাতে পাঁচশ বৎসরের ধ্যানের ফলে যাহা হয়, তাহার বহুগুণ গুরুকৃপায় মুহূর্ত্তে অর্জ্জিত হয়। তবে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকায় কর্ম্মবশে সংসারে সংসারী সাজিয়া গুরুকৃপা লাভ করিতে হইলে গুরুর মানসিক সেবা চাই। যেরূপ তাড়িৎ ঘণ্টার (Electric Bell) বোতাম টিপিলে বহুদূরে শব্দ হয়, তদ্রূপ গুরু ধ্যানের ফলে গুরুর হৃদয়ে চিন্তা বা দয়া উঠে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিতে শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, গুরু দীক্ষায় অমনীভাব কি প্রকারে সিদ্ধ হয়। গুরুর মন্ত্র মনঃস্থৈর্য্যের সহায়ক। "মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ স মন্ত্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ সমস্ত বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া মন্ত্রমূর্ত্তিতে মনন করিতে হইবে। মনন অর্থাৎ মন্ত্রের মনোময়ী মূর্ত্তির একান্ত চিন্তনই হইল, বিষয়ান্তর হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিবার উপায়। ইহাই হইল আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। অধ্যাত্ম জীবনে আমরা শিশু। শিশুকে যেমন গৃহের বাহিরে নানা বিপদাশঙ্কায় গৃহপকোষ্ঠে নিবদ্ধ করিতে হইলে সুন্দর ক্রীড়নক দ্বারা তাহার মন আকৃষ্ট করিতে হয়, তদ্রূপ আমরাও অন্তর্জগতে শিশু বিধায় চঞ্চল মনকে বিষয় বিমুক্ত করিতে হইলে মনোময়ী মূর্ত্তিতে সুদৃঢ় ভাবে সংলগ্ন করিতে হইবে। বাস্তবিক আমাদের রূপ উপাস্য নহে। অরূপে পৌঁছিতে হইলে রূপের আশ্রয় লইতে হয়। নদীর অপর পারে যাইতেই তরীর প্রয়োজন, পরপারে পৌঁছিলে তরীর আর আবশ্যকতা নাই।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

—সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় অশরীরী দেহাদিদোষশূন্য অমূর্ত্ত ব্রহ্ম এক রূপ পরিগ্রহ করেন।

অনভ্যাস্য রূপস্য স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
যস্যাঃ সূক্ষ্মস্বরূপং মে দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥

—যাহা দেখিলে মুক্তিলাভ করা যায়, সেই সূক্ষ্মরূপ দর্শনে অধিকার আমার স্থূলরূপ ধ্যান না করিলে হয় না।

কিন্তু কি প্রকার স্থূল রূপ সাধকের উপাস্য? মনের অবলম্বন স্বরূপ শ্রীভগবানের অনন্ত রূপের ভিতর যে কোন এক শ্রীমূর্ত্তিতে যদি স্বাভাবিকী ভক্তির উদয় হয়, সে মূর্ত্তি যদি নয়নরঞ্জন এবং মনোভিরাম হয়, মন যদি তাহাতে একান্ত নির্ভর করিয়া আনন্দরসমাধুর্য্যসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারে, তবে সেইরূপ মূর্ত্তিকে মনের চিন্তার বিষয় করিতে হইবে।

"ধ্যানন্তু নিয়মে দৃষ্টিসৌকর্য্যাৎ।"

অর্থাৎ যে রূপ চিন্তা করিলে নেত্র তৃপ্ত হয়, সেই রূপই ধ্যান করিবে।

দৈহিক চেষ্টা ধ্যানের পক্ষে অনুকূল নহে। দৈহিকচেষ্টায় শ্বাসবায়ু অসংযত হয়। এই শ্বাসের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্বাসবায়ু কর্ত্তৃক চিত্ত তরঙ্গায়িত হয়। তজ্জন্য শ্বাসের স্থৈর্য্য, দৃষ্টির স্থৈর্য্য ও মনঃস্থৈর্য্যের অনুকূল বিধায়, সাধক স্থিরভাবে কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া কিছুক্ষণ দৃষ্টি কোনও স্থির পদার্থে নিবদ্ধ করিবে। তৎপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অভীষ্ট মূর্ত্তির ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে। মূর্ত্তির ধারণা হৃদয়েই করিতে হয়।

পুটদ্বয়াদ্বিনির্ম্মুক্তো বায়ুর্যত্র বিলীয়তে।
তত্র সংস্থং মনঃ কৃত্বা তং ধ্যায়েৎ পার্থ ঈশ্বরং॥

অর্থাৎ যেখানে শ্বাসের লয় হয়, সেই স্থানেই ধ্যান বিধেয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীনন্দ

—*—

ক্রমে নন্দের আনন্দবাহিনী চিদম্বরমের মন্দির দুয়ারে উপনীত হইল। নন্দের হৃদয় যেন তখন সঙ্গীতের অফুরন্ত প্রস্রবণ—তাঁহার কণ্ঠ হইতে আনন্দের সুধাধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মন্দির দুয়ারে আসিয়া নন্দ গান ধরিলেন—"এই তো আমি কৈলাসের স্বর্ণ-দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শুদ্ধচিত্ত সাধক ছাড়া অপর কাহারও তো এ দুয়ার পার হইবার অধিকার নাই—আর যে একবার এ দুয়ার পার হইয়াছে, সে আর ফিরিয়া যায় না। সাধকশ্রেষ্ঠ মাণিককার এই দুয়ার পার হইয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দিব্যোন্মাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে একদিন মন্দিরের অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল—মহাকবি, মহাসাধক অপ্পরের বেদগানে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার উঠিয়াছিল। তারপর আসিলেন প্রেমিক কবি সুন্দরর—এই চিরপ্রেমময়ের মিলনাভিসারে। দেখ ভাই—এ কি অপরূপ ঠাঁই—এখানে দেবতা আছেন, আবার তিনি নাই-ও। তিনি এখানে সাকার হইয়াও আবার নিরাকার। এখানে তিনি চিরনৃত্যশীল, আবার শান্ত সমাহিত। এখানে আসিলে যাহারা কিছু জানে না, তাহারাই তাঁহাকে জানিতে পারে, আর যাহারা বলে, তাঁহাকে জানি—তাহারাই জ্ঞানহারা হইয়া যায়। আকাশ এখানে—জ্যোতিঃ মাত্র এখানে; এইখানেই সৃষ্টি—এইখানেই প্রলয়।

নন্দ ভাবস্থ হইয়া আবার গান ধরিলেন, "ওরে আমার রঙ্গিণী মন, দেখ্ তোর বঁধু-য়াকে! অনন্ত আকাশে তার মধুর নৃত্য দেখ্—দেখ্, সে নৃত্য হইতে প্রেমের মন্দাকিনা বহিয়া চলিয়াছে! ওই নৃত্যচঞ্চল চরণ দুটীর প্রেমে পাগলিনী আমি—তার বিরহে আমার প্রাণ যে যায়!"

তখন সকলে সমস্বরে গাহিতে লাগিল—"পরম নৃত্যকুশলী নটরাজ! তোমার নৃত্যের রঙ্গভূমি বাহিরে না অন্তরে?"

নন্দ আবার ধরিলেন, "দেখিয়াছি—দেখিয়াছি—আজ তার আনন্দমুরতি ধরা পড়িল! আমি তার নৃত্য ভালবাসি—আমি তাকেই ভালবাসি। সেও যে প্রেমরঙ্গে আমার মনের আঙ্গিনায় নাচিয়া ফিরে। ওরে রঙ্গিণী মন, দেখ্, দেখ—কি আনন্দ ছানিয়া তার মুরতি গড়া।"

সকলে সমস্বরে গাহিল—"মহাশিব—সদাশিব! রাজরাজ—নটরাজ—নিখিলের পরম শ্রেয় তুমি! শিব—শিব—সদাশিব—ব্রহ্মাণ্ড-অঙ্গন তোমার নৃত্যের রঙ্গভূমি!"

নন্দ গাহিতে লাগিলেন, "কি ছার এ মিছার জগৎ বন্ধু,—বন্ধু আর আমি যে এক—চিরমিলনে, রসমিলনে। ওরে আমার মন, তার কথা আমি কেমন করিয়া তোর কাছে বলি?—আমি যে কথা দিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি না।"

সকলে গাহিল, "অনন্ত অরূপ আকাশের যে সঙ্গীত—তাই সত্য—আর সমস্ত গীত মিথ্যা। মধুর আমাদের নটরাজের গীত—তার কাছে সংসারের গীত?—সে তো শুধু বাসনার কলরব!"

আবার অভিমানভরে নন্দ গান ধরিলেন,

"সে যে ত্রিনয়ন, কিন্তু তবুও কি সে অন্ধ? প্রেমে কত পাষাণ গলাইয়া দিল, কিন্তু নিজে কি সে পাষাণ নইলে আমার ব্যথায় তাহার হৃদয় গলিল না? আমি তো ছলনা জানি না —তবে সে আমায় ছলনা করে কেন? বল্ তো তোরা, আমি তার পায়ে কি অপরাধ করিলাম?

সকলে গাহিতে লাগিল, "দরিদ্রের নিধি তুমি নটরাজ—তুমি অমৃত জ্যোতিঃ—তুমি নিখিলপ্লাবিনী আনন্দধারা—তুমি বেদের শিরোমণি!"

এমনি করিয়া ক্রমে মন্দিরাঙ্গন হইতে নাচিয়া গাহিয়া তাঁহারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেন—অস্ফুট পদ্মকলির চারিদিকে মধু-লোভী ভ্রমরের মত নটরাজের চারিদিকে গুঞ্জরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কখনও নিকটে, কখনও দূরে নন্দের সুধাকণ্ঠ মন্দিরাঙ্গনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল—

"সখি, দেখ্ তোরা নিঠুরের নিঠুরালি! সে আমার সব নিয়াছে, তবুও কি তার পিপাসা মিটে নাই? আমাকে যাতনা দিবার জন্যই কি সে আমার সঙ্গ নিয়াছে? সে তো প্রেমের দেবতা, কিন্তু চোখে তার কিসের আগুন? আমাকে সে দগ্ধিয়া মারিল—কিন্তু আমার করুণ বিলাপ কি তার হৃদয় গলাইতে পারিল না? একবার একটু চোখের দেখার জন্য আমি পাগল—তবু কেবল আমার সঙ্গেই তার যত লুকা-চুরী!"

*

"নটরাজ, তুমি কল্পতরুর ছায়া—সেই ছায়ার সুষমা তুমি। তুমি শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা—তুমি পক্কশীর্ষ শস্যগুচ্ছের স্বর্ণরাগ। তুমি বিশ্বের সৌন্দর্য্য—তুমি প্রাণ—চির নৃত্যশীল তুমি নটরাজ!

"তুমি পূর্ণিমার জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নার সুধা-ধারা তুমি—তুমি আকাশের দীপ্তি—অন্তরে তুমি চিদাকাশ। তুমি প্রেমের ঠাকুর, আনন্দের দেবতা—তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ!—চির জ্যোতির্ম্ময় তুমি নটরাজ!

"জীবনের জ্যোতিঃ তুমি—প্রাণের জ্যোতির্ম্ময় শক্তি তুমি। তোমার আলোই বিশ্বের প্রাণ। তোমার করুণার অবিরাম ধারাসারে জগৎ সিক্ত।—অনন্ত জ্যোতির আধার তুমি নটরাজ!

"শ্রেষ্ঠগতি তুমি—তুমি সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল—তুমি আত্মস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। ঊর্দ্ধে —আরও ঊর্দ্ধে তুমি—তুমি চিরশান্তিময়—তবুও তোমায় পাই না কেন?—চিরজ্যোতির্ম্ময় তুমি নটরাজ!"

ততক্ষণে দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় আকাশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। নন্দের উদ্দীপনা আরও বাড়িয়া উঠিল—তিনি গাহিতে লাগিলেন—

"সুধাকর, তুমি আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, তুমি প্রেমিকের চিরসাথী—বলিয়া দাও, আমি কোন্ পথে যাইব, কোন পথে গেলে তাহাকে পাইব।

"সোহাগভরে তোমাকে সে মাথায় রাখিয়াছে—তুমি জান, সে কোথায়। তার প্রেমের পাথারে আমি ডুবিয়া মরিতে চাই—তুমি আমায় পথ দেখাইয়া দাও, সুধাকর!

"অনন্ত জীবনের সন্ধান তুমি পাইয়াছ কেননা নটরাজের চূড়ায় তোমার স্থান। মর্ত্ত্যজীবনের বিনিময়ে আমিও সেই জীবন চাই। আমার আমাকে আমি ফিরিয়া চাই—কিন্তু পথ যে দেখিতে পাই না। বল, ব-

সুধাকর—নির্জ্জন নিকুঞ্জে আমার প্রিয়তমের দেখা পাইব কি?—নিঠুর সে, অতি নিঠুর—নহিলে অদর্শনে এমন করিয়া কাঁদাইয়া মারে?—বন্ধু আমার বড় অভিমানী—বড় অভিমানী!

"তাঁহারই স্বরূপ পাইতে চাই আমি—আমি সে—সে আমি। বল বল কি করিয়া তাহাকে পাই—আর তো আমি সহিতে পারি না—প্রাণ যে যায়। এই তো দেখি, জগতে পঞ্চফণা ফণীকে সে নাচাইবে কি! (পঞ্চেন্দ্রিয়); আবার দেখি, সে একা সদানন্দ—মহাশূন্যে তার অবিরাম নৃত্য। বল সুধাকর

সুধাকর—আমি কি করিয়া তাহাকে পাই—আমায় পথের সন্ধান দাও তুমি।

"শুনিয়াছি এই জগৎ নাকি তাহারই নৃত্য বিলাস। এস সুধাকর তোমার সুধাময় রূপের একটী কিরণ দিয়া আমার অন্তর ছুঁইয়া যাও—আমায় আনন্দে বিভোর কর। মহাশূন্যে তার আনন্দ নৃত্য—আর আমার দুঃখের নৃত্য এই অধোলোকে! আমায় পথের সন্ধান দাও হে সুধাকর!"

প্রবল আনন্দের বন্যা নন্দকে ভাসাইয়া চলিল। আবার তিনি গাহিতে লাগিলেন,

"ওরে তোরা নাচরে নাচ—নাচিতে নাচিতেই নটরাজের দেখা পাইবি! সে যে রাজার রাজা—তার স্তুতি গাহিয়া নাচ্ তোরা নাচ—ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ্! সে যে পরম শুদ্ধ, কামনার অতীত—তবুও কোন আকর্ষণে প্রেমিকের হৃদয় জয় করে সে? সেই প্রেমিকের প্রেম-গাথা গাহিয়া গাহিয়া নাচ্ তোরা নাচ্।"

সকলে সমস্বরে গাহিল, "আয়রে ওরে প্রেমের পথে—নাচিয়া গাহিয়া নটরাজকে পাইবি তোরা। কি আনন্দ!—নাচ আর গাও, শুধু নাচ আর গাও।"

নন্দ আবার ধরিলেন—"সে যে নাচের রাজা, প্রেমের রাজা, রাজার রাজা সে যে! প্রেমমদের বল্লভ, প্রচণ্ড শক্তিধর, বিশ্বনৃত্যের নটরাজ—দরিদ্রের পরম ধন সে। সে শুদ্ধ জাগ্রত, চির আনন্দময়। ওরে, অন্তরে খুঁজলে পাবি সে রতন।" (সমাপ্ত)

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

—*—

তন্ত্রের উদ্দেশ

এই পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে বোঝা যায়, সাংখ্যশাস্ত্র রচনা প্রেক্ষাবান্ শ্রোতার নিকট নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হইবে না। তাই কারিকাকার বক্ষ্যমাণ শ্লোক-সমূহে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যাহাতে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেই জন্য প্রথমতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ
মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তু বিকারো
ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥৩

—মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে। মহদাদি সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। অতঃপর ষোলটী তত্ত্ব বিকৃতি মাত্র। পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন।

সংক্ষেপতঃ সাংখ্য-শাস্ত্রতত্ত্ব চারি প্রকার; কোনও তত্ত্ব প্রকৃতি মাত্র, কোনও তত্ত্ব বিকৃতি মাত্র, কোনও তত্ত্ব প্রকৃতি বিকৃতি উভয়ই - আবার কোনও তত্ত্ব প্রকৃতি বা বিকৃতি—এই দুইয়ের একটীও নয়।

প্রকৃতির লক্ষণ

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রকৃতি কাহাকে বলে? তদুত্তরে কারিকাকার বলিতেছেন, "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ।" যাহা প্রকৃষ্টরূপে কিছু করে, তাহাই প্রকৃতি। সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির অপর নাম প্রধান। উহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি কাহারও বিকার হইতে উৎপন্ন নহে বলিয়া উহার নাম প্রকৃতি। তবে তাহাকে "মূল" বলা হইল কেন?—না প্রকৃতি সকলের মূলও বটে, প্রকৃতিও বটে। অর্থাৎ এই জগতে যে কার্য্য-সংঘাত দেখিতে পাইতেছি, প্রকৃতিই তাহার মূল। কিন্তু প্রকৃতির আর কোনও মূল নাই। [প্রকৃতিরও যদি মূল স্বীকার করা যায়, তবে তাহারও মূল—আবার তাহারও মূল—এইরূপ করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আর কোথাও শেষ মূল পাওয়া যাইবে না—তর্কেরও বিশ্রাম হইবে না। তর্কের এইরূপ অবিশ্রামকে অনবস্থা দোষ বলে।] প্রকৃতিরও আবার মূল স্বীকার করিতে গেলে এইরূপ অনবস্থা দোষ ঘটে কিন্তু এইপ্রকার অনবস্থা অপ্রামাণ্য, কেন। তাহাতে কোনও বস্তু নিশ্চয় হয় না।

[জগতে কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। সাধারণভাবে তাহার কারণপরম্পরাও কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া থাকি। কিন্তু দার্শনিক বুদ্ধি দিয়া সমস্ত কার্য্যের যে চরম কারণ নিরূপণ করিয়া থাকি, তাহারই নাম দিয়াছি মূলা প্রকৃতি। ইহাকে সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা বলি কেন? জগতের কার্য্য-সমূহের তিনটী বিভাব দেখিতে পাইতেছি—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও আবরণ। ইহাদিগকেই বলি গুণত্রয়ের লীলা। সমস্ত কার্য্যেই ইহাদের ন্যূনাধিক সমাবেশ একটু চিন্তা করিলেই ধরিতে পারি। কার্য্যভেদে যখন এই গুণত্রয়ের বিচিত্র বৈষম্য দেখিতে পাই, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্যের মূল কারণে এই বৈষম্যের একটা মীমাংসা চাই। অর্থাৎ মূল কারণে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকিলেই কার্য্যে বৈষম্যের যুক্তিযুক্ততা সিদ্ধ হয়। মূল কারণগত সাম্যাবস্থাই কার্য্যগত সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের ধারক, প্রেরক ও সামঞ্জস্যের মূল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই জন্যই বলা হইল প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা।]

প্রকৃতি-বিকৃতি

প্রকৃতি ও বিকৃতি এই উভয়বিধ স্বরূপ কাহাদের, তাহাদের সংখ্যাই বা কত?—"মহদাদি সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতি বিকৃতি।" যেমন মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি, আবার মূল প্রকৃতির বিকৃতি। আবার তেমনি অহঙ্কার তত্ত্ব তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকৃতি, আবার মহত্তত্ত্বের বিকৃতি। আবার পঞ্চতন্মাত্র

আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রকৃতি, অহঙ্কারের বিকৃতি। [এইরূপে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র—এই সাতটী প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়-স্বরূপ।]

বিকৃতি

বিকৃতি কাহাদিগকে বলিব, তাহাদের সংখ্যাই বা কত ?—"ষোড়শকস্তু বিকারঃ।" ষোড়শ সংখ্যা পরিমিত গণ বা সমষ্টিকে বলা হইল "ষোড়শক।" মূলে "তু" শব্দ অবধারণ বা পরিচ্ছেদ বুঝাইতে ভিন্নক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শটী তত্ত্বের গণ কেবল মাত্র বিকারই, প্রকৃতি নহে। ["তু" শব্দটী দ্বারা এই প্রকারে অর্থের অবধারণ বা সঙ্কোচ করা হইয়াছে, অথচ উহা অবধার্য্যমাণ "বিকারের" পরে না বসিয়া পূর্ব্বে বসিয়াছে। ইহাই ভিন্নক্রম।]

কেহ আপত্তি করিতে পারে, সম্মুখে একটা গাভী বা একটা কলস বা একটা গাছ দেখিতে পাইতেছি। ইহারা তো পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতেরই বিকার অর্থাৎ পঞ্চভূত ইহাদের প্রকৃতি ; আবার গরুর দুধ, গরুর বিকার, গাছের বীজ গাছের বিকার। দধি আবার দুধের বিকার ; অঙ্কুর বীজের বিকার। [এইরূপ বিকারের পরম্পরা চলিতে থাকিলে ইহাদের মূল কারণকে প্রকৃতি বলিব না কেন ?]—কিন্তু গাভী, বীজ ইত্যাদি তো পঞ্চভূত হইতে পৃথক কোনও তত্ত্ব নহে। যে তত্ত্ব অন্য তত্ত্বের উপাদান, আমরা তাহা-কেই এখানে প্রকৃতি বলিতেছি—উপাদান মাত্রকেই প্রকৃতি বলিতেছি না। গাভী, ঘট, [illegible] ইত্যাদি সমস্তই স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য— সুতরাং আপাততঃ ভেদ দেখা গেলেও উহা তত্ত্বতঃ এক।

পুরুষ

পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহে- সুতরাং তিনি অনুভয়রূপ অর্থাৎ প্রকৃ- বিকৃতি দুইয়ের একটীও নহেন। এই স- কথা পরে বিস্তার করিয়া বলা যাইবে। (৩

—*—

প্রমাণের উদ্দেশ

উপরে যে সমস্ত তত্ত্বের কথা বলা হই- তাহাদিগের প্রামাণ্য স্থাপন করিবার জ- সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত বিভিন্ন প্রমাণের লক্ষ- করিতে হইবে। প্রথমতঃ একটা সাধা- লক্ষণ করিলে তাহার পর বিশেষ লক্ষণ ক- চলে। তাই প্রমাণের সাধারণভাবে লক্ষ- করিতে যাইয়া কারিকাকার বলিতেছেন—

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ
সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রামাণ্যমিষ্টং
প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি॥ ৪

—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন—- তিনটী প্রমাণ সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত, কেন- ইহাদিগ হইতেই অন্য সমস্ত প্রমাণ - হইয়া থাকে। প্রমাণ হইতেই প্রমেয় - হইয়া থাকে।

প্রমাণের লক্ষণ

এখন, "প্রমাণ" এই শব্দটীর লক্ষণ কি- হইবে। প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগদ্বারা শব্দ- নির্ব্বচন করিলেই উহার লক্ষণ করা হইবে

যাহা দ্বারা কোনও বস্তু প্রমিত হয়, তাহাই প্রমাণ—এই হইল প্রমাণ শব্দের নির্ব্বচন বা প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগলব্ধ অর্থ। দেখা যাইতেছে, প্রমার প্রতি যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ করণ হয় কিরূপে? যে বিষয় পূর্ব্বে আমাদিগের অধিগত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ও অবিপরীত চিত্তবৃত্তির আবির্ভাব করাই প্রমাণের কাজ। ইহার ফলে পুরুষের "আমি জানিতেছি" ইত্যাকার বোধ হইয়া থাকে—উহাই প্রমা; প্রমাণ এই প্রমার সাধন বা করণ। যাহারা সংশয়, বিপর্য্যয় বা স্মৃতির সাধন, তাহাদিগকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা ইহাদিগকে প্রমাণ হইতে পৃথক করা হইল।

[বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে চিত্তে নানাপ্রকার বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। উহা দ্বারাই বিষয়ের তত্ত্বনিশ্চয় হয়। কিন্তু তত্ত্বনিশ্চয়ের পক্ষে সমস্ত চিত্তবৃত্তিই অনুকূল নহে। কখনও বা একই ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য জ্ঞান জন্মিতে পারে—তখন "ইহা এই বস্তু কি না" এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে। এই প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম সংশয়। উহা দ্বারা বস্তুর তত্ত্বাবধারণ হইতে পারে না বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলা চলে না। আবার এমনও হইতে পারে যে, যে বস্তু বাস্তবিক যাহা নয়, তাহাকে তাহাই বলিয়া ভ্রম হইল—এইরূপ অযথারূপ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলে। উহাও প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বোধেরই সংস্কার থাকে। উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হইলে সেই সংস্কার জাগ্রৎ হইয়া অতীত বিষয়েরও জ্ঞান জন্মাইতে পারে। আমরা ইহাকে বলি স্মৃতি। প্রমাণের গণ্ডী হইতে ইহাকেও বাদ দিতে হইবে। এই গুলিকে ছাড়িয়াই প্রমাণের লক্ষণ করা হইল—যাহা হইতে অনধিগত বিষয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অবিপরীত চিত্তবৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই প্রমাণ।]

প্রমাণের সংখ্যা

প্রমাণের সংখ্যা লইয়া মতভেদ হইতে পারে, তাই কারিকাকার বলিলেন—"প্রমাণ তিন প্রকার মাত্র"—তাহার কমও নয়, বেশীও নয়। প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার পর আমরা এই কথা বুঝাইয়া বলিব।

এই তিন প্রকার প্রমাণ কি কি? প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন। অবশ্য এখানে লৌকিক প্রমাণের কথাই বলা হইতেছে। কেননা লৌকিক জগতে তত্ত্ব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যকতা—শাস্ত্রের অধিকারও এই পর্য্যন্তই বিস্তৃত। ঊর্দ্ধরেতা যোগীদিগের যে আর্ষ বিজ্ঞান, তাহাদ্বারা লৌকিক ভাবে কোনও তত্ত্ব ব্যুৎপাদন করা চলে না—সুতরাং তেমন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল না, কেননা আর্ষ বিজ্ঞান লৌকিক অধিকারের বহির্ভূত।

প্রমাণ তিনটীর কম নয়, ইহাই মানিতে পারি; তিনটীর বেশী নয়—ইহা কি করিয়া বলি? উপমান প্রভৃতি প্রমাণের কথাও তো প্রতিবাদীরা বলিয়া থাকেন, [সুতরাং প্রমাণ তিনের বেশী হইতে বাধা কি—এইরূপ আশঙ্কা যাহাতে না হয়,] সেই জন্য কারিকাকার বিশেষ করিয়া বলিলেন—এই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন দ্বারাই সমস্ত প্রমাণ সিদ্ধ হইয়া থাকে

অর্থাৎ অন্যান্য প্রমাণ ইহাদেরই অন্তর্ভূত। এই কথা যে পরে বুঝাইব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রমাণের আবশ্যকতা

তারপর প্রশ্ন হইতে পারে, এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তো প্রমেয় তত্ত্বই ব্যুৎপাদন করা; তবে আবার প্রমাণের সামান্য লক্ষণ, বিশেষ লক্ষণ করিবার কি প্রয়োজন? —ইহার উত্তরে কারিকাকার বলিতেছেন, যেহেতু, প্রমাণ হইতেই প্রমেয়ের সিদ্ধি বা প্রতীতি হইয়া থাকে। [প্রমাণ প্রয়োগেই আমরা বস্তুর তত্ত্বনিশ্চয় করিয়া থাকি। সুতরাং তত্ত্ব জানিবার পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ীভূত প্রমাণসমূহের নিরূপণ ও অবধারণ করা কর্ত্তব্য।]

এই কারিকাটী পাঠক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অর্থক্রমের অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (৪)
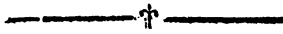
স্বরূপানন্দ-স্মৃতি

—*—

[আমি গত ১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বগুড়ায় ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি। সেই সময় হইতে, উক্ত সনের ২৭শে ফাল্গুন শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ দাদার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা যাহা জানি, নিম্নে লিখিতেছি।—লেখক।]

জীবনবিধ্বংসী দারুণ কালাজ্বরের আক্রমণে বিগত ১৩৩০ সনের বৈশাখ হইতে স্বরূপানন্দ দাদা রোগশয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন স্থানীয় গুরুভ্রাতৃগণ কালাজ্বরের বিশেষ ইনজেকসন চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেবা শুশ্রূষার সুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাসায় তাঁহারা সেই বাসায় রাখিয়া প্রাণপণে সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে থাকিলেন। যথাক্রমে ৩৭টী ইনজেকশন হইল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ দাদার রোগের কোনরূপ উপশম উপলব্ধি হইল না। অধিকন্তু শোথ, আমাশয়, কর্ণ ও মাড়ির উপসর্গাদি দেখা দিল। এইরূপে ৬।৭ মাস অতীত হইলে পর স্বীয় অনুভূতি দ্বারা দাদা বুঝিতে ও জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার জগতের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, শীঘ্রই তিনি মুক্ত হইয়া সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হইবেন। ইহার পর হইতে চিকিৎসা ও ঔষধাদির প্রতি তিনি বীতরাগ হইলেন।

দাদার জনৈক সহপাঠী স্থানীয় সবডিপুটী কলেক্টার মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুনরায় বাইওকমিক ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি ভারত বাবুর বাসা হইতে স্থানীয় আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। মাসাধিক কাল বাইওকেমিক ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ কিছু উপকার প্রাপ্ত

না হওয়ায় তখন আমি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহাতে দাদা আমাকে বলিলেন, "এখন আর কোনও ঔষধ ব্যবহার করিব না। ৭ই মাঘ আমার যাওয়ার দিন একরূপ স্থির বুঝিতেছি। ঐ তারিখ যদি যাওয়া না হয়, তবে পরে যাহা হয় করিও।"

আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিলেন, "যখন আমি প্রথম বগুড়ায় আসিলাম, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, তোমরা যেন বগুড়া আসিয়াছ এবং আমার জীবনের সহিত তোমাদের জীবনে যেন কি একটা বিশেষ সম্বন্ধ—একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। তার পর সত্যই অপ্রত্যাশিতরূপে তোমরা বগুড়ায় আসিলে।"

তার পর ৭ই মাঘ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। একদিন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছি, তখন দাদা ধীরে ধীরে আমাকে বলিতে লাগিলেন, "দাদা, আজ বেলা ৯টার সময় আশ্রমের একটা হিসাব নোট করিতে করিতে শরীরটা যেন বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল, খুব যেন ঘুমের আবেশ আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমি কলম রাখিয়া, নিতান্ত অসময় হইলেও ঘুমাইতে প্রস্তুত হইলাম। পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম—একটী স্বপ্ন আরম্ভ হইল—

"দেখিলাম—আমার শিয়রের জানালা দিয়া ২।৩টী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের চরণ মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই, তাঁহারা শূন্যে অবস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন—'আর কেন? বাঁধন কাট।' আমি বলিলাম, আমি ত বন্ধন খুঁজিয়া পাইতেছি না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'খুব ভাল করে দেখেছ? খোঁজ—খোঁজ।'"

"এই সময় ললিত দাদা আসিয়া ডাকিলে পর মূর্ত্তি কয়েকটী পুনরায় জানালা দিয়া বাহির হইলেন, আমি জাগিলাম। তার পর চিন্তা করিতে করিতে স্মরণ হইল যে দুই জন চিকিৎসকের ঔষধের মূল্য বাবতে আনুমানিক ১০৲ টাকা পাওনা আছে। তাঁহাদিগকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংবাদ দিয়াছি। আর কোন বন্ধন তো দেখি না।"

পরদিন আবার আশ্রমে গেলে দাদা আগ্রহের সহিত বলিলেন, "দাদা, আমার যাওয়া বোধ হয় ঠিক হইয়া গেল।" আমি বলিলাম—"আবার কিরূপ খবর আসিল?" দাদা বলিলেন—"গত রাত্রে দেখিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আমার রাস্তা পরিষ্কার করিতে খুব ব্যস্ত! খুব লোকজনের কার্য্য ব্যস্ততা দেখিলাম।"

এই সময় দাদার মুখখানা যেন আনন্দ ও জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার মুখপানে চাহিয়া কি যেন অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিলেন।

এরূপ দুর্ব্বল শরীরে এই প্রবল উত্তেজনা আশু আশঙ্কাজনক মনে করিয়া কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার ভাবতরঙ্গকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা আর কোন খবর আছে?" উত্তর দিলেন, "না।"

তার পর দিন তাঁহার ঘরে ঢুকিতেই বলিয়া উঠিলেন, "দাদা, আজ আবার নূতন ভাব দেখি যে?"

আমি বলিলাম, "কি রকম ?"

"আবার যে শক্তিসঞ্চারের দৃশ্য দেখিলাম ?"

"তাতে আমাদের লাভ আছে ?"

"লাভ ত ভারি ! ভাঙ্গা নৌকায় অনবরত তালি দাও, আর হাতুড়ির ঘ মেরে আমাকে কৃতার্থ কর ! আমাকে তোমরা আর টানিও না। আমাকে এখন যাইতে দাও।"

"রাখা না রাখার কর্ত্তা কি আমরা ? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কিরূপ শক্তিসঞ্চারের দৃশ্য দেখিলে ?"

"দেখিলাম, কাছে ঠাকুর বসিয়া আছেন, চারিদিক হইতে ঠাকুরের ভক্ত অভক্ত সকলেই যেন আমাকে তাহাদের স্বীয় শক্তি প্রদান করিতেছে।"

"তাহাতে নিজকে তখন হইতে কিরূপ শক্তিসম্পন্ন মনে করিতেছ ?"

"কিছু সবলই বোধ করিতেছি। কিন্তু দাদা, তোমার আমার ইচ্ছায় কিছুই হইবে না। এ শক্তিসঞ্চার শুধু আমার ভোগ বৃদ্ধিই করিবে।"

"তখন যে কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিলে, তাঁহার শ্রীমুখের ভাব কেমন ছিল ?"

"নিরপেক্ষ কিন্তু চিন্তিত।"

"তোমার এই রোগজীর্ণ দেহ সংস্কার করা যদি শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভিপ্রেত হয়, তবে হয়ত সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ লাভও করিতে পার। তাঁর ইচ্ছায় সবই হইতে পারে।"

"হাড়মাংসের দেহের সংস্কারেরও একটা সীমা ও অবস্থা আছে। এ দেহ একেবার অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।"

"দেখা যাক, ৭ই মাঘ কি হয়। যদি সে দিন তোমার যাওয়া না হয়, তবে হয়ত তুমি ক্রমশঃ কর্ম্মক্ষম হইতেও পার। হইলে আমাদের একটা বিশেষ লাভ আছে।"

"কি বিশেষ লাভ ?"

"খাঁটি জ্যান্তে-মরা বা জীবন্মুক্তরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাকে আমাদের মধ্যে পাইব।"

"কিন্তু প্রায় সর্ব্বদাই সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের কথাগুলি মনে পড়ে।—'আর কেন ? বাঁধন কাট—(বাঁধন) খোঁজ, খোঁজ।'"

"আর কিছু খুঁজিয়া পাইলে কি ?"

"না, তেমন কিছুও আর দেখি না। তবে—"

"তবে কি ?"

"একটা কথা এতদিন কাহাকেও বলি নাই।"

"কি সে কথা, দাদা ?"

"কয়েকটী খাদ্যদ্রব্যে সময় সময় স্পৃহা হয়।"

"ইহা ত কিছু অস্বাভাবিক নয়। রক্তমাংসের শরীর, প্রকৃতি তাহা চাহিতে পারে। সুদীর্ঘকাল রসনাকে কঠোর ভাবে সংযত রাখিয়াছ। শরীর দুর্ব্বল বলিয়া প্রকৃতি মাঝে মাঝে মনের ভিতর উঁকি মারিতে পারে। এমতাবস্থায় প্রকৃতি যাহা চায়, তাহা সময় সময় ঔষধের কার্য্যও করিয়া থাকে। অতএব যাহা যাহা খাইতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা আমি আমার সাধ্যানুসারে পূর্ণ করিব।"

"আগামী ৩রা মাঘ পর্য্যন্ত অন্ন গ্রহণ করিব, তারপর হইতে মৌনী হইব ও কেবল দুগ্ধ পান ও ফল আহার করিব ইচ্ছা

করিয়াছি। ৭ই তারিখ তুমি এবং মা এখানে থাকিও।"

"বেশ, ইতিমধ্যেই তবে আমি তোমার উপযোগী করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব। তুমি যে ইহা আমাকে জানাইলে, ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।"

সেদিন এই পর্য্যন্তই কথা হইল। তারপর কার্য্যানুরোধে বাসায় ফিরিলাম এবং পরদিন হইতে তাঁহার ঈপ্সিত দ্রব্যাদি বাসা হইতে প্রস্তুত করিয়া নিয়া কাছে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলাম। ৪ঠা মাঘ হইতে দাদা মৌনী হইলেন ও দুগ্ধপান এবং ফল আহার করিতে লাগিলেন।

৭ই মাঘ প্রাতে নিয়মিত সময়ে শয্যা-ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিলে পর কিছু ফল আহার ও দুগ্ধ পান করিলেন, পরে বেলা ৯টার সময় পুনরায় কিছু ফল ও দুগ্ধ গ্রহণ করি-লেন। সমাগত ভক্তগণ বাহিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় ১১টার সময় আমার স্ত্রীকে দাদা ইঙ্গিতে তাঁহার নিকট বসিতে বলিলেন। তিনিও ছোট একটী টুলে বসিলেন। তার পর দাদা ডান হাতখানা আমার স্ত্রীর কোলে রাখিলেন, তিনি তাঁহার হাতের তালুতে ও শরীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

তখন দাদার মুখে শান্তি ও আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিল, দুই চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। ইসারায় কীর্ত্তনকারিগণকে গৃহের মধ্যে আসিতে বলিলেন; তাঁহারা সেইখানে আসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রায় ১১।৷টার সময় সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল, শ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিল ও মস্তক বালিসে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। উপস্থিত গুরুভাই-গণ ও ভক্তগণ বুঝিলেন যে দাদা মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন। তখন পূর্ণ উদ্যমে নাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকাল অতি-বাহিত হইলে পর ক্রমে ক্রমে পুনরায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চক্ষু মেলিয়া গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরে আমার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মা! আজ যাওয়া হইল না"—এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর আবার বলিলেন,—"মা! তুমিই আমাকে যাইতে দিলে না।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "হাঁ, তা বৈকি—আমি তোমাকে যেতে দিলাম না! বেশ অনুযোগ বটে।"

দাদা অন্যান্য গুরুভাইদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যাওয়া হল না! এমনি করে তোমরা সকলে মিলে আমাকে টেনে ফিরালে।" এই বলিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, "দাদা, তোমাদের সম্মিলিত ইচ্ছা-শক্তির টানে আমাকে আবার এই নরকে রাখিয়া দিলে? আমি যে বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম।"

"কি কি অবস্থার ভিতর দিয়া উঠিয়া-ছিলে?"

"প্রথমে দেখিলাম, আমার দেহের গ্রন্থি-গুলি শিথিল করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে সারাংশ সংগৃহীত হইয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রস্তুত হইল। সেই দেহে ক্রমশঃ আমি বহু উর্দ্ধে উঠিলাম। পূর্ণানন্দে আমি উর্দ্ধে ভরপুর। আরও উর্দ্ধে দূরে শ্রীশ্রীঠাকুর দণ্ডায়মান! আমি শান্তিধামে প্রবেশ করিব, এমন সময় হঠাৎ একটী আবরণ যেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঢাকিয়া দিল। কে যেন তখন ক্ষিপ্রহস্তে আমার গ্রন্থিগুলি পুনরায় টিপিয়া সরল করিয়া দিল। নীচে তোমরা অসংখ্য

লোক যেন চতুর্দ্দিক হইতে সমানে নীচের দিকে আমাকে টানিয়া নামাইতেছে। দাদা! তোমরা এমন নিঠুর হইলে কেন? এতদূর হইতে ফিরাইয়া আনিলে কেন?"

তখন হঠাৎ পাঁচবৎসর পূর্ব্বের একটী কথা আমার মনে পড়িল। যখন আমি ময়মনসিংহের অন্তর্গত ঈশ্বরগঞ্জে ছিলাম, তখন দাদা আমার বাসা হইতে প্রথম বগুড়া আসিবার সময় আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "মা! ইহাতে যে আতপ চাউল আছে, তাহা কিন্তু খরচ করিও না। উহা আমার।" তাই সে চাউল তারপর হইতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। বগুড়া আসার পরে দাদার রুগ্নাবস্থায় সে চাউলের অন্নপ্রদানের সময় ও সুযোগ হয় নাই। অদ্য সেই কথাটী মনে হওয়ায় আমি বলিলাম—"দাদা, মনে পড়ে? মনে পড়ে তোমার সেই ঈশ্বরগঞ্জের চাউলের কথা? তাহা যে এখনও তোমার কথামত রাখিয়া দিয়াছি। তাহার কি হইবে? ইহাও একটা বন্ধন হইতে পারে।"

শুনিয়া দাদা ও গৃহস্থিত সকলেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে দাদা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বলিলাম, "দাদা! আজ 'যাত্রা' যখন 'কবি' হইল, তখন আজ হইতে আবার অন্নগ্রহণ কর। ৩টা বাজে, ৪টার সময় ত তোমার পথ্য গ্রহণের সময় নিরূপিত ছিল।" দাদা সম্মতি জানাইলে, আমার স্ত্রী তখনই উঠিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি ওল এবং মানকচু ভাতে ভাত ও মুগের ডাল পাক করিয়া দিলেন। দুধ জাল দেওয়া ছিল, তাহাও পুনরায় গরম করিয়া ৪॥টার সময় দাদাকে আহার করান হইল। সন্ধ্যার পর আমরা বাসায় আসিলাম।

৮ই মাঘ মধ্যে গেল। ৯ই মাঘ দাদাকে আমি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। বর্ত্তমান উপসর্গাদি ও জ্বর ক্রমশঃ কমিতে থাকায় ১৭ই মাঘ তারিখে দাদাকে আমার বাসায় আনিলাম। আশ্রমসেবকদের দ্বারা মুখরোচক পথ্যাদি পাক করাও অসম্ভব মনে করিয়াছিলাম। যাহা হউক, বাসায় আসার পর হইতে দাদার অবস্থা ক্রমশঃ ভালই দেখা যাইতে লাগিল। চারি সপ্তাহ পরেই স্বাভাবিক গতিতে জ্বর ত্যাগ হইল। প্লীহা যকৃৎ ক্রমে কমিতে লাগিল। দুই সপ্তাহের উপর জ্বর নাই। এক দুর্ব্বলতাই অবশিষ্ট রহিল এবং সেই দুর্ব্বলতা প্রকৃতপক্ষে জীবনীশক্তির ক্ষীণতারই প্রমাণ বলিয়া প্রধান চিন্তার বিষয় হইল।

এইরূপে ২০শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিল। সে দিন সকালে দাদা মুখ হাত ধোয়ার পর একটু জলযোগ অন্তে বসিয়া আছেন—নিকটে আমি আছি। আমার স্ত্রী কার্য্যোপলক্ষে গৃহে আসিয়া বলিলেন, "কাল এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিয়াছ? আমার বিষয়ে নিশ্চয়।"

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "হাঁ। দেখিলাম—একটী বাড়ীতে খুব কীর্ত্তন হইতেছে। আমি সেই স্থান দিয়া যাইতেই আমার সহোদর কুমুদকে দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, ঠাকুরের প্রধান শিষ্য আজ দেহত্যাগ করিবেন। ইহা শুনিয়া আমিও সেই বাটীতে গেলাম। একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানী তক্তপোষের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিলাম, অন্তশয্যায় তোমাকে রুগ্নাবস্থায় দেখিলাম। বাহিরে খুব কীর্ত্তন চলিতেছে।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণকায় ভীমদর্শন একটা মূর্ত্তি গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর খুব ঘামিতেছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলাম। ঐ মূর্ত্তিটি দেখিয়া আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ব্যক্তি কে বাবা? তিনি বলিলেন—'যম।' আমি যেন উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—'কি? যম? গুরুভক্ত ত্যাগী সন্ন্যাসীকে গুরুর সম্মুখে যমে নিবে? এত বড় আস্পর্দ্ধাই যম রাখে? দেখি ও কেমন করিয়া এখানে আসে!' এই বলিয়া আমি দরজার সম্মুখে গিয়া সেই মূর্ত্তিকে বলিলাম—'কে তুই? সাবধান, এদিকে এক পা অগ্রসর হইবি ত তোকেই আজ তোর যমের বাড়ী পাঠাইব!' তারপর সে মূর্ত্তি চলিয়া গেল। তখন ঠাকুর যেন দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অমনি সকলের মধ্যে একটা মহা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।"

দাদা বলিলেন, "হাঁ মা, আমিও পূর্ব্বে এক স্বপ্নে দেখিয়াছি, একটী কাল নারীমূর্ত্তি কলসী কক্ষে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি বলিলাম—'মাগো, এতদিন পরে কি আমার জন্য শান্তিসুধা নিয়ে এলি?' দেখিতে দেখিতে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল।"

তারপর দুই দিন পর্য্যন্ত ভালই কাটিল। তখনও জ্বর নাই। শেষে ২২শে তারিখ একটু সামান্য সর্দ্দির লক্ষণ দেখা গেল। পরে শরীরের উত্তাপও কিছু বাড়িল। ক্রমে হঠাৎ সর্দ্দি শুষ্ক হওয়ায় একটু হাঁপানির মত ভাব দাঁড়াইল। তখনই আমি চিন্তিত হইলাম।

২৬শে ফাল্গুন শেষ রাত্রিতে আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখিলেন, "যেন আঙ্গিনায় বাবাজীর শবদেহ শায়িত, তাঁহার নিকট একটী বৃহৎ জ্যোতিঃ, তন্মধ্যে একটী ত্রিনয়না লোহিত-বসনা মহাশক্তিমূর্ত্তি। তিনি যেন হস্তদ্বারা বাবাজীর স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহটী ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া দিলেন।" আমার স্ত্রী এই স্বপ্নের কথা তখন কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।

অদ্য ২৭শে ফাল্গুন। সকাল হইতেই নাড়ীর অবস্থা খারাপ দেখিলাম। কবিরাজ দাদা (স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্ত) আসিয়া দেখিলেন। আমি এক ডোজ ঔষধ দিলাম। খাইয়া দাদা বলিলেন, "দাদা, এখনও ঔষধ দিতেছ? আমাকে এখন বিদায় দাও। দাদা, কেন তোমরা আমার জন্য এত করিতেছ?"

"এত কি করিলাম?"

"আমাকে আটকাইয়া রাখিয়া নিজেরাও কষ্ট পাইতেছ, আমাকেও কষ্ট দিতেছ।"

"তোমার শারীরিক কষ্ট দূর করিতে পারিতেছি না বলিয়াই যা কষ্ট, নচেৎ আর কষ্ট নাই, কর্ত্তব্যমাত্র করিতেছি। আমরা আটকাইয়া রাখিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না।"

দাদা আমার স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "মা, তবে তুমি আমাকে আটকাইয়া রাখ নাই?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "না, আর তোমাকে আটকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করি না।"

বেলা প্রায় ১২টার সময় একটু দুধ পথ্য দেওয়া হইল। জ্বর কমিতে থাকিল। আবার ৩টার সময় দুধ খাওয়ান হইল। ৩াটার সময় হইতে একটু অস্বস্তির ভাব দেখা গেল। তখন দাদা আমাকে বলিলেন, "দাদা,

আমার গেঞ্জিটা খুলিয়া দাও।" আমি খুলিয়া দিলাম। পরে আবার বলিলেন, "দাদা, ভাল ত লাগে না, কি করি?"

আমি বলিলাম, "প্রস্তুত হও, ঠাকুর দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন।"

দাদার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল,—দাদা চক্ষু বুজিলেন, ক্রমে আত্মস্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমে পাঁচটার সময় মহাশ্বাস দেখা দিল। তাঁহার অতিসাধের "জয় গুরু" নাম করিতে করিতে তাঁহার পবিত্র দেহ কোলে করিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে আঙ্গিনায় আসিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপানন্দের দেহ আমার কোলেই চিরনিদ্রিত হইল। মুখে অবিশ্রান্ত "জয় গুরু! জয় গুরু!!" পবিত্র সন্ন্যাসী দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া আঙ্গিনায় কিছু কাল মহানন্দে নৃত্য করিলাম।

তার পর সেই মুক্ত গগনপথে মুক্তবিহঙ্গ উড়িয়া গেল, শূন্য দেহপিঞ্জর শেষ শয্যায় শায়িত রহিল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃতে চরণ ধূলি গুলিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে দাদার সিদ্ধ নাম "জয়গুরু" লিখিলাম। পুষ্পমাল্যে মনের সাধে দাদার দেহ সাজাইলাম। তার পর মহাসমারোহে রাত্রি ১০॥টার সময় কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখে রওনা হইলাম। শেষে রাত্রি ৪টার সময় পবিত্র দেহ ভস্মে পরিণত হইলে, তথাকার কার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন করিয়া, ভস্মাবশেষ গ্রহণ করতঃ সকলে বাসায় ফিরিলাম সে ভস্ম এক্ষণে সযত্নে আশ্রমের আসনগৃহে রক্ষিত আছে। অক্ষয়া তৃতীয়ার পরবর্ত্তী শুক্লা পঞ্চমীদিন দাদার পবিত্রাত্মার তৃপ্ত্যর্থে স্থানীয় আশ্রমে দরিদ্রনারায়ণ সেবা-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

সহজ

তোমারে খুঁজিনু কত! ভাবিলাম মোহের শিকলি
কামনার সাথে বাঁধি' রাখিয়াছে অন্তর বিকলি';
কঠিন আঘাত হানি' কভু যদি পারি টুটিবারে
এ নিগড়, বীর্য্যভরে সত্যপানে পারি ছুটিবারে—
কিন্তু হায়!—আঁখি মুদি' খুঁজি আলো সারা বিশ্বময়,
দেখি নাই—মোহ 'পরে সত্য জ্বলে নিত্য জ্যোতির্ম্ময়!
মোহেরে সরাতে দূরে, মোহে বিশ্ব দূরে ছুটে যায়—
সহজ আনন্দে রসি' হাস তুমি দীপ্ত চেতনায়!

বেদান্তসার

—•—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—অনুবন্ধচতুষ্টয়]

—•—

প্রয়োজনানুবন্ধ

আর একটি কথা—তাহা হইলেই প্রয়োজনানুবন্ধ সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তি ও স্বরূপানন্দ লাভই বেদান্ত-বিদ্যার প্রয়োজন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এইখানে একটী কথা উঠিতে পারে। বিদ্যা ও অবিদ্যা পরস্পর বিরোধী—বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার নিরসন যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবও বটে। সেই হিসাবে অবিদ্যানিবৃত্তিকে ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া স্বরূপানন্দ লাভকে কি করিয়া বেদান্তবিদ্যার সাধ্য বলিয়া স্বীকার করি? স্বরূপ নিত্যস্বভাব—স্বরূপানন্দ নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু। যাহা নিত্য, তাহা কোনও কিছুর সাধ্য হইতে পারে না। কেননা সাধ্য স্বীকার করিলে তাহাকে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহা উৎপন্ন, তাহা নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং স্বরূপানন্দকে নিত্য বলিতে হইলে, তাহাকে বেদান্তবিদ্যার সাধ্য বলা যায় না। তবে স্বরূপানন্দ লাভ বেদান্ত বিদ্যার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য হয় কি করিয়া?

বৈদান্তিক এই কথার এইরূপে মীমাংসা করিয়া থাকেন। আনন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ আমাদের নিত্যপ্রাপ্ত বটে, কিন্তু অবিদ্যাবস্থায় তাহা আমাদের যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। যেমন একজনের গলায় একটা সোনার হার ছিল। কিন্তু সে তাহার কথা ভুলিয়া গিয়া এদিক সেদিক হার খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় একজন অভিজ্ঞ পুরুষ আসিয়া তাহাকে গলার হারটী দেখাইয়া দিলেন, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বুঝিল, হার তাহার গলায় বরাবরই ছিল বটে, কিন্তু মাঝে একটা বিস্মৃতির চাপে উহা তাহার অগোচর হইয়া ছিল। যখন প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা বিস্মৃতি দূর হইয়া গেল, তখন সব সময়েই যে হারটী তাহার গলাতেই ছিল—এই অবাধিত প্রত্যয় তাহার চিত্তে উদিত হইল। স্বরূপানন্দও সেই প্রকার নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু, কিন্তু অবিদ্যা বা ভেদজ্ঞান দ্বারা উহা অনভিব্যক্ত থাকে বলিয়া আমরা অবিদ্যাবস্থায় উহাকে জানিতে পারি না। বেদান্তবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা দূর হইলেই স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, স্বরূপানন্দ লাভ বেদান্তবিদ্যার সাধ্য—নতুবা নিত্যসিদ্ধবস্তুর সাধ্যতা অন্য কোনও প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। মহাজনেরাও তাই বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।" এই কথাটী আরও সূক্ষ্মভাবে বুঝিবার জন্য আমরা অন্যত্র হইতে এতৎ সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"সংসারের নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই, এখানে অনুভূতির গাঢ়তার তারতম্য আছে। যে কোনও বস্তুকে সবাই এক ভাবে জানে না বা বোঝে না। কোনও বস্তু সম্বন্ধে কাহারও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিমাণ দিয়া সেই বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেননা আজ তুমি যতটুকু বুঝিতেছ আর একজন হয়ত সেই বস্তুটিই তোমার চেয়ে বেশী বুঝিতেছে, কিম্বা তুমিই হয়ত কাল আজকার চেয়ে বেশী বুঝিবে। আমাদের অনুভূতির রাজ্যে যদি এই ভাবে সঙ্কোচ প্রসার ঘটিতে থাকে, তবে কোনও অবস্থাতেই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে নিরপেক্ষ সত্য বলা চলে না। অনুভূতির চরম সঙ্কোচে আমরা দেখিতেছি জড়ত্বের উদ্ভব। কিন্তু তাহার চরম প্রসারে যে কি, তাহা আমরা সাক্ষাৎভাবে বলিতে পারি না। অথচ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝি, ব্যবহারিক অনুভূতি সীমাবদ্ধ হইলেও সেই সীমা চিরন্তন নহে—তাহারও প্রসার আছে।

"প্রসার যে আছে, ইহা আমরা অনুভবও করি। তাহা ছাড়া অন্তরে যাহারা একটু গূঢ় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসারের দিকে যে এক অনুভূতির আকর্ষণ, তাহার পরিচয় বিশেষ করিয়াই পান। ফলকথা, লোকসিদ্ধ অনুভূতির পরেও যদি কিছু থাকে, তাহা শুদ্ধ চিত্তেরই অনুভবসিদ্ধ। এখন কথা এই যে, তাহার স্বরূপ কি?

"লৌকিক অনুভূতি দেশ, কাল ও গুণ-পরিণাম দ্বারা বিশিষ্ট। উহা যে সীমাবদ্ধ, তাহার কারণই এই দেশ, কাল ও গুণের বেষ্টনী। কিন্তু বস্তুর মূলে দেশকালাদির অতিরিক্ত আর একটী সত্তা রহিয়াছে—যাহা একরস হইয়াও সর্ব্ববৈচিত্র্যের বীজ। এই একরস ভাব ও তাহার সহচারী শক্তির প্রেরণাতেই লৌকিক বৈচিত্র্যের উদ্ভব। যে কোনও বস্তুর সঙ্গে অনুভববৃত্তির যে সংঘাত, তাহার অনুধ্যান করিলেই এই তত্ত্বটী বোঝা যায়।

"অনুভূতির প্রসারে আমরা শক্তির কেন্দ্রীভূত এই রসান্তরই পরিচয় পাই। ইহাতে অবগাহন করিলে দেশ, কাল ও গুণের বন্ধন খসিয়া যায়। তখন বুঝা যায়, লৌকিক অনুভূতি জগৎকে দেখা সত্যের বিপর্য্যয়। অনিত্যের পারে দাঁড়াইয়া নিত্যের অনুভূতি হইতে পারে না। অনিত্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া নিত্যভূমিতে উপনীত হইলে বুঝা যায়, এইখানে সম্পূর্ণ বস্তুটীর সাক্ষাৎ মিলিয়াছে—অনিত্য [illegible] রহস্য, তাহাও নিত্যের [illegible] দেখা [illegible]ছে। কিন্তু অনিত্যের মাঝে দাঁড়াইয়া তো নিত্যকে এমন সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধ করা যাইবে না। সেই জন্য নিত্যের কথা বলিতে গেলেই অনিত্য ধর্ম্মের সঙ্গে তাহাকে না জড়াইয়া কিছু বলিবার উপায় থাকে না। তার ফলে নিত্যের স্বরূপ লইয়া যে স্বতোবিরোধ উপস্থিত হয়, অপ্রবুদ্ধ [illegible] তাহার মীমাংসার কোনও উপায় [illegible]।

"অনিত্যের রঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া যদি বলি, নিত্যসিদ্ধ ভাবকে প্রকট করিবার জন্যই সাধনা, নতুবা ভাব সাধ্য বস্তু নয়, তাহা হইলে শুনিতেই কথাটা কানে ঠেকে। যাহা নিত্যসিদ্ধ, তাহার তো কোনও কালেই ব্যভিচার নাই—তবে আর তাহাকে প্রকট করিবার জন্য সাধ্যসাধনা কেন? আবার সাধনা

দ্বারাই যদি তাঁহাকে প্রকট করিতে হয়, তবে তাহা নিত্য হইল কি করিয়া?—কি জ্ঞান বিচারে, কি ভাব বিচারে, উভয়ত্রই সংশয়ীর মনে এই তর্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। আবরণ-ক্ষয়বাদ ও প্রাকট্যবাদ দিয়া ইহার যে মীমাংসার প্রয়াস করা হইয়াছে, বুদ্ধিশুদ্ধি ব্যতিরিক্ত তাহার সারবত্তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই জন্য শেষ পর্য্যন্ত ইহার কোনও যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা হয় না।

"কিন্তু সাধকের মনে ইহার অনুভবসিদ্ধ মীমাংসা মিলে। সমস্ত গণ্ডগোলের মূল হইতেছে, এই বিচারে যে জ্ঞানকে আমরা প্রামাণ্য ভাবিয়া বিচারকের আসনে বসাইয়াছি, সেই। এখানকার জ্ঞান বলিতেছে, নিত্যকে যদি প্রকট করিতে হইল, তবে অপ্রকট অবস্থায় তাহার অনুভূতি না থাকায় তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় কি করিয়া? কিন্তু অপ্রকট অবস্থায় নিত্যের যে অনুভূতি মিলিল না, ইহার জন্য দায়ী কে? কাহার নিকট এই অনুভূতি ধরা পড়িল না?—এই লৌকিক জ্ঞানের কাছেই। কিন্তু কথা হইতেছে নিত্যত্বাসিদ্ধির তর্কে বস্তুর তত্ত্বাবধারণে লৌকিক জ্ঞানের সামর্থ্য কতটুকু? সে কি শুধু তর্কের প্রণালীটী মাত্র ধরাইয়া দিয়াছে, না তাহার সঙ্গে সঙ্গে তর্কের বিষয়ীভূত বস্তুর সম্যক্‌জ্ঞানও তাহার হইয়াছে? অর্থাৎ যে "নিত্য" লইয়া তাহার তর্ক, সেই নিত্যের অপরোক্ষানুভূতি তাহার আছে কি? নিশ্চয়ই নাই, নিত্যসম্বন্ধে আমাদের যে লৌকিক-জ্ঞান, তাহা বিকল্পজ্ঞান মাত্র। বিকল্পরূপ মিথ্যাজ্ঞান লইয়া যে তর্কের প্রতিষ্ঠা, তাহা দ্বারা কখনও সত্য নির্ণয় হইতে পারে না।

"আবার রহস্য এই, নিত্যত্ব সম্বন্ধে বিকল্প-জ্ঞানকে দূরীভূত করিয়া যদি আবার তর্কের সূচনা করিতে যাই, তবে তর্কের অবসরই মিলিবে না অর্থাৎ নিত্যত্বের সম্যক জ্ঞান হইলেই তর্কদ্বারা যাহা সাধ্য ছিল, তাহা অনায়াসেই অপরোক্ষানুভূতিতে সিদ্ধ হইবে। এইজন্য নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রাকট্য কি করিয়া তর্কের অবরোধে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা সাধনা দ্বারাই বুঝিতে হইবে—লৌকিক জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া তর্ক দ্বারা তাহার বিনিশ্চয় হইবে না। এক কথায় নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রতি চিত্তের লোলুপতা চাই, তাহার প্রতি যে আমাদের সহজ আকর্ষণ রহিয়াছে, শুদ্ধচিত্ত দ্বারা তাহা অনুভব করা চাই।"

—(আর্য্যদর্পণ, ১৪শ বর্ষ, পৃঃ ৩৩৮—৩৪০)

সত্যপিপাসা

—*—
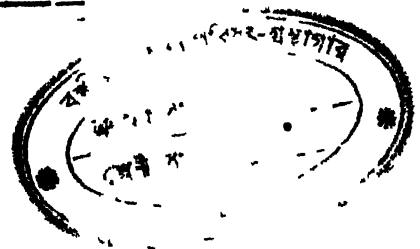
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সত্যলাভ। কথাটা খুব ব্যাপক, কেননা সত্য কি, তাহা সকলে সমানভাবে বুঝে না। প্রথমতঃ একটা কথা ধরিয়া লইতে পারি, সত্য ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম কি?—যাহা যাহার সত্তার পক্ষে প্রয়োজন, তাহাই তাহার ধর্ম্ম—অর্থাৎ যাহার যাহা না হইলে চলে না, তাহাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম। জগৎ বিচিত্র—সুতরাং সকলের পক্ষে এক ধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌম রূপ স্বীকার করা প্রয়োজন। সমস্ত ধর্ম্মের মূলেই সত্য রহিয়াছে। সত্য এক ভিন্ন দুই নয়। সুতরাং সমস্ত ধর্ম্মেরই পরিণতি যে একমুখী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য পরিণতি বলিতে উৎকর্ষই বুঝিব, যেমন মুকুলের পরিণতি পরিপক্ক ফলে। যেখানে ধর্ম্ম চরম পরিণতি বা বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, সেখানে উহা সত্যের সহিত অভিন্ন। এই সত্যধর্ম্মই সকলের আদর্শ।

আদর্শে পৌছিবার জন্য কতকগুলি উপায় নিরূপণ করা হইয়াছে। ইহাকেই বলে নীতি। নীতির মাঝে সাম্প্রদায়িকতা নাই, জাতিভেদ নাই। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনুষ্যত্বের মূল নীতিগুলি সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। নীতির উপরেই সমাজ বা সংসারের প্রতিষ্ঠা। নীতি অভ্যস্ত হইলে উহাকে আচার বলে। সদাচার ভিন্ন ধর্ম্মের স্বরূপ বোঝা অসম্ভব। ধর্ম্মের আচরণে যে আত্মার ব্যাপ্তি ও তুষ্টি ঘটে, উহাই ধর্ম্মসম্বন্ধে চরম প্রমাণ। উহা সত্যেরই প্রতিরূপ। এই ব্যাপ্তি ও তুষ্টির অবিকশিত অবস্থায় প্রকারভেদ থাকিলেও চরমে উহা সৎ-চিৎ সুখস্বরূপ। ইহাই সত্যের রূপ।

সত্যলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই। আকাঙ্ক্ষা তীব্র না হইলে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে না—সাধ্য ছাড়িয়া সাধনার প্রতিই মন বেশী করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িবে। তখন মনে হইবে, এইখানে থাকিলে সত্যলাভ হইবে, কি ওইখানে গেলে হইবে না ইত্যাদি। কিন্তু সত্য তো বাহিরের বস্তু নয়। আমি যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সত্য হইতে বিচ্যুত থাকিতে পারি না—কেননা আমি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার আমাকেই খুঁজিতে হইবে, তাহারই রসের পিপাসা মিটাইতে হইবে। তাহার উপায় বাহিরের সঙ্গে বিরোধ নয়—সামঞ্জস্য। সামান্য হইলেও ইচ্ছার স্বাধীনতা আমার আছে—আনন্দলাভের প্রেরণাও আছে। এই দুইটী পুঁজি করিয়াই বাহিরটাকে আমার মনমত করিয়া গুছাইয়া লইতে হইবে। গুছাইবার শক্তিও ভগবান্ আমাকে দিয়াছেন। অভ্যাসে শক্তির স্ফুরণ হয়। আজ যদি একটা সমস্যার সমাধান ভিতর হইতেই করিতে পারি—সাহস বাড়িয়া যাইবে, নিজকে আরও শক্তিশালী বলিয়া অনুভব করিব।

সুতরাং সমস্তই যদি আমার ভিতরে থাকে তবে বৃথা একটা আকাশ-কুসুমের কল্পনায় কেবল অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া লাভ কি?

সাধনার মূলই হইল—বীর্য্য, নিরুদ্যম ভাব। কিছুই ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিব না—যেখানে ভগবান্ আমার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেইখানে থাকিয়াই তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিব। ধর্ম্মের জোয়ারে ভাসিয়া যাইবার প্রলোভনটা বড় বেশী। প্রাণে যদি একটু ব্যাকুলতা আসিল, অমনি একটা মনঃকল্পিত সাধনার আশায় মানুষ নিশ্চিতকে ছাড়িয়া অনিশ্চিতের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু এর মত মারাত্মক ভুল আর হইতে পারে না। মানুষ যদি একটা ব্যবসা ফাঁদিতেও বসে, তখনও তাহার কত হুঁসিয়ারী, কত চুলচেরা হিসাব। কেবল ধর্ম্মসাধনার বেলায় কোনও বিবেচনার প্রয়োজন নাই—যেমন তেমন করিয়া ভাসিয়া পড়িলেই হইল। ক্ষণিক বৈরাগ্যের প্রেরণায় কতজন ঘর ছাড়ে, কিন্তু দু'দিন পরে দু' কূল হারাইয়া জীবনটা মাটী করে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, আমার আকাঙ্ক্ষা তীব্র কিনা। যদি পাওয়ার জন্য এতই তীব্র লালসা হয়, তবে এখানে বসিয়াই পাই না কেন? তুমি হয়ত বলিবে, এখানে অবস্থা প্রতিকূল, কি করিয়া পাইব! কিন্তু তুমি তো প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করিবার বাসনা লও নাই—অবস্থা অনুকূল হউক, আর প্রতিকূলই হউক, তোমার চাই সত্য। তাহা এখানেও আছে; তাহা যে অনুকূল অবস্থাতেই থাকে, প্রতিকূলে থাকে না—এমন কোনও কথা নয়। বরং প্রতিকূলের সঙ্গে যুঝিয়া তাহাকে পাওয়াই খাঁটী পাওয়া। কেবল অনুকূল অবস্থার খোঁজে থাকিলে অলক্ষ্যে আরামপ্রিয়তা আসিয়া সকল ভুলাইয়া দিবে—সত্যলাভের ইচ্ছা তখন চুলার দুয়ারে যাইবে—কেবল বাহ্যিক কতকগুলি অনুষ্ঠান করিয়াই মন খুসী থাকিবে—ভাবিবে, ঠিক পথেই চলিয়াছি।

আর একটা কথা। বর্ত্তমান অবস্থাকে যখনই প্রতিকূল বলিয়া তাহার প্রতিকার চাহিতেছ, তখনই তোমার সত্যলাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। "আমি ভাল হইব" এই যদি তোমার জীবনের একমাত্র কামনা হয়, তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যদি এই ভাব গাঁথা থাকে, তবে তোমাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবে কে?—সংসারের মমতা, সংসারের নির্য্যাতন? এইটুকু বাধা যদি ঠেলিয়া পার হইতে না পারিলে, দু' ফোঁটা চোখের জল বা দুটা অত্যাচারের বিভীষিকাতেই যদি তোমার সব ভণ্ডুল হইয়া যায়, তবে অমন পায়রার প্রাণ লইয়া ... উচ্চ বাহানা ধরিলে চলে না।

বর্ত্তমান অবস্থাকে যে অতিক্রম করিতে হইবে না, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাহাকে আয়ত্ত করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে—এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। একটা প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া আপনার মনমত আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিলে কোনও পরীক্ষকই সন্তুষ্ট হইবেন না। বাধা জয় করিতে হইবে নিজের ভিতর হইতে। তুমি হয়ত বলিতেছ, সংসারে থাকিয়া আমার ধর্ম্মলাভ হয় না—আমাকে সংসার ছাড়িতে হইবে। সংসার ছাড়ার পক্ষে কেহ আপত্তি করিবে না, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জিজ্ঞাস্য এই, সংসারে কেন ধর্ম্মলাভ হইবে না, ভাবিয়াছ কি? সে কি সংসারের দোষ, না তোমার দোষ? যেদিন এমন কথা বলিতে পারিবে

যে, আমি এত বড় ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছি, যাহা সংসারধর্ম্মের চেয়েও ব্যাপক, সংসারের বিরোধী না হইয়াও যাহা সংসারকর্ত্তব্যের চেয়ে বড়—সেই দিন ভিতর হইতেই ত্যাগের মন্ত্র পাইবে। সেইদিন সব ছাড়িয়া যাইও—কেহ বাধা দিতেও পারিবে না—তোমারও প্রাণ বিপুল তৃপ্তিতে, বিপুল প্রেমে ভরিয়া উঠিবে।

আজকাল এতগুলা কথা বুঝাইয়া বলিতে হয়, তাহার কারণ আছে। পূর্ব্বে ছিল, "যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ"—যে মুহূর্ত্তে বৈরাগ্য হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ঘরের বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু আজকাল এত সরাসরি হুকুম দিতে মন সরে না। কেননা সকল বিধিরই অধিকারিভেদ আছে। আজকাল অধিকারিভেদের নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। নিষ্কর্ম্মা থাকিয়াও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হইতে পারে—এটা আধুনিক যুগের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। কর্ম্ম জমা থাকিতে বৈরাগ্য হইতেই পারে না। এই জন্য স্বধর্ম্মাচরণ সকল ধর্ম্মের প্রথমে। এখন সমাজে শৃঙ্খলা নাই, ব্যবস্থা নাই, কাহার স্বধর্ম্ম আচরিত হইয়া কর্ম্মত্যাগের অধিকার জন্মিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া দিবে কে? তাই কর্ম্মের দায় এড়াইবার জন্য সন্ন্যাসের ঠাট লইতে অনেকে পশ্চাৎপদ হয় না। সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রকৃত অধিকারীও যেমন নিষ্পেষিত হয়, তেমনি অনধিকারীও প্রশ্রয় পায়।

আগে দেখ, ভোগ পিপাসা দূরে গিয়াছে কি না। দেহের সুখবাঞ্ছা, কল্পনার তৃপ্তি—এইগুলি মিটিয়াছে কিনা। যদি ধর্ম্মের জন্য সব ছাড়িতে পার, দেহ মনের উপর ভ্রূক্ষেপহীন হইতে পার, তবে বুঝিবে, প্রথম শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে—এইবার প্রমোসন পাইবার উপযুক্ত হইয়াছ। কিন্তু এই পরীক্ষা ক্ষণিকের উত্তেজনায় হইবার নয়। বহুদিনের অভ্যাসে সংযম চরিত্রে দৃঢ়মূল হইয়া থাকে—উহাই নিবৃত্তি-পথের সহায়ক হয়। পূর্ব্বে বাল্য হইতেই সংযমের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং কাহার ভোগশান্তি হইয়াছে, তাহা সহজেই ধরা পড়িত। কিন্তু এখন সে ব্যবস্থা নহে। কাজেই বৈরাগ্য খাঁটী কি না, তাহা সহজে বোঝা যায় না। অপরে বুঝিয়া বলিবে, এমনও সম্ভব নয়—কেননা এখন বড় কেহ কাহারও আশৈশব ভার লইয়া বসিয়া থাকে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় নিজকেই নিজের পরীক্ষক করিতে হইবে। ক্ষণিক উত্তেজনার বশে একটা কাজ করিয়া ফেলিলে শেষে তাহার জন্য আমাকেই কষ্ট পাইতে হইবে—এই ভাবিয়া বিবেচনা সহকারে দুর্গম পথে পা বাড়াইতে হইবে।

চারিদিককার ব্যবস্থা ও অবস্থা যখন অনিশ্চিত, তখন পরীক্ষাও খুব কঠোর হওয়া চাই। একটু নির্য্যাতন ভোগ না করিলে বুঝিতে পারিবে না—প্রাণের টান কোন দিকে। তা ছাড়া সত্য যে বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না—এই কথাটাই বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। বাহিরের প্রতিকূলতাকে অন্তরের রসায়ন দিয়া স্নিগ্ধ করিতে হইবে—শুধু বিরোধ আর অসন্তোষে কাজ হইবে না। বাহিরের অবস্থার চেয়েও যখন তুমিই বড় বলিয়া অনুভব করিবে, তখন ভগবানই হৃদয়ে থাকিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, রাখিতে হইবে কি ছাড়িতে হইবে, তাহা তিনিই বলিয়া দিবেন।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭১।৩

কর্ম্মের ঘূর্ণিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মানুষ কখনও কখনও একটু অবসর খোঁজে। কিন্তু অবসর উপভোগ করবার মত বীর্য্য থাকা চাই। যে অবসরে চিত্তে জাগে না, নিত্যকর্ম্মের অন্তরালে অন্তরের মাঝে যে কোন্ শিল্পীর রচনা চলছে, তা প্রাণ দিয়ে অনুভব করবার শক্তি মিলে না—তাকে অবসর বলি কি করে? কর্ম্মের বিরতিতে অপ্রবুদ্ধ চিত্ত কেবলই ভাবে, যেন লোহার শিকল দিয়ে কে তাকে মাটীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে—এখানকার বদ্ধবায়ুতে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে—তবুও যেন কোথাও পালাবার পথও নাই—চেষ্টাও নাই।

*

এই তো মোহ। এতে বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকলেই তো অবসন্ন চিত্তের কাছে ভাল-মন্দ সকলই মিথ্যা হয়ে যায়। এই জড়তা হতে বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, কোনও কঠিন নিয়মে নিজকে বেঁধে রাখা—নিজের ছন্দোহীন জীবনকে একটা ছন্দতাললয়ের লীলার মাঝে সমর্পণ করা। আর চাই ভ্রূক্ষেপহীন গভীর স্তব্ধতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতির দিকে তাকালে আর তখন চলবে না—অবাধ মুক্তির ক্ষেত্র যে তোমার হৃদয়ের সামনে প্রসারিত রয়েছে—এইটুকু আগে উপলব্ধি করতে হবে। কেবল অবিরাম সৃষ্টি পরম্পরায় নিজকে বিকসিত করে তোলা—একটা বৃহৎ সত্যকে কেন্দ্র করে নিত্য নূতন সৃষ্টির দিগন্তস্পর্শী পরিধির মাঝে নিজকে ব্যাপ্ত করে দেওয়া—এই চাই। জ্ঞান এই কেন্দ্র—প্রেমে তার ব্যাপ্তি। কর্ম্মের অবসরকে এমনি করে পূর্ণ করা চাই।

*

হয়ত এ জীবন আজ দুর্ব্বহ ভার বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তা বলে তার বেদনাকে তো আর প্রত্যাখ্যান করা চলে না। এ তোমায় সইতেই হবে—একে সইবার জন্য চাই অকুণ্ঠ বীর্য্য। এ জীবনকে বিদীর্ণ করে তোমার চারদিকে আজ হাহাকার ছাপিয়ে উঠেছে—তার ক্ষুধাকে মিটাবার জন্য চাই সৌন্দর্য্যের সুধা। সৌন্দর্য্যের অভাব যেখানে, সেখানেই যে বেদনার সৃষ্টি। সেই অমৃতের পিপাসী বলেই তো তোমার বুকের কাঁটা কিছুতেই দূর হলো না—তাই না জগতের প্রত্যেকটী নিষ্ঠুর আঘাত কঠিন ভঙ্গীতে তোমায় জানিয়ে দেয়—বন্ধনের ব্যথা কত নিদারুণ। তাই তো তোমার চিত্ত আবেশ-রসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবার জন্য মুক্তিকল্পনায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। মনে হয়, "এই যে বাদ আর বিসম্বাদ, কাজ আর অকাজ—এই যে কথার মেলা, আর অভি-মানের ছলা—কেবল এরই ভারে ভারে আমার প্রাণের বজ্রবেদিকা আবর্জ্জিত করে রাখব? না গো না—আমার সকল ব্যথার

উপর তোমার অলক্তলাঞ্ছিত পদ্মরাগমণ্ডিত কমলকলির মত সুকোমল চরণ দুটী রেখে—দাঁড়াও তুমি আমার নিখিল আকুলতা-মন্থনকরা অমৃতের হলাহল! তীব্র আবেগে, হৃদয়ের জ্বালাময় উচ্ছল আকাঙ্ক্ষায় আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে তোমায় আমি শোষণ করি—পতঙ্গের মত একবার সে দুরন্ত অনলে ঝাঁপিয়ে পড়ি!"

*

এই যে প্রাণের আকুল উচ্ছ্বাস—এ ই কি সত্য?—এ ও কি বেদনায় ম্লান হয়ে আসে না? শুধু মৃত্যুর মত্ততায় দিকহারা হলে তো চলবে না—এ জগতে বাঁচতে হবে যে তোমাকে! আর সে বাঁচা তো কেবল নির্জ্জীবের মত জীবনের মাঝে মৃত্যুকে বহন করা নয়—সে যে মরণকে জয় করে আনন্দের! নিবিড় চুম্বনে তার হিমপাণ্ডুর ওষ্ঠতটে যৌবনের সলজ্জ তপ্ত শোণিমা ফুটিয়ে তোলা। তাই শুধু মুগ্ধতা নয়—চাই বীর্য্য। দুঃখকে জয় করবার শক্তি চাই, ক্ষতিকে প্রসন্নহাসিতে সহ্য করবার শক্তি চাই, মৃত্যুকে সখা বলে বুকে তুলে নেবার মত বল চাই।—এ শক্তি আসবে তোমার নীরন্ধ্র জীবনের প্রেমসমুজ্জ্বল প্রশান্তি হতে।

*

আপনাকে বাঁধতে হবে—নইলে আর কিছুতেই শান্তি পাবে না। জ্বালা তো শুধু তোমারই ভিতরে নয়। বাইরের আর দশজনকেও তো জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছ—তাদের জ্বালাও যে তোমায় সইতে হবে।

*

এই যে দশের আদর আর উৎপাত—এই জীবনে সবার চেয়ে তীব্র হয়ে বিঁধতে থাকে বলেই দশকেও আমরা সুখী করতে পারি না—নিজের মাঝেও একটা স্বস্তি পাই না। আবার সোয়াস্তি পাব বলে দশের স্পর্শকে দূরে এড়িয়ে গেলেও তো লাভ হবে না। বীণার তারে আঘাত দিলেই ঝঙ্কার ওঠে; কিন্তু সেই আঘাতের মাঝে চাই ছন্দ, তাল—সেইটুকুই সমাহিত মনের শিক্ষা। সে শিক্ষা আমাদের জীবনে কোথায়? তার জন্য যে ধৈর্য্য, যে ত্যাগের প্রয়োজন—তার ব্যথা সইবার মত বীর্য্য কি আমাদের আছে? না প্রেমের ভান করে শুধু নির্ব্বীর্য্যতাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি?—জীবনকে সঙ্গীতহীন নগ্ন মরুভূমিতে পরিণত করবার সর্ব্বনাশা সাধনাকেই বড় নাম দিয়ে পূজা করছি? তাই তো আমাদের একূল ওকূল দু'কূল ভেসে যায়—আমরা না হই ঘরের, না হই পরের।

*

দ্বন্দ্ব মিটাতেই হবে—স্থৈর্য্য দিয়ে, ধৈর্য্য দিয়ে, আর বীর্য্য দিয়ে। ভালবাসি, কি ভালবাসা পেতে চাই—এই নেশাতে মন যখন ক্ষেপে ওঠে, তখন চঞ্চলতাকেই সত্য বলে মনে করি—স্থৈর্য্যের বাঁধন তখন আলগা হয়ে যায়। আবার কর্ম্মের অভিমান যখন দূর দূরান্তরের কল্পনার পরদাগুলি একটী একটী করে তুলে ধরে, তখন ধৈর্য্যের ঠেক দিয়ে, চিত্তকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। তার ওপর নির্ব্বীর্য্যতা তো আছেই। এই হল জীবনের নিত্যকার ইতিহাস। একে মিথ্যা স্তুতি দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেই আমরা অন্তরাত্মাকে তৃপ্ত করতে চাই। কিন্তু হাজার হলেও

নাই আর

ভাঙানো তাদের ঘর দুঃখের একটি ফুৎকারেই ভেঙে পড়ে।

*

অহরহ সংসারে তো এই অভিনয়ই হচ্ছে। চিত্ত কেবল প্রমত্ত হয়ে, স্ফীত হয়ে, মুখর হয়েই ফিরছে। কিন্তু যাকে সে খুঁজছে, তাকে সে পাচ্ছে কি? না, না পাওয়াটাকেই সে তার চরম নিয়তি জেনে কেবল পাওয়ার ভান করেই নিজকে ভোলাচ্ছে? এমনি করেই আমাদের সুখের হাট আমাদেরই কর্ম্মফলে তিল তিল করে ভেঙে পড়ছে।

*

তবুও একটা কথা। জীবন ভাঙছে তিল তিল করে—কিন্তু গড়বেও কি তিল তিল করে? হতে পারে। কিন্তু এ দুটোর একটাকেও আমরা সত্য বলে মানব না। সমগ্র রূপে দেখাই হল সত্য দেখা—চাই ভূমাকে, অল্পকে নয়। তাই জীবনের খণ্ডতার অন্তরালে যে মহাশক্তি ক্রিয়া করছে—তারই অখণ্ড মহিমা প্রত্যক্ষ করতে হবে। তার রূপ সমগ্র, একক এবং এক। তা নইলে জীবনের এই ক্ষণিকের কাহিনী অর্থপূর্ণ হত কি করে?—সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বের মাঝেও কাব্য-সুধা উৎসারিত হত কোথা হতে?

*

বিনাশ আর সৃষ্টি—উভয়কে একাসনে দেখা—সে হল সিদ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় হবার জন্য সাধককে আগে মৃত্যুর হাত হতে নিস্তার পেতে হবে। তাই বিনাশের সমগ্র রূপকে প্রত্যাখ্যান করে সৃষ্টির সমগ্র ধারাকেই আগে বুঝতে হবে। তিল তিল করে গড়ে উঠবার প্রতীক্ষায় কাল কাটালে আর চলে না—চাই প্রাণপূর্ণ এক বিরাট প্রবাহ, যার উচ্ছ্বাসে জীবনের সমস্ত অবকাশগুলি পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাকে চাইলেই আজ যদি বাস্তবে না পাই, তবুও ক্ষতি নাই। আমাদের কল্পনাতেই সে অমর হয়ে থাকুক—তবেই তার সঞ্জীবনী শক্তিতে অন্যত্র বাস্তবেও প্রাণ মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে। এই পরিপূর্ণ মহিমার নিটোল সৌন্দর্য্যই আমাদের জীবনের কাম্য। অরূপ হতে তার রূপে অবতরণেই জীবন সার্থক। তাকে যদি পাই, তবে আর ক্ষতিতে পীড়িত হব না—বিচ্ছেদে মূঢ় হব না।

*

আঘাতে বিচলিত হয়ে একটা মন বলে, জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখতে নাই। এ আমাদের বৈরাগী মন। কিন্তু অনুরাগী মনও যে আছে—সে তো এত সহজে মায়া কাটাতে চায় না। অনুরাগের প্রলেপে হৃদয়ের ক্ষত শুকিয়ে যায়—আবার মানুষের সঙ্গে মানুষ বিচিত্র সম্পর্কে বাঁধা পড়ে। এর মাঝে কোনটাকে সত্য বলব? কোনটা জীবনের একমাত্র কাম্য হবে? অগভীর দৃষ্টিতে তার কোনও মীমাংসা হতে পারে না। বৈরাগ্যও সত্য, প্রেমও সত্য। কিন্তু বাস্তব জগতে উভয়ের মিলন দেখতে পাই না। অথচ অন্তর্য্যামী বলছেন, উভয়ের মিলনেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ। প্রকাশের পথ প্রশান্তিতে। আঘাতের পরিবর্ত্তে বিক্ষুব্ধ মনের যে জবাব পাই, তাকেই সত্য মনে করে উত্তেজিত হলে উঠলে বিরোধের মীমাংসা কোনও কালেই হবে না। আবার উত্তেজনা যদি না থাকে, তবে মনের শক্তি খর্ব্ব হয়ে যাবে—ঔদাসীন্য আসবে। তাতে সংস্কারবশে আপাত ক্ষতি হলেও আশঙ্কা নাই। মনের বিকারবুদ্ধিও খর্ব্ব হলেই সত্য সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকাশ হবে। তখন সত্য যদি মনের লাগাম ধরে—তাহলে আর ভয় কি?

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রমসংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামে অবস্থিত করিতেছেন।

জন্মমহোৎসব

আগামী ২৯শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথিমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। উক্ত দিবসে সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের বগুড়াস্থিত শাখাশ্রমেও জন্মতিথি মহোৎসব ও ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

"জিনবাণী"

কলিকাতা, ১৭—১৯ শ্যামবাজার ব্রীজ রোড স্থিত "বঙ্গবিহার অহিংসা ধর্ম্ম পরিষদের" মাসিক মুখপত্র।—আমরা উক্ত পত্রিকার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। জৈনধর্ম্মের সত্যসমূহ বর্ত্তমান যুগে বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিবার বোধ হয় ইহাই প্রথম প্রয়াস। জৈন ধর্ম্ম, দর্শন ও সাহিত্যের মাঝে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের যে এক বিপুল অধ্যায় সমাহিত রহিয়াছে, ইহা সুধীবৃন্দের অগোচর নহে। বঙ্গবাসীর নিকট অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটিত হইতে চলিল দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সত্যনির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যতই উদারভাবে আলোচনা হইবে, ততই ধর্ম্ম জগতের বিদ্বেষ কোলাহল প্রশমিত হইয়া সত্য স্বমহিমায় প্রকাশিত হইবে। "জিনবাণীর" প্রবন্ধ-সমূহ সুচিন্তিত ও অভিনব তথ্যপরিপূর্ণ। ইহার কিয়দংশে হিন্দীভাষায়ও প্রবন্ধাদি থাকে। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। আমরা নবীনা সহযোগিনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

নিবেদন

বিগত বগুড়ার ভক্তসম্মিলনীর প্রস্তাবানুসারে সম্মিলনীর সদস্য ভক্তগণ সকলেই যথাসাধ্য "আর্য্য দর্পণ" পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। তদনুযায়ী বর্ত্তমান বর্ষে আমরা অধিকসংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করিয়াছি। "আর্য্যদর্পণ" কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে—ইহার সমস্ত আয় অত্রত্য সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের অনাথদিগের শিক্ষা ও সেবাকল্পে ব্যয়িত হইয়া থাকে। সেবাব্রত উদ্‌যাপন সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। আমরা সকলের সমবেত চেষ্টা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই কৌপীনমাত্রৈকসম্বল হইয়াও এই গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা আছে, ধর্ম্মের প্রতি, দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া শ্রীগুরুর মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তাকল্পে সদস্য ভক্তগণ স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন। এ বৎসর অধিকসংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করা সত্বেও সদস্যভক্তগণের ঐকান্তিক-চেষ্টায় দারিদ্র আশ্রমকে বর্দ্ধিত ব্যয় ভারহেতু ক্লান্ত হইতে হইবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।
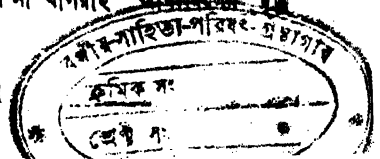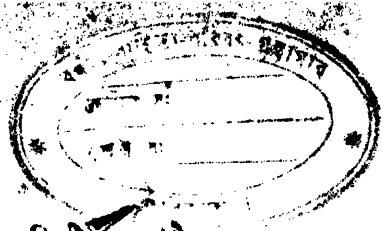
(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } শ্রাবণ { ৪র্থ সংখ্যা

ব্রহ্মণস্পতিঃ

[ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।২।১]

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত
আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥

দেবাশ্চিৎ তে অসুর্য্য প্রচেতসো
বৃহস্পতে যজ্ঞিয়ং ভাগমানশুঃ।
উস্রা ইব সূর্য্যো জ্যোতিষা মহো
বিশ্বেষামিজ্জনিতা ব্রহ্মণামসি॥

আ বিবাধ্যা পরিরাপস্তমাংসি চ
জ্যোতিষ্মন্তং রথমৃতস্য তিষ্ঠসি।
বৃহস্পতে ভীমমমিত্রদম্ভনং
রক্ষোহণং গোত্রভিদং স্বর্বিদম্॥

সুনীতিভির্নয়সি ত্রায়সে জনং
যস্তুভ্যং দাশান্ন তমংহো অশ্নবৎ।
ব্রহ্মদ্বিষস্তপনো মন্যুমীরসি
বৃহস্পতে মহি তৎ তে মহিত্বনম্॥

দেবগণমধ্যে তুমি গণপতি—করি আবাহন,
কবিদেরও কবি তুমি—কীর্ত্তি তব বিশ্বে অতুলন।
শ্রেষ্ঠেরও নমস্য তুমি, ব্রহ্মবিদ্ বেদ-অধিপতি,
শোন এ আহ্বান, দেব, এস যজ্ঞে হরিতে দুর্গতি।

প্রাণের প্রেরক তুমি, দিব্যজ্ঞানে নিত্য বিভূষিত—
বৃহস্পতি-যজ্ঞভাগে দেবগণ হ'ল হরষিত;
পড়িয়াছে বিশ্বে যথা জ্যোতির্ম্ময় রবির কিরণ,
তব জ্ঞানদীপ্তি হতে তেমনি এ বেদের স্ফুরণ।

স্তব্ধ করি নিন্দুকেরে, আঁধারের বক্ষ বিদারিয়া—
ঋতময় জ্যোতিষ্মান্ দিব্য রথে আরোহিলে গিয়া।
ভীম রথ, বৃহস্পতি, অমিত্রের কাঁপায় পরাণ—
রক্ষোঘাতী, অভ্রভেদী, স্বর্গপথে তার অভিযান।

দিয়াছ শরণ তারে—পুণ্যপথে সাথী তুমি তার—
অর্পে যে তোমারে হবি—তারে নাহি স্পর্শে দুরাচার।
ব্রহ্মদ্বেষী জনে তুমি দহ, দেব, দর্প করি চূর—
তব মহা মহিমায় ত্রিভুবন করিয়াছ পূর।

শ্রীনন্দ

—*—

এমনি করিয়া সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে তিন দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু নন্দের প্রাণের পিপাসা তো মিটিল না। যে দরশন যাচিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহা পাইবেন কি না, তাহার ইঙ্গিত তো তিনি পাইলেন না। মন্দিরাঙ্গনের অদূরে পুরোহিতেরা তাঁহাকে দেখিয়াছে, মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গীত শুনিয়াছে, গ্রামবাসীরা সানন্দে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে—কিন্তু এ পাগল কিসের জন্য দেওয়ানা হইয়া ফিরিতেছে, তাহা তো কেহ বুঝিতে পারে নাই। আর বুঝিলেই বা কি? —অস্পৃশ্য পারিয়াকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার কথা তো কেহ কল্পনাই করিতে পারিবে না। সাধারণ মানুষ বুঝে, ভাব দূর হইতেই সুন্দর, কিন্তু তাহা যদি কোনও চিরপোষিত সংস্কারকে আঘাত করিতে আসে, তবে তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করা চলে না।

এদিকে নন্দের প্রাণে দারুণ জ্বালা। যে আনন্দ তিনি বুকে পুরিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, আশাভঙ্গের মনস্তাপে তাহা দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে—বিরহের আর্ত্তনাদে বক্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের উপর ভরসা করিবার কিছুই নাই, তাহা তিনি জানেন! যিনি কৃপার আধার, তাঁহার কৃপা না হইলে মানুষের কাছে যাচিয়া কি কখনও কৃপা পাওয়া যায়—না, পাইলেও চিরদিনের মত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায়? নটরাজ ছাড়া নন্দের আর কে আছে? শৈশবের অস্ফুট স্বপ্নের মাঝে চকিতের মত তিনি তাঁহার দেখা পাইয়াছেন, আজ পরিপূর্ণ যৌবনে সেই শৈশব কল্পনাই বাস্তবের মূর্ত্তি ধরিয়া প্রাণের আঙ্গিনা আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছে—কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্পর্শে সে কল্পনা সার্থক হইল কোথায়? তিনি শুধু অরূপ চাহেন না—তিনি রূপেরও ভিখারী। তাঁহার দিব্যানুভূতিতে রূপে-অরূপে আর অরূপে রূপ যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত রহিয়াছে।

তাঁহার প্রাণে পিপাসা জাগাইল কে?—নটরাজ। আপনি যাচিয়া আসিয়া মিলনের সকল বাধা দূর করিয়া দিল কে?—নটরাজ। ডমরুধ্বনিতে প্রাণে প্রেমের কাঁপন তুলিয়া ঘরের বাহির করিল কে?—নটরাজ। সঙ্গীতের আনন্দে অভিসারের পথ ছাড়িয়া দিল কে?—সে-ও সেই নটরাজ। আর আজ তাঁহার সেই নটরাজ দুয়ারে ডাকিয়া ফিরাইয়া দিবে? এতই নিষ্ঠুর সে?—নন্দ আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার বুক ফাটিয়া অশ্রুর নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। "হে প্রভু, এ কি পুলক বেদনায় ক্ষণে তুমি আকুল করিয়া তুলিলে! এ কি বিষামৃতের রসায়ন আমায় পান করিতে দিলে তুমি! তোমাকে চাই, পাই না—তাই মর্ম্মদাহী সন্তাপে জ্বলিয়া মরিতেছি।—কিন্তু তাহারি মাঝে তোমার সুরভি অঙ্গের অমৃতশীতল স্পর্শ সহসা আমায় উন্মনী করিয়া তোলে কেন?—আমি যে বুঝিতে পারিতেছি না, এ মিলন না বেদন। হে নটরাজ, আর কত ছলনা করিবে?"—নন্দ অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িলেন, কলকণ্ঠের কাকলি থামিয়া

গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল মাথার উপরে চতুর্দ্দশীর আপূর্ণ চাঁদ নীরবে হাসিতে লাগিল।

এদিকে মন্দিরে সে দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড হইয়াছে। চিদম্বরমের পুরোহিতের সংখ্যা ২৯৯৯—স্বয়ং নটরাজকে লইয়া ইহাদের তিন সহস্র সংখ্যা পুরিয়াছে। এই পুরোহিতেরা সকলেই সন্ন্যাসী—লোকে ইহাদিগকে শিবাবতার জ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকে। নটরাজের মতই ইহারা নগ্নকায়, বিভূতিলিপ্ত, রুদ্রাক্ষভূষিত। সে দিন পূর্ণিমা। প্রতিদিনের মত অতি প্রত্যূষেই পুরোহিতেরা স্নান করিতে গিয়াছেন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত আপ্পিয়া দীক্ষিত যেন অন্যদিনের চেয়েও একটু বেশী গম্ভীর—মুখভাবে সুস্পষ্ট সংশয়ের ছাপ পড়িয়াছে। স্নান সমাধা করিয়া নিত্যকর্ম্মে না যাইয়া পুরোহিত সকলকে সেদিন দেবসভাগৃহে ডাকিলেন। এইটী পুরোহিতদিগের মন্ত্রণাগৃহ। অনেকের মনই নানা চিন্তায় তোলপাড় হইতেছিল। পুরোহিতের অসময়ে আহ্বানে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন না। সকলে নীরবে সভাগৃহে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

দেবসভায় আসিয়া আপ্পিয়া দীক্ষিত গম্ভীর স্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই সব, আমি কাল রাত্রিতে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়াই তোমাদিগকে স্বপ্নকথা শুনাইবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছি।

"স্বপ্নে দেখিলাম, নটরাজ যেন আমার কাছে আসিয়া বলিতেছেন—'মন্দিরাঙ্গনে আজ তিন দিন ধরিয়া যে পারিয়া আমাকে গান শুনাইতেছে, সে আমার পরম ভক্ত। সে আমাকে দেখিতে চায়। তোমরা তাহাকে দেবদর্শন করাইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহার দেহ সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধ ও ব্রাহ্মণোচিত করিয়া লইবে।' এখন ইহার কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সভাস্থ সকলে নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দ্বিতীয় পুরোহিত কুপ্পন দীক্ষিত উঠিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয়, আমিও কাল রাত্রে অবিকল এই স্বপ্নই দেখিয়াছি।" তৃতীয় পুরোহিত শুভ দীক্ষিতও সেই কথাই বলিলেন। ক্রমে প্রকাশ হইল, নটরাজ গতরাত্রে সকলকেই নন্দ পারিয়াকে ব্রাহ্মণ করিয়া দেবদর্শন করাইতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন।

এখন কি করিয়া নন্দের দেহ সংস্কার করিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য। অনেক যুক্তি পরামর্শ করিয়া শেষে স্থির হইল, নন্দকে অগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করাইতে হইবে। আপ্পিয়া দীক্ষিত মন্দিরাঙ্গনে অচেতনপ্রায় নন্দের কাছে এই সংবাদ লইয়া গেলেন। এদিকে মন্দিরাঙ্গনে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা হইল।

পুরোহিতের কাছে নটরাজের আদেশ শুনিয়া নন্দের আনন্দ বুক ছাপাইয়া উঠিল। "বন্ধু, আমায় তবে ভোল নাই! হায় গো বন্ধু, ক্ষণিকের অবিশ্বাসে তোমার প্রাণে কত না যাতনাই দিয়াছি! আমি তোমায় চাহিব কি?—যুগ যুগ ধরিয়া তুমিই না আমায় চাহিয়া আসিয়াছ! ভালবাসার অভিমানে অন্ধ হইয়া তোমার প্রেমে আমি অবিশ্বাস করিয়াছি বন্ধু—তুমি নিঠুর পীড়নে পীড়িত করিয়া আমায় সে অপরাধের শাস্তি দাও। তুমি আমার অগ্নিপরীক্ষা করিবে বন্ধু? তোমার প্রেমের আগুন আমার শিরায় শিরায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে—সে আগুন [illegible] ছে এই পৃথিবীর

আগুন যে তুষারের মত শীতল, মলয়ের মত সুরভি। তোমার রুদ্র আহ্বান যে আমার কাণে ভ্রমর গুঞ্জনের মত, বীণার ঝঙ্কারের মত!—ওগো, যাই গো বন্ধু যাই—"

নন্দ ভাবাবেশে টলিতে টলিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। সম্মুখেই প্রচণ্ড তেজে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—তাহার চারিদিকে নটরাজের দীক্ষিতেরা দাঁড়াইয়া। দূর হইতে নন্দের সাথীরা শ্রদ্ধায়, ভয়ে, বিস্ময়ে এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। দীক্ষিতেরা পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—সম্মুখে ভীষণ অগ্নি গর্জ্জিতেছে—নন্দ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত স্থিরদৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইতেছেন পশ্চাতে আপ্রিয় দীক্ষিত। সহসা প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল, অগ্নির লোলহান শিখা আকাশ স্পর্শ করিল—নন্দ নিষ্পলক, চেতনাহীন, পুলকে কণ্টকিততনু। ধীরে ধীরে নন্দ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

তারপর যাহা ঘটিল, তাহা দুর্জ্ঞেয়। ভীষণ ধূম আসিয়া নন্দকে ঘিরিয়া ফেলিল। কুণ্ডের মাঝে কি হইতেছে, কেহই দেখিতে পাইল না। সত্যই কি প্রেমের আগুনের কাছে মর্ত্ত্যের আগুন পরাভূত হইল? অগ্নি কি নন্দের দেহ স্পর্শ করিল না? চিন্ময় জগতের বিধানের কাছে জড়-জগতের বিধি কি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল?—জানি না।

সহসা সকলে বিস্ময়ে দেখিল, নন্দ অগ্নিকুণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু এ তো সেই কৃষ্ণকায় নন্দ পারিয়া নয়। কে এ লাবণ্য-ঢলঢল তপ্তকাঞ্চন-জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ! বিস্ময়ে ভক্তিতে কণ্টকিত হইয়া দীক্ষিতেরা ভক্ত ও ভগবানের জয়ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

ভাববিহ্বল নন্দ নটরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—দুইটী হাত প্রিয়তমের দিকে প্রসারিত, মুখে আনন্দের বিজলী! এ কি সেই স্থূলদেহধারী নন্দ, না তাঁহারই ভাববিগ্রহ? ভক্ত ও ভগবানের যুগল মাধুরী দেখিয়া দীক্ষিতেরা কৃতার্থ হইলেন। আপ্রিয় দীক্ষিত ভক্তিতে গদগদ হইয়া উভয়ের আরতি করিলেন। নন্দ আবার তাঁহার গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"নটরাজ, বন্ধু আমার, নটরাজ—এই যে আমি আসিয়াছি বন্ধু!—তুমি আর আমি যে এক—আমিই তুমি—তুমিই আমি—তবে আর দূরে কেন?—ভেদ কেন?—এসো বন্ধু—যাই—"

তারপর যাহা ঘটিল তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। উন্মত্তের মত নন্দ নটরাজের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—সহসা এক অসহন তীব্র জ্যোতিঃতে সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল—মন্দিরস্থ সকলে সে তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে সম্বিৎ পাইয়া সকলে চাহিয়া দেখে—মন্দির শূন্য—নন্দ কোথাও নাই—কেবল নটরাজের চোখের জ্যোতিঃ ঠোঁটের হাসি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দ—আনন্দ; নটরাজও আনন্দ; নটরাজই নন্দ। আজও দাক্ষিণাত্যের চিদাম্বরমের মন্দিরাঙ্গনে হেমন্তের মধুর প্রভাতে কুমারীরা নটরাজের নৃত্যভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া নন্দ-পারিয়ার অপরূপ প্রেমের গাথা গাহিয়া থাকে। নটরাজের (আ)নন্দ আমাদের হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া থাকুক। ওঁ শান্তিঃ।

(সমাপ্ত)

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

—*—

প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ

প্রমাণের সামান্যলক্ষণ করার পর সম্প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষণ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ করা হইবে, কেননা প্রমাণ সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই অধীন। তাহা ছাড়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোনও দার্শনিকেরই মতান্তর নাই। [নিম্নোক্ত কারিকায় কারিকাকার প্রমাণ সমূহের পর্য্যায়ক্রমে বিশেষ লক্ষণ করিতেছেন]—

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং
ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম্
আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনং তু ॥

—বিষয়সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের অধ্যবসায়ই প্রত্যক্ষ। তিন প্রকার অনুমান স্বীকৃত হইয়া থাকে; অনুমান লিঙ্গ ও লিঙ্গীর জ্ঞানপূর্ব্বক হইয়া থাকে। আপ্তশ্রুতিকেই আপ্তবচন বলে।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ

কারিকাকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্।" এই বাক্যে "দৃষ্টম্" এই পদদ্বারা যাহার লক্ষণ করিতে হইবে, সেই লক্ষ্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাক্যের অবশিষ্ট অংশটুকু লক্ষণ। লক্ষণ কি করে?—না সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তু সমূহের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা ধরাইয়া দেয়।

"প্রতিবিষয়াধ্যবসায়"—এই লক্ষণটীর প্রত্যেকটী অংশ ভাঙ্গিয়া বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখি, বিষয় কাহাকে বলে। বিষয় শব্দটী বন্ধনার্থক সি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যাহা বিষয়ীকে অর্থাৎ জ্ঞানকে অনুবন্ধ করে তাহাই বিষয়। বিষয় জ্ঞানকে স্বরূপ দ্বারা নিরূপণযোগ্য করিয়া থাকে, ইহাই বিষয় দ্বারা বিষয়ীর অনুবন্ধন।

বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ

[তাৎপর্য্য এই, জ্ঞান অখণ্ডস্বরূপ, ব্যবহারিক দশায় আমরা তাহাকে স্বরূপে ধারণা করিতে পারি না। ব্যবহারিক জ্ঞান খণ্ডিত। উহা কি করিয়া উৎপন্ন হয়? —ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞানই বিষয়াকার ধারণ করিয়া আমাদের সাক্ষাৎকারের যোগ্য হইয়া থাকে। ইহাই বিষয় দ্বারা বিষয়ীর নিরূপণ বা অনুবন্ধন। "জ্ঞান বিষয়াকারে পরিণত হয়"—এই কথাটী প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিক আমরা একটা কিছু জানি—ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? জ্ঞান হইতে গেলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হওয়া প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে পারি। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, বিষয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত হয় এবং সংজ্ঞানাড়ী দ্বারা তাহা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইলে বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাতে জ্ঞানের বহির্ব্যাপারটুকু ব্যাখ্যা করা হইল। কিন্তু জ্ঞানের আন্তর ব্যাপারের মীমাংসাও চাই—অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞানের সময় জ্ঞাতার কি প্রকার অবস্থা হয়, উপলব্ধি হইতে তাহা বুঝা চাই। জ্ঞানকে

যদি 'আমি' বলি, তবে বিষয় জানিবার সময় আমি কোথায় থাকি, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। সমস্ত বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশেষ একটীমাত্র বস্তুর জ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক জগতে হয় না—কেননা ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খোলা রহিয়াছে, বিষয়-বৈচিত্র্যেরও অভাব নাই, সুতরাং বিচিত্র অভিঘাতের বেদনা সর্ব্বদাই বোধকেন্দ্রে পৌঁছিতেছে। এই জন্য বিষয়-জ্ঞানকে দেশের মাঝে না দেখিয়া কালের মাঝে দেখিলে আমাদের বুঝিতে সুবিধা হইবে। ধর, এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটী—এখন আমি কোথায়? বিচিত্র বেদনার ভিতর দিয়া একটা বিচিত্র জগৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে—কিন্তু আমি এই জগতের সর্ব্বত্র। আমার চোখে রূপের অভিঘাত, কাণে শব্দের অভিঘাত, ত্বকে মৃদুত্ব, কাঠিন্য, উষ্ণত্ব শীতলত্বের অভিঘাত, আভ্যন্তরিক শরীরযন্ত্রের অভিঘাত—এইগুলি লইয়া একটা বহির্জ্জগৎ আমার সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে। আবার তেমনি অন্তরেও নানা চিন্তা, স্মৃতি, সুখ-দুঃখের আস্বাদ ইত্যাদি চলিতেছে। এই অন্তর্জ্জগতেও আমি আছি। এই বহির্জ্জগৎ আর অন্তর্জ্জগৎ—এই দুইটী ছাড়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রাকৃত দৃষ্টি লইয়া আমার আমিকে কোথায়ও খুঁজিয়া পাইব না। আমার জ্ঞানগ্রাহ্য জগতের সর্ব্বত্রই আমি—এক কথায় বলিতে গেলে আমি আর আমার জগৎ অভিন্ন। অবশ্য বিশুদ্ধ দ্রষ্টার আসন ইহার উপরে—কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তো তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইবে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখি, আমি আর আমার জগৎ এই দুইটীকে পৃথক করিবার উপায় নাই—যতটুকু আমি, ততটুকু জগৎ—যতটুকু জগৎ, ততটুকু আমি। তাই যদি হয়, তবে কাহাকে কাহার নিমিত্ত বলিব? এ কি জগৎই আমি আকারে পরিণত, না আমিই জগদাকারে পরিণত? দার্শনিক যখন তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বিষয় ও বিষয়ীর উর্দ্ধেও এক সাক্ষী আমির সন্ধান পাইয়াছেন, তখন তিনি বলিবেন, আমিই অর্থাৎ আমার কিয়দংশই জগদাকারে পরিণত। তাহা হইলে জ্ঞানই বিষয়াকারে পরিণত হয়—এই কথাই প্রমাণিত হইল। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, এই পরিণামের নিয়ামক কি? সে কথা এখানে আলোচ্য নহে, তাহাতে পুথি বাড়িয়া যাইবে।]

—*—

আমাদের বিষয় কি?—পৃথিবী প্রভৃতি ভৌতিক সৃষ্টি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিই আমাদের বিষয়। তন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ আমাদের বিষয় নহে। তবে উর্দ্ধস্রোতা যোগীদিগের উহারা বিষয় বটে।

[বিষয় বুঝিলাম, কিন্তু প্রতিবিষয় কাহাকে বলে?]—প্রত্যেক বিষয়ে যাহার বৃত্তি আছে, তাহাই প্রতিবিষয়। বৃত্তি অর্থে সন্নিকর্ষ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ই প্রতিবিষয়। ফল কথা, বিষয়ের সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়কে প্রতিবিষয় বলা যাইতে পারে।

প্রতিবিষয় বা ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত যে অধ্যবসায়, তাহাই প্রতিবিষয়াধ্যবসায় বা প্রত্যক্ষের লক্ষণ। বুদ্ধির ব্যাপারজ্ঞানকেই বলি অধ্যবসায়। [অবশ্য এখানে ব্যবহারিক জ্ঞানের কথাই বলা হইতেছে।] গৃহীতবিষয় ইন্দ্রিয়-সমূহের সন্নিকর্ষ হইলে পর বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হইয়া যে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, উহাই অধ্যবসায়। [এখানে] উপরি-উক্ত তত্ত্বটীই সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যক্ত

করা হইল।] ইহাকে বৃত্তিও বলে, জ্ঞানও বলে। ইহা প্রমাণও বটে। এই প্রমাণ দ্বারা চেতনাশক্তির অনুগ্রহ বা আয়ত্তীকরণ হইলে যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রমাবোধ হইয়া থাকে। [কিরূপে তাহা বলিতেছি।]

পুরুষ ও বুদ্ধির সম্বন্ধ

বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির পরিণাম, সুতরাং উহা অচেতন। কাজেই বুদ্ধির যাহা অধ্যবসায়, তাহাও অচেতন—যেমন ঘট পট জড় বলিয়া অচেতন। তেমনি বুদ্ধিতত্ত্বেরই সুখপ্রভৃতি বিভিন্ন পরিণামও অচেতন। পুরুষ এই সুখ দুঃখপ্রভৃতির সহিত যুক্ত নহেন, কিন্তু তিনি চেতন। পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন, আবার বুদ্ধির ছায়া তাঁহাতে উপরক্ত হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি পুরুষে উপচরিত হওয়ায় তিনিও যেন জ্ঞানী, সুখী, এইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এইরূপে বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ হয়। বুদ্ধি অচেতন, তাহার অধ্যবসায়ও অচেতন, কিন্তু চিৎপ্রতিবিম্ববশতঃ উহাও চেতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কারিকাকারও পরে বলিবেন, "এইরূপ সংযোগবশতঃ অচেতন বুদ্ধি প্রভৃতিও চেতনবৎ হইয়া থাকে; আবার গুণেরই কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও উদাসীন পুরুষও যেন কর্তা হন।" (কারিকা ২০)

তাৎপর্য্য

[প্রকৃতির আদি বিকার মহত্তত্ত্ব, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বুদ্ধি এই মহত্তত্ত্বেরই নামান্তর। বুদ্ধি বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহাই দেখিতে হইবে। অবশ্য প্রথমতঃ সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বেরই আলোচনা করিব, তাহাতে প্রাকৃত সৃষ্টির ক্রম বুঝিতে সহজ হইবে।

প্রথম হইতেই একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সাংখ্যতত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকের বা পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তত্ত্বান্বেষী মাত্রেই জগৎতত্ত্ব জানিতে চাহেন, উহার কারণরহস্য উদ্ভেদ করিতে চাহেন। জগতে যে কার্য্য দেখিতে পাইতেছি, উহা একটা অখণ্ড স্থির বস্তু নহে—বিভিন্ন পরিণামে উহা ক্রমে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং কারণের অনুসন্ধান করিতে হইলে কাহার পরিণাম এবং কেনই বা পরিণাম, ইহার উত্তর চাই; অর্থাৎ উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ এই দুইটীর জ্ঞান চাই। বেদান্ত এই দুইটী কারণতত্ত্বকে দুইটী সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়াছেন—উপাদান—শক্তি, নিমিত্ত—চৈতন্য। চৈতন্যেরই শক্তি—সুতরাং এই যুগলের আনন্দধারা জগতের অনন্ত অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত বহিয়া চলিয়াছে—বৈদান্তিকের এই অনুভূতি বুঝাইবার জন্যই উপাদানকে জড় না বলিয়া শক্তি বলিলাম। জড় শক্তিরই রূপান্তর।

কিন্তু সাংখ্যকার এই তত্ত্বটী একটু স্বতন্ত্র ভাবে দেখিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিবেকজ্ঞানই সাংখ্যতত্ত্বের মেরুদণ্ড। এই বিবেকজ্ঞানের বলে চৈতন্য ও জড় এই দুইটী বিরোধী তত্ত্ব সাংখ্যকারকে উপস্থিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিরোধ থাকিলেও উভয়ের সমবায়েই কার্য্য জগৎ চলিতেছে। সুতরাং কার্য্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য সাংখ্যকারকে প্রকৃতিতে এক অনাদিসিদ্ধ পরিণামশক্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রকৃতি অনাদি, স্বতঃপরিণামী, নিত্য ব্যাপ্ত—ইহাই সাংখ্যের অভিমত। তাহা ছাড়া প্রকৃতি পরার্থা অর্থাৎ তাহার স্বার্থে কোনও প্রবৃত্তিই নাই, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিবার জন্য তাহার প্রবৃত্তি,

ইহাও সাংখ্যকারের মত। ইহার পর সাংখ্যকার আবার প্রকৃতির প্রতি পুরুষের নিত্য-সান্নিধ্যও স্বীকার করিয়াছেন। এই কথাগুলি স্বীকার না করিলে জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা চলে না। অভিজ্ঞ পাঠক বৈদান্তিক ও সাংখ্যকার উভয়ের মত তুলনা করিলে দেখিবেন, কার্য্যতঃ জগৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উভয়ে এক স্থানেই উপনীত হইয়াছেন। ধারা উভয়েরই এক, কিন্তু দৃষ্টি বিভিন্ন। সাংখ্য বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে চাহেন, বেদান্ত চাহেন সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে। এইজন্য পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধনির্ণয়ে উভয়ের মাঝে এইরূপ ভাষার ভেদ ঘটিয়াছে। ফল কথা, সাংখ্যতত্ত্ব আলোচনার সময় আমাদিগকে সর্ব্বদাই বিবেকজ্ঞানের তাৎপর্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উপরের বিষয়টী প্রণিধানসহ আলোচনা করিলে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির তাৎপর্য্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রকৃতির বিকারগুলি যেন এক একটা থাপ মাত্র—চৈতন্যজ্যোতিঃর স্ফুরণের এক একটা বিশিষ্ট আবহাওয়া মাত্র। উহার মূলে সর্ব্বত্রই বিবেকদৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া এই থাপগুলিকে আমাদের জড় বলা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু উহাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে বৈদান্তিক বা পৌরাণিক পরিভাষায় বুঝাই সহজ—কেবল বেদান্ত যেখানে দুইটীকে জড়াইয়া এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেখানে সাংখ্যের বিশ্লেষ দৃষ্টি লইয়া দুইটী তত্ত্বকে পৃথক রূপে ধারণা করিতে হইবে।

এই ভাবে দেখিলে আমরা সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বকে উপাদানের দিক দিয়া শুদ্ধসত্ত্ব বা ইচ্ছাশক্তি বলিতে পারি। বেদান্তী আবার তাহার অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য মহাবিষ্ণুকে নিমিত্তস্বরূপে এই সঙ্গেই দেখিতে পাইবেন। মহত্তত্ত্ব তাহা হইলে সৃষ্ট্যুন্মুখ অবস্থা। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট অতি প্রাঞ্জল ভাবে উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"অব্যাকৃতমেব প্রকৃতি ইষ্যতে। তস্য চ সৃষ্ট্যুন্মুখত্বং সৃষ্ট্যাদ্যকালযোগরূপং—তদেব মহত্তত্ত্বং। ততো 'বহু স্যাম্' ইতি অভিমানাখ্যাকেক্ষণকালযোগিত্বম্ অব্যাকৃতস্য অহঙ্কারতত্ত্বম্। তত আকাশাদিপঞ্চভূতসূক্ষ্মাণি ক্রমেণ উৎপন্নানি পঞ্চতন্মাত্রাণি। ততস্তেভ্যো এব স্থূলানি উৎপন্নানি পঞ্চমহাভূতানি।" ইহার আর বিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজন।

সাংখ্যকার এই অবস্থাগুলির মাঝে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিয়া কেবল পুরুষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন মাত্র।

সাংখ্যকার প্রকৃতিকে কোন্ অর্থে অচেতন বলেন এবং তাহার পরিণামভেদ দ্বারা জগতের কোন্ কোন্ অবস্থাকে সূচিত করিতে চাহেন, অতঃপর তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিন হইবে না। মূল রহস্যটী আয়ত্ত করিতে পারিলেই আমরা কেবল মাত্র নৈয়ায়িকের যুক্তি প্রয়োগ করিয়া পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করিতে পারিব। যেখানে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে, সেখানে মূল রহস্যের সঙ্কেতে অর্থ অবধারণ করিলেই চলিবে।

প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন, বুদ্ধির অধ্যবসায়ও অচেতন—অতঃপর এই কথাগুলি শুধু ন্যায়ানুসারে সাজাইয়া

গেলেই চলিবে। বুঝিতে হইবে, সাংখ্যকার সর্ব্বত্র খাপটাকেই লক্ষ্য করিতেছেন !

তারপর একটা কথা আছে, "সুখ প্রভৃতিও অচেতন।" এই কথাটায় আমাদের একটু গোল ঠেকে। কারণ সুখ বলিতেই আমরা তাহার সঙ্গে অনুভূতিকে জড়াইয়া লই। সুতরাং, সুখ বুদ্ধির ধর্ম্ম এবং বুদ্ধি অচেতন বলিয়া উহাও অচেতন—সহসা এই কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু এখানেও মনে রাখিতে হইবে, জড়াজড়ি ভাবটা সাংখ্যকার মোটেই আমল দিতে চাহেন না। সুখের বেলাতেও চৈতন্যকে বিবিক্ত করিয়া লও—চিত্তবৃত্তির একটা খোলস মাত্র পড়িয়া থাকিবে। এই সম্বন্ধে আর এক দিক হইতে দুইটা কথা বলিতেছি।

চেতন আর অচেতনের পার্থক্য নিরূপণ করিতে গিয়া একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—চৈতন্য নিত্য সুতরাং পরিণামরহিত, কিন্তু জড় পরিণামী। অবশ্য পরিণাম কেন হয়, তাহার কোনও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সাংখ্যকার দেন নাই, দিবার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই—তিনি শুধু পরিণামকে মানিয়া লইয়াছেন। বেদান্তী চৈতন্যাশ্রিত শক্তি স্বীকার করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, যেখানেই পরিণাম দেখিব, সেখানেই বুঝিব, প্রকৃতির খেলা—জড়েরই পরিণাম। এই পরিণাম সংসাধিত হয় গুণত্রয়ের সাহায্যে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনটি গুণ জগতের তিনটি বিভাব মাত্র—বাহিরে তাহারা প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও সঙ্কোচ রূপে, আর বেদনাতে সুখ দুঃখ মোহরূপে জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। এখানেও শুধু খাপটাই দেখিতে হইবে, অবিবেকীর মত সব একাকার করিয়া দেখিলে চলিবে না।

যদি দেখি, কোনও তত্ত্ব এই তিনটী গুণের প্রাদুর্ভাব ও অভিভব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবে বিনাবাক্যে তাহাকে জড় বলিয়া স্বীকার করিব। ব্যষ্টি বুদ্ধিতেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ করা চলে। গীতায় ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। সুতরাং গুণস্পর্শ দেখিয়াও বুদ্ধিকে অচেতন মানিয়া লইব। এখন সুখ দুঃখকে অচেতন কেন বলিব, তাহার আরও দুইটি সঙ্কেত বলিতেছি।

প্রথমতঃ সুখ আপেক্ষিক সত্তা—উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে—সুখদুঃখের পরস্পর প্রতিযোগিতাই উহার হেতু। ইহা হইতেই স্বীকার করিতে হয়, সুখ প্রভৃতি পরিণামী সুতরাং জড়। এই গেল এক কথা।

তারপর সুখ দুঃখের ফল বিচার করিলে আর একটা বুঝিতে পারি। সুখ দুঃখকে যথাক্রমে অনুকূলবেদনীয় ও প্রতিকূলবেদনীয় ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল ভাব গ্রহণেচ্ছা ও বর্জ্জনেচ্ছা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। সহজ কথায় সুখ গ্রহণ করি, দুঃখ বর্জ্জন করি—এই আমাদের কাজ। কিন্তু এই গ্রহণ-বর্জ্জন ব্যাপার যদি সম্পূর্ণ যন্ত্রবৎ সংসাধিত হইতে পারে, তবে সুঃখদুখ হইতে অনুভূতির অংশটুকু বাদ পড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান এই সম্বন্ধে আশ্চর্য্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে।

একটা ব্যাঙের মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার দেহকে নানা উপায়ে উত্তেজিত ও অভিহত করিয়া দেখা গিয়াছে, কতকগুলি দৈহিক ব্যাপারে সে এমন ভাবে সাড়া দেয়, যাহাতে অনুকূলের

গ্রহণ ও প্রতিকূলের বর্জ্জন কার্য্যতঃ অতি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, এমন কি তখন আপাতদৃষ্টিতে একটা অক্ষত ব্যাঙের সহিত তাহার কোনও পার্থক্যই দেখা যায় না। ব্যবচ্ছেদ যত উর্দ্ধকেন্দ্রে হইতে থাকে, এই সুনিরূপিত কার্য্যের সংখ্যাও তেমনি বাড়িতে থাকে। পরিশেষে কেবল মাত্র মস্তিষ্কের সেরিব্রাম অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিলে সাধারণ দৃষ্টিতে উহার সমস্ত কার্য্যই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ অবস্থায় আর উহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত কোনও প্রবৃত্তি থাকে না। অক্ষত প্রাণীর সহিত এইখানেই উহার প্রভেদ।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে এই প্রমাণিত হয়, অনুকূলের গ্রহণ বা প্রতিকূলের বর্জ্জন সমস্তই সম্পূর্ণ যন্ত্রবৎ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সুতরাং উহা দেখিয়া চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত্তির অনুমান করা নিরাপদ নহে। সুখদুঃখের অনুভূতি হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্তির অংশটুকু বাদ দিলেও যে উহাদের আকৃতি অবিকৃত থাকিতে পারে, উল্লিখিত ব্যাপার হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত্তি পরগত চৈতন্যেরই লিঙ্গ বা অনুমাপক—এই কথাটুকুও এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সুখ প্রভৃতিকে অচেতন বলিতে কোনও সঙ্কোচ হয় না। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে প্রাচ্যতত্ত্ব-বিদ্যা সমধিক পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে।]

কোন্‌টা বড় ?

—*—

সত্য সব স্থানেই আছে—এই শ্রদ্ধাটুকু চাই। সংসারেও সত্য আছে, বনেও আছে। মূলে সকল মানুষেরই এক লক্ষ্য। লক্ষ্য যদি হারাইয়া যায়, তাহা হইলে সংসারে থাকিয়াও ঠকিতে হইবে, বনে আসিয়াও ঠকিতে হইবে। আবার আকৃতি-প্রকৃতিতে সব মানুষ একরকম নয়, সকলের রুচিও এক নয়। তাই কারু কাছে সংসারই ভাল লাগে, কারু কাছে বা বন-জঙ্গলই ভাল লাগে। এর মাঝে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ—এ বিচার যাহারা করিতে যায়, তাহারা অর্ব্বাচীন। তাহারা মানুষের ভিতরের সত্যটা দেখে না—দেখে বাহিরের খোলসটা। মাথাগুন্তিতে বেশী হইলেই কোন কিছু বড় হয় না। সংসারী অনেক, সংসার-বিরাগী অল্প, এ তুলনায় কোনও সত্যই নির্দ্ধারিত হয় না। দুই দল খুঁজিলে খাঁটি সংসারী আর খাঁটি বিরাগী হাজারকরা কয়জন মিলিবে বলা যায় না। রুচিভেদে পথের ভেদ হইয়াছে। ভেদ লইয়া মারামারি করাটা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়—দুয়ের মাঝে যে নির্ভেদ সত্যটুকু আছে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির কর, দেখিবে দুই জনই বড় নিকট আত্মীয়, কাহারও কাহাকে ছাড়িয়া চলে না।

পথের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইবে কি যুক্তি,

তর্কের কাছে? তোমার পথ যে বড়, তাহা শাস্ত্রে প্রমাণ করিতে পারিবে না, তর্কে প্রমাণ করিতে পারিবে না—সে প্রমাণ রহিয়াছে তোমার কাছে। কর্ত্তব্য করিয়া আপনি বলিয়া তাহার সার্থকতা তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। এই পথ সোজা, ওই পথ কঠিন—এ শুধু কল্পনা মাত্র। তুমি বাঙ্গালী, তাই ইংরেজের মাতৃভাষা তোমার কাছে কঠিন—কিন্তু ইংরাজের ছেলের কাছে তো তা নয়। আবার ভাষার ভেদ থাকিলেও ভাবে দুইই এক। এমন জায়গাতেও মানুষ পৌছাইতে পারে, যেখানে ভাষার ভেদে ভাব-বিনিময়ে কোনও বাধা হয় না। সেখানে ভাবই স্বতঃস্ফূর্ত্ত—ভাষার খোলস খসিয়া পড়িয়াছে।

তাই বলি, সংসারে থাকিয়া ভগবান মিলিবে, কি সংসার ছাড়িয়া মিলিবে—এই তর্কই মিথ্যা—যদি ভগবানের জন্য ঠিক দরদ উপস্থিত না হয়। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁহাকে পাওয়া। কোথায় তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তাহা তিনিই বলিয়া দিবেন। আমার পক্ষে যাহা সহজ, তিনি এমন ব্যবস্থাই করিয়াছেন। জন্মিবার পূর্ব্বে মাতৃস্তন্যে যিনি দুধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমার প্রাণের পিপাসা বুঝিয়া কি তিনি কোনও বন্দোবস্তই করেন নাই? আমি যেখানে থাকিলে তাঁহাকে পাইব, ঠিক তেমন স্থানেই তিনি আমায় রাখিয়া দিয়াছেন—মনে তেমনি আশা আকাঙ্ক্ষা, তেমনি পিপাসা জাগাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাড়াহুড়া করিলে কি হইবে? প্রবৃত্তির ডাক আর বিবেকের ডাক—দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করিতে শিখিতে হইবে। তাঁহার কথা শুনিয়া যদি চলি, তাহা হইলে আর ভয় নাই —যেখানেই থাকি না কেন, তিনি ছুটিয়া আসিবেন। মানুষ তাঁহাকে পাইবে কি জোর করিয়া?—তিনি নিজে সাধিয়া ধরা না দিলে? আবার এও জানি, ধরা দিবার জন্যই তিনি বসিয়া আছেন। পরীক্ষার কথা বল? —তিনি যেমন সমস্যা দিয়াছেন, তেমনি প্রাণের মাঝে তার উত্তরটাও দিয়া রাখিয়াছেন। যার যতটুকু বিদ্যা, তিনি তাহাকে তেমন প্রশ্নই করেন। তিনি এমন পরীক্ষক নন যে ছাত্র ঠকাইবার জন্য শক্ত প্রশ্ন করিয়া বসিবেন। পরীক্ষায় পাশ করানই তাঁহার উদ্দেশ্য, ফেল করা নয়।

যেখানেই তিনি রাখিয়াছেন, সেইখানেই স্থির হইয়া বস, মনপ্রাণ এক করিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার কথা শুন। যে অবস্থাতেই থাক না কেন, কর্ত্তব্য কোথাও কম নয়। সংসারেও যেমন দায়িত্ব, সংসারের বাহিরেও তেমনি দায়িত্ব। দায়িত্ব কেন?—না তিনি তোমাকে একটু ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন বলিয়া। তুমি যে পশুপক্ষীর মত নও। তাহাদের তো কোনও চিন্তা করিতে হয় না—খাওয়া শোওয়া সবই তিনি দেখেন। কিন্তু তুমি মানুষ, তোমার ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা আরও আশ্চর্য্য হইয়া ফুটিবে, শুধু ফুটিবে নয়—তুমি নিজে সে লীলার স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিবে, করিয়া আত্মহারা হইবে—যতই শক্তির স্ফুরণ হইবে ততই তাঁহার সহিত নিজের একাত্মতা বুঝিতে পারিবে। তাই তিনি তোমাকে একটু অসহায় অথচ স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন—ভালমন্দ দুই সামনে রাখিয়া বলিতেছেন, বাছিয়া লও। আবার বাছনিতে ভুল হইলে তাহা সংশোধনও করিয়া দিতে-

ছেন—আঘাত করিয়া, বুদ্ধি জাগাইয়া, শক্তি জাগাইয়া। এই জন্যই মানুষ বলিয়া তোমার ঘাড়ে কর্ত্তব্যের চাপ আছে; কিন্তু পশু-পক্ষীর কোনও কর্ত্তব্য নাই, তাহাদের কাজের ভালমন্দ বিচার হয় না।

কর্ত্তব্যই হইল জীবনের নিয়ামক। তাই ধর্ম্ম আচারে। কর্ত্তব্য বিচার করিতে গেলেই একটা মাপকাঠি চাই। সব কাজেই যখন করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি তোমার রহিয়াছে, তখন তুমি কোনটা করিবে, এই হইল সমস্যা। আদর্শও তোমার মাঝেই রহিয়াছে। বিকাশ আর অবিকাশ, শক্তি আর দুর্ব্বলতা, চেতনা আর জড়তা—দুইই তুমি বোঝ; তার কোনটা যে তোমার ইষ্ট, তাও জান। দেহমনপ্রাণে শক্তি আসুক, চিত্ত ফুটিয়া উঠুক, জ্ঞানের দীপ জ্বলিয়া উঠুক—এ কে না চায়! সুতরাং ওই তো পথ। কর্ত্তব্যকে ওই আদর্শেই পরিচালিত করিতে হইবে।

কাজেই মানুষের আদর্শ এক—কর্ত্তব্যের তাগিদও সকলের পক্ষেই সমান। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে কর্ত্তব্যের প্রকারভেদ হয় মাত্র। কর্ত্তব্য সংসারীরও আছে, বৈরাগীরও আছে। যতক্ষণ উভয়ে উভয়ের কর্ত্তব্য করিবে, ততক্ষণই তাহারা খাঁটী; কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়া যে নিজকে ঠকায়, সেই ভণ্ড। শুধু বৈরাগীই ভণ্ড হয় না, সংসারধর্ম্মে যে ফাঁকি দেয়, সেও ভণ্ড সংসারী। ভগবানের চোখ কেহই এড়াইয়া যাইতে পারিবে না—যে যেমন কাজ করিবে, তাহাকে তেমন ফল দিয়া তিনি কাঁদাইবেন, হাসাইবেন, শিখাইবেন, তাঁহার করিয়া লইবেন। তুমি যা খুসী করিয়া বেড়াও—তোমার সাতখুন মাপ—এমন পরোয়ানা তিনি কাহাকেও দেন নাই। তবে তর্কের জোরে যদি তাঁহার কথার এমন অর্থই করিয়া থাকি, তবে তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

কে বলে সংসার প্রবৃত্তির পথ?—অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির পথ ধরিয়াই সংসারে চলিতেছে বলিয়া কি সেটাই ভগবানের আইন হইল? যিনি নিরপেক্ষ থাকিয়া সংসারী-বিরাগী উভয়কে দেখিতেছেন, তিনিই উভয়ের গতির ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন—এ প্রবৃত্তির পথে চলিয়াছে—ও চলিয়াছে নিবৃত্তির পথে। এ শুধু তথ্য-কথন মাত্র—আদেশ নয়। কিন্তু তুমিও কি সংসারে থাকিয়া বলিতে পার—আমি সংসারী জীব, সুতরাং প্রবৃত্তিই আমার পথ? এক হিসাবে প্রবৃত্তি সকলেরই পথ—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র আবার এ কথাও বলিতেছেন, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—সুতরাং নিবৃত্তি তোমার আদর্শ পথ। প্রবৃত্তির পথে চল, আপত্তি নাই—কিন্তু ঘা খাইয়া ফিরিতেই হইবে। তবে যে বুদ্ধিমান, সে গুরুজনের কথা শুনিয়া বলে, কাঁটার খোঁচা খাইয়া ফিরার চেয়ে কাঁটার পথে না যাওয়াই ভাল।

সংসারের মাঝেও একটা ভাব আছে, তাহার বাহিরেও একটা ভাব আছে—দুইই বড় সুন্দর। দুয়ের সমন্বয়ে জীবন পূর্ণ। তবে বলিয়াছি, রুচি অনুযায়ী, কর্ম্ম অনুযায়ী কেহ একটা পথ বাছিয়া নেয়। দুইয়েই যখন কর্ত্তব্য করিয়া যায়, তখন কাহারও সহিত বাধে না। দুজনেই সত্য লাভ করে, আনন্দ লাভ করে। কিন্তু যেখানেই কর্ত্তব্যের গলদ, সেখানেই রেষারেষি—ভালমন্দের বিচার; তখন একজন আর একজনকে ভুলাইয়া দলে টানিতে চায়।

প্রবৃত্তির পথে বহুলোক চলিয়াছে, কিন্তু

তা বলিয়া ওই পথই অনুসরণ করিতে হইবে —এমন নয়। এ কথা বারবার করিয়া বলিতেছি। সংসারে আছ বলিয়া প্রবৃত্তির ফতোয়া পাও নাই—এইখানে থাকিয়াই ভগবানের মহিমা নিজের জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে, দশের কাছে আদর্শ হইতে হইবে—ঠিক ভগবানের মত সংসারী হইতে হইবে।

একটা গল্প মনে পড়ে। এক ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে পাঠ সাঙ্গ করিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, এখন আমি কোন আশ্রম গ্রহণ করিব? কোন আশ্রম বড়—গার্হস্থ্য আশ্রম, না সন্ন্যাসাশ্রম?" গুরু উত্তর করিলেন, "এ কথার মীমাংসা এখন করিব না —তুমি কিছুদিন ঘুরিয়া আইস। পথে যদি আশ্চর্য্য কিছু দেখ, আমাকে আসিয়া বলিও।" ব্রহ্মচারী বিদায় হইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইল। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বনের মাঝেই রাত্রি হইয়া গেল। নিরুপায় ভাবিয়া সে একটা গাছে চড়িয়া রাত্রি কাটাইয়া দিবে মনে করিল। গাছে একটা পাখীর বাসা ছিল। সেদিন বড় দুর্য্যোগ। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, তবু পক্ষিণী এখনও বাসায় ফিরে নাই, তাই পক্ষীটী বাসায় বসিয়া তাহার জন্য বিলাপ করিতেছিল। এমন সময় এক ব্যাধ বৃষ্টিতে ভিজিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত। তাহার হাতে সেই পক্ষিণী। পক্ষিণী পক্ষীর বিলাপ শুনিয়া ডাকিয়া বলিল, "আমার জন্য দুঃখ করিও না —এই অতিথি বিপন্ন, ইহার সেবার আয়োজন কর।" শুনিয়া পক্ষী তাড়াতাড়ি ব্যাধের কাছে আসিয়া বলিল, "আপনি অতিথি, আপনার আমি কি কাজ করিতে পারি?" ব্যাধ একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমি বড় শীতার্ত্ত—আমার শীতনিবারণের একটা উপায় কর।" পক্ষীটী তখন কতকগুলি শুকনা পাতা জড় করিয়া কোথা হইতে এক টুকরা জলন্ত কয়লা আনিয়া ব্যাধকে আগুন ধরাইয়া দিল। শীত দূর হইলে ব্যাধ বলিল, "ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়—কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।" পক্ষীরা তো কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখে না—সুতরাং ব্যাধকে খাইতে দিবে কি? অথচ না দিলে এ বেচারী মারা যাইবে। পক্ষী তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যাধকে বলিল, "ঘরে তো আর কোনও খাদ্য নাই—আপনি আমাকে আহার করিয়াই ক্ষুধানিবৃত্তি করুন।" এই বলিয়া পক্ষীটী আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিয়া পক্ষিণী বলিল, "একটা পক্ষীর মাংসে আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না, সুতরাং আপনি আমাকেও আহার করুন।" এই বলিয়া সে-ও আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পক্ষিদম্পতীর এই আত্মোৎসর্গ দেখিয়া ব্যাধের তখন বৈরাগ্য হইল। সে আর আহার না করিয়া অস্ত্রপাতি সেখানে ফেলিয়া ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। গাছের উপরে ব্রহ্মচারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল, "এ এক আশ্চর্য্য কাণ্ড বটে। গুরুদেবকে এ কথা বলিতে হইবে।"

আর একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মচারী এক রাজার রাজধানীতে উপস্থিত। রাজবাড়ীর সম্মুখে সেদিন মহা হট্টগোল! ব্রহ্মচারী গিয়া দেখে, রাজা পাত্রমিত্র লইয়া দেওয়ানে বসিয়াছেন, তাঁহার পাশেই এক আশ্চর্য্য সুন্দরী কন্যা। রাজার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড কড়াইয়ে তপ্ত তৈল ফুটিতেছে। চারিদিকে লোকজনের মহা কলরব। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, "আজ রাজার

একমাত্র কন্যার স্বয়ম্বর। রাজা পণ করিয়াছেন, যদি কেহ ওই তপ্ত তৈলে ডুব দিয়া উঠিতে পারে, তবে রাজা তাঁহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিবেন। রাজার আর পুত্রসন্তানাদি নাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর জামাতাই রাজা হইবে। তবে রাজার এই পণ সফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না—কেননা অনেক রাজপুত্রও আসিয়াছেন বটে। কিন্তু তপ্ত তৈলে অবগাহন করিতে সকলেরই নিতান্ত অনিচ্ছা।" ব্যাপার কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্য ব্রহ্মচারী সেখানে দাঁড়াইল। এমন সময় সেখানে এক সন্ন্যাসী উপস্থিত। সন্ন্যাসী কাহাকে কিছু না বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে তৈলকুণ্ডের কাছে গেলেন, কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া কুণ্ডের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—আবার অক্ষত শরীরে কুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আপনমনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রজারা সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, রাজা কন্যাকে লইয়া সন্ন্যাসীর পায়ে প্রণত হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু আমার এই কন্যা আর এই রাজ্য গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? রাজা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তোমার পণের কথা আমি জানিতাম না। তৈলকুণ্ড দেখিয়া খেয়াল হইল, তাই একটা ডুব দিয়া উঠিলাম। তোমার কন্যাতে বা রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ষোড়শী সুন্দরী ও রাজ্য সম্পদ্ হেলায় পায়ে ঠেলিয়া প্রশান্ত মনে সন্ন্যাসী আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল, "এ ও এক আশ্চর্য্য বটে; গুরুদেবকে এ কথাও বলিতে হইবে।"

যথাসময়ে ব্রহ্মচারী গুরুর কাছে আসিয়া দুইটী ঘটনাই তাঁহার কাছে নিবেদন করিল। গুরু বলিলেন, "বৎস, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, গার্হস্থ্যাশ্রম বড় না সন্ন্যাসাশ্রম বড়। তোমার প্রশ্নের উত্তর ওই দুইটী ব্যাপারের মাঝেই রহিয়াছে। যদি পক্ষিদম্পতীর মত আত্মোৎসর্গ করিতে পার, তবে গৃহস্থ হও—আর যদি ওই সন্ন্যাসীর মত অনাসক্ত হইতে পার, তবে শেষ আশ্রম গ্রহণ কর। এখন বল দেখি, কোন পথ বড়?"

তাই বলি, সত্য সব ঠাঁই আছে। চাই শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম প্রাণ; আর প্রবর্ত্তের পক্ষে চাই—কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা।

মনোলয়

—*—

(নিবৃত্তিমার্গ)

মস্তিষ্ক প্রবলশক্তিসম্পন্ন না হইলে, চক্ষু মুদ্রিত করিলে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। "ষড়োর্ম্মিরাহিত্যকে" ব্রহ্মচর্য্য বলে। ব্রহ্মচর্য্যের ফলে মস্তিষ্কে শক্তিসঞ্চার হয় এবং চক্ষুমুদ্রণেও হৃদয়ে জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির তৈলধারার ন্যায় ঐকান্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তনে ক্রমে ক্রমে কিছু দিন অন্তে শ্রীমূর্ত্তির ক্রম স্ফূর্ত্তি হয়। কখনও বা এক অঙ্গ, কখনও বা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ দৃষ্ট হয়। কারণ তখনও মন বহির্বিষয়ের মোহময় আকর্ষণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ হয়ত শ্রীমূর্ত্তিতে মন সংলগ্ন হইতেছে—পুনরায় মন বহুদূর গমন করিতেছে। এরূপ স্থলে—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

অর্থাৎ মন যেখানে সেখানে বিচরণ করিবে, সেই সেই স্থান বা বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিতে হইবে।

এইরূপে ক্রমশঃ অভ্যাসে মন বিষয় হইতে বিরত হইলে শ্রীমূর্ত্তি ক্রমশঃই সুস্পষ্ট নয়নগোচর হইবে। যতই মন বিষয় হইতে বিযুক্ত হইবে ততই মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হইবে।

ধ্যাত্বা মধ্যস্থমাত্মানং কলসান্তরদীপবৎ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমাত্মানং ধূমজ্যোতিঃস্বরূপকম্॥

কলসের মধ্যবর্ত্তী প্রদীপের ন্যায় হৃদয় কমলস্থ আত্মার ধ্যান করিয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বুদ্ধিস্থানোপলক্ষিত ধূমশূন্য জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার ধ্যান করিবে। অর্থাৎ তখন আর হৃদয়াভ্যন্তরে অন্ধকার থাকিবে না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একান্ত চিন্তনে চিন্তনীয় স্থান স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল বলিয়া প্রতীত হইবে।

অন্যত্র—

"তত্রাত্মায়ং তুরীয়স্য তূর্য্যান্তে বিষ্ণুরুচ্যতে।
ধ্যানেনৈব সমাযুক্তো ব্যোম্নি চাত্যন্তনির্ম্মলে॥
সূর্য্যকোটীদ্যুতিমণ নিত্যোদিতমধোক্ষজম্।
হৃদয়াম্বুরুহাসীনং ধ্যায়েদ্বা বিশ্বরূপিণম্॥

মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে কোটী সূর্য্য সমুদিত হইলে যেমন জ্যোতিঃ প্রকাশমান হয়, ধ্যান গাঢ় হইলে বিষ্ণুও তাদৃশ প্রভাযুক্ত হইয়া প্রকাশ পান। তিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ, অধোক্ষজ ও বিষ্ণুরূপে প্রাণিসমূহের হৃদয়পদ্মে উপবিষ্ট। তিনিই বিশ্বরূপী।

এই জ্যোতিঃ, যাহা ধ্যান গাঢ় হইলে সাধকের নিকট প্রতিভাত হয়—তাহা প্রখর নহে। উহা অতীব স্নিগ্ধ। উহাই আত্ম- বা ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ। এইরূপে গলিতপারদবৎ শিশির-শীতল জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ইষ্টদেবতার আনন্দ-ঘন মূর্ত্তির দিব্য প্রকাশ হয়।

তখন সাধকের যে অবস্থা, তাহা স্বপ্ন-লোকের অবস্থার সহিত তুল্য হইতে পারে। তখন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলের উপর শত

স্থলকমলনিন্দিত ইষ্টদেবতার চরণযুগলে, সুন্দর ঢল ঢল প্রেমবিহ্বল নয়ন যুগলে, সাধকের মন নিবিষ্ট থাকে। এরূপ অবস্থায় সাধকের ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তর্ম্মুখী। তিনি অন্তররাজ্যে তন্ময়। সুতরাং গৃহমধ্যে ঘটিকা যন্ত্রের টিক্‌টিক্ শব্দ, ছেলের ক্রন্দন, এমন কি শঙ্খধ্বনি পর্য্যন্ত সাধকের অনুভূতি হয় না। শব্দ হইতেছে—গন্ধ বহিতেছে, কর্ণ ও নাসারন্ধ্র মুক্ত রহিয়াছে। অথচ তখন শব্দ ও ঘ্রাণ সাধককে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—তখন সাধক বহির্জ্জগতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

অতঃপর যখন মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান হয় অর্থাৎ যখন মন চঞ্চল হওয়ায় সংস্কার বশে নিজের উপর দৃষ্টি পড়ে বা বিষয়ে ছুটিয়া যায়, তখন "কি হারাইলাম—কি হারাইলাম" বোধ হয়।

"ক্ষণে বাহ্য হইল মন" অবস্থা ঘটিলে সাধকের প্রকৃত ব্রজভাব ঘটে। যাঁহারা সংসার হইতে দূরে আসিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রজধামে আসিয়াছেন। সাধক এতক্ষণ প্রকৃতই সংসার হইতে বহুদূরে ছিলেন। এইক্ষণে স্বপ্নলোক হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় সাধকের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আইসে। তখন ক্ষণিক পূর্ব্বের অনুভূত আনন্দ হৃত হওয়ায় যে ব্যাকুলতা, উহা প্রকৃত বৃন্দাবনের গোপীগণের ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতাবশে সাধকের সর্ব্বকার্য্যের ভিতর একমাত্র লক্ষ্য স্থির থাকে। দিবস মানবের কার্য্যকাল—রাত্রি বিশ্রাম সময়। এই বিশ্রামকালকে কার্য্যে পরিণত করা যায়। দিবসে যিনি যেরূপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবেন, রাত্রে স্বপ্নেও তৎতদ্ বিষয়ের সূক্ষ্মানুভূতি হইবে। এমন কি সুষুপ্তিতে পৃথক পৃথক বস্তুর পৃথক্ পৃথক জ্ঞান না থাকিলেও একটা মিশ্রিত জ্ঞান মাত্র থাকে এবং সেই সময় যে যে-কর্ম্মের কর্ম্মী, তাহাতে সেই সেই কর্ম্ম করিবার শক্তি সঞ্চারিত হয়।

মানবের আয়ুষ্কাল যদি পঞ্চাশ বৎসর হয়, তবে পঁচিশ বৎসর রাত্রে নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। কারণ মানুষ যাহা করে, তাহা জাগ্রত থাকিয়া করিয়া থাকে। বাকী পঁচিশ বৎসর কার্য্যকালের ভিতর দশ বৎসর বাল্যে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্টকাল উদরান্নের সংস্থানের জন্য ও বাজে কাজে ব্যয়িত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানব যাহাকে বাঁচা বলে বা জীবনের উদ্দেশ্য যাহা, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য সারা জীবনে কয় ঘণ্টা কাল ব্যয়িত হইয়া থাকে? ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে আমরা বাঁচিয়া নাই; সমস্ত জীবনই মরিয়া রহিয়াছি। কারণ বাঁচিবার উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত হয়ত সমস্ত জীবনের ভিতর একমুহূর্ত্তও! চেষ্টা করি নাই। কিন্তু সাধকগণ তাঁহাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। সতত সর্ব্বকার্য্যে "তগদতমনা" হইয়া মনে মনে রূপ চিন্তন বা তাঁহার মহিমা চিন্তন, শুভ কামনা, শুভ উদ্যোগ বা মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে যদি কিছু করিতে হয়, তবে জাগ্রৎ থাকিয়াই করিতে হইবে এবং তাঁহারা বাহ্যিকভাবে কার্য্য করিলেও ভাবনারাজ্যে সব সময়ই মনকে খাটাইয়া থাকেন। দিবসের স্থূল কর্ম্মের রাত্রে সূক্ষ্মানুভূতি হয়। তখন সাধকের স্বপ্নে মন্ত্রজপ, ইষ্টমূর্ত্তি ও গুরুমূর্ত্তি দর্শন ও চিন্তন ইত্যাদি মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। রাত্রে নিদ্রা হইলেই অল্প-বিস্তর স্বপ্ন হয়। কাহারও মনে থাকে—কাহারও থাকে না।

স্বপ্নেঽপি যো হি যুক্তঃ স্যাজ্জাগ্রতীব বিশেষতঃ।
ঈদৃক্‌চেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠঃ বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্॥

জাগ্রৎকালে যেরূপ বিশেষভাবে আত্মানুরক্ত থাকিবেন, স্বপ্নেও যিনি সেইরূপ থাকিতে পারেন এবং যাঁহার ঐরূপে অবস্থানের চেষ্টা আছে, তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন

এই স্বপ্নাবস্থা পরে সুষুপ্তিতে পরিণত হয়।

"ভ্রমবিশ্রান্তঃ শকুনিঃ পক্ষৌ সংহৃত্য নীড়াভিমুখং যথা গচ্ছতি, তথা জীবোঽপি জাগ্রৎপ্রপঞ্চে ব্যবহৃত্য শ্রান্তোঽজ্ঞানং প্রবিশ্য স্বানন্দং ভুঙ্‌ক্তে।"

অর্থাৎ ভ্রমণহেতু বিশেষরূপে পরিশ্রান্ত পক্ষী যেমন পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া স্বীয় নীড়াভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ জীবও জাগ্রৎ স্বপ্নকালীন ব্যবহার দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দানুভব করেন। ইহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। এই সময় আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য পদার্থের সত্তা উপলব্ধি হয় না, কারণ অন্য কোন সত্তা থাকে না। তখন অন্তঃকরণ, বাহ্য ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বস্তু না থাকায় স্পষ্টজ্ঞান অর্থাৎ পৃথক পৃথক বস্তুজ্ঞান হয় না। একটা মিশ্রিত জ্ঞান হয়। সুষুপ্তিকালে স্বপ্রকাশিতরূপে আত্মা নিজকে জানেন এবং আনন্দময় অবস্থায় উপনীত হন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মানুষ সঙ্গে সঙ্গে কোন অন্তররাজ্যে গমন এবং কি প্রকার শরীর গ্রহণ করে

মানবচৈতন্যের চারি প্রকারে অভিব্যক্তি হয়। যথা—

নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থং তু তুরীয়ং মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতম্॥

অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় নেত্রস্থরূপে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। স্বপ্নাবস্থার কণ্ঠস্থ, সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়স্থ এবং তুরীয়াবস্থায় মস্তকস্থরূপে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়।

জাগ্রদবস্থায় স্থূল অন্নময় শরীরের সাহায্যে কার্য্য করিতে হয়। আবার যখন সুষুপ্তির পূর্ব্বাবস্থা, তখন ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ লোক বা স্বপ্নলোকে গমন হয়, তখন তদুপযুক্ত প্রাণময় শরীর গ্রহণ করিতে হয়। এই স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মার দৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়। X Ray দ্বারা যেমন স্থূল পদার্থের ভিতর দিয়া অনায়াসে দৃষ্টি চলে এবং স্থূলের অন্তরালের ঘটনা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ জীবাত্মার দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও বহুদূরগামী হওয়ায় দেহের ভিতর থাকিয়া দেহান্তর্বর্ত্তী ভুবর্লোকের সহিত বাহিরের ভুবর্লোক যুক্ত থাকায় অবাধ দৃষ্টি দ্বারা মৃত আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এইরূপ প্রতি রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোকস্থ দেবতা, সিদ্ধব্যক্তি ও মৃত আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে। এই স্বপ্নাবস্থা অতিক্রম করিয়া জীব আরও অন্তরতর রাজ্যে গমন করেন এবং তদুপযুক্ত সূক্ষ্মতর শরীর গ্রহণ করেন। এই অবস্থাই সুষুপ্তির অবস্থা। এই সময়ে জীব স্বর্গলোকে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে জীব আনন্দময় শরীর গ্রহণ করেন। প্রত্যেক সুপ্ত ব্যক্তির সহিত কর্ম্ম সূত্র থাকায় সুষুপ্তির পর পুনশ্চ স্বপ্ন ও জাগরণের দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। মৃত্যুর পর জীবের এই সমস্ত শরীর বা কোষ যান রূপে ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবধান এই মাত্র যে, তাহাদের কর্ম্মসূত্র সাময়িক ভাবে ছিন্ন হইয়া যায়, তজ্জন্য তাহাদের কিয়ৎ-

ক্বাল-পরজগতে থাকিতে হয়। আর সুষুপ্তির সময় কর্ম্মসূত্র সঙ্গে সঙ্গে থাকায় জীবাত্মা স্বর্লোক ভুবর্লোক এবং ভূলোকে আসিয়া উপস্থিত হন—তখনই নিদ্রাভঙ্গ হয়।

প্রত্যেক রাত্রের সুষুপ্তির সময় নব শক্তি লাভ করেন। কারণ জাগ্রৎকালে যিনি যে প্রকার শক্তির উৎকর্ষের প্রয়াসী থাকেন, সুষুপ্তির সময় শক্তির আধারের সহিত মিলনে জীবাত্মায় তদ্রূপ শক্তি সঞ্চারিত হয়। তজ্জন্য জাগ্রদবস্থায় সাধকের তীব্র ব্যগ্রতা, একাগ্রতা ও অনাবিল শান্তি লাভ হয়। মন সংসার হইতে দূরে থাকিতে চায়। জনসঙ্ঘ ভাল বোধ হয় না—"অরতির্জনসংসদি" হয়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হওয়ায় আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সাধক তখন সততই ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন, হৃদয়াভ্যন্তরে শ্রীভগবানের সাড়া পান। কখনও বা সুমধুর মুরলীধ্বনি, কখনও বা নূপুরধ্বনি শুনিতে পান। চক্ষু মুদ্রিত করিলে শ্রীরাসমণ্ডলে সখীগণপরিবেষ্টিত মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীমূর্ত্তি তখন আর চঞ্চল বোধ হয় না। কিছু দিন পরে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সময় সময় ইষ্টমূর্ত্তি হাস্য করেন, অঙ্গভঙ্গী করেন এবং কথা বলেন। বৈষ্ণবের পক্ষে এই রাস-রস উপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ।

শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যেরাও এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এ অবস্থা সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বাবস্থা। বৈষ্ণবেতরগণ এই আনন্দভাব অতিক্রম করিয়া যান। সেই বিরাট সিন্ধু হইতে বিন্দুরূপী জীব যখন জীবলীলা করিতে আইসেন, তখন প্রতি বিন্দু দুগ্ধে যেমন ঘৃত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ সৎ-চিৎ-আনন্দ ভাব জীবের সঙ্গে আইসে। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন সৎ-চিৎ-আনন্দ ভাব প্রস্ফুট হইতে থাকে। চিত্ত স্থির হইলে ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তর্মুখী হয় এবং জীব নিজের ভিতর প্রচ্ছন্ন সৎ-চিৎ আনন্দ শক্তি ধীরে ধীরে বিকাশ হওয়ায় নিজেকে শক্তিমান বলিয়া অনুভব করেন। জীবের এই সমস্ত শক্তি পূর্ণ আয়ত্তের প্রাক্‌কালে তদুপযুক্ত দেহের পরিস্ফুটতা প্রাপ্তি হয়। আধারের অভাবে শক্তি বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

ভগবানের তিন প্রকার স্বরূপ শক্তির মধ্যে সৎ হইতে সন্ধিনী। সন্ধিনী শক্তির সার অংশ বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে—ইহাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম লাভ করে। চিৎ হইতে সম্বিদ্। সম্বিৎশক্তি বা জ্ঞান শক্তি দ্বারা ভগবানের ভগবত্তা জ্ঞান। আনন্দ হইতে হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম ও ভাব। এই তিন শক্তির ভিতর যে যে শক্তি স্ফুরণের চেষ্টা করিবে, তাহার সেই শক্তি স্ফুরিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্রের আপনা হইতে বিকাশ হইতে থাকিবে।

সিদ্ধি লাভের পর সাধকের আর একটী শরীর প্রকাশিত হয়। উহাকে দহর কোষ বলে। দহর কোষই চরম বা শেষ দেহ। এই দেহ অপ্রাকৃত উপাদানে নির্ম্মিত। যোগিগণ যখন এই সৌরজগৎ হইতে আর অন্য জগতে বা ব্রহ্মাণ্ডে গমনেচ্ছুক হন, তখন এই শরীরই যানরূপে ব্যবহৃত হয়।

তত্র ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি সন্ত্যাসংখ্যানি ভূরিশঃ।
তান্যন্যোন্যমদৃষ্টানি ফলানীব মহাবনে॥

সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর, দেবতার দেবতার কৃপায় কত সৌরজগৎ, কত কোটী কোটী

ব্রহ্মাণ্ড নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা কে ইয়ত্তা করিতে পারে? বহির্জগতের প্রতিবিম্বস্বরূপ মানবদেহে অনন্ত কোটী অতি সূক্ষ্ম সৌরজগৎ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। যোগী যখন অন্তর্মুখী হইয়া হৃদ্‌পদ্মে অবস্থিত হন, তখন তাঁহার দৃষ্টি এত প্রসারিত হইতে থাকে যে, এক সৌরজগৎ হইতে অন্য সৌর জগতে ক্রমেই অতিক্রম করিতে থাকে। অনেক যোগীর আত্মদৃষ্টি এতই প্রসারিত হয় যে, তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না। ইহাকে আধ্যাত্মিক মৃত্যু বলে। এরূপ অবস্থায় বৈষ্ণবেতরগণ অরূপে পৌঁছান। অর্থাৎ তখন আর "আমি তুমি" থাকে না। উপাস্য ও উপাসকের লয় হয় এবং শ্রীমূর্ত্তি জ্যোতিঃতে বিলীন হন এবং একমাত্র জ্যোতিঃই অবশিষ্ট থাকে। তখনই অমনীভাব বা নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়। মুসলমানগণের ভিতর যাঁহারা সুফিয়া, তাঁহারা ইহাকেই "ফানা ফিল্লা" বলেন। ফানা অর্থে লয়, ফি=ভিতরে, ল্লা=আল্লা। আল্লা অর্থাৎ "রস্‌নি" বা জ্যোতিঃর ভিতরে লয় হইয়া যান। মৃত্যুর পর এই শ্রেণীর সাধকের ব্রহ্মলোকে গমন হয়। তবে যাঁহারা যোগবলে দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা বিদেহ কৈবল্য লাভ করেন। আর যাঁহারা প্রারব্ধক্ষয়ে দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মলোক বলিতে জন, তপ ও সত্য—এই তিন লোককে বুঝায়, কারণ "ত্রিভূমিকো প্রজাপতিলোকঃ।" ব্রহ্মলোক স্তরভেদে অর্থাৎ জন, তপ ও সত্যলোক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। সাধকগণ প্রথমতঃ জন, পরে তপ, তথা হইতে পুনরায় সত্যলোকে গমন করেন। এই ব্রহ্মলোক হইতেও সাধক ভূলোকে ফিরিয়া আসেন।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" কিন্তু সে আবর্ত্তনে বাধ্যবাধকতা নাই। সে আবর্ত্তন স্বেচ্ছাবর্ত্তন। কারণ ভূলোকে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজে প্রয়োজন বোধে কর্ম্ম করিতে আইসেন। আর যাঁহারা আগমন না করিয়া ক্রমেই উন্নতির পথে গমন করেন, তাঁহারা পরে মোক্ষপদের অধিকারী হন এবং অপ্রপঞ্চ ধামে, যাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলে, তথায় গমন করেন।

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং।
অবিশেষো ভবেৎ তত্ত্বে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥

অর্থাৎ যেরূপ জলে জল, ঘৃতে ঘৃত, ক্ষীরে ক্ষীর মিশিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়।

তখন আত্মাই একমাত্র অনুভবিতারূপে অবস্থান করেন।

কিন্তু যাঁহারা বহু যত্ন সত্ত্বেও সমাধিস্থ হইতে পারেন নাই—নিবৃত্তি মার্গের এই শ্রেণীর নিম্ন অধিকারীর কি প্রকারে মৃত্যু হয় ও মৃত্যুর পর কি প্রকার গতি হয়?

"অথাস্য প্রযতঃ পুরুষস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।"

মানবের মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে, সেই তেজ পরদেবতা আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে প্রথমেই বাগিন্দ্রিয়ের লোপ হইয়া যায়। মুমূর্ষু তখন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিয়া সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা

তখনও বিদ্যমান থাকে। মানব তখন সমস্ত জীবনে যাহা করিয়াছে, তাহা অতি অল্প সময়ের ভিতরেই পুনর্দৃষ্টি করে এবং তখন যে কোন এক ভাব বলবান্ হয়। অতঃপর তৎক্ষণাৎ মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়—একটা অসাড়তা—একটা আচ্ছন্নভাব আইসে; তখন উদান বায়ুর সাহায্যে জীবাত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

"অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্।"

অর্থাৎ উদান বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া জীবকে পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপবশতঃ পাপ লোকে লইয়া যায়। উভয় সমান হইলে মনুষ্যলোকে লইয়া যায় অর্থাৎ শীঘ্রই পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্ম হয়।

এই শ্রেণীর সাধক, যাঁহারা মৃত্যুর প্রাক্-কালে—মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে যখন নিজের জীবনে পুনর্দৃষ্টি করেন, তখন জীবনে ধর্ম্মকরণ হেতু মনে ধর্ম্মভাব হয় এবং সুদীর্ঘ জীবনে সতত মন্ত্রজপ করায় শ্বাসের সহিত মন্ত্র গাঁথিয়া যায়। মৃত্যুর পর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রেরও স্মরণ হয়। তখনও শিষ্যের হাত হইতে গুরুর নিষ্কৃতি নাই। পূর্ণমাত্রায় বাসনা-কামনার হাত হইতে নিস্তার পান নাই—যত্নসত্ত্বেও সফলকাম হইতে পারেন নাই, এতাদৃশ লোকের ভুবর্লোকে জাগরণ হয় না। কারণ যে উপাদানে এই ভুবর্লোক গঠিত—সে স্তর তিনি জীবিতাবস্থায় অতিক্রম করিয়াছেন। এতাদৃশ ব্যক্তি যদি কখনও প্রমাদবশতঃ কোনও গর্হিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তবে নিজ নিজ সাধন ভজন ধ্যানধারণার দ্বারা তাহার কুফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন।

তপেৎ বর্ষসহস্রাণি একপাদস্থিতো নরঃ।
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ভ্রূণহত্যাশতানি চ।
এতানি ধ্যানযোগশ্চ দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্॥

ধ্যানের দ্বারা সমস্ত পাপ নির্বীর্য্য হইয়া যায়। কাজেই ভুবর্লোকে যাতনা দেহে আধ-ঘুম আধজাগরণে অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বর্লোকে অকস্মাৎ তাঁহাদের জাগরণ হয় এবং তথায় কিছুদিন কাম ভোগ করেন। তৎপরে কামভোগের অসারতা উপলব্ধি করিয়া বীতশ্রদ্ধ হন এবং স্বর্লোকের উচ্চস্তরে গমন করেন এবং তথায় মহর্লোকে গমনোপযোগী যানস্বরূপ দেহ লাভ হয়। তথায় গিয়া ধ্যান মাত্রে তৃপ্ত হন। পরে মহর্লোক হইতে জনলোকে গমনান্তর দীর্ঘকাল অবস্থান করতঃ ভূলোক তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা উপকৃত হইতে পারে বুঝিয়া পুনর্ব্বার মাতৃজঠরে আগমন করেন এবং জন্মগ্রহণের পর পৌর্ব্ব-দেহিক জ্ঞান ও সংস্কার লাভ করেন। এ জন্মে সাধনা দ্বারা পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন এবং "অমনীভাব"-সিদ্ধ হয়।

কর্ম্মকথা
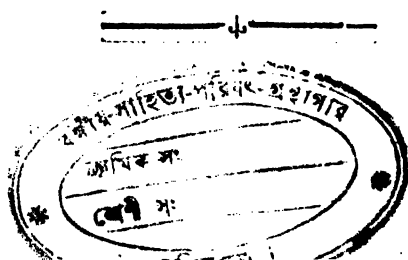
প্রেম না নিয়ে এ জগতে যে এক পা-ও চলে, সে অবধারিত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হয়।

বিদ্যা আর বুদ্ধি এক জিনিষ নয়। এমন কি, অনেক সময় দুয়ের মাঝে মোটেই বনিবনাও থাকে না। বিদ্যা অতীতের দিকে তাকিয়ে আছে—বুদ্ধি রয়েছে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

তারপর কি করা উচিত—এইটুকু জানতে পারাই হল বুদ্ধি। ধর্ম্ম হচ্ছে, সেটুকু কাজে দেখান।

ধর্ম্ম ছাড়া বুদ্ধির কসরৎ কেবল জড়ত্বের রোমন্থন। ইচ্ছাই ক্রিয়াতে পরিণত হয়; বিজ্ঞান শিল্পে পরিণত হয়; জ্ঞান শক্তিতে পরিণত হয়। তেমনি বুদ্ধি যেখানে ধর্ম্মানুকূল না হয়, চিন্তা যেখানে কাজে পরিণত না হয়, সেখানে শুধু নীতিজ্ঞানের সঙ্কোচ জন্মে, না হয় মনের অজীর্ণ রোগ হয়। মানুষের শুধু ভাবই আছে, দাঁড়াবার জোরটুকু নাই—এ হলে তাকে বুদ্ধির পোকা ছাড়া কি বলব?

আমেরিকার একজন রসিক লেখক লিখেছিলেন—"আমার খুড়ামশায় বলতেন, 'সংসারের কথা, মানুষের কথা আমি কত ভেবে দেখেছি—মানুষ যতটা খাটে, ততটা যদি ভগবানকে না ডাকে, তবে আর মোটেই তাঁকে ডাকাডাকির প্রয়োজন কি? যদি তোমার কোনও কিছুর দরকার হয়, তবে তা পাবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে যাও! আর হাপুস নয়নে কেঁদে যদি তা না মিলে, তবে চোখের জল ভগবানের পায়ে ফেলে কি হবে—তার চেয়ে মাথার ঘাম নিজের পায়ে ফেলে দেখ না।'—আমার খুড়ামশায় এই কথাই বলতেন!"

বহির্জ্জগতের সমস্যার যদি ঠিক ঠিক জবাব দিতে পার, তাতে যদি কোথাও আঁচড়টুকু না লাগে, তবেই বুঝব, তুমি হুঁশে আছ। আর যে দরকার-মাফিক কাজ গুছিয়ে নিতে পারে না, তাকে বেহুঁশ বলেই জানব। প্রকৃতির একমাত্র সঙ্কেত—"হয় সামলে চল, না হয় মর।" মহাকাল যেমন এগুচ্ছেন, তেমনি তাঁর সমানে সমানে পা ফেলে চল, তবেই জীবন সংগ্রামে বাঁচবে। (ভারতবাসী, হুঁশিয়ার!)

কর্ত্তব্যবুদ্ধির মর্ম্মকথাটি শ্রীকৃষ্ণের এই সরল হৃদয়গ্রাহী উপদেশে স্বর্ণাক্ষরে ফুটে উঠেছে—"তোমার শুধু কাজ নিয়ে কথা; কাজের ফলাফল নিয়ে চিন্তা করবার তোমার প্রয়োজন কি? কর্ম্মফল যেন তোমায় জড়িত করে না ফেলে—আবার অকর্ম্মেরও অধীন হয়ে পড়ো না যেন!"

কর্ম্মেই বেঁচে থাক। প্রাণপণে খেটে যাও। কর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম হোক—তার মাঝে স্বার্থচিন্তা না থাকে, লাভ-ক্ষতির ভাবনা না থাকে। ভাল মন্দ দুই-ই তোমার কাছে সমান। সমত্বই যোগ, তাই ধর্ম্ম।

লড়তে হবে তোমায়; তাই ধর্ম্ম। পুরুষ যেমন নারীকে ভালবাসে, বীরও তেমনি সংগ্রামকে ভালবাসে। যদি লড়তে গিয়ে মৃত্যু হয়, তবে স্বর্গ বা সত্যকে লাভ করে

একেই আচার্য্য শঙ্কর দাসত্বের বন্ধন বলেছেন।

একটী ছেলে রাস্তায় শিশ্ দিচ্ছিল। পুলিশ তাকে বারণ করল। ছেলেটী বল্ল, "শিশ্ কি আমি দিচ্ছি—ও আপনা হতেই বেরিয়ে যাচ্ছে।"

কোকিলকে গাছের উচ্চ চূড়ায় বসিয়ে দাও, আপনা থেকেই তার কণ্ঠ হতে গানের ধারা ঝরে পড়বে।

ক্ষুদ্র আমিকে অন্তরের মাঝে বিসর্জ্জন দাও। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আপনাকে অভেদ বলে জান, দেখ্‌বে, ব্রহ্মানন্দ তোমার ভিতর দিয়ে কল্যাণময় বীরকর্ম্মের আকারে উৎসারিত হচ্ছে—সে কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল। এই হল ভাগবত জীবন—এই তো তোমার জন্মস্বত্ব।

"নিজের কাছ থেকে পালিয়ে এসে উন্মুক্ত সূর্য্যালোকে সে দাঁড়াল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একবার জগতের দিকে তাকাল;—সমস্ত জগৎ তার কাছে প্রেমে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল—সে জগৎকে কল্যাণময় বলে অনুভব করল।"

সোপেনহাউর বলেছেন, "নিজের মাঝে সুখ পাওয়া বড় শক্ত। কিন্তু আর কোনও-খানে পাওয়াও একেবারে অসম্ভব।"

সব বড় বড় কাজের পেছনে একটী বুদ্ধিমান "আমি" বসে আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার দ্বারা কিছু হচ্ছে না—করছে কিন্তু অকর্ত্তায়। সূর্য্য স্বমহিমায় সাক্ষিস্বরূপে মাত্র প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাতেই তুষার-শৃঙ্গের বক্ষে নদী জেগে ওঠে, সমীরণ আনন্দে মাতাল হয়ে বেড়ায়, প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়—পশু জাগে, পাখী জাগে, তরুলতা জাগে—ফুল ফোটে—নরনারী-শিশুর চোখ প্রভাতের আলোতে ফুলের মতই ফুটে ওঠে। সব হয় শুধু সবিতার মহিমময় প্রকাশে।

সর্ব্বভূতাত্মরূপে, জ্যোতিঃস্বরূপে, আনন্দের উৎসরূপে, জেগে ওঠ হে শিবময়—প্রাণ, উৎসাহ, বীর্য্য সব কিরণের মত তোমার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ফুল ফোটে, আর সৌরভ আপনি ছোটে।

যে সাঁতার জানে না, সে যদি দৈবাৎ জলে পড়ে যায়, তাহলে তার ভেসে থাকবারই কথা; কিন্তু সে স্থৈর্য্য হারিয়ে প্রাণপণে যখন কেবল হাত-পা ছুঁড়তেই থাকে, তখনই আর ডুবতে বেশী দেরী হয় না। তেমনি যে ক্ষুদ্র "আমি"র ভাবনা-চিন্তায় আকুল হয়ে কেবল সংসারে খাবি খাচ্ছে, তারি ভরা ডুবী হয়।

"ইজরালাইট্‌রা যখন বনে বনে ঘুরছিল, তখন নিত্য তাদের জন্য অমৃত বর্ষণ হত; কিন্তু একদিন মুশার অতিথিদের মধ্যে কতকগুলি অবিশ্বাসী লোক পেঁয়াজ চেয়ে বস্‌ল—সেই হতে আর অমৃত আস্‌ত না।"

মাথা ধরে, মাজা বেঁকে যায়, বুক ধড়ফড়্ করে—কেন? পায়ে না হেঁটে মাথায় হাঁট বলে। পা তোমার পৃথিবীর উপরেই থাক, আর মাথা অনন্ত আকাশের আনন্দে অবগাহিত থাক্। ভগবান যে ব্যবস্থা করেছেন, তা উল্টাতে যেও না। পৃথিবীটাকে মাথায় তুলে নিয়ে বলো না যে তুমি হুঁশে আছ। আত্মার সত্যের চেয়ে মায়াকে বেশী শ্রদ্ধা করো না।*

* স্বামী রামতীর্থ

বেদান্তসার

—*—

পঞ্চম খণ্ড

মূল

অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো, দীপ্তশিরা জলরাশিমিব, উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি—সমিৎপাণিঃ "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। স পরমকৃপয়াধ্যারোপাপবাদন্যায়েন এনম্ উপদিশতি, "তস্মৈ স বিদ্বান্ উপাসীনায় প্রাহ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। (৫)

অনুবাদ

এই প্রকার অধিকারী জন্মমৃত্যু প্রভৃতিতে সমাকুল সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া, প্রদীপ্তমস্তক ব্যক্তি যেরূপ জলরাশির নিকট ছুটিয়া যায়, তেমনি উপহারহস্তে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবে। এই সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদও বলিতেছেন, "মুমুক্ষু সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে।" (৩, ৪, ১১)। গুরুও পরমকৃপাপূর্ব্বক অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় দ্বারা শিষ্যকে উপদেশ করিবেন। যথা তৈত্তিরীয়োপনিষদে—"শিষ্য উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবিদ্ গুরু তাহাকে বলেন—।" (২, ১)। (৫)

বিবৃতি

অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন—এই চারিটী অনুবন্ধই নিরূপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে অধিকারীর কি কর্ত্তব্য, তাহাই বলা হইতেছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবৃতি অনাবশ্যক। কেবল মূলের দুই একটী কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

মূলে শ্রীগুরুর উপসরণ ও অনুসরণ—এই দুইটী কথা আছে। তন্মধ্যে উপসরণ বলিতে কেবল মাত্র সমীপগমন বুঝায়। অনুসরণ অর্থে অনুবৃত্তি—কায়মনোবাক্যে সেবা।

শ্রীগুরুর নিকটে উপহারহস্তে যাইতে হয়। এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের অনুশাসন রহিয়াছে—"রিক্তপাণির্ন সেবেত রাজানং দেবতাং গুরুম্"—রাজা, দেবতা ও গুরুকে সেবা করিতে গেলে কখনও রিক্ত হস্তে যাইবে না।

শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ—গুরুর এই দুইটী বিশেষণ। শ্রোত্রিয় অর্থে যিনি চতুর্ব্বেদ ও ষড়্‌বেদাঙ্গে পারদর্শী; অথবা যিনি বেদান্তের অর্থ সম্বন্ধে পারদর্শী, তিনিই শ্রোত্রিয়—এই তাৎপর্য্যই এখানে বিশেষ করিয়া খাটে। আবার শ্রোত্রিয় বলিতে "অবৃজিন" ও "অকামোপহত"ও বুঝায়। এই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—"যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৩, ৩, ৩৩)। যিনি যথোক্তকারী, অতএব কর্ম্মজনিত পাপ যাঁহাকে স্পর্শ করে না—তিনিই "অবৃজিন।" আর ব্রহ্মানন্দ ব্যতিরেকে অন্য আনন্দের প্রতি যিনি বিতৃষ্ণ, তিনি "অকামহত" অর্থাৎ কামনার অভিঘাতে তিনি মুগ্ধ নহেন।

শ্রীগুরু ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে তিনি পরিপূর্ণ।

শ্রুতিতে শিষ্যকে "সমিৎপাণি" হইয়া গুরুর নিকট যাইতে বলা হইয়াছে। সমিৎ অর্থে যজ্ঞকাষ্ঠ। ইহা প্রাচীনকালের রীতি। সুতরাং সমিৎশব্দটীকে এখানে উপলক্ষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কালোপযোগী যে কোনও উপহার সমিৎশব্দদ্বারা উপলক্ষিত হইতে পারে। (৫)

শাসনে দ্বিধা*

—•—

"তদৈক্ষত—অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়"—এই ঈক্ষার পর সৃষ্টি হয়েছিল। মূলে যা ঘটেছিল, আজ পর্য্যন্ত তার পুনরাবৃত্তি চল্‌ছে। অর্থাৎ এখনও জগতে দেখ্‌ছি, আগে ঈক্ষা, আলোচনা বা কল্পনা—তারপর সৃষ্টি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঈক্ষার যে কত প্রয়োজন, তা বলে শেষ করা যায় না। এইখানেই তো আদত সৃষ্টি। দেহ হতে দেহ নয়—তার চেয়ে বড়—মন হতে মনের, হৃদয় হতে হৃদয়ের—প্রবুদ্ধ আত্মার স্পর্শে সুপ্ত আত্মার জাগরণ। এই সৃষ্টি সফল করতে হলে আদি পুরুষের অভিমান নিয়ে বলতেই হবে, "অহম্ ঈক্ষে—বহু স্যাং প্রজায়েয়।"

কিন্তু আমাদের মুখ থেকে কখনও এই ঈক্ষার ঘোষণা প্রচারিত হয় কি? শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা ঈক্ষাপূর্ব্বক কিছু সৃষ্টি করে থাকি কি?—উত্তরে বলব, প্রায়শ:ই না। সংসারে আমাদের সর্ব্বদাই একটা ত্রস্ত ভাব; তাড়াহুড়া করে কোনও রকমে কাজ বাগিয়ে নিতে পারলেই আমরা বাঁচি। জীবনটা এত তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে যে, দু'দণ্ড এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চার দিক দেখে শুনে ঈক্ষাপূর্ব্বক একটা কিছু বলতে আমাদের সময়ে কুলাবে না। তাই পথে ছুটতে ছুটতে যতটুকু নজরে পড়ছে, ততটুকুর উপরেই ভিত্তিস্থাপন করে আমরা চলার মুখে একটা রায় দিয়ে যাচ্ছি। সংসারে আমাদের বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ বলে যাঁদের সুনাম [illegible] আছে, [illegible] [illegible] সবাই বেদবাক্য বলে মেনে নেবে।

শিক্ষার বেলায় এমন রায় আমরা অনেক বিষয়েই দিই। এর মাঝে গতানুগতিকের পথ ধরে চলার ঝোঁকটাই বেশী। বিচার দিয়ে, কল্পনা দিয়ে নূতন একটা কিছু উদ্ভাবন করবার দৃষ্টান্ত প্রায়শঃই চোখে পড়ে না। বাস্তবিক নিজের সম্বন্ধে যার যতটুকু অজ্ঞতা, অপরের হিতাহিত সম্বন্ধে কল্পনা ও বিচারের অপ্রাচুর্য্য তারই তত বেশী। আজ আমরা সমস্তটা জাতই আত্মবিস্মৃতির তলে তলিয়ে আছি—আমাদের প্রাণ নাই, জাগৃতি নাই, আমরা সৃষ্টি করব কি? আমাদের আছে শুধু শঙ্কা; বুঝি আর নাই বুঝি, কোনও রকমে পুরাতনের ঠাটটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে পড়ে আছি—এখন তার মাঝে যতই অসঙ্গতি থাক না কেন। হতে পারে এতে আমাদের ভুলের সংখ্যা কমই হচ্ছে। কিন্তু যে বিচারশীল, যে জীবন্ত, তারও ভুল হয়, আবার সেই বিচার দিয়ে সে ভুলের সংশোধন করে নেবার সামর্থ্য রাখে। যে বিচারহীন জড়বৎ, তার আর ভুল হবার আশঙ্কাই কোথায়? মোট কথা ভুল করে ক্ষতি সহ্য করবারও একটা তেজ থাকা চাই। আমাদের আজকাল সে সব নিভে গিয়ে একেবারে পরম সাম্য লাভ হয়ে গিয়েছে।

যাক সে কথা। বলছিলাম, শিক্ষায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অবিবেচনা আছে। তার একটা বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করব। শিক্ষার মাঝে শাসনের স্থান কোথায়, তাই দেখতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের মাঝে সরাসরি দুটা মত প্রচলিত আছে বলা

চলে। কেউ কেউ বলবেন, শিক্ষার ক্ষেত্র হতে শাসন-ব্যাপারটা তুলে দেওয়াই উচিত। আবার কেউ বলবেন, শাসনই মূল—শাসন ছাড়া শিক্ষা অসম্ভব। দু'দলের কথাতেই সপক্ষে বিপক্ষে কিছু না কিছু বলবার আছে। উভয়ের কথা নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করেই আমাদের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

প্রথমতঃ যাঁরা শাসনের বিরোধী, তাঁদের কথাই বলি। এঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষ আসলে মন্দ নয়, ভাল হবার বীজ তার মাঝে নিহিত রয়েছে, একদিন তা ফুটবেই। আজ যাকে আমরা মন্দ বলছি, তা মানুষের অপরিণত অবস্থা মাত্র। অবিকশিতকে বিকশিত করবার জন্য প্রকৃতির মাঝে একটা অবিশ্রাম চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টার স্বরূপ সব সময় আমাদের প্রত্যক্ষ না হলেও এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই। মনুষ্যের সভ্যতার বিবর্ত্তনের ইতিহাসই এই প্রকৃত চেষ্টার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিবেচনার একটা বিরোধ আছে। মানুষ আপন খুসীতে একটা কিছু করবার স্পর্দ্ধা রাখে বলেই অনেক সময় অনধিকারচর্চ্চা করে বা তাড়াতাড়ি ফল পাবার লোভে প্রকৃতির কাজকে বাধা দিয়ে নিজেরই সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে থাকে। শিক্ষার শাসন এই অসহিষ্ণুতারই পরিচয়। কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে মানুষ একটা কিছু করে তুলব বলে আস্ফালন করে বটে, কিন্তু কোন্ শক্তির পরিচালনায় যে তার কর্ত্তৃত্ব সফল হবে, তার কোনও খবরই সে রাখে না। ফলে শক্তির সঙ্গে শক্তির বিরোধ ঘটিয়ে সে কেবল মানবের ক্রমোন্নতির পথে কাঁটাই দেয়।

শাসনও যে শিক্ষার একটা অঙ্গ হতে পারে, তা আমরা একেবারে অস্বীকার করতে চাই না। যে নীতিশাস্ত্রকার বলেছেন, "তাড়নে বহবো গুণাঃ, অতএব তাড়য়েৎ, ন তু লালয়েৎ"—তিনি মানবচরিত্রের একটা দিক সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথার মাঝে যে কোনও সত্যই নাই, এমন কথা বলছি না—বরং ছেলেবেলায় বহুবার আমাদের পিঠের উপর দিয়ে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যা হচ্ছে, তারই কথা বলে গিয়েছেন, কি হওয়া উচিত, তার কথা বলেননি। ওটা শুধু ইতিহাসের কথা—সৃষ্টির মন্ত্র নয়।

শাসনকেই যেখানে শিক্ষানীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেখানে বিবেচনার অভাব যে ঘটবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আঘাত পেয়ে আঘাত ফিরিয়ে দেবার স্বভাবটা মানুষের মজ্জাগত—এর মাঝে আছে শুধু নিছক দেনা-পাওনার হিসাব। কিন্তু লাভক্ষতির বিচারের উপরে যে উঠে গিয়েছে, সেই যথার্থ নির্ব্বিকার থেকে ক্ষতিকে সহ্য করতে পারে, তার পূরণ করতে পারে—সেই ক্ষমা করতেও জানে। আমরা যখন দণ্ডধর হই, তখন লাভক্ষতির হিসাব থেকে কতটা যে মুক্ত থাকি, তা পরিমাণ করে বলা শক্ত। অনেক জায়গায়ই হয়ত কোথায় কোন গুপ্ত স্বার্থে আঘাত পড়েছে—হোক্ না সে স্বার্থ মনোগত বা বস্তুগত—আর স্বার্থহানির উত্তাপে উত্তপ্ত হয়েই আমরা শাসনদণ্ডের পরিচালনা করতে গিয়েছি এই হচ্ছে নির্ব্বিচার শাসনের অপকৃষ্টতম ফল। যে শিক্ষক অসহিষ্ণু হয়ে শাসন করে, সে শিক্ষকের মাঝে অধমাধম।

তারপর শাসনের পক্ষে একটা মস্ত ওজর হচ্ছে, বিচার্য্য কর্ম্মের দুর্নীতিকতা। কাজকে আমরা মোটামুটী দুটো ভাগ করে নিই—তার কতকগুলি সুনীতিদ্বারা প্রণোদিত, আর কতকগুলি দুর্নীতি দ্বারা প্রণোদিত। তাই শিক্ষাক্ষেত্রের বিচারালয়ে দণ্ড-পুরস্কারের ভাগটাও আমরা সোজাসুজি করে ফেলি। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাই যে কাজের মাঝে শুধু সুনীতি আর দুর্নীতির বিচার করলেই চলে না—এমন কতকগুলি কাজ আছে, যারা সুনীতি বা দুর্নীতি কোনটারই আমলে পড়ে না—তারা একেবারে নীতিশাস্ত্রের আইনের বাইরে—ইংরেজীতে যাকে বলে non-moral; এ কিন্তু im-moral থেকে পৃথক্। মূল কথা—ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও নির্ব্বাচনশক্তি না জন্মান পর্য্যন্ত কোন কাজকেই নীতির কোঠায় আনা যায় না। ভাল মন্দ দুটাই বেছে নেবার শক্তি যার জন্মায়নি, তার কাজকে আইনের গণ্ডীতে ফেলা চলে না। আগে কাজের বাছাই করতে শেখাও, কোনটা আদর্শ তা বুঝিয়ে দাও—তারপর আইন ভাঙ্গলে সাজা দিও। কিন্তু ছেলেকে শাসন করবার সময় আমরা এত কথা ভেবে দেখি না। আমরা ছেলে আর বুড়োর বুদ্ধি এক তৌলে ওজন করে বিচার করি। এটা কতদূর সঙ্গত, তা বিবেচ্য।

এই সম্পর্কে শাসননীতির আর একটা গলদের কথা মনে পড়ে। সেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে organisationর অভাব। ভালমন্দের বিচার করে ভালটা গ্রহণ করতে শেখাতে হবে, এই হল আমাদের মৎলব। কিন্তু কি করে তা করা যায়? আমরা সাধারণতঃ বুঝি, তাড়নায় কাজটা সহজ হয়ে আসে, ছেলের পেছনে পেছনে ঘুরে সময়ের অপব্যবহার না করে বিজ্ঞ অভিভাবক সংসারের অন্যান্য হিতকর কাজে সে সময়টুকু ব্যয় করতে পারেন। অতএব বলতেই হবে "তাড়নে বহবো গুণাঃ।" কিন্তু এই নীতির পেছনে যে কতখানি ঈক্ষার অভাব রয়েছে, সেইটাই আমাদের ভেবে দেখবার বিষয়। এ ক্ষেত্রে শাসন মানে কি? অর্থাৎ যে কাজটা আমি সঙ্গে থাকলে তুমি করতে না বা করবে না, সেই কাজটাই তুমি যাতে ভবিষ্যতে না কর, তার জন্য অগ্রিম কিছু দক্ষিণা দিয়ে রাখা। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না—অতএব আমার এই লাঠিগাছটীকে আমার প্রতিনিধিস্থলে রেখে গেলাম। আমি যদি সঙ্গে থাকতাম, তবে হয়ত তোমার অন্যায়টা বুঝিয়ে দিয়ে তোমায় সাবধান বা প্রতিনিবৃত্ত করতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু সে সুযোগ আমার নাই, কাজেই আমার এই নির্ব্বাক প্রতিনিধির উপর তোমাকে বোঝাবার ভার দিয়ে গেলাম। এ ব্যবস্থাটা মন্দ কিসে? আমরা বলি, সত্যই তো—এতে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙ্গল না।

অবশ্য মানুষ যে অন্যায় করবে না, এমন কথাও যেমন বলা যায় না, তেমনি সে অন্যায়ের কোনও সাজাও যে পাবে না—এমন আবদারও আমরা করতে পারি না। প্রকৃতির মাঝেই দেখি, প্রত্যেকটা আইনভঙ্গের জন্য শাস্তি পেতেই হয়—সেখানে কেউ রেহাই পায় না। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শাসনপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আমরা তাকে প্রকৃতির অনুবর্ত্তনেই গড়ে তুলতে চাই।

ছেলে যদি অন্যায় করে, তবে সে অন্যায়ের যা স্বাভাবিক ফল, তাই তাকে ভোগ করতে দাও। সে বুঝুক, "আমি এই অন্যায় করেছি, সুতরাং তার জন্য আমাকে এই দণ্ড পেতে হবে—কোনও মানুষের বিচারে নয়, একেবারে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য আইনের বিচারে।" বিচারক যদি অপ্রধৃষ্য স্থানে থেকে বিচার করেন, তবে আর অপরাধীর বলবার কিছু থাকে না—প্রতিহিংসাটা পর্য্যন্ত নেবার সুযোগ থাকে না। মানুষের নাগাল পাওয়া যায়, তাই মানুষের বিচারে স্বভাবতঃই একটা সন্দেহ, একটা প্রতিহিংসার লালসা জেগে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির বিচারকে আর তুমি কি বলবে? তাই তার শিক্ষাটা মানুষের পক্ষে বড় কার্য্যকরী হয়। সুতরাং শিক্ষা-ক্ষেত্রে শাসননীতিকে প্রকৃতির অনুকূলেই পরিচালনা করা উচিত।

এই হল একদিককার কথা।

এই সমস্ত যুক্তির মূলে কতকটা সত্য আছে। বাস্তবিক আমরা সাধারণতঃ লাঠির প্রতিনিধিত্বে যে বিচার করে থাকি, তার মাঝে দেনাপাওনার ভাবটা সময় সময় এত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তরুণ মনের উপর তার ছাপ পড়তে বেশী দেরী হয় না। এই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনের ফলে শিক্ষা না হয়ে অন্যায় জেদ, প্রতিহিংসার স্পৃহা ইত্যাদি দানবীর বৃত্তিগুলিই জেগে ওঠে। ধর ছেলেটা দুষ্টুমী করছে; তার ব্যবহার ভাল কি মন্দ, কতটুকু প্রশ্রয় তাকে দিতে হবে, তার হিসাব করবার সময় আমার হয়ে উঠছে না। এদিকে দুষ্টুমীর মাত্রাটা বেড়ে গিয়ে শেষে একটা অকাণ্ড বাধিয়ে তুলল। এই অবস্থায় আমার অনবধানতার ক্রটী যদি ছেলের পিঠে লাঠি ভেঙ্গে সংশোধন করতে যাই, তবে ছেলে মনে করবে কি? প্রথমতঃ আমার এতখানি উষ্মার কারণ টাই সে বুঝতে পারবে না। তার আচরণটা যে অসঙ্গত হয়েছে, তাও ক্রমে ক্রমে হয়েছে, একেবারে হয়ে ওঠেনি। সুতরাং পরিণামে তার কতখানি গুরুত্ব জন্মেছে, তা বুঝবার বেচারীর অবসরই হয়নি, কেননা বালকসুলভ মনোবেগের বশে সে কেবল একটা ঝোঁকের মাথাতেই কাজ করে গিয়েছে, পদে পদে বিচার এসে তার আচরণ সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে দেয়নি। সুতরাং সঙ্গতি-অসঙ্গতি বোধ তার গোড়াতেও যতটুকু ছিল, পরিণামে অকাণ্ডটা পর্য্যন্তও সেটা ততটুকুই আছে। এমন অবস্থায় শাসনের মাত্রাটা অধিক এবং আকস্মিক হলে ছেলে কিছুতেই তার সঙ্গতি বুঝতে পারবে না। ফলে আমার শাসনটা তার কাছে অন্যায় বলেই মনে হবে। তখন হয় সে সেটা অগ্রাহ্য করবে, নতুবা আমাকে নির্ব্বিবাদে উত্যক্ত করবার জন্য তার মাঝে একটা প্রবল স্পৃহা জন্মাবে। এদিকে আমি যদি আত্মানুসন্ধিৎসু হই, তবে আমিও বুঝব, আমার শাসনের মূলে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ততটা নাই, যতটা আছে বিরক্তি ও সাংসারিক লাভ-লোকসানের হিসাব।

এই কথাটা যখন বিচার করি, তখন বুঝতে পারি, শাসনের চেয়ে সংরক্ষণ কত প্রয়োজন।

শিক্ষার শাসনকে যাঁরা প্রকৃতির অনুবর্ত্তী করতে চান, তাঁদের স্বপক্ষে যে যুক্তি আছে, তার কথা বলা হল। বাস্তবিক শাসনের মাঝে যেখানে সমাহিত চিত্তের বিচার নাই, অতি অস্পষ্ট হলেও বিরক্তি ও প্রতিশোধস্পৃহা যেখানে লুকিয়ে আছে, সেখানে শাসনের সুফল না হয়ে কুফলই হয়

থাকে। এই হিসাবে শাসকের মনোবৃত্তিকে একটা নিবাত নিষ্কম্প অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য প্রকৃতির অনুবর্ত্তন প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, শাসনের মাঝে একটা জিঘাংসা ছাড়া কি আর কিছুই থাকতে পারে না?

প্রকৃতির অনুবর্ত্তননীতি যে ভাব থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, তার মূলে একটা জাতিগত আদর্শ বৈষম্যের বীজ রয়েছে। যে দেশে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী করে, সাম্যনীতির কথা যেখানে পথে ঘাটে বিকায়, সেখানে প্রেমে কাউকে শাসন করতে একটা সঙ্কোচ বোধ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অবশ্য এখানে শাসক বলতে আমরা আপাততঃ সম্পর্ক শিক্ষককে লক্ষ্য করছি। আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শে আচার্য্য গুরু হয়ে দাঁড়ান; আর গুরু যে কত বড় আত্মীয়, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের চেয়েও যে তাঁর অধিকার কতদূর বিস্তৃত, তা আমরা শুধু সংস্কারবশেই নয়, যুক্তি বিচার দিয়েও বুঝতে পারি; সুতরাং এদেশে ছাত্রের উপর আচার্য্যের অপ্রতিহত অধিকার থাকাটা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। আচার্য্যের ছাত্রের উপর বাৎসল্যের যেমন সীমা নাই, তেমন তাঁর শাসন করবার অধিকারও পর্য্যাপ্ত।

কিন্তু এই ভাবটা পাশ্চাত্যদেশে ফুটে উঠবার সুযোগ পায়নি। অন্ততঃ আমাদের ভাগ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার যতটুকু দর্শন-স্পর্শন মিলছে, তাতে ব্যক্তিগত অধিকারটা বজায় রাখাই যে পুরুষার্থ, এ ভাবটা ক্রমশঃ আমাদের মাঝে সংক্রামিত হচ্ছে। পশ্চিমে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার চলতে গেলেই অধিকার অনধিকারের কথা এসে পড়ে। এই হিসাবে পিতা-মাতাও সন্তানের উপর অধিকার বিস্তার করতে সঙ্কুচিত হন। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠাই যেখানে শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেখানে শাসনরূপ অধিকার-সঙ্কোচের কথাই তো উঠতে পারে না। তবুও যে শাসনের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা মুখে স্বীকার না করলেও কার্য্যক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হয়। তাই শাসন নীতিটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করবার জন্য, মানুষের অধিকারের সীমা অব্যাহত রাখবার জন্য ওটাকে প্রকৃতির ঘাড়ে চালান দেওয়া হয়েছে। এতে শাসন করাও চলে, অথচ মানুষের সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চ্চারও দোষ আসে না এবং শাসিতের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও কোথাও ক্ষুণ্ণ হবার অবকাশ পায় না—কেননা সে জানে শাসক প্রকৃতি মানুস নয়; প্রকৃতির হাতের উপর যখন হাত চলে না, তখন বাধ্য হয়ে শাসনটাকে হজম করতেই হয়।

কিন্তু এখানে দুটা কথা আমাদের খেয়ালে আসেনি। প্রথমতঃ মানুষকেও প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া চলে—কেবল জড়জগতের আইনটাই ন্যায়ান্যায় বিচারের মাপকাঠি নয়—মনোজগতের একটা আইন কানুন আছে এবং সেটাও প্রাকৃতিক। দ্বিতীয় কথা—সকল কাজের বিচারের জন্য সব সময় প্রকৃতির প্রতীক্ষা করে বসে থাকলেও চলে না। ঠেকে শেখাটাই জগতের চিরকালের দস্তুর হলে মানবজাতির অতীত অভিজ্ঞতার পুঁজি নিরর্থক হত। আর শিক্ষা যদি অতীত অভিজ্ঞতার উপরই না দাঁড়ায়, তবে তাকে কখনও উন্নতিশীল বলা চলবে না—সে চিরকাল এক জায়গাতেই অচল হয়ে থাকবে।

এমন কল্পনার পেছনে যে মানুষের হৃদয় বলে একটা পদার্থ নাই, তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যাকে আমি ভাল বাসব, তার উপর আমার অসীম অধিকার। ভালবাসার মাঝেও যদি অধিকার অনধিকারের বিচার করে ব্যবহার চালাতে হয়, তাহলে ভালবাসার মাধুর্য্য থাকল কোথায়? ভাল যদি বাসি, তবে শাসন করবার জন্য কি কারু মুখ তাকিয়ে থাকতে হবে? যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা যতখানি দুঃখ দিতে পারি, অপরকে ততখানি পারি না। আপন জনের উপর কঠোর হতে পারাটাই হল প্রাণের টানের পরিচয়। যেমন একবার রুদ্ররূপে শাসন করব, তেমনি আবার সেবায় যত্নে স্নেহে মায়ের আসন অধিকার করব—এই হচ্ছে ভারতীয় আচার্য্যের নীতি। ছেলে কি আমার পর যে প্রকৃতির আড়াল থেকে গা বাঁচিয়ে তাকে শাসন করতে হবে? আমি মানুষের মতই সুখে-দুঃখে, হর্ষে বেদনায় স্পন্দমান, কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ অসঙ্কোচ ব্যবহারেই আমার প্রাণ স্ফূর্ত্তি হয়। এই জন্য আমরা সোহাগ করতেও জানি, আবার শাসন করতেও জানি। আমরা প্রকৃতির অন্ধনীতিকে কবুল করি না—আমরা জানি মানুষের প্রাণের আইনকে।

শাসন সম্বন্ধে দুই তরফের কথাই বলা হল। এখন শাসনের যথার্থ স্বরূপ কি তাই বুঝতে হবে।

আরণ্যক

—✻—
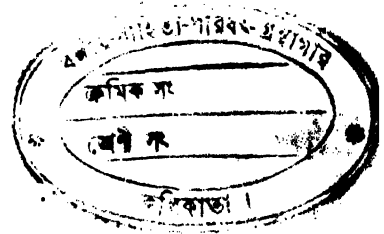
"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৩

ভোগে শক্তির ক্ষয় হয়, ত্যাগে শক্তির সঞ্চয় হয়। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই সঞ্চিত শক্তিকে আবার ভোগের পশ্চাতে ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাকেই বলি শক্তির অপব্যয়। এই অপব্যয়ের আকর্ষণে ও ভোগের প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ অধৈর্য্য হইয়া উঠে। তখন সেই উত্তেজনার মুখে সে যাহাই করিতে যায়—তাহাই তাহার পক্ষে ভোগ অপেক্ষা মারাত্মক হইয়া পড়ে। কাজেই ভোগের মাঝে পড়িয়া নিজকে প্রকৃত পথে পরিচালনা করিতে মানুষের যেমন অসীম ধৈর্য্যের, সুনিয়ত স্থৈর্য্যের আবশ্যক—ত্যাগের পূর্ব্বেও তেমনি নিজকে অসীম ধৈর্য্যে সঞ্চিত শক্তির প্রয়োগে পরাঙ্মুখ করিয়া না লইলে ত্যাগ মানুষের পক্ষে নিরঙ্কুশ হয় না।

✻

"ভালবাসতে যদি হয়, তাঁরেই শুধু বাস ভাল যে জন প্রেমময়!"—নইলে জীবনে তোমায় যথেষ্ট ঠক্‌তে হবে। মানুষের ভাল-বাসায় সম্মোহন আছে—তাকে দমন করবার শক্তি আগে অর্জ্জন করে নাও—তার পর

উপর থেকে অবতরণ করে ডুবে সে লীলায় অবগাহন করো। ভালবাসায় প্রবৃত্তি যদি থাকে, তবে দেখবে, তার মাঝে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ রয়েছে—নির্ব্বিকারচিত্ত হতে না পারলে সেগুলির ঐন্দ্রজালিক বিলাস মানুষ যথার্থ ভাবে চিনে নিতে পাবে না। তাই সেখানে বিচারের প্রয়োজন। কঠোর সাধনায় সংযমের আলে আগে চিত্তের রসের খাদ কেটে নাও—তারপর ভালবাসায় আত্মবিসর্জন দিও—তবেই যথার্থ প্রেমে একাত্ম হতে পাববে। তোমার ভিতরে ব্যক্তিগত আমিত্বের অভিমান থাকা পর্য্যন্ত, সেই বিরাট আমত্বের সায়রে, বুদ্বুদের মত নিঃস্বার্থভাবে ডুবে যাওয়া—সে কি তোমার সাধ্য মনে করছ? তা কখনই নয় —তাঁর জন্য হৃদয়াসন তোমার শূন্য করে ঐকান্তিক প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে তোমায় থাকতে হবে। নইলে তোমার একবিন্দু আমিত্ব থাকা পর্য্যন্ত তাঁর আলোকের অবাধ স্ফুরণ তোমার ভিতর লীলায়িত হবে না।

*

নিজের শক্তির অভিমান ত্যাগ করিয়া সুদৃঢ় চেষ্টায় ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংহত এবং সংযত কর। তারপর নিমিত্তমাত্র হইয়া সেই মুক্তাকাঙ্ক্ষ ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাও—দেখিবে, মহাশক্তিময়ের শক্তি তোমায় ভিতরে আপনি স্ফুরিত হইতেছে। ইহাই হইল প্রকৃত আত্মশক্তি। আগে অভিমানকে জয় না করিলে এই শক্তি উপলব্ধ হয় না। আর এ শক্তিকে অনুভব করিতে না পারিলে তোমার জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টাই সব সময় একথাটী মনে রাখিও—"আমি যাহাই করিতেছি, হয়ত তাহা ভাল নয়।" তাহা হইলে অনেক সময় অভিমানের হাত হইতে ত্রাণ পাইবে। নিজের কাজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানাই অধিকাংশ সময় অভিমানের মূল কারণ। বলিতে পার, "আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না থাকিলে কাজ করিব কিরূপে?" কিন্তু একটু তলাইয়া ভাবিলেই দেখা যায়, "আত্মশক্তি" বলিতে অনেক সময় আমরা ভুল বুঝি।—"আত্মশক্তি" বলিতে আত্মার অর্থাৎ ভগবানের শক্তি না বুঝিয়া আমাদের দেহের শক্তি বা ইন্দ্রিয়ের শক্তিকেই বুঝিয়া থাকি। যখন এই ভুল বোঝাটাকেই আমরা ঠিক বলিয়া মনে করি এবং তাহা লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করি, তখনই আত্মবিশ্বাস আমাদের দেহাভিমানে পরিণত হয়—তাহারই পাকে জড় হইয়া আমরা নিজকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলি। তখন হইতেই কর্ম্মের সাধনভূমি আমাদের নিকট অভিমান অহঙ্কারের প্রেতভূমি হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই "হয়ত" বলিতে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অর্থাৎ ভগবদ্বিশ্বাসকে দূর করিবার কথা বলিতেছি না। তাঁহাতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তো রাখিতেই হইবে—নহিলে তোমার সমস্ত সাধনাই বৃথা হইবে। তবে বলিতেছি এই যে,—সন্দেহ রাখ তোমার দেহের উপর—ইন্দ্রিয়ের উপর;—তাহারা যাহা করিবে, তাহাতে প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। আর বিশ্বাস করিবার সময় করিও তাঁহাকে—তোমার অন্তরে, সমগ্র বিশ্বের অন্তরে যিনি রহিয়াছেন, সেই ভগবানকে—ইন্দ্রিয়কে নয়।

ওঁ তৎ সৎ
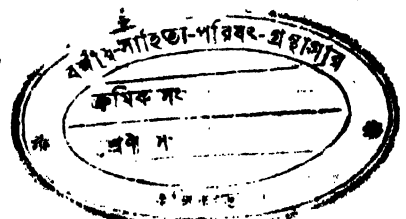
(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)
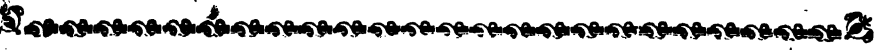
৭শ বর্ষ } ভাদ্র { ৫ম সংখ্যা

আদিত্যাঃ

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৬।৫]

সুগো হি বো অর্য্যমন্ মিত্র পন্থা
অনৃক্ষরো বরুণ সাধুরস্তি।
তেনাদিত্যা অধি বোচতা নো
যচ্ছতা নো দুষ্পরিহন্তু শর্ম্ম॥

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা
যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্ত্যাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষে
শ্যাম আয়ূংষি সুধিতানি পূর্ব্বা॥

ন দক্ষিণা বিচিকিতে ন সব্যা
ন প্রাচীনমাদিত্যা নোত পশ্চা।
পাক্যা চিদ্ বসবো ধীর্য্যা চিদ্
যুষ্মা নীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্॥

অদিতে মিত্র বরুণোত মৃল

যচ্চো বয়ং চকৃমা কচ্চিদাগঃ।
উর্ব্বশ্যাম্ অভয়ং জ্যোতিরিন্দ্র
মা নো দীর্ঘা অভিনশন্ তমিস্রাঃ॥

সুন্দর, সুগম পন্থা, হে অর্য্যমা, হে মিত্রাবরুণ—
কণ্টক-আঘাত যারে রক্তপাতে করেনি অরুণ—
সেই পথে নিত্য শুনি তোমাদের সুধাময় বাণী,
শান্তিভরা ক্ষয়হীন বিত্ত, দেব, নিত্য দাও আনি!

নিখিলের প্রাণ তুমি, হে বরুণ, -রাজঅধিরাজ—
মর্ত্ত্য তব লোটে পায়, আজ্ঞাবাহী দেবের সমাজ।
দীপ্তি শত শরতের আন, দেব, করি দরশন—
পূর্ব্বপুরুষের আয়ু বীর্য্যভরা করি আস্বাদন।

সব্যভাগ কারে বলে নাহি জানি, না চিনি দখিণ,
প্রাচী আর প্রতীচীর, হে আদিত্য, নাহি জানি চিন্—
জ্ঞানহীন মন্দমেধা—তবু স্মরি দেবতা-নিদেশ
অভয় জ্যোতিঃর মাঝে অনায়াসে করি পরবেশ।

হে মিত্রাবরুণ, শোন, হে অদিতি—যাচি পরসাদ,
তোমাদের পায়ে যদি করে থাকি কোনো অপরাধ!
ইন্দ্রের অভয় জ্যোতিঃ—হেরি তার বিপুল প্রকাশ—
দীর্ঘ তমিস্রার মাঝে নহে যেন মোদের বিনাশ!

———০———

মনোলয়

—*—

(প্রবৃত্তিমার্গ)

নিবৃত্তিমার্গে মনোলয় কাম্য হইলেও, প্রবৃত্তি-মার্গে মনোলয় অসম্ভব নহে। মানব প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির মোহময় মদিরায় লুপ্তচৈতন্য। তাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম না জানিয়া যাঁহার ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে গভীর নিদ্রামগ্ন, সেই সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বপ্রাণীর একান্ত বিশ্বাসস্থান, বিপথগামী অবোধ সন্তানের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব "কামিনী-কাঞ্চন" ভুলিতে পারিবে না বলিয়াই তন্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিয়া মানব হরিনাম লইবে না, এই কথা প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের গোচরীভূত হইলে, তিনি নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন, মাছ, মাংস খাইয়া রমণীর ক্রোড়ে বসিয়া মানব হরিনাম করুক। প্রবৃত্তি-পূর্ণ মানবের উদ্ধারের পথ মহাজন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঘোরতিমিরাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যে পথভ্রান্ত শ্রান্ত পথিকের ন্যায় অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতেছি। আমরা পথের সন্ধান লইতেছি না। আমরা ভুলি-য়াও কখনও মনে করি না যে আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি—আমাদের যাত্রার সমাপ্তি কোথায়? আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, যেমন পানগৃহে নানালোকের একত্র সম্মিলন—সংসারে আমাদেরও সম্বন্ধ তদ্রূপ—প্রাক্তন কর্ম্মফলে কখনও সংযোজিত, কখনও বিয়ো-জিত হইতেছি। "আমার" মনে করিয়া যাহার সুখের জন্য, নিজে অশেষ দুঃখে জড়াইয়া থাকিতেছি—সেই পুত্রকে কেন এত ভালবাসি? কারণ সে আমার দেহ-সম্ভূত? স্ত্রী আমার ভোগের উপকরণ? তাহা তো নহে। যদি তাহাই হইত, তবে যে সত্য বস্তু দেহত্যাগ করিলে দেহ অসাড় হইয়া যায়, তখন তাহাকে তুচ্ছজ্ঞানে ভস্মী-ভূত করি কেন? কারণ জড় দেহ তো আমার আত্মীয় নয়। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের দ্বারা মালা গ্রথিত হইলে সেই বিভিন্ন জাতীয় পুষ্পের ভিতর যেমন একই সূত্র অনুস্যূত থাকে, তদ্রূপ আমরা সেই এক আত্মা সূত্রে গ্রথিত হওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি। কারণ—

প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্
লোকেস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ভবত্যন্যঃ প্রিয়ঃ শিবে॥

কিন্তু আমাদের ভালবাসা অন্তর্দৃষ্টির অভাব হেতু নিজ পরিবারবর্গের উপর সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ আমরা জ্ঞানহীন—দেহাত্ম-বোধপ্রধান। আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ আত্মার সঙ্গে। কাজেই সে সম্বন্ধ বিশ্বব্যাপী এবং সেই আত্মা একমাত্র সত্য বস্তু। কিন্তু সেই আত্মার স্বরূপ কি? শাস্ত্র বলিতেছেন—

আদির্নিরাময়ঃ শুদ্ধঃ জন্মমৃত্যুাদিবর্জ্জিতঃ
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিতশ্চিদানন্দাত্মকো মতঃ॥
অনঙ্গঃ সুপ্রভঃ পূর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহগতঃ পরঃ॥
স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাসয়ন্ স্বয়মাস্থিতঃ।
—ইত্যাত্মনঃ স্বরূপম্॥

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধি প্রাণ দেহ অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন অস্মৎশব্দের

গোচর অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ। তিনি অনাদি, বিকারশূন্য, নির্ম্মল ও জন্মমৃত্যুব্যাধিবর্জ্জিত। বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার উপাধি নহে। তিনি চিন্ময়—আনন্দময়। তিনি অশরীরী জ্যোতির্ম্ময়, তিনি নিত্য পূর্ণ ও শুদ্ধ জ্ঞানাদিময়। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, সর্ব্বাতীত, সর্ব্ব-দেহগত। তিনি নিজ জ্ঞানপ্রভায় দেহাদিকে উদ্ভাসিত করিয়া স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন।

এক সূর্য্য যেমন ঘটভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেমন বহু গাভী দোহনে একই প্রকার দুগ্ধ ঘটস্থ হয়, তদ্রূপ দেহ বিভিন্ন হইলেও, আত্মা একই। মনের বহুত্বে নানারূপে, নানা দেহপরিচ্ছেদে প্রকাশিত। এই মনের উৎকর্ষে ও অপকর্ষে কেহ জ্ঞানী—কেহ অজ্ঞান, কেহ ধনী—কেহ নির্ধন, কেহ সুন্দর—কেহ কুৎসিৎ, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী। আমরা এখন যাহা, তাহা আমাদের বহু বহু জন্মের অতীত চিন্তারাশির ফলস্বরূপ। আবার বর্ত্তমানে যেমন চিন্তা করিতেছি, পরজীবনে তাহাই হইবে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে
ন গন্ধর্ব্বাণাং বিবরপ্রদেশে।
ন মাতৃমূর্দ্ধ্নি প্রস্রুতস্তথাঙ্কে
ত্যক্তুং ক্ষমঃ কর্ম্ম কৃতং নরোহি॥

নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জীব বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করে। ভাগ্যে যদি কিছু সুখ থাকে, তবে আমিই সে সুখের কর্ত্তা—আমার দুঃখের আমিই নির্ম্মাতা। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ভাবিয়া গড়িবার উপায় নাই—অতীতের জন্য অনুশোচনা করিয়া ফল নাই, কারণ "প্রারব্ধং নিশ্চয়াৎ ভুংক্তে।" কিন্তু আমরা অনারব্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে যত্ন করিতে পারি। সংসাররূপ বিশাল বারিধিবক্ষে যদি জীবনতরীর হাল একটু ঘুরাইয়া দিই, তবে হয়ত একদিন এ তরী বেলাভূমিতে পৌঁছিতে পারে। চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি মানব "কামিনীকাঞ্চনে"র ভিতর দিয়া মদন মরণের ভিতর দিয়া মদনমোহনের চিরশান্তিময় চরণতলে আশ্রয় পায়, তবে কে তাহাতে না প্রয়াসী হইবে? প্রকৃত শিক্ষার অভাবহেতু মানবের লালসা তাহার লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা গ্রাস করিতেছে। যদি এই প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবের স্থূল রূপরসের ভিতর প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় করিয়া দেওয়া যায়, তবে সে যতই ভোগপ্রয়াসী হউক না কেন—যতই সে ভোগের ভিতর ডুবিয়া যাউক না কেন, আন্তরিক শ্রদ্ধা তাহার স্বাভাবিকী শক্তি বিস্তার করিয়া মানবকে পঙ্কিল ভোগপ্রবাহের মধ্য হইতে টানিয়া তুলিবে। তীব্র শ্রদ্ধার বলে মানব ভোগে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সংযমী হইবে—আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইবে। সত্য মিথ্যার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।

কিন্তু মানবের এই অসৎপথে গমনের এবং ভোগপ্রবৃত্তির হেতু কি? যদি শ্রীভগবানই "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" হন, তবে মানব তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য কতখানি দায়ী?

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "অহং বীজপ্রদঃ পিতা।" তিনি বীজ ছড়াইতেছেন। বীজ ছড়াইতেছেন বলিলে, কৃষক যেরূপ কোথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া থাকে, সেরূপ বুঝিতে হইবে না। কারণ

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" তিনি নিজেই বীজ হইতেছেন এবং নিজেই বিকাশ লাভ করিতেছেন। এই বিকাশ লাভই জীবলীলা। শ্রুতি বলিয়াছেন—

সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে,
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥

অর্থাৎ জীব ক্রমবিকাশে ধীরে ধীরে মানবত্ব লাভ করে। অতঃপর মানবত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বর তাঁহার প্রেরক এবং ঈশ্বর হইতে সে ভিন্ন মনে করিয়া আপাততমো ভুলিয়া থাকে। অতঃপর প্রবৃত্তিমার্গের ঘাতপ্রতিঘাতে যখন মনের অধিকতর বিকাশ লাভ হয়, এবং বুঝিতে পারে যে, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; তখনই নিবৃত্তিমুখী হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে তাহার নিজ আলয়ে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টিত হয়। কাজেই মনোবিকাশের হেতু প্রবৃত্তির যে প্রয়োজন নাই, এ কথা বলা চলে না।

এইক্ষণে বিচারের বিষয় এই যে, যদি ভগবানই জীবরূপে লীলা করিতে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন, তবে দুঃখভোক্তা এবং পাপপুণ্যের জন্য দায়ী কে ?

জীবাত্মা নিজের বিশেষক উপাধি মনের সহিত বিজাতীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া মনঃকৃত বাসনাকামনার বশে অবশ হইয়া ঘুরিতেছেন।

"বিশুদ্ধঃ স্ফটিকো যদ্বদ্রক্তপুষ্পসমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনা ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনোঽপি তথা গতিঃ ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারঃ জীবস্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্মবশতস্তত্তৎফলভোক্তার এব তে ॥

অর্থাৎ যেরূপ নির্ম্মল স্বচ্ছস্ফটিক, রক্তবর্ণ পুষ্পের সমীপে থাকিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ বা তত্তৎ পুষ্পের সবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক স্ফটিকের লৌহিত্য নাই, তদ্রূপ আত্মা নির্ম্মল স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ম্ময় হইলেও তত্তৎ পদার্থের সমগুণসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। অতএব মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইত্যাদি জীবের সহকারী বিধায় তাহাদেরই কৃত কর্ম্মের ফল শুভাশুভ হেতু তাহা দ্বারা নিজেরাই সুখ দুঃখ অনুভব করে—আত্মা করেন না। কারণ আত্মা নির্লিপ্ত।

মানব যতদিন প্রবৃত্তি মার্গে থাকিবে, ততদিন ঈশ্বরবিমুখ, কাজেই ভগবানই মনকৃত পাপপুণ্যের জন্য দায়ী মনে হইবে। আবার যখন সেই মানবের সময় হয়, তখন তিনি ঈশ্বরমুখী হইয়া স্ব স্বরূপে পৌঁছিতে চেষ্টিত হন এবং ভগবানই সকল করিতেছেন, ইহা তাঁহার নিকট পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন ভগবানকেই সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন। এ সময়ে তাহার পাপ পুণ্য আদি কিছুই থাকিবে না—কারণ মনে আর পাপ পুণ্যে প্রবৃত্তি থাকিবে না। যদি পাপ পুণ্যে মতি হয় তবে বুঝিতে হইবে, যে ভগবান সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া তাহার ধারণা দৃঢ় হয় নাই—কারণ সে নিজে পাপ পুণ্য করিতে গিয়া ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেই কর্ত্তা হইতে যাইতেছে। কাজেই জীবের শুভাশুভ, ভালমন্দ, ভগবানের কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস হওয়ায় লোপ পাইবে। জীবের তখন মন বুদ্ধি অহঙ্কার সমস্তই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবানের আশ্রিত হইয়া থাকিবে। কারণ তখন আর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা থাকিবে না।

সাধারণ মানব যখন কিছুতেই ধর্ম্মাচরণ

করিতে রাজী হয় না—তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহারা সবে মাত্র প্রবৃত্তিমার্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতাদৃশ ব্যক্তি জীবনের প্রভাত হইতে স্থির করিয়া বসিয়া থাকে যে বার্দ্ধক্যই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃষ্ট সময় এবং তৎপূর্ব্বে নহে। জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এবং ধর্ম্মাচরণের যে কোন কাল নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহা বুঝিতে চাহে না।

"ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে॥"

মানব সর্ব্বদাই মৃত্যুমুখে দণ্ডায়মান। যদি তাহাই হয়, ধর্ম্মাচরণ স্থগিত রাখিলে নিজেই বঞ্চিত হইবে। বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে যখন দৈহিক কোন প্রকার সামর্থ্য থাকে না—মস্তিষ্কের প্রখরতা থাকে না—অশেষ বাসনা কামনায় জড়াইয়া যায়—তখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুযোগ কোথায়? "পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।" তাই আচার্য্য বলিয়াছেন—

"দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যাহা অভ্যাস করিবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারই শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা……ভাল কামনা, ভাল চিন্তা জীবনে বিশেষ অভ্যস্ত বা প্রকৃতিগত না হইলে তাহার মৃত্যুযাতনা বা অন্তিম বিদায়ের ব্যস্ত কোলাহলের ভিতর মনে না আসাই সম্ভব। যাহা আহার করা যায়, তাহারই উদ্গার উঠে। তাই বলি, কামনা লালসা দু' দণ্ডের খেয়াল নহে, তাহা অনন্তের পরমায়ু—সংস্কাররূপে তাহা আত্মার আবরণ হইয়া দাঁড়ায়।"

কাজেই সময় থাকিতে এই মনের বিনাশ সাধন করিতে হইবে। কিন্তু প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবের সে শক্তি কোথায়? এই শক্তি লাভের জন্য সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার শত প্রবৃত্তির মধ্যে একটা মাত্র অভ্যাস প্রকৃতিগত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার ছন্নছাড়া জীবনে শত বাসনাকামনার ভিতর একটা মাত্র লক্ষ্য রাখিলে অশেষ কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে। শয়নে-স্বপনে, বিলাসে-ব্যসনে, ভ্রমণে-ভোজনে, সুচিন্তায়-কুচিন্তায়, জীবনের যে কোন অবস্থায়—স্মরণ রাখিতে হইবে যে একজন আছেন—আছেন তাহার হৃদয়ের ভিতরে।

"কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়ে ঘৃতং।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পাপপুণ্যবিবর্জ্জিতঃ॥

সেই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত দেবতা হৃদয় আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তিবেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

সেই মহৎপুরুষের কথা স্মরণ করিয়া মানব স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে—স্বেচ্ছায় ভোগ করিতে পারে। সেই "গুরুঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ" সব দেখিতেছেন—সবই জানিতেছেন। মানব যাহা করিতেছে—গোপনে করিলেও, আর কেহ না দেখিলেও—তিনি সাক্ষিভূত তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সর্ব্বাবস্থায় মানব যদি হৃদয়ের ভিতর কাহারও সাড়া পায়—এবং অনুভব করিতে শিক্ষা করে, তবে যত বড় প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব হউক না কেন,

যতই ভোগে নিয়ত হউক না কেন—মানব আপনা হইতে সংযত হইবে। মানুষমাত্রেরই জীবনে একটা সময় আসে—যখন নদীর জলোচ্ছাসের মত প্রবল ভোগপিপাসার উদ্দাম গতি সহজে বাধা মানে না। বাধা দিতে চেষ্টা করিলে—উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব যদৃচ্ছা ভোগ করিবে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, যেন এক জন গুহাশায়ী আছেন—তিনি সর্ব্বকর্ম্মের দ্রষ্টা। তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া এই দেহমন্দিরকে কোন না কোন হেয় কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন, সর্ব্বাবস্থায় এইরূপ স্মরণের ফলে তাঁহারই প্রসাদে মানব সংযত হয় এবং ভোগে বীতস্পৃহ হয়। তখনই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তিনি সংসারে থাকিয়া ভগবৎপরায়ণ হইয়া—প্রকৃত গৃহস্থ হন এবং অচলভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করেন। তাঁহার গৃহের গণ্ডী ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মবিচার এবং ধ্যান ধারণার দ্বারা হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করেন এবং স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সবের ভিতর একই সত্তা অনুভব করেন। ক্রমশঃ পরিবার হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে দেশের মঙ্গলের জন্য তৎপর হন এবং আত্মার বিস্তার ঘটে। তখন তিনি সবার ভিতরেই একটা অখণ্ড ভাব উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহার বোধ হয় যে, অনন্ত বিশ্বের সহিত তাঁহার মিলন আছে। বাহিরের আকাশের সহিত তাঁহার দেহান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশের মিলন আছে। অনন্ত ছিদ্রময় দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সহিত, তেজের সহিত, রসের সহিত, বাহিরের বায়ুর, তেজের ও রসের মিলন রহিয়াছে। তিনি তো ক্ষুদ্র নন—তিনি অনন্তের অংশ। তখন তিনি

একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্॥

এই জ্ঞানে বিশ্বের হিতের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং সর্ব্বদাই ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন থাকেন।

আর যাহারা নিম্ন অধিকারী, যাহারা স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার চেষ্টা করে নাই এবং যাহারা ইহসর্ব্বস্ব, তাহারা ঘোর সংসারী বলিয়া খ্যাত। তাহারা অসময়ে ভগবানের স্মরণ করে এবং কাম্যকর্ম্মাদি দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টিবিধানের চেষ্টা পায় এবং স্বসুখবাঞ্ছাই তাহাদের সর্ব্বকর্ম্মের হেতু হয়। এই শ্রেণীগত মানবের বিপদের সময় সাময়িক চৈতন্য হয় এবং কাম্যকর্ম্মাদি করিয়া থাকে। কর্ম্ম আদৌ অকরণের চেয়ে কাম্য কর্ম্মও ভাল। ধ্রুব সিংহাসনের লোভে গৃহত্যাগ করিলেও এমন পদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, সে পরম পদ আর কেহ পায় নাই। কাম্য কর্ম্ম করিতে করিতে মানব পরে কাম্যকর্ম্মের অসারতা বুঝিতে পারে এবং পরে নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী হয়। আর এই মার্গের অধম শ্রেণীর মানব কিছুই করে না—শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীবনযাপন করেন।

এইক্ষণ এই তিন শ্রেণীর অধিকারীর মৃত্যুর পর কি প্রকার গতি হয়?—মৃত্যুর পর মনুষ্যের দুই মার্গে গতি হয়—এক দেবযান বা শুক্ললোক, অপর পিতৃযান বা ধূম্রলোক।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিং অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

উচ্চ অধিকারী দেবযানে গমন করেন এবং তাঁহাকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না—আর নিম্ন অধিকারী পিতৃযানে গমন করে এবং তাহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তম অধিকারী ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় ভাস্বর অথচ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখিতে পান এবং শ্বাসবায়ু সেই জ্যোতির সহিত দক্ষিণ নাসিকা-পথে বহির্গমন করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুনঃকর্ম্মানুসারিণী॥

এবং তৎপরে "উত্তরাভিমুখী" অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং তথায় গিয়া ধ্যানমাত্রে তৃপ্ত হন। আর যাহাদের পাপপুণ্য সমবল, তাহাদের শ্বাসবায়ু বাম নাসাপথে গমন করে।

ইড়া চ বামনিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতিজ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥

ইহাদের কিছু দিন অন্তরীক্ষলোকে অপেক্ষা করিতে হয়। তথায় কিয়ৎকাল লিঙ্গশরীর অথবা যাতনাময়দেহ অবস্থান করে, এবং বাসনা-কামনার হাত হইতে নিস্তার না পাওয়ায় অশেষপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। কারণ তাহাদের লালসা আছে, কিন্তু ভোগসমর্থ শরীর নাই, ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপায় নাই। এইরূপে কিছুদিন অপেক্ষা করে, পরে ভূলোকে আত্মীয়স্বজন যে শ্রাদ্ধাদি করে—তাহাতে মৃতব্যক্তির যন্ত্রণার উপশম হয়। কারণ শ্রাদ্ধের মন্ত্রের শব্দে আকাশে তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই তরঙ্গ মৃতব্যক্তির লিঙ্গশরীরে আঘাত করে। সেই আঘাতের ফলে মৃতব্যক্তির লিঙ্গশরীর বা কামময়দেহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখন স্বর্লোকে উপস্থিত হয়।

এইক্ষণ মানব ভূলোকের চিন্তার ধারা দ্বারা কি প্রকার ভোগসুখে রত থাকেন, তাহা দেখিতে হইবে।

মানবের চিন্তার ধারা দুই প্রকার, সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্ম হইলেই অমূর্ত্ত, স্থূল হইলেই মূর্ত্ত। এই দুই ধারাকেই হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণত দেবযান ও পিতৃযান বলিয়াছেন। মানুষ চিন্তাশীল জীব, সে যখনই চিন্তা করে, তখনই সে কোন এক মনোময়রাজ্যে গমন করে ও তখন তাহার অন্য কোন ইন্দ্রিয় কার্য্য করে না। সে তথায় মনের ধারণার বিষয় সাধারণতঃ মূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল বিষয়ের মনোময় ফটো দেখিতে থাকে। কাজেই মৃত্যুর পর জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমবায়ে গঠিত ক্ষেত্র লইয়া এই অন্নময় দেহ হইতে বহির্গত হয়। প্রেতত্ব অতিবাহনের পর মৃতব্যক্তির মনোময় শরীর যে উপাদানে গঠিত, affinity দ্বারা তদ্রূপ উপাদানে গঠিতলোকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব মৃত্যুর পর কিছু সুকর্ম্ম করিবার হেতু এই স্থানে গমন করিয়া কাম ভোগ করে। এইক্ষণ কামভোগের অর্থ বুঝিতে হইবে। ভূলোকে থাকিতে যেরূপ চিন্তা হৃদয়ে মূর্ত্ত হইয়া উঠিত অর্থাৎ চিন্তা করিবামাত্রই সেই চিন্তা স্থূলের অনুরূপ ... গ্রহণ করিত, মনোময়কোষ স্থূল অন্নময় দেহের ভিতর রুদ্ধ না থাকায় এবং একই উপাদানে গঠিত লোকে অবস্থিতি হেতু চিন্তা করিবামাত্র—চিন্তারাশি দিব্য formation গ্রহণ করে বা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। যাহার যেরূপ চিন্তার ধারা—তিনি তদনুরূপ জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত ক্রীড়াসুখে রত থাকেন, কারণ সংকল্প-সিদ্ধিত্বই স্বর্লোকের ধর্ম্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"তথায় (স্বর্লোকে) দেবতার ন্যায় নিজ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত দিব্য ভোগসকল ভোগ

করিয়া থাকেন। মনোহর বেশ ধারণপূর্ব্বক নিজ পুণ্য দ্বারা সর্ব্বভোগসম্পন্ন শুভ্র বিমানে আরোহণ করিয়া অপ্সরাগণের ভিতরে বিহার করিতে করিতে গন্ধর্ব্বদিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন। দেবতাদিগের ক্রীড়া স্থান সকলে কিঙ্কিণীজালজড়িত কামগামী যানযোগে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সুখিত হইয়া আপনার অবশ্যম্ভাবী পতন জানিতে পারেন না।"

উপরোক্ত প্রকারে কাম ভোগ করিয়া "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" পুণ্যক্ষয় হইলে কালপ্রেরিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে অধঃপতিত হন।

কিন্তু যাঁহার' আত্মচিন্তা দ্বারা সমস্ত জগৎকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিবার শক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা স্থূল হইতে অমূর্ত্তে বা অরূপে পৌঁছিয়াছে; তাঁহারা সর্ব্বদাই দ্বন্দ্বাতীত হইয়া সূক্ষ্ম (Abstract) চিন্তা লইয়াই ভূলোকে ব্যাপৃত থাকায় মৃত্যুর পর দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞান হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দময়স্বরূপে অবস্থান করেন।

কিন্তু যাহারা এতদুভয়ের কোন শ্রেণীর নহে, তাহারা ভূবর্লোক হইতে অসংখ্য ছিদ্রময় পৃথিবীর মধ্যে আকাশ বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত নরকে বহু দিন যাপন করে।

রুদ্র-আবাহন

এস রুদ্র, এস মহাকাল—
আন্দোলিয়া ভীম শূল, আলোড়িয়া পিঙ্গ জটাজাল,
তৃতীয় নয়ন হ'তে বিচ্ছুরিয়া দীপ্ত হুতাশন—
বাসনার বক্ষ দলি' কর আজি প্রলয়নর্ত্তন!
কামনা-ক্লেদের মাঝে কৃমির মতন
দুলাইয়া পুচ্ছ ওই ক্লিন্নদেহে করে সঞ্চরণ—
এরি নাম মানবজীবন?—
বিদ্ধ কর—দগ্ধ কর তারে!—ওই শোন কাতর ক্রন্দন
তীব্র সুরে দীর্ণ করি চলে ব্যোমতল!
হে নিষ্ঠুর, আঁখিকোণে এসেছে কি এক বিন্দু জল?
নহে, নহে!—ক্ষমা কোথা চিত্তে তব, হে ভৈরব!—
আজি তব প্রলয়-উৎসব—
মরণপীড়নে তাই বিশ্বেরে নিঙাড়ি'
পূরিয়াছ সুধাপাত্র—লভিয়াছ তারি
অগ্নিস্রোতা তীক্ষ্ণ আস্বাদন!—
সত্য—তুমি—শান্ত তুমি—শিব তুমি—মধুর মরণ!

স্বানুভূতি

—*—

লোকে বলে, বনে শাক তুলতে গেলে বট গাছের পানে আর কেউ মাথা তুলে চায় না। বন্ধু, সংসারের লাভলোকসানের হিসাবের ওপর তোমার অমন কড়া নজর, ওদিকে যে অনন্ত আনন্দের খনি আত্মস্বরূপকে ভুলে রয়েছ—তার কি খেয়াল নাই? যে "আমির" ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা, কর্ত্তব্যের বোঝা, মনের বোঝা চাপিয়েছ, সে কি আসল কর্ত্তা? ঘোড়ার পাঁজরে একটা ডাঁশ যদি হুল ফুটিয়ে ভাবে, আমিই ঘোড়াকে দিয়ে গাড়ী টানাচ্ছি—তবে কেমন হয়?

চিরানন্দময় সত্যের জ্যোতির্ম্ময় উচ্ছাস ওই তোমার সামনে—ক্ষুদ্র এই আমিটুকু দিয়ে তাকে বাধা দিতে যেও না। মহাশক্তিকে বিশ্বাস কর। যে আত্মার অধিষ্ঠানবশতঃ লোকচক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র "অ্যামিবা" হতে ক্রমে তোমার এই মানব দেহের ক্রমবিকাশ হয়েছে, সেই পরমানন্দময় ঋতস্বরূপ আত্মাই আছেন। তিনি মরেন নি, ঘুমিয়েও নাই—তবে আর পতনের ভয় কি?

সিন্ধুশকুন যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভরে সমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে যায়—কোথাকার স্রোত কোথায় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার খেয়ালও করে না, তেমনি অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় আমরা লীন রয়েছি—যে আনন্দম। বেগে গ্রহনক্ষত্র আবর্ত্তিত হচ্ছে—সেই আনন্দই আমাদের আশ্রয়। আমেরিকার ব্রহ্মচারী থোরো বলছেন, "ভগবানের উপর যে কাজের ভার ফেলে রাখি, তিনি খুসী হয়ে তা করে দেন; আর যে কাজটা আমরা বলি, আমরা করব, ভগবান আর তাকে ছোঁন না।"

তুমি যে বন্দী, অবস্থার দাস মাত্র—তার নিশানা হচ্ছে সংসারের দুঃখদরদ। তুমি বিচ্ছিন্ন,—এমন নাস্তিকসুলভ ধারণা হলে চলবে কেন? ঝেড়ে ফেলে দাও ও সব মিথ্যা সংস্কার! যে শক্তি বহির্জ্জগত শাসন করছে, আর যে শক্তি তোমার অন্তর্জ্জগতে, তারা যদি ভিন্ন হত, তবে আর কথা ছিল না—স্বচ্ছন্দে হাত কচলিয়ে কপাল চাপড়িয়ে জাহান্নমের পথে যেতে পারতে। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কি, একদিক দিয়ে তুমি যেমন অবস্থার বিপর্য্যয়ে বন্দী আছ, আবার আর এক দিক দিয়ে তুমিই সেই অবস্থার বিপর্য্যয়। আয়নাটা আমাদের অর্থাৎ আমার হাতে রয়েছে, আবার আমিও আয়নার মাঝে আছি।

কে এসে যেন জোরে জোরে আমার দুয়ারে ঘা দিলে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কে গো তুমি?" আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রতীক্ষায় রইলাম, তার পর দেখি একি!—অমিয়মাখা প্রেম এসে চুপি চুপি আমার কানে কানে বলল, "এ যে তুমিই তোমার দুয়ারে আঘাত করেছ, তা কি জান না?"

মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম যিনি বুঝেছেন, তিনি জানেন, তাতে লেখা আছে, মানুষের মাঝে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে স্বীকার করেনি বলে ভগবানের শ্রেষ্ঠ পার্ষদের পক্ষেও অনন্ত নরকের বিধান হয়েছিল। আর আহ্মদে অহদকে দেখে অর্থাৎ

জীবে শিব দেখে জঘন্য নারকীরও স্বর্গলাভ হয়েছিল।

ইস্‌লাম বা শ্রদ্ধা কি?—আমার আত্মাকে সর্ব্বভূতের আত্মারূপে দেখা—এই জীবন্ত বাস্তব অনুভূতিই শ্রদ্ধা।

একে শুধু একটা মতবিশ্বাস বলা ভুল হবে। এই হচ্ছে চরম বিজ্ঞান—বেদ-অন্ত বা বেদান্ত। এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আর্ট।

ডাক্তার জর্ডন বলছেন, "সত্যের চরম পরীক্ষা হচ্ছে এই যে, দেখ্‌তে হবে তাকে ধরে আমাদের কাজ চলে কি না? আমরা তার হাতে জীবন পর্য্যন্ত সঁপে দিতে পারি কি না?" "স্বর্গস্থ পিতা ও আমি এক" কিম্বা "অহং ব্রহ্মাস্মি"—সমস্ত জগৎ প্রতিভাসের মূলে এই সত্য। এই সত্যের কাছে সব সমর্পণ করা চলে, জীবন দেওয়া চলে।

মাধ্যাকর্ষণের আইনকে বিশ্বাস করে কোথাও ঠকবার হয়ত সম্ভাবনা থাকতেও পারে, কিন্তু ব্রহ্মাত্মৈক্যের আইন মেনে কোথাও ঠকবার কথা নয়। এই ঐক্য একবার অনুভব কর দেখি, দেখবে, সমস্ত জগৎ তোমারই দেহরূপে ক্রিয়া করছে। হে অমৃতের পুত্র, আত্মস্বরূপ ভুলে গেলে কেন? সোণারূপা জমিয়ে তোমার জীবনকে নির্ভাবনা করবে ভেবেছ? তুমি যে প্রাণকেও প্রাণময় করেছ, স্বর্ণরজতের ঔজ্জ্বল্য তুমি, চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতিঃ তুমি।

লোকমতের ভয়, অন্ধ আচারের অনুবর্ত্তন—এইগুলি যে হিমালয়ের মত মানুষের বুকে চেপে আছে, তাকে ঠেলে মানুষ যে এক পা-ও এগুতে পারে না—তার উন্নতি আর কি করে তাড়াতাড়ি হবে? সঙ্কোচের অস্বাস্থ্যকর কুসংস্কার হতে নিজকে মুক্ত কর দেখি! এমন তেজস্কর রসায়ন তোমার হৃদয়পাত্রে সঞ্চয় কর, যার এক বিন্দু বহির্জগতে পড়লে জগৎ গলে যায়।

জ্ঞান সেই অনন্তবীর্য্যময় রসায়ন, জগৎ তাতে গলে যাবে—জলের মত স্বচ্ছ ও তরল হয়ে যাবে। ঠিক ঠিক যদি ভাব ধরতে পার, তাহলে আশমান ভেঙ্গেই পড়ুক, আর দুনিয়াই ফাঁক হয়ে যাক্—সবই তোমার কাছে বীণার ঝঙ্কার বলে মনে হবে; আর তারই তালে তালে তুমি আনন্দে চলে যাবে। কোনও শত্রুর চোখে তুমি পড়বে না, তোমার চোখেও শত্রু থাকবে না। শত্রুর কথা যে তুমি তখন ভাবতেও পারবে না।

গানের সুরের পর্দ্দাগুলি একটা বিশেষ ক্রম অনুযায়ী ওঠা নামা করতে পারে। পর্দ্দাগুলি ঘাঁটলে বা তাদের পরস্পর তুলনা করলেই আর সঙ্গীতের মাধুর্য্য বোঝা যায় না। তা বুঝ্‌তে হলে অন্তরাত্মার যে আনন্দ হতে সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে, যে আনন্দে সঙ্গীত ধৃত রয়েছে, সঙ্গীতের উৎস যে আনন্দে, তার সৃষ্টি-কলার অভিব্যক্তি যে আনন্দে—সেই আনন্দানুভূতির সঙ্গে সুর-সপ্তকের কি সম্বন্ধ তাই বুঝতে হবে। তবেই সঙ্গীতের মাধুর্য্য বোঝা যাবে।

তাই শুধু উপরভাসা কতকগুলি আইন, কার্য্যকারণের কতকগুলি ভাসা ভাসা পর্য্যায় জানতে পারলেই প্রকৃতির রহস্য জানা যাবে না। জড় কি করে মানুষ হল—তাই বুঝতে হবে।

অনুভূতিতে যদি সব না পেলে, তবে জানবে কি? একেবারে সত্যের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে যাও—এই নামরূপের জলে তলিয়ে যাও। বনে প্রান্তরে, পর্ব্বতে-সরিতে, দিবসে-

রজনীতে, মেঘে-নক্ষত্রে, সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়—আকীট দেবতায় আপনাকে বিস্তার কর—সবার আত্মস্বরূপে। এই তো জীবন, এই তো আত্মজ্ঞান, এই তো বাস্তবজ্ঞান!

যে সমস্ত জগতের সঙ্গে নিজকে এক বলে জেনেছে, সমস্ত জগৎ তার কার্য্যের সহচর হবেই হবে।

কারণজগতে যদি জ্ঞান হয়, সত্যের জীবন্ত অনুভূতি হয়, তবে জ্ঞান বিশ্বাবগাহী প্রেমে রূপান্তরিত হবে। তখন তুমি সবার সঙ্গে এক—রসে পরিপূর্ণ—আনন্দে চির উচ্ছল। জ্যোতির্ম্ময় সবিতার মত তখন আর তুমি ফলাকাঙ্ক্ষা করবে না, পুরস্কার চাইবে না—কিছুই খুঁজবে না—সূক্ষ্মজগতে বা মনোজগতে সবিতার মত ত্যাগরূপে তখন তুমি আত্ম-প্রকাশ করবে। আবার সেই ত্যাগ স্থূল জগতে আশ্চর্য্য শক্তি ও বিচিত্র কর্ম্মে অভি-ব্যক্ত হবে।

এই হল জ্ঞান—প্রেম—ত্যাগ—কর্ম্ম তার প্রকাশের ধারা।

পরিবর্ত্তনে আমার দ্বিধা নাই—আমার মৃত্যুভয় নাই। আমি জন্মি নাই—আমার পিতা নাই, মাতা নাই। আমি পরম সত্তা, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ। সোঽহম্—সোঽহম্।

আমি দুঃখী নই—দুঃখের নিমিত্ত নই। আমি কারু শত্রুও নই—আমারও কোন শত্রু নাই। আমি অখণ্ড সত্তা, অখণ্ড জ্ঞান, অখণ্ড আনন্দ।

আমার আকার নাই, সীমা নাই—আমি দেশের অতীত, কালের অতীত। আমি সবার মাঝে, বিশ্বের মর্ম্মে আমি আনন্দস্বরূপ—আমি সর্ব্বত্র। আমি অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ। সোঽহম্—সোঽহম্!

আমি দেহ নই, দেহের বিকার নই—আমি ইন্দ্রিয় নই, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নই। আমি অখণ্ড সত্তা, অখণ্ড জ্ঞান, অখণ্ড আনন্দ—সোঽহম্—সোঽহম

আমি পাপ নই, পুণ্য নই; আমি মন্দির নই—পূজা নই। আমি তীর্থ নই—শাস্ত্র নই। আমি অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ—সোঽহম্—সোঽহম্।

আমার হৃদয়মন্দিরে প্রেমের আলো তার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রেমের ফুল ফুটেছে, চারদিকে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে—কাঁটার ভয় কচ্ছ কেন? ও কাঁটা যে মিথ্যা—মায়া মাত্র। আনন্দের চির-উৎস হতে আত্মার সমুজ্জ্বল মহিমা উচ্ছ্-সিত হয়ে উঠেছে—আনন্দের মাদকতাভরা গানে নন্দনকাননের সুরভি বাতাস মাতাল হয়ে উঠ্‌ল যে! আহা—কি শান্তি, কি আনন্দ, কি প্রেম! এ অপার্থিব আনন্দের তুলনা কোথায়? সঙ্গীতের বিপুল প্রবাহে বিশ্ব প্লাবিত হয়ে গেল—এ সঙ্গীত যে আমা-রই। মুক্ত আকাশে সুপর্ণের দল মুক্তির আনন্দগাথায় দিগন্ত মুখরিত করে তুলেছে। বসন্তের আনন্দবাহিনী শিশুর সলজ্জ হাসি নিয়ে কলকণ্ঠে আবাহনগীত গাইছে। উষার সদ্যোবিকশিত স্বর্ণরাগে তড়াগ, প্রান্তর, পর্ব্বত সুরঞ্জিত। অনন্ত প্রেমের সজল জলধর স্নিগ্ধ ধারাসারে জগৎ সিক্ত করছে। ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণরাগে দিগ্‌বধূর মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠেছে। মুক্তার মত শিশিরবিন্দুর বুকে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। কি আনন্দ! প্রেমের

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য আমি—প্রাণের অন্তহীন সবিতা আমি!

শুনেছ, তালীবনে দীর্ঘনিঃশ্বাসে মর্ম্মরিত ব্যথার ধ্বনি?—ও যে আমার হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস—তোমার চোখে চোখে চেয়ে প্রাণের ভাষায় বলছে—ওগো বন্ধু, জাগো জাগো! বন্ধু আমার, এই যে আমি—আনতমুখে তোমার নিঃশ্বাস অনুভব করছি—ওগো জাগো জাগো! ওগো প্রিয়তম—আর কেন, হৃদয়ের আবরণ খসে যাক্!—ওগো, জাগো, জাগো!*

* স্বামী রামতীর্থ

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

প্রত্যক্ষের লক্ষণসঙ্গতি

লক্ষণে যে "অধ্যবসায়" শব্দটী গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা সংশয় হইতে প্রমাকে পৃথক করা হইয়াছে। অধ্যবসায় ও নিশ্চয় একই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু সংশয় নিশ্চিত জ্ঞান নহে, কেননা উহা অনবস্থিত অর্থাৎ উহা কেবল একটী মাত্র বিষয়েই পুরুষপ্রবৃত্তিকে নিয়োজিত করে না।

লক্ষণে "বিষয়" পদদ্বারা প্রত্যক্ষকে বিপর্য্যয় হইতে পৃথক করা হইল। বিপর্য্যয়ের বিষয় অসৎ। যাহা যাহা নয়, তাহাকে তাহাই বলিয়া যে চিত্তবৃত্তি দ্বারা জানা যায়, তাহাই বিপর্য্যয়। [বিপর্য্যয় অর্থে ভ্রম। লক্ষণে বিষয় পদটী দ্বারা বুঝান হইতেছে যে, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের অধ্যবসায় হইলেই হইবে না—উহার একটী সত্য বিষয় থাকা চাই। প্রত্যেক প্রমার পক্ষে উহার বিষয় যথার্থ এবং পর্য্যাপ্ত। অসৎখ্যাতিবাদীরা বলেন, যাহা নাই, তাহাই ভ্রমকালে জানা যায়। কথাটা একদিকে ঠিক। কিন্তু বিষয় অসৎ অর্থাৎ কোনও বিষয়ই নাই, অথচ জ্ঞান হইতেছে—ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে। তবে ভ্রম হইবে কোথায়? কোনও ইন্দ্রিয়ের দোষ, বিষয়ের দূরত্ব, অন্য কোনও বিষয়ের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ সংস্কারের উদ্বোধ ইত্যাদি ত্রুটী যেখানে থাকিবে, সেইখানেই ভ্রমের উৎপত্তি। কিন্তু ভ্রম ব্যাহত না হইলে বাধিত হয় না। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের পক্ষে সামগ্রীর আবশ্যক। কারণের সমষ্টিকে সামগ্রী বলে। ভ্রম ও প্রমার সামগ্রী পৃথক। কিন্তু এই কথা আমরা পরে জানিতে পারি। সামগ্রী দুই প্রকার বলিয়া একটা বিষয়কেই আমরা একবার এক রকম জানিলাম, পরে আবার আর এক রকম জানিলাম। মনে কর পূর্ব্বের জ্ঞানটী ভ্রম, দ্বিতীয়টী উহার বাধক প্রমা। এখানে যাহা যাহা নয়, তাহাকে তাহাই বলিয়া জানিয়াছি বলিয়া ভ্রম স্বীকার করিতে পারি। যেমন ঝিনুককে রূপা মনে করিয়া ভ্রম হইল; এখানে রূপা অসৎ অথচ তাহার জ্ঞান হইতেছে—এই

কথা মানা চলে। কিন্তু তাই বলিয়া উহার অধিষ্ঠানও যে অসৎ তাহা তো বলা চলে না। একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা জ্ঞান হইল কি করিয়া ? সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানেই একটা কিছু বিষয় থাকা চাই। বিষয় মোটেই নাই, অথচ বিপর্য্যয় জ্ঞান--ইহাও স্বীকার করা চলে না। যেখানে প্রমাণ আছে, সেই খানেই সত্য বিষয়ও আছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিপর্য্যয়ের বেলাতে বিষয় যথাভূতরূপে অত্যন্ত সৎ নহে, ইহাই পার্থক্য।]

লক্ষণে "প্রতি" শব্দটী ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই বুঝাইতেছে। [পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিবিষয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়কে প্রতিবিষয় বলা হয় কেন ? না প্রত্যেক বিষয়ে উহা অনুগত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া উহাকে প্রতি-বিষয় বলা হইতেছে। এই যে একটা কিছু বিষয়ে অনুগত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, এই ভাবটী "প্রতি" শব্দটীর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করি-য়াই আমরা পাইতেছি।] ইহাতে অনুমান, স্মৃতি প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ হইতে পৃথক করা হইল। [কেননা, অনুমানে, স্মৃতিতে অথবা আপ্ত বচনে কোথায়ও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না।]

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তু হইতে প্রত্যক্ষকে পৃথক করায় "প্রতি-বিষয়াধ্যবসায়"—এই কথাটী প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্যান্য শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষের বিবিধ লক্ষণ করিয়াছেন। গ্রন্থ বাড়িয়া যাইবে মনে করিয়া আমরা সে সমস্ত লক্ষণ সমর্থন বা খণ্ডন কিছুই করিলাম না।

—*—

অনুমান

ভূমিকা—চার্ব্বাকমতখণ্ডন

[তারপর দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমানের কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, প্রত্যক্ষ সমস্ত প্রমাণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু অনুমানের বেলায় এ কথা খাটে না। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছুই মানেন না। অনুমানকে তিনি প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে চার্ব্বাকের মত খণ্ডন করিতে হইবে।]

চার্ব্বাক বলেন, অনুমান প্রমাণ নয় অর্থাৎ উহা যথার্থ জ্ঞানের করণ নয়। যদি তাহাই হইল, তবে—অপর কাহারও কোনও বিষয়ে জ্ঞান হয় নাই, সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে বা ভ্রম হইয়াছে—চার্ব্বাক এ কথা জানিবেন কি করিয়া ? [যথার্থ জ্ঞানের সার্থকতা প্রবৃত্তিতে। অর্থাৎ যাহা যথার্থরূপে জানি-য়াছি, তাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যবহারিক জগতে চলাফেরা করিতে গেলে ঠেকিতে হয় না। ঝিনুককে যদি ঝিনুক বলিয়াই জানিতে পারি, তবে তাহাকে দিয়া ঝিনুকের কাজও করিয়া লইতে পারি। কিন্তু তাহাকে যদি রূপা বলিয়া জানি, তবে শুধু জানাই সার হইবে—রূপার কাজ তাহা দ্বারা হইয়া উঠিবে না। কাজের বেলায় যখন দেখিব ঠেকিতে হইতেছে—তখনই বুঝিব, উহা আমার ভ্রম। মরুভূমিতে মরীচিকা যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ বেশ; কিন্তু উহার জল খাইতে গেলেই ঠেকিতে হয়—কাজেই তখন বুঝিতে পারি, উহা ভ্রম। এইভাবে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই-তেছি, প্রবৃত্তি যদি ব্যাহত না হয়, তাহা

হইলে জ্ঞান যথার্থ, ইহা অসঙ্কোচে মানিতে পারি। চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষও নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং অপরপুরুষের প্রবৃত্তিসাফল্য দেখিয়াও অপরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যদিও পরগত চৈতন্যের কি করিয়া প্রত্যক্ষ হইবে ইহা বলা কঠিন, তথাপি কেবল মাত্র অপরের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা আমার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সংসারে চলা যায়—ইহা মানি। এ ক্ষেত্রে অপরের প্রত্যক্ষ আছে কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন করারও প্রয়োজন নাই—আমি শুধু যেমনটী দেখিব, তেমনটী মানিয়া লইয়া আমার কাজ গুছাইয়া চলিব। আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমি স্বীকার করি, অপরের প্রবৃত্তিও আমার প্রত্যক্ষ, সুতরাং শুধু প্রত্যক্ষ মানিয়াই সংসার চলিতে পারে—ইহাই চার্ব্বাকের অভিপ্রায়। কিন্তু কেবল প্রত্যক্ষের ভরসা করিয়াই জগৎ চলে না। অপরের অজ্ঞান, সন্দেহ, ভ্রম—এইগুলিকে না বুঝিলে এবং বুঝিয়া তদনুযায়ী আমার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে পদে পদে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা। চার্ব্বাক অনুমানব্যতিরেকে এগুলি কি করিয়া বুঝিবেন, ইহাই আচার্য্যের প্রশ্ন।]

অপরের অজ্ঞান সন্দেহ বা ভ্রম অপরে কখনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারে না। [লোকটা নিশ্চয়ই এ বিষয় জানে না, বা এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিয়াছে, অথবা সে ভুল জানিয়াছে—নতুবা সে এমন কথা বলিবে কেন? এমন কাজ করিবে কেন?—এইরূপ তর্ক করিয়াই আমরা অপরের অজ্ঞান, সন্দেহ বা ভ্রম জানিতে পারি।] কিন্তু চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণ স্বীকার করেন না, সুতরাং অন্য প্রমাণে যে এইগুলি জানা যাইবে, তাহাও বলিতে পারেন না। অপরের অজ্ঞান, সংশয় বা ভ্রম যথাযথরূপে না জানিয়া তিনি যদি সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করেন, তবে কেহই তাঁহার কথায় কান দিবে না, তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে উন্মত্তজ্ঞানে উপেক্ষা করিবে। সুতরাং অপর পুরুষের অজ্ঞান, সন্দেহ, ভ্রম জানিতে হইলে তাহার অভিপ্রায় বা বাক্যের ভেদরূপ হেতু হইতে তাহা অনুমান করিতে হইবে। [বলিতে হইবে, এই ব্যাপারে আমরা যে কথা বলিতাম, এ ব্যক্তি তো সেরূপ বলিতেছে না; অনুমান হয়, ইহার এইরূপ অভিপ্রায়, তাই এ কথা বলিতেছে। আবার ইহার অভিপ্রায় যখন এই, তাহা হইলে অনুমান হয়, ব্যাপারটা এ আমাদের মত প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে না—এ ব্যক্তি অজ্ঞ, সন্দিগ্ধ বা ভ্রান্ত। এখানে বাক্যের ভেদ হইতে অভিপ্রায়ের ভেদ ও তাহা হইতে অজ্ঞান, সন্দেহ বা বিপর্য্যয়ের অনুমান করিতে হইল।] সুতরাং চার্ব্বাক অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিতে না চাহিলে হইবে কি, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অনুমান মানিতেই হইবে।

অনুমানের ক্রমনিরূপণ

অনুমান প্রত্যক্ষেরই কার্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ মূলে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ না থাকিলে, অনুমান করা চলে না। সুতরাং প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়াই অনুমানের লক্ষণ করিতে হইবে। [আপ্তবচনও তো প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ, সুতরাং প্রত্যক্ষের পর তাহারই বা স্থান নির্দ্দেশ করা হইবে না কেন?—এমন আপত্তি করা চলে না। কেননা বস্তুতঃ সমস্ত প্রমাণের

মূলেই যে প্রত্যক্ষ, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমরা বলিয়াছি, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রমাণসমূহের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাহা হইলেও অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে পরম্পরা ক্রমে পরস্পরের অপেক্ষা আছে—যেমন প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া অনুমান, আবার অনুমানকে আশ্রয় করিয়া আপ্তবচন। সুতরাং প্রমাণ-নির্দ্দেশ এই পরম্পরা অনুসারেই করা উচিত।]

অনুমানের সামান্যলক্ষণ

এখানেও লক্ষণ করিতে হইলে পূর্ব্বে সামান্য লক্ষণ করিয়া তাহার পর বিশেষ লক্ষণ-সমূহ উপস্থাপিত করা উচিত। তাই আচার্য্য অনুমানের সামান্য লক্ষণ করিলেন, "অনুমান লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বক।" যাহা ব্যাপ্য, তাহাকে বলে লিঙ্গ বা হেতু। যাহা ব্যাপক, অর্থাৎ লিঙ্গ বা হেতু যাহাতে থাকে, তাহাকে বলে লিঙ্গী বা সাধ্য। সমস্ত শঙ্কিত ও সমারোপিত উপাধি নিরাস করিয়া যাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপিত হয়, তাহাই ব্যাপ্য এবং যাহা দ্বারা উক্ত সম্বন্ধ নিরূপিত হয়, তাহাই ব্যাপক। লিঙ্গ ও লিঙ্গী বিষয়কে বুঝাইতেছে; এই বিষয়ের নির্দ্দেশ হইতেই বিষয়ী প্রত্যয় বা জ্ঞান সূচিত হইতেছে। [অর্থাৎ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর স্বাভাবিক সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান তাহাই অনুমান—ইহা বলাই আচার্য্যের অভিপ্রেত।] ধূম ব্যাপ্য আর বহ্নি ব্যাপক, এই যে প্রত্যয় বা জ্ঞান, ইহাকে ধরিয়াই অনুমান হইয়া থাকে। লিঙ্গী বা সাধ্যের প্রসঙ্গ এখানে দুইবার উত্থাপিত করিতে হইবে। তাহাতে যেমন লিঙ্গিশব্দ হইতে সাধ্যও পাওয়া গিয়াছে, তেমনি "লিঙ্গ ইহাতে আছে—সুতরাং ইহা লিঙ্গী"—এইরূপ ব্যাখ্যাবলে পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানও পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে মোটামুটী লক্ষণ দাঁড়ায় এই—ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়া অনুমান সিদ্ধ হয়। [অতঃপর ইহার বিবৃতি আবশ্যক।

শক্তিসাধনা

—*—
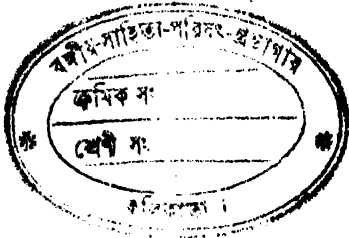
জগৎরহস্যের মূলে শক্তি। যুক্তিতর্ক দিয়া এ কথা প্রমাণ করিতে হয় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই শক্তির তত্ত্ব জানিবার জন্যই যুগে যুগে মানুষের আকুল পিপাসা। জড় বিজ্ঞান বল, অধ্যাত্মবিজ্ঞান বল, সকলেরই এক উদ্দেশ্য, শক্তির রহস্য উদ্ভেদ করা। কারণ হইতে কার্য্য ঘটিতে দেখিতে পাই, জগতে নিত্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই—তাই দেখিয়া তাহার রহস্য নির্ণয় করিতে যাই। এইরূপে একটী কার্য্যের একটী কারণ, আবার তাহার আর একটী কারণ—এইভাবে কারণের কারণ খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে আর অন্ত পাওয়া যায় না, বুদ্ধি এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া যায়, বলে—"এই হইল এই ব্যাপা-

রের তত্ত্ব। কিন্তু তবুও সেই তত্ত্বও কার্য্য-রূপ—তাহারও পিছনে কারণশক্তি বিদ্যমান—তাহা অপরিজ্ঞেয়—সুতরাং তত্ত্বনির্ণয় হইল কি করিয়া বলা যায়? একটা গাছের সারা জন্মের ইতিহাস কার্য্যকারণ-পরম্পরার ভিতর দিয়া আলোচনা করিয়া শেষকালে বীজে আসিয়া পৌঁছিলাম—অঙ্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া ফলোৎপত্তি পর্য্যন্ত সমস্তগুলি অবস্থার পর্য্যায়ই খুঁটিয়া বলিলাম, কিন্তু তবুও বীজ হইতে কোন শক্তির বলে অঙ্কুর উৎপন্ন হইল, তাহার মীমাংসা হইবে না। জগৎ বিশ্লেষণ করিতে করিতে পরমাণুতে গিয়া পৌঁছিলাম—হয়ত সেখানে আকর্ষণ-বিকর্ষণে শক্তির দুই রূপ দেখিতে পাইলাম—কিন্তু কোন প্রেরণার বশে পরমাণু হইতে জগৎ গড়িয়া উঠিল, তাহার কোনও নির্দ্দেশ মিলিল কি? আধুনিক বিজ্ঞান "তত্ত্ব" জানিবার স্পর্দ্ধা রাখে, কিন্তু বাস্তবিক বিজ্ঞান কোনও ব্যাপারের তত্ত্ব আজও জানাইতে পারে নাই। বিজ্ঞান যাহা বলিয়াছে, তাহা শক্তির ক্রিয়ার বিবরণ মাত্র। একটা ক্রিয়ার পর আর একটা ক্রিয়াকে সাজাইয়া গেলে শক্তির প্রকাশের ইতিহাস পাওয়া যায় বটে—কিন্তু উহাই শক্তির তত্ত্ব নয়। তত্ত্ব স্বীয় অনুভূতিতে জ্ঞেয়। শক্তিকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে তাহার তত্ত্ব জানা যায় না।

স্বানুভূতিতে শক্তি আয়ত্ত হয়। উহাই তত্ত্বজ্ঞান। উহারই নামান্তর ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে ব্রহ্মের জ্ঞান—এইরূপ অর্থ করা চলে না। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান শক্তিরই জ্ঞান। অপর ব্রহ্মই শক্তি, সুতরাং এই হিসাবে শক্তির জ্ঞানকেও ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে পারি বটে। এই শক্তিজ্ঞানই মুক্তি। শক্তিকে জানি না বলিয়াই আমরা বদ্ধ—তাহাকে জানিলে অন্তরঙ্গরূপে অনুভব করিলেই মুক্ত। তাই তন্ত্র বলিতেছেন, "শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।"

এই শক্তিজ্ঞানের ইতিহাস সামবেদীয় কেনোপনিষদে সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে। শক্তি সম্বন্ধে দুইটা রহস্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কেনোপনিষৎ অতি সুন্দর ভাবে তাহাদের মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা এখানে সেই উপনিষৎপ্রতিপাদিত শক্তি-রহস্যেরই আলোচনা করিব।

শক্তির স্বরূপ জানাই হইল আসল কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা বিজ্ঞান দ্বারা যেরূপে বহির্জ্জগতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে যাই, তাহাতে শক্তির প্রকাশের ইতিহাস মাত্র গড়িয়া উঠে, শক্তির স্বরূপের সাক্ষাৎকার মিলে না। একটা কিছু অনির্ব্বচনীয় সকলের পিছনে রহিয়াছে—এই হইবে বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত—কিন্তু সে জিনিসটা যে কি, তাহা বিজ্ঞানের ভাষায় কখনই ব্যক্ত হইবে না। শুধু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেন, যে বিজ্ঞানেরই ভিত্তি পঞ্চেন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহারই এই দশা হইবে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। পঞ্চেন্দ্রিয় দৃশ্যের গ্রাহক। দৃশ্য জড়। জড়ই শক্তি নহে। শক্তি জড়ের প্রাণ। ইন্দ্রিয় তাহার কার্য্য বুঝিতে পারে মাত্র—কিন্তু তত্ত্ব বুঝিবে কি করিয়া? দ্রষ্টা আর দৃশ্যের মাঝে দৃক্‌শক্তি। ইন্দ্রিয়শক্তি স্বয়ং তাহার আভাস মাত্র। উহা যখন দৃশ্যের জ্ঞান জন্মাইতেছে, তখন উহা করণ-শক্তি মাত্র। করণ কখনও কার্য্য হইতে পারে না। এই জন্যই দৃশ্যজ্ঞানের সময় শক্তির অতীন্দ্রিয়

বিকাশের জ্ঞান হয় মাত্র—কিন্তু শক্তির স্বরূপ অজ্ঞেয়ই থাকে। করণশক্তিরূপে উহা জড়ের উদ্ভাসনের নিমিত্ত হয় মাত্র। আবার এই বহিরিন্দ্রিয়রূপ করণশক্তিকে যদি অন্তঃকরণ শক্তি দ্বারা জানিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে শক্তির জড় অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বিকাশের পরিচয় পাইব, কিন্তু শক্তির স্বরূপ আবার তাহারও অন্তরালে গুপ্ত থাকিবে। এইরূপে শক্তির স্বরূপ জানিতে হইলে ক্রমশঃ দৃশ্য হইতে ব্যাবৃত্তচক্ষু হইয়া অন্তর্মুখী হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। বিজ্ঞান এই অন্তর্মুখী সাধনা ধরে নাই—সে কেবল বহির্মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাতে তাহার শক্তির কার্য্যজ্ঞান হইবে মাত্র, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

বাহিরে শক্তি স্বরূপে খুঁজিয়া পাই না বটে, কিন্তু অন্তরে অহরহঃ তাহার সাক্ষাৎ পাইতেছি। আমি শক্তিমান—ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। শক্তির স্ফূর্ত্তিতে আনন্দ—ইহাও অনুভবসিদ্ধ। শক্তির স্বরূপ বাসনা বা ইচ্ছা—ইহাও অনুভব করিতেছি। আবার আমার মাঝেই দেখিতেছি—শক্তির দুই লীলা—বুদ্ধি আর অহঙ্কার। বহির্জ্জগতকে জ্ঞানের বিষয় করিতেছি—শক্তির বলে; ইহাই বুদ্ধির রহস্য। আবার বহির্জ্জগতকে আঘাত করিতেছি, পরিণাম ঘটাইতেছি—তাহাও শক্তির বলে। ইহা অহঙ্কারের ফল। তত্ত্ব হিসাবে বিচার নাই করিলাম, লৌকিক অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারি—যে শক্তিশালী, সে বুদ্ধিমান, সে অহঙ্কারী, তাহার ইচ্ছার বেগ দুর্দ্দমনীয়। জীবনে সকলেরই হয়ত এমন একটা মুহূর্ত্ত আসে, যখন তাহার মাঝে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আত্মাভিমানের প্রবল উচ্ছ্বাস ও ইচ্ছার প্রচণ্ড বেগ ছাড়া আর কিছুই অনুভূত হয় না—মনে হয়, এই গুলির সমষ্টিই যেন তাহার সত্তা। কর্ম্মের উন্মাদনায় তখন সে আকুল হইয়া পড়ে, তাহার ইচ্ছার সম্মুখে জগৎ সম্ভ্রমে নুইয়া পড়ে। এই তো শক্তির অন্তরঙ্গ আস্বাদন। বাহির হইতে তুমি ইহার কার্য্যগুলিই মাত্র প্রত্যক্ষ করিবে—সে সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একটা পৌর্ব্বাপর্য্যের শৃঙ্খলা দর্শন করিবে মাত্র—কিন্তু শক্তির আনন্দময় আস্বাদন, যে শক্তির পরিচালক, তাহারই মাঝে, বাহিরের দর্শকের মাঝে নয়।

কিন্তু মানুষের মাঝে স্বভাবতঃ যে শক্তির বিকাশ হয়, তাহার পরিমাণ আর কতটুকু? বাহিরে দেখিতেছি, প্রাকৃতিক শক্তি কত প্রচণ্ড। সেখানে যেন অন্ধ আবেগে জগৎ আবর্ত্তিত হইতেছে—মানুষকে সে যেন গ্রাস করিতে চাহে। কিন্তু মানুষের মাঝেও আছে অহঙ্কারের বীজ—শক্তির স্বাতন্ত্র্য! মানুষ পিছু না হটিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে—"যুদ্ধং দেহি!" এই হইল উপনিষদ্ বর্ণিত দেবতা আর অসুরের যুদ্ধ। অসুরের শক্তি দুর্জ্জেয়, প্রচণ্ড, বোধহীন, তমসাচ্ছন্ন—আপনার উন্মত্ত বেগে সে গর্জ্জিয়া চলিয়াছে—এই তো জড়প্রকৃতির রূপ। ইহাকে মানুষ বাঁধিবে—দেবশক্তির সহায়ে—সাত্ত্বিক প্রকাশ দ্বারা—জ্ঞান দ্বারা। শক্তি জ্ঞান দ্বারাই আয়ত্ত হয়। জগতে কি দেখিতে পাইতেছি? প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে যে যত জ্ঞানী, সে তেমনি বিজয়ী। অবশ্য প্রকৃতিকে এখানে খুব স্থূল অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। প্রাকৃতিক বাধা বিপ্লবের সঙ্গে লড়াই করিয়া মানুষ নিজের ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করিতেছে—কিসের সহায়ে?—একমাত্র জ্ঞান তার সহায়। জড় জগতের আইন-কানুন জানিতেছে বলিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রকৃতির শক্তিকে

আপন ইচ্ছামত খাটাইয়া লইতেছে। এইরূপে অন্তর্জ্জগতের বিধান যিনি জানিতেছেন, তিনি মূঢ় অবিবেকশক্তিকে পরাভূত করিয়া অন্তর্জ্জগতের উপর আধিপত্য লাভ করিতেছেন। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে, "তে দেবা ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি…দেবতারা মনে করিলেন, এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।" এই তো অহঙ্কার—শক্তির স্বারসিকী অনুভূতি।

এইরূপে জ্ঞান দ্বারা মানুষ শক্তিকে আয়ত্ত করিতেছে। কিন্তু লৌকিকজগতে যে ভাবে আমরা শক্তিকে আয়ত্ত করিয়াছি মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, উহাতে বাস্তবিক শক্তি কতটুকু আয়ত্ত হইতেছে? ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, কার্য্যজগতে আমাদের যে আধিপত্য, তাহার মূলে জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু সেখানেও শক্তিরই আইন মানিয়া শক্তিকে আমরা বাঁধিয়াছি কি না? একটা রোগের বীজাণু আবিষ্কার করিয়া তাহার আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিলাম। রোগের নিদানজ্ঞানদ্বারা প্রকৃতির সংহারিণী শক্তি আমার আয়ত্ত হইল বটে; কিন্তু এখানেও প্রকৃতিই অনুকূল হইয়া তাহার আর একটা গুপ্তশক্তির ভাণ্ডার আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছে—তাই আমাদের জয়লাভ সম্ভব হইয়াছে। সংহারিণী শক্তিও প্রকৃতির, রক্ষাকারিণী শক্তিও প্রকৃতির। সংহারিণীশক্তি পূর্ব্বে দুর্জ্ঞেয় ছিল বলিয়া আমরা তাহার বশে ছিলাম, এখন জানিয়া তাহার পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু আবার দুর্জ্ঞেয় রক্ষাকারিণী শক্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। মৃত্যুর রহস্য জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিলাম, কিন্তু জীবনের রহস্য তো জানিতে পারিলাম না। সেখানেও যে প্রকৃতিরই ইঙ্গিতে আমরা পরিচালিত। সুতরাং, শক্তির সাহায্যেই শক্তির একদেশ আয়ত্ত করা—প্রকৃতপক্ষে এ বিজয় কাহার? আমাদের না শক্তির? আবার উপনিষদের ভাষায় বলি, "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে—তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি—ব্রহ্মই দেবগণের হইয়া জয়লাভ করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা নিজকেই মহিমান্বিত মনে করিলেন, তাঁহারা আলোচনা করিলেন, এ বিজয় আমাদেরই—আমাদেরই এই মহিমা।"

কি অন্তর্জ্জগতে, কি বহির্জ্জগতে, সর্ব্বত্রই আমরা ঠিক এই ব্যাপারই দেখিতে পাইতেছি না কি? সর্ব্বত্রই সেই ব্রহ্মেরই বিজয়, মহাশক্তিরই জয়—অথচ আমরা অহঙ্কার করিতেছি—এই বিজয় আমাদেরই। মা ইচ্ছা করিয়া ছেলের কাছে হারিয়া যাইতেছেন—ছেলে ভাবিতেছে, আমিই হারাইয়া দিলাম। অথচ এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে, এই অহঙ্কারের লীলাটুকু মা যদি ছেলের মাঝে হইতে না দিতেন, তবে ছেলে চিরদিনের মত জড় হইয়া থাকিত—শক্তির আস্বাদন না পাইলে শক্তিকে আয়ত্ত করিবার ইচ্ছাও জাগিত না। অহঙ্কারেই তো শক্তির স্ফূর্ত্তি। তবে অহঙ্কার ক্ষুদ্র হইলে শক্তির বিকাশও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। উপনিষদের ওই উপাখ্যানটীতেই দেখিতে পাইতেছি, ব্রহ্ম কি করিয়া অগ্নি ও বায়ুর অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন—তাঁহারা দেখিলেন, যে শক্তি দ্বারা তাঁহারা বিজয়লাভ করিয়া-

ছেন, তাহা তাঁহাদের নহে—সকল সময়ই সে শক্তি তাঁহাদের ইচ্ছায় তো পরিচালিত হয় না। স্পর্দ্ধাদ্বারা তাঁহারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে গিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, জানিতে পারিলেন না—সেই যক্ষ কে? ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন। হৈমবতী উমা মনোময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহার কাছে আবির্ভূত হইয়া জানাইয়া দিলেন, সেই যক্ষ কে, কাহার শক্তিতেই বা দেবতারা বিজয় লাভ করিয়াছেন। এখানে দুইটী কথা পাইতেছি। অহঙ্কারে যে শক্তির স্ফূর্ত্তি, তাহার প্রকাশ সঙ্কুচিত, সত্যের পরীক্ষায় তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মহাশক্তিকে লাভ করা তাঁহারই অহৈতুক কৃপা-সাপেক্ষ। ইন্দ্রের অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া মা দেখা দিলেন না—দেখা দিলেন অহেতুক করুণায়। ইহার মাঝে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অভিমানের কোনও সার্থকতাই নাই। তাই চণ্ডী বলিতেছেন—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

কেনোপনিষদের উত্তরার্দ্ধ হইতে শক্তির এই রহস্য বুঝিতে পারিলাম—শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই লৌকিক জগতে আমাদের বিজয় হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বিজয় যদি আমরা আমাদেরই বলিয়া মনে করি, তবে শক্তিকে চিনিতে পারিব না—বিজয়ের অহঙ্কারও পরাভূত হইয়া যাইবে। যতক্ষণ অভিমান, ততক্ষণ শক্তির অন্তর্গত থাকিয়াই আমরা শক্তির একদেশ মাত্র জানিতে পারিব, উহা তাঁহার তত্ত্ব নহে। তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ।

অহঙ্কারে শক্তির কতটুকু স্ফূর্ত্তি ও তাহার পরিণাম কি, তাহা বলিয়াছি। এখন শক্তির আর একটী অত্যদ্ভুত রহস্যের আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শক্তি আমাদিগের মাঝে ইচ্ছার আকারে প্রকাশ পায়। কেনোপনিষদের পূর্ব্বার্দ্ধে শক্তির এই বাসনা-রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জড়জগতে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই—রূপান্তর দেখিতে পাই। বিজ্ঞান বলিতেছে, শক্তির রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু উহার সমষ্টি সর্ব্বদাই সমপরিমাণ থাকে। রূপান্তরের ফলে শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ষ্টিমের শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হইল, মানুষের কর্ম্মশক্তি তাপে রূপান্তরিত হইল—কিন্তু সর্ব্বত্রই শক্তির রূপান্তর মাত্র, উহার সমষ্টি এক। আমার ইচ্ছায় জড়জগতে যখন কোন ক্রিয়া হয়, তখন জড়ের সীমার মধ্যে শক্তিসমষ্টির কোনও ব্যত্যয় হয় না—ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু আমাকেই যদি শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই, তবে আমার ইচ্ছায় যে শক্তির বিকাশ হইল, ইহাকে কাহার রূপান্তর বলিব? এই শক্তি কি আগন্তুক? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নূতন নূতন ইচ্ছার উদ্বোধনে শক্তিসমষ্টির পরিমাণ আর তো ঠিক থাকিবে না। তাহা ছাড়া আমার শারীর ক্রিয়ার সহিত ভৌতিক ক্রিয়ার সম্বন্ধে শক্তির বিনিময় চলিবে, কিন্তু মানসিক ক্রিয়ার সহিত ভৌতিক ও শারীর ক্রিয়ার সম্বন্ধেও কি শক্তির বিনিময় হইবে? বিনিময় যে হয়, ইহার কোনও প্রমাণ আমরা পাই না—কেননা দুইটী ক্রিয়ার অধিকার স্বতন্ত্র। অথচ উভয়ে যোগ হয় কিরূপে? আধুনিক বিজ্ঞান ইহার কোনও সদুত্তর দিতে পারে নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যেক শারীর ক্রিয়ার সহিত প্রত্যেক মানস ক্রিয়ার যোগাযোগ দেখাইয়া বলিতেছেন—দুইটী ধারা সমান্তরাল হইয়া সর্ব্বদা বহিয়া চলিয়াছে। মনের

প্রত্যেক ক্রিয়া শরীরে তদনুরূপ ক্রিয়া উপস্থিত করিতেছে, আবার শরীরও বিপরীতক্রমে মনে স্বানুরূপ ক্রিয়া উপস্থিত করিতেছে। প্রাণ-শক্তি উভয়ের মাঝে যেন সেতুর কাজ করিতেছে। কিন্তু প্রাণ স্পন্দনমাত্র—উহা বাহ্য শক্তির নিয়ামক, উৎপাদক নহে। সুতরাং প্রাণের ধারা ধরিয়াও দেহে মনে শক্তি বিনিময়ের আমরা কোনও সন্ধান পাই না। শারীর ক্রিয়া ও মানস ক্রিয়া যদি দুইটী সমান্তরাল ধারা হয়, তবে কেহ কাহারও নিমিত্ত হইতে পারে না। তবে উভয়ের প্রবর্ত্তক কে?—সকলেই বলিবে ইচ্ছা। ইচ্ছার উদ্বোধক কি?—সংস্কার। সংস্কারই বা থাকে কেন?—ইচ্ছার বশে। ইচ্ছা হয় কেন?—সংস্কারবশে। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা সেই একই আবর্ত্তের মাঝে আসিয়া পড়িতেছি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাই সমস্ত মানস ক্রিয়ার মূলে আদিম ইচ্ছার সন্ধান পায় নাই—জীববিজ্ঞান শারীর ক্রিয়ার মূলে আদিম প্রাণের সন্ধান পায় নাই। কেনোপনিষদের প্রথমেই এই রহস্য প্রশ্নাকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে—কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ?—কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া এই মন ব্যাপৃত হয়? কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ?—প্রাণ কাহার সহিত যুক্ত হইয়া প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়?

এইখানে শক্তির অধ্যাত্ম রহস্য। ইচ্ছা আমারই—প্রাণও আমারই। ইচ্ছার বিকাশ প্রাণ—প্রাণ ইচ্ছার আধার। ইহাই শক্তির অন্তরঙ্গ রূপ। ইহার রহস্য কিরূপে উদ্ভেদ করিব? যদি ইচ্ছার কার্য্যকেই তাহার কারণরূপে ধরিতে যাই—তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় আসিয়া পড়িবে—ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তাই ঋষি বলিতেছেন—সংস্কারদ্বারা এই রহস্যের মীমাংসা করিতে পারিবে না—"অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি"—এই সংস্কারের জগৎকে ছাড়িয়া যাও, চিত্তকে শান্ত কর—মর্ত্যলোকের ঊর্দ্ধে অমৃতলোকে এই রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র কিছুর সাহায্যেই এই তত্ত্ব বোঝা যাইবে না। "যে বলে, ইহাকে আমি বুঝিয়াছি, সে কিছুই বোঝে নাই—যে বলে, বুঝি নাই—সে-ই বুঝিয়াছে।" অর্থাৎ ইহা স্বানুভববেদ্য, বুঝিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই—ইহা বুঝাইতে পারিব না—এই কথাই ইহাকে প্রকাশ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

ইচ্ছার রহস্য উদ্ভেদ করিবার একমাত্র সঙ্কেত—ইচ্ছার বন্ধ হইতে নিজকে নির্ম্মুক্ত রাখা। চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, মন, সমস্তই ইচ্ছার কার্য্য। এই কার্য্যের সহিত নিজকে জড়াইয়া ফেলিও না—উপনিষদের ভাষায় ইহাদিগ হইতে নিজকে অতিমুক্ত রাখ, ধীর হও। ইন্দ্রিয় ফিরিয়া তাঁহাকে পাইতেছে না, কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়কে সামর্থ্য জোগাইতেছেন—এইরূপ অন্তরাবৃত্তচক্ষু হইয়া শক্তির কার্য্য দেখিতে হইবে, তবেই শক্তির সহিত ঐকাত্ম্যানুভূতি দ্বারা শক্তির জ্ঞান জন্মিবে এইরূপ দিব্যজ্ঞানদ্বারা শক্তি আয়ত্ত হইবে। সর্ব্ববাসনাবিনির্ম্মুক্ত আমিই বাসনার আশ্রয়—ইহাই শক্তির তত্ত্বজ্ঞান—এই জ্ঞানেই মুক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদজ্ঞানই স্বরূপজ্ঞান। ইচ্ছা আমারই আনন্দের বিলাস, সুতরাং আমি ইচ্ছার অতীত—অর্থাৎ ইচ্ছা আমা হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত—আমি ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন নই। আমার অধস্তন চক্রে ইচ্ছা ক্রমে

অবর্ত্তিত হইয়া স্তরে স্তরে আনন্দের সৃষ্টি করিয়া নামিয়া যাইবে—অবশেষে জড় পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিবে। কিন্তু আমি ইহাদের মাঝে অনুস্যূত থাকিয়াও ইহাদের উর্দ্ধে থাকিব, তবেই শক্তির কার্য্যপরম্পরা আমার কাছে আর রহস্যময় বোধ হইবে না এবং ইচ্ছা বা শক্তি আমারই অন্তরঙ্গ জানিয়া তাহার স্বরূপ সম্বন্ধেও আমার জ্ঞানের অভাব হইবে না। কিন্তু নিম্নস্তরের যে কোনও একটা অভিমানে অবরুদ্ধ থাকিলে মূল বাসনা বা শক্তি আসিয়া উর্দ্ধপথ আবরিত করিয়া থাকিবে। তখন নীচের দিকের সমস্ত সমস্যার সমাধান মিলিবে, কিন্তু উপরের দিকে আর দৃষ্টি চলিবে না। তখন শক্তির আবেষ্টনের মাঝেই চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে এবং সকল প্রশ্নের উত্তরেই একটা অন্যোন্যাশ্রয়ঘটিত সমস্যা জাগিবে। কিন্তু বাসনাযুক্ত হইয়া শক্তিকে আত্মস্বরূপে জড়িত ও আশ্রিত বলিয়া অনুভব করিতে পারিলেই সকল রহস্য মীমাংসিত হইবে। ইহাই মুক্তি। শক্তির জ্ঞানেই মুক্তি। জ্ঞান বাসনার উর্দ্ধে। কেনোপনিষদের পূর্ব্বার্দ্ধে শক্তির এই রহস্যই বিবৃত রহিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ

বেদান্তসার

—*—

[ষষ্ঠ খণ্ড—অধ্যাসবাদ]

—•—

মূল

অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ, বস্তুনি অবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ। বস্তু—সচ্চিদানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি-সকলজড়সমূহঃ অবস্তু। অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি —অহম্ অজ্ঞঃ ইত্যাদ্যনুভবাৎ, "দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ান্" ইত্যাদি-শ্রুতেশ্চ। (৬)

*

অনুবাদ

যেমন রজ্জু বাস্তবিক সর্প নয়, তথাপি তাহাতে সর্পের আরোপ হইয়া থাকে, সেই রূপ বস্তুতে অবস্তুর আরোপকেই অধ্যারোপ বলে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বস্তু। অজ্ঞান হইতে সমস্ত জড়প্রপঞ্চের সমষ্টিই অবস্তু। অজ্ঞান সৎও নহে, অসৎও নহে—উহা অনির্ব্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী, অথচ ভাবস্বরূপ। অজ্ঞান যেন কি একটা কিছু—আচার্য্যেরা ইহাই বলিয়া থাকেন। "আমি অজ্ঞ" এই প্রকার অনুভূতি হইতে অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া শ্রুতিও ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"[যাঁহারা ধ্যানযোগের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অজ্ঞানকে ব্রহ্মের স্বীয় শক্তিরূপে এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে আলিঙ্গিতা রূপে দর্শন করিয়াছেন।" (শ্বেতাশ্বতর, ১৷৩) —৬

বিবৃতি—উপক্রমণিকা

বর্ত্তমান খণ্ডে বহু বিচার্য্য বিষয় রহিয়াছে। আমরা প্রথমতঃ শ্রীমৎ সুবোধিনীকারের ব্যাখ্যাটী উপক্রমণিকাস্বরূপে উপস্থিত করিলাম। ইহাতে এই খণ্ড সম্বন্ধে মোটামুটী একটা ধারণা হইবে।

পূর্ব্বখণ্ডে অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় বলিয়া দুইটী ন্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে নিবন্ধকার অধ্যারোপ ন্যায়ের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপবাদের কথা পরে বলা হইবে।

প্রথমতঃ অধ্যারোপ বা অধ্যাস কি, তাহা বুঝাইবার জন্য আচার্য্য একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের কথনও কথনও রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। তখন ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়। ব্যবহারিক জগতে আপাততঃ আমরা রজ্জুকেই বস্তু বলিয়া মানিয়া লইলাম। তাহা হইলে, আমরা যখন সর্প দেখিতেছি বলিয়া মনে করিতেছি, তখন বাস্তবিক রজ্জুই দেখিতেছি, কিন্তু সেই বাস্তব রজ্জুতে তখন কল্পিত সর্পের আরোপ করিতেছি বলিয়া আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতেছে। এখানে রজ্জুই বাস্তব, সর্প কল্পিত ও অবাস্তব।

এইরূপ জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে? আমরা জানি, জ্ঞানই খণ্ডিত হইয়া বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে। খণ্ডজ্ঞানেই বিষয় ও বিষয়ীর বোধ হইয়া থাকে—অখণ্ডজ্ঞানে এইরূপ ভেদ নাই। এই জন্য যাহা বিষয়, তাহাকেও চৈতন্য বলিতে পারি, কিন্তু উহা অখণ্ডচৈতন্য নহে—উহা অবচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত চৈতন্য। সর্ব্বত্র আমিই আমাকে খণ্ডিতরূপে জানিতেছি—ইহাই বেদান্তের রহস্য। বিষয় ও বিষয়ীতে এইরূপ খণ্ডতা বা দূরতা যতই তিরোহিত হইবে, ততই জড়বুদ্ধি নষ্ট হইয়া সম্যকজ্ঞান বিকশিত হইতে থাকিবে এবং পরিশেষে যখন সমস্ত খণ্ডজ্ঞান বা অবচ্ছেদ দূর হইয়া যাইবে, তখন একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন। উহাই বিষয় ও বিষয়ী উভয়ের পরমার্থ তত্ত্ব।

এই দিক হইতে বিষয়মাত্রকেই আমরা চৈতন্যের খণ্ডরূপ বা আবৃতরূপ বলিতে পারি। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে রজ্জু আমাদের একটী বিষয়। সুতরাং উহাও চৈতন্যের খণ্ডরূপ। এই কথাটাই দার্শনিকের পরিভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে আমরা বলিব, রজ্জুজ্ঞান অর্থে রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যের আয়ত্তীকরণ। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বরূপে আমাদের গোচরীভূত হইতেছে না—তাহা হইলে আমরা রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জানিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যে জানিতেছি না—ইহাই আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞান, একথা বুঝিতে কোনও বেগ পাইতে হয় না। এই অবিদ্যা আমাদের উপরি-উক্ত রজ্জুজ্ঞানসম্বন্ধে, সুতরাং দার্শনিক ভাষায় বলিতে পারি, এই অবিদ্যা রজ্জ্ববচ্ছিন্নচৈতন্যস্থ অবিদ্যা। অবিদ্যা চৈতন্যের আবরক। যদি উহা না থাকিত, তাহা হইলে স্বভাবতঃই আমাদের রজ্জুজ্ঞান হইত—বিষয়িচৈতন্য দ্বারা বিষয়চৈতন্যের পরিব্যাপ্তিতে কেহ বাধা দিতে পারিত না।

কিন্তু এখানে ব্যাপার আরও একটু জটিল হইয়াছে। আমরা যখন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিতেছি, তখন কেবল যে রজ্জুকে জানিতেছি না—এমন কথা নহে, আমরা রজ্জু হইতে পৃথক আর একটা বস্তু জানিতেছি—উহা সর্প। অর্থাৎ রজ্জু সম্বন্ধে অবিদ্যা কেবল মাত্র আমাদের রজ্জুজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহা তাহার স্থানে আর একটা অভিনব বিষয়ও আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। এই বিষয়টী সর্প। আবার এই সর্পজ্ঞানও যে বাস্তব, তাহা বলিতে পারি না, কেননা পরে যখন ভ্রম দূর হইয়াছে, তখন জানিয়াছি, এই সর্পজ্ঞানের কোনও বাস্তব উপাদান ছিল না। এই জন্য আমরা এমন কথাও বলিতে পারি, এই সর্পজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানের আভাস মাত্র।

জ্ঞানাভাস কোথা হইতে জন্মিল ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি - ভ্রম দূর হইলে খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ইহার কোনও বাস্তব উপাদান পাই নাই। উহার একমাত্র উপাদান বলিতে গেলে আমাদের সেই পূর্ব্বোক্ত রজ্জুজ্ঞান সম্বন্ধী অবিদ্যা। অবিদ্যাবশে আমরা রজ্জুকে তো জানিতে পারি-ই নাই, অধিকন্তু তাহার স্থলে সর্পকেই জানিয়াছি। সুতরাং বলিতে পারি, রজ্জ্বচ্ছিন্ন চৈতন্যস্থ অবিদ্যাই এই সর্পজ্ঞানাভাসের আকারে পরিণত হইয়াছে। এই কল্পিত সর্পের উপাদান কেবল মাত্র অবিদ্যা—ইহার আর কোনও বাস্তব উপাদান নাই।

এই যে সর্পাকার জ্ঞান, অবিদ্যার দিক হইতে ইহাকে বলিতেছি পরিণাম অর্থাৎ ইহার উপাদান অবিদ্যা। কিন্তু মূলে একটা রজ্জু তো ছিল- অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিয়াই না এই পরিণাম ঘটাইয়াছে। সুতরাং কারণ হিসাবে অবিদ্যার সহিত সর্পজ্ঞানের যেমন একটা সম্পর্ক আছে, সেইরূপ রজ্জুর সহিতও তাহার একটা সম্পর্ক আছে। বলা যাইতে পারে অবিদ্যা যদি সর্পজ্ঞানের উপাদান কারণ, তবে রজ্জু তাহার নিমিত্ত কারণ—নতুবা ভ্রম তো আর শূন্যে শূন্যে হয় নাই। এই হিসাবে বলিতে পারি, উল্লিখিত সর্প অবিদ্যার পরিণাম, কিন্তু রজ্জুর বিবর্ত্ত। পরিণাম আর বিবর্ত্তে ভেদ এই যে, পরিণামে তত্ত্বের বিকার হয়, কিন্তু বিবর্ত্তে তত্ত্বের বিকার হয় না। দুগ্ধ যদি দধি হয়, তবে উহাকে দুগ্ধের পরিণাম বলি। আমরা যখন দধির আকারে উহাকে ব্যবহার করিতেছি, তখন উহার কারণ দুগ্ধ স্বরূপতঃ আর উহাতে বর্ত্তমান নাই। দুগ্ধ আছে বটে, কিন্তু বিরূপ হইয়া আছে। ইহাই পরিণাম। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে অবিদ্যা সর্পাকারে পরিণত হইল, ইহাতে এই বুঝি, আমরা যখন ভ্রমবশতঃ সর্প দর্শন করিতেছি, তখন আর তাহার হেতুস্বরূপ অবিদ্যাকে স্বরূপতঃ দর্শন করিতেছি না—অথচ উক্ত সর্পজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যা রহিয়াছে। কিন্তু তখন রজ্জুর কি কোনও তত্ত্বতঃ বিকার ঘটিয়াছে ?—আমরা বলিব, না। রজ্জুজ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে মাত্র, উহার স্বরূপতঃ কোনও চ্যুতিই হয় নাই। অথচ উহাকে আশ্রয় করিয়াই অবিদ্যা সর্পজ্ঞানাকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাই বিবর্ত্ত।

রজ্জুতে যে সর্পভ্রম, উহা চিরকাল থাকে না। যখন বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিতে যাই, তখন বুঝিতে পারি, ওহো, এ তো সর্প নয়—এ যে রজ্জু! সর্পভ্রমের অধিষ্ঠান ছিল রজ্জু। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হওয়া মাত্রই রজ্জুসম্বন্ধী অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সর্পভ্রান্তিও দূর হইয়া যায়।

রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম, সেইরূপ ব্রহ্মে আমাদের জগদ্‌ভ্রম। এইরূপ বস্তুতে অবস্তুর আরোপকেই বলে অধ্যারোপ বা অধ্যাস। বেদান্তী বলিতেছেন, ব্রহ্মে জগৎ অধ্যারোপিত বা অধ্যস্ত।

যাহা বস্তু, তাহা কালত্রয়ে অবাধিত। ব্যবহারিক জগতে এরূপ বাস্তব সত্তা অহরহঃ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। যেমন পূর্ব্বোক্ত রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্তস্থলে, রজ্জু বস্তু, সর্প অবস্তু; কেননা সর্পপ্রত্যয় বাধিত হইয়াছে, কিন্তু রজ্জুকে যখন জানিয়াছি, তখন হইতে আর তাহার জ্ঞান বাধিত হয় নাই। অবশ্য এই বাধ এবং অবাধ, উপমার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই প্রযোজ্য। পরমার্থতঃ অবাধিত বস্তু বলিতে একমাত্র আত্মাকেই বুঝিব। মূলে ইহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানের পক্ষপাতী—এই জন্য ব্রহ্মের প্রত্যক্‌স্বরূপত্ব বুঝাইবার জন্য এখানে আত্মা শব্দের ব্যবহার করিলাম।

ব্রহ্ম যদি বস্তু হইলেন, তাহা হইলে অবস্তু কি?—অজ্ঞান ও তাহা হইতে প্রসূত আকাশাদি প্রপঞ্চই অবস্তু। ইহাদিগকে কেন অবস্তু বলিলাম, তাহা বুঝিতে হইলে বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে হয়। তুলনায় দেখি, ব্রহ্ম সত্য—কিন্তু ইহারা মিথ্যা, কেননা ইহারা কালত্রয়ে অবাধিত নহে; প্রপঞ্চের বিলয় হয়, কিন্তু ব্রহ্মের হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম দ্রষ্টা—ইহারা দৃশ্য। তৃতীয়তঃ—ব্রহ্ম অবিভাজ্য, অখণ্ড, অতএব নিরবয়ব, কিন্তু ইহারা সাবয়ব সুতরাং অনিত্য। চতুর্থতঃ, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ—কিন্তু ইহাদের বিকার আছে। পঞ্চমতঃ, ব্রহ্মবস্তু নির্গুণ সুতরাং প্রপঞ্চের নিরপেক্ষ হইয়া তিনি সিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু প্রপঞ্চ সগুণ বলিয়া তাহার সিদ্ধি ব্রহ্মসিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং উহা আপেক্ষিক। এই সমস্ত কারণে আমরা অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চকে অবস্তু বলিতেছি।

অজ্ঞানকে প্রপঞ্চের কারণ বলা হইয়াছে। এই অজ্ঞানের স্বরূপ কি? উহা সৎ না অসৎ? ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান হইলে এই অজ্ঞান শশকশৃঙ্গের মত মিথ্যা বা তুচ্ছ হইয়া যায়, সুতরাং ইহাকে সৎ বলা যায় না। আবার ইহাকে নিতান্ত অসৎও বলিতে পারি না—কেননা তাহা হইলে উহা প্রপঞ্চের কারণ হয় কি করিয়া? নিতান্ত অসৎ বস্তু কখনও কারণ হইতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞান সৎও নহে—অসৎও নহে। এইরূপে উহার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব বলিয়া উহাকে অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ বলা যায়।

আবার অজ্ঞানকে যদি অনির্ব্বচনীয় বলি, তাহা হইলে কেহ হয়ত মনে করিতে পারে, উহার স্বরূপ বুঝি কোনও উপায়ে জানা যায় না। সুতরাং অজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ হইতে পারে। এই জন্য আরও একটু স্থূলভাবে বলা যাইতে পারে, অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণাম্" বলিয়া অজ্ঞানকে সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

এখানে কেহ আপত্তি করিতে পারেন, "তুমি অজ্ঞানের যেরূপ সংজ্ঞা দিলে, তাহাতে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া তো কঠিন দেখিতেছি। তোমার কথাতেই পাইলাম, অজ্ঞান, অনাদি (অজ), উপনিষৎপ্রতিপাদিত

বস্তু, উহা আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিকশিত হইয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং যে বস্তুর এতখানি প্রসিদ্ধি; তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভপূর্ব্বক আমাদের সংসার-নিবৃত্তি হওয়া কি সম্ভব?" ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, "অজ্ঞানের যে এত আয়োজন-আড়ম্বর, তাহা থাকা সত্ত্বেও আত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানের সম্মুখে অজ্ঞান-প্রপঞ্চ-জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই জন্য আচার্য্য বলিতেছেন, অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "এই দৈবী মায়া গুণময়ী—ইহাকে সহজে অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে।" ভগবানের আশ্রয় লাভ করিলেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িকেরা বলিবেন, জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান। কিন্তু অজ্ঞানকে অভাবরূপে প্রতি-পাদন করা বৈদান্তিকের অভিপ্রেত নহে—কেন না বৈদান্তিক অভাবের কারণত্ব স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার অনুবন্ধ-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। [আর্য্যদর্পণ, ১৪শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।] এই জন্য আচার্য্য অজ্ঞানকে "ভাবরূপ" বলিলেন।

যদিও অজ্ঞানকে ভাবরূপ ও ত্রিগুণাত্মক বলা হইল, তথাপি—"অজ্ঞান এই প্রকার"—এমন করিয়া পিণ্ডাকারে তাহার কোনও নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। তাই আচার্য্য বলি-লেন, অজ্ঞান "যেন একটা কিছু।" তাৎপর্য্য এই, অজ্ঞান অঘটন ঘটাইতে পটু। ইহাই মায়ার স্বভাব।

অজ্ঞানকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়াছি, আবার তাহাকে অনাদি ভাবরূপও বলিতেছি। এরূপ অবস্থায় অজ্ঞান সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট প্রমাণ না দিলে ব্যাপারটা কি, তাহা কিছুই বোঝা যায় না। তাই বলা হইতেছে, অনুভবই অজ্ঞান সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। "আমি আমাকে আমি জানি না"—এইরূপ সাক্ষাৎ অনুভব হইতেই আমরা অজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাইতে পারি। তাহা ছাড়া এ সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণও মূলে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভক্তির স্বরূপ ও সাধন

—*—

শ্রীরূপগোস্বামী বলিতেছেন, ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি?—না "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"—অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। অনুশীলন বলিতে এখানে শুধু "ক্রিয়া" শব্দের মত ধাতুর অর্থমাত্র বুঝাইতেছে। ধাতুর সামান্যতঃ দুই অর্থ—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। কায়, মন এবং বাক্য দ্বারা প্রবৃত্ত্যানুকূলে অথবা নিবৃত্ত্যানুকূলে যে কোনও চেষ্টাই করি না কেন, তাহাই অনুশীলনপদবাচ্য। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এইপ্রকার আনুকূল্যসহকারে অনুশীলনই ভক্তি—ইহাই হইল ফলিতার্থ। আনুকূল্য বলিতে রুচি সহকারে প্রবৃত্তি বুঝায়। সহজ কথায়, ভক্তি বলিতে এই বুঝিব, ভগবান যখন আমাদের প্রাণ মন এমন করিয়া কাড়িয়া লইবেন যে কোনও কাজে প্রবৃত্তই হই আর নিবৃত্তই হই—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহাই করি না কেন, তাহাতেই চিত্তে রুচির উদয় হয়, প্রাণে তৃপ্তি পাই—তখনই জানিব, চিত্তে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের সাধনা বুঝি না—যেটুকু জ্ঞান রহিয়াছে, তাহা দিয়া সেই প্রাণের দোসরকেই আঁকড়িয়া ধরিতে চাই; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্মের ফলাফল বুঝি না, যে কর্ম্মশক্তিটুকু আছে, তাহা দিয়া কেবল মাত্র তাঁহারই পরিচর্য্যা করিতে চাই—চাই কেবল তাঁহাকে—আর কাহাকেও নয়—চিত্ত যখন এইরূপ অন্যাভিলাষশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাভিমানশূন্য হইয়া শ্রীভগবানের পানে ছুটিয়া যাইবে, তখনই বুঝিব, ভক্তির উদয় হইয়াছে। মহাজনেরা ইহাকে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ বলিয়া থাকেন।

এই ভক্তি যখন গাঢ় হইয়া পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা **ভাব** নামে কথিত হয়। তাই শ্রীরূপগোস্বামী আবার বলিতেছেন—

> শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
> রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

—শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষ যাহার স্বরূপ, যাহা প্রেমসূর্য্যকিরণের তুল্যচ্ছবি, শ্রীভগবানকে লাভ করিবার অভিলাষরূপ রুচি দ্বারা যাহা চিত্তকে মসৃণ করিয়া দেয়, তাহা ভাব নামে কথিত হয়।

শুদ্ধসত্ত্ব বলিতে এখানে মায়াবৃত্তি বুঝিতে হইবে না। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সম্বিদ্‌রূপা যে বৃত্তি অর্থাৎ যাহাতে ভগবানের ভগবত্তা জ্ঞান হয়, তাহাকেই এখানে শুদ্ধ সত্ত্ব বলা হইয়াছে। ভাব শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা। শুদ্ধ সত্ত্বের বিশেষ বলিতে হ্লাদিনী নামে মহাশক্তিকে বুঝায়, উহাও শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আর একটী বৃত্তি। সুতরাং ভাব শ্রীভগবানের সম্বিৎ শক্তি ও হ্লাদিনী শক্তির সারস্বরূপ। মহাজনদিগের কথায় উহা—"ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা * * হ্লাদিনীসারসমবেত-সম্বিৎসারস্বরূপা"—এই ভক্তি হ্লাদিনী শক্তি ও সম্বিৎ শক্তির সমবেতসাররূপিণী—ইহাই ভগবানকে বশ করিবার একমাত্র হেতু। শ্রীভগবান্ মায়ার বশ নহেন, কিন্তু তিনি ভক্তির বশ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, ভক্তি মায়াতীতা।

ভাবভক্তিকে হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির **সার** বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে উহা ভগবানের নিত্য পরিকরসমূহে অধিষ্ঠিত, সুতরাং উহা নিত্যসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে ভক্তির

সামান্য লক্ষণ করা হইয়াছে, ভাবভক্তি তাহারই বিশেষ প্রকাশ। (তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়তদানুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ।)

ভাবে চিত্তে রুচির উদয় হয়, অর্থাৎ ভগবানকে আপন করিয়া লইবার জন্য চিত্তে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং তাহার ফলে চিত্ত নির্ম্মল ও আর্দ্র হইয়া যায়। এই আর্দ্র চিত্তেই ক্রমে প্রেম অঙ্কুরিত হয়। তাই বলা হইতেছে, প্রেম যদি প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নসূর্য্য হয়, তাহা হইলে সূর্য্য উদিত হইবার প্রাকালে যে উষার স্নিগ্ধরাগ, তাহাই ভাব, সহজ কথায়—"ভাবঃ প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপঃ।"

এই ভাব অপ্রাকৃত, ইহাতে মোক্ষসুখও তুচ্ছ হইয়া যায়—শ্রীভগবান ইহাতে প্রকাশিত হন—ইহা ভগবানের আনন্দক। তাৎপর্য্য এই, ইহা ভগবানের স্বরূপজ্ঞানানন্দরূপ নহে, পরন্তু তাঁহার জ্ঞানানন্দশক্তিরূপ। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, সুতরাং উহা ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যদিও এই ভাবকে আমরা শ্রীভগবানের নিত্যপরিকরে অধিষ্ঠিত বলিতেছি, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার প্রপঞ্চস্থিত ভক্তগণের চিত্তবৃত্তিও নিত্যপরিজনের চিত্তবৃত্তির অনুরূপ হইতে পারে। সুতরাং একই লক্ষণে নিত্যপরিকর ও প্রপঞ্চস্থিত ভক্তের ভাবভক্তি লক্ষিত হইল।

ভাবের স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ বলা হইল। এই ভাব গাঢ় হইলে প্রেম বলিয়া কথিত হয়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিতেছেন—

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

—যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ হইয়া যায়, যাহা মমত্বের পরাকাষ্ঠাসমন্বিত, ভাবের সেই ঘনীভূত স্বরূপকেই প্রেম কহে।

ভগবানে অনন্যসাধারণ মমতা, অর্থাৎ সমস্ত চিত্ত গলিয়া গিয়া "সে আমার"—এই বোধ ছাড়া আর কোনও বোধ যখন থাকে না—তখনই প্রেমের প্রকাশ। তখন দেহ তুচ্ছ—মুক্তিসুখও তুচ্ছ।

এখন জীবহৃদয়ে কি করিয়া এই ভক্তি উন্মিষিত হইয়া পরিণামে প্রেমে পর্য্যবসিত হয়, মহাজনেরা তাহাই বলিতেছেন।—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—

ভক্তিপথের পাথেয় হইল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধি অর্থাৎ শ্রীভগবান আছেন, তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে পাওয়া জীবের পুরুষার্থ—এইপ্রকার বিশ্বাসকে বলে শ্রদ্ধা। মহাজনেরা বলেন, "কোনও ভাগ্যে কোনও জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।"—অর্থাৎ ভগবানে শ্রদ্ধা সকলের থাকে না—জোর করিয়াও শ্রদ্ধার উদয় করাইয়া দেওয়া যায় না—উহা ভাগ্যসাপেক্ষ। তাই বলিয়া হতাশ বা নিরুদ্যম হওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা জ্ঞান ও প্রেম আত্মার স্বভাব। অবিদ্যায় না হয় আজ স্বভাব আবৃত রহিয়াছে, কিন্তু একদিন উহা প্রকাশিত হইবেই—ইহা ধ্রুবসত্য। মানুষের বন্ধন কখনও চিরকালের জন্য নহে—ইহা তাহার অন্তরাত্মাই বলিয়া দিতেছেন। তবে সকলই সময়-সাপেক্ষ। ভোগ নিবৃত্তি না হইলে শ্রদ্ধার উদয় হইবে

না। রসের পরিপাক না হইলে আম্রের অম্লত্ব দূর হয় না। কাহার কখন ছুটীর হুকুম হইবে, তাহা প্রভুই জানেন। বাহির দেখিয়া ভিতরের খবর কে বলিতে পারে? তাই মহাজনেরা বলিতেছেন, বিষয়ভোগে মত্ত জীবের যে শ্রীভগবানকে মনে পড়ে—ইহা তাহার ভাগ্যবশে এবং শ্রীভগবানের অপার করুণায়।

শ্রদ্ধার উদয় হইলে তবে ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়ে স্থিতি লাভ করে। নতুবা উপদেশ সকলেই জানে, ধর্ম্মের বহিরনুষ্ঠানও অনেকে করে, কিন্তু তথাপি সারা জীবনেও তাহার ফল দেখা যায় না কেন?—শ্রদ্ধা নাই বলিয়া—বাঁধন কাটিবার সময় আসে নাই বলিয়া। মহাজনেরা তথাপি ছাড়েন না—কেননা সদ্যঃ ফল না হউক, বিলম্বে তো হইবে? আর কিছু না হউক, ভোগাসক্তির সংস্কার তো শিথিল হইবে?

কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, সে প্রাণের টানে সাধু খুঁজিয়া বেড়ায়। সাধুসঙ্গ তাহার ভবব্যাধিপীড়িত হৃদয়ের পক্ষে তখন অমৃত রসায়নস্বরূপ। ভগবানে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কিন্তু পাইবার উপায় কি? যাঁহারা পাইয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাছেই সন্ধান মিলিবে।—তাই সাধুর কাছে আসা, তাঁহার সঙ্গ করা, সেবা করা—তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের অনুশীলন—অনুকরণ করা। ভক্তি সাধনার এই দ্বিতীয় স্তর।

কি করিয়া ভক্তির সাধন করিতে হয়, তাহা সাধুই শিখাইয়া দেন। এখনও হয়ত প্রাণে দোটানা ভাব রহিয়াছে—এক একবার বিষয়ের দিকে মন ছুটিয়া যায়; কিন্তু গুরু বুঝিয়াছেন, এ আকর্ষণ বিষয়ের মরণ-কামড় মাত্র। তাই রুচি না হইলেও বাধ্য করিয়া তিনি শিষ্যকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনে প্রবৃত্ত করান। "রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।"—ইহাই ভজনক্রিয়া। সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে ইহা পূর্ব্বেই সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রকার বৈধীমার্গে ভজনের ফলে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ যে সমস্ত অবিদ্যাবৃত্তি অন্তরে নিহিত ছিল, তাহা দূর হইয়া যায়। এইরূপে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে চিত্তে ভক্তিবিষয়ে নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়। তখন আর হালচাল হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয় না—একটা সুদৃঢ় অবলম্বন পাইয়া চিত্ত তখন নিশ্চিন্ত ও একাগ্র হয়।

নিষ্ঠা হইতেই রুচি উৎপন্ন হয়। তখন আর জোর করিয়া সাধন করাইতে হয় না—ভক্তিরসের আস্বাদন পাইয়া ভক্ত তখন আপনা হইতেই সাধন লইয়া থাকিতে ভালবাসে। যেমন ক্রীড়ামত্ত বালককে জননী বলপূর্ব্বক ধরিয়া মুখে কোনও মিষ্ট দ্রব্য পুরিয়া দিতে গেলে প্রথমতঃ সে ঘোরতর আপত্তি করে, কিন্তু একবার মিষ্ট আস্বাদ পাইলেই শান্ত হইয়া উহা লেহনে প্রবৃত্ত হয়—সাধকেরও তখন এইরূপ অবস্থা হয়।

রুচি গাঢ় হইলেই আসক্তি হয়। রুচি আর আসক্তিতে পার্থক্য এই—রুচি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা—অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া তখনও তাহাতে একটু ইষ্টানিষ্টবিচারপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু আসক্তি স্বাভাবিক—ইহাতে আর বিচারবুদ্ধি নাই। এইবার সাধক স্রোতের টানে সচ্চিদানন্দসাগরের দিকে ভাসিয়া যাইতে থাকেন।

আসক্তি হইতে চিত্তে ভাব জন্মিয়া থাকে।

ভাবের অপর নাম রতি। ইহার লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥"

শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমমহাধন॥

ইহার মধ্যে সম্বন্ধতত্ত্ব ও অভিধেয়তত্ত্ব "শ্রীশ্রীরূপসনাতন" প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেমভক্তিরসের দিঙ্‌নির্দ্দেশমাত্র করা হইল। শ্রীগুরুর কৃপা হইলে আমরা পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে ইহা আরও বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিব।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৩

কর্ম্মের ফলাফলের বোঝা যখন আমি নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লই অর্থাৎ ভগবানকে যখন আমা হইতে দূরে ছুঁড়িয়া মোহের ক্রীড়নক হইয়া পড়ি—তখনই জগতের মাঝে নিজের ব্যর্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাই। ইহার নামই হইল অভিমান। ইহার পাকে জড়াইয়া পড়িয়াই মানুষ নিজকে জগতে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া মনে করে। কাজেই ইহাই পাপ। শুধু দেখাইয়া বেড়ানোতেই কৃতিত্বের সাফল্য নয়—ফলাফল তাঁহাতে সঁপিয়া দিয়া নিমিত্তমাত্র হইয়া কর্ম্ম করাতেই কৃতিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ও তাহাই তাহার প্রধান পরিচয়—কামনাবিহীন কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত কৃতিত্বেই কর্ত্তার সাফল্যের চরম পরিণতি। ইহাই হইল কর্ম্মযোগ—ইহা মুক্তিরও অপরিপন্থী।

*

"বয়ম সূর্য্যোচা অতিথয়ঃ"—সূর্য্যদ্বারা দিনের পর দিন আমরা উচ্চ হব!—আমাদের তেজ হবে অসীম—সাহস হবে দুর্জ্জয়—সঙ্কল্প হবে অটল—মন হবে অসীম, আনন্দময়;—কিন্তু আজ এ সব পৌরুষ তোর কোথা গেল?—সবই যে অতল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত করে আশাপথ চেয়ে তুই বসে ছিলি—কেবল কল্পনার রোমন্থনকেই জীবনের সার বলে ভেবেছিলি—আজ ক্ষুদ্র এই কামনার ফুৎকারে কোথায় গেল তোর সেই কল্পনার আকাশ কুসুমের সুরভিনিঃশ্বাস? কিন্তু তা বলে ভাবনা করা চলবে না!—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—অতএব, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত!

*

তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও—তাঁর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি আপনিই করিবেন

—তোমাকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে না। তুমি যাহাই কর না কেন—তাহার ফল অব্যর্থ। এ জগতে অতি ক্ষুদ্র একটী চেষ্টাও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা নাই—চেষ্টা প্রয়োগ করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া একদিন না একদিন হইবেই হইবে। কাজেই তুমি যদি কিছু করিয়াই ফল পাইবার আশায় তাঁহার কর্ত্তব্যের প্রতীক্ষায় নিজের চেষ্টাকে স্থগিত রাখ, তবে এই স্থগিত রাখার ফলটাই হয়ত তোমাকে আগে পাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি নিরাশ হও—তাঁহাকে অবিশ্বাস কর, তবে পূর্ব্বকৃতের ফল পাইলেও হয়ত তাহা তোমার কাছে ব্যর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কাজেই প্রকৃত ফললাভ যদি করিতে চাও, তবে আগে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস কর—তোমার কর্ত্তব্যের ফল তখন আপনা হইতেই আসিয়া তোমাকে সহস্র বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। নিরাশ হইও না—সত্যকে হারাইবার বিন্দুমাত্র ভয়ও করিও না। কেননা তিনি স্বমুখেই বলিয়াছেন,—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

*

স্বভাবে থাক। তোমার সমস্ত চেষ্টা, সাধনা, তপস্যা, সকলই স্বাভাবিকতার মাঝে মিলিয়ে যাক্—সঙ্কীর্ণতা এসে যেন তাদের অবরুদ্ধ না করে। তোমার চেষ্টাকে তোমার বলে মনে করাই তো অভিমান। চেষ্টার ভিতরেও যে তাঁরই প্রেরণা, তাঁরই ইচ্ছা—এ যদি তুমি বুঝ্‌তে পার, তবে তোমার মাঝে অস্বাভাবিক বলে আর কি থাকতে পারে? তখন যে তোমার শ্রম বলে কিছু জগতে থাকতে পারে না—জীবনটাই তখন যে তোমার কাছে একটা অখণ্ড বিশ্রাম ও আনন্দের খনি। যতক্ষণ নিজকে নিজের কর্ত্তা বলে মনে করছ, ততক্ষণই শ্রমে তোমার বিশ্রামের দরকার। কিন্তু যখন জানলে—তোমার ইচ্ছা, তোমার চেষ্টা, তোমার যা কিছু সমস্তের প্রচোদক এক মাত্র তিনিই, একমাত্র কর্ত্তাও তিনিই—তখন তুমি আর বিশ্রাম দিবে কাকে?

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম—সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমান মাসেই পুরীধাম হইতে মঠাভিমুখে যাত্রা করিবেন। বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে তিনি অত্র মঠে পদার্পণ করিবেন।

উৎসব—সংবাদ

বিগত ২৯শে শ্রাবণ তারিখে অত্র মঠে শ্রীমৎ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত তিথিতে ঢাকা—জয়দেবপুর সারস্বত আশ্রমে ঢাকা বিভাগের শিষ্যভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক, বগুড়া—শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে তত্রত্য শিষ্যভক্তগণকর্ত্তৃক, কলিকাতা—৮নং রাজা কালীকিশনলেনাস্থিত শ্রীশ্রীজয়গুরু সেবাসঙ্ঘ কর্ত্তৃক এবং নীরখোত, উচাগন ও কুচবিহারস্থ ভক্তমণ্ডলীকর্ত্তৃক শ্রীমৎ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসবও ঐ দিবসে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবারকার উৎসব সর্ব্বত্রই অধিকতর আনন্দ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ জানাইতেছেন—

"ভাওয়াল সারস্বত-আশ্রমে ২৯শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের

জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকা জেলার ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মহাদেবপুর, ময়মনসিংহ জেলার কালীবাড়ী, দত্তের বাজার, ঋগড়ার চড় প্রভৃতি স্থানের শিষ্যগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।"

উৎসবে সাহায্যপ্রাপ্তি

জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমরা মঠে নিম্নলিখিত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি—সন্দীপস্থ ভক্তবৃন্দ ১০৲, শ্রীযুক্ত তারানাথ দাস মণ্ডল ৫৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ শী ২৲, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সিংহ ২৲, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র প্রামাণিক ২৲, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভৌমিক ২৲ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার নাগ ১৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্র নাথ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ১৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার ১৲, শ্রীমতী গগনতারা কর্ম্মকার ১৲, শ্রীমতী নবদুর্গা কর্ম্মকার ১৲, শ্রীমতী কৌশল্যাসুন্দরী কর্ম্মকার ॥০, শ্রীমতী জগদীশ্বরী কর্ম্মকার ॥০, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র সরকার ॥০, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার দাস ॥০, শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেব্যা ॥০, শ্রীযুক্তা উত্তমাসুন্দরী দেব্যা ॥০, শ্রীমতী যশোদাকুমারী ঘোষ ।০, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস ।০, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দলই ১৴০, শ্রীযুক্ত হরিনাথ কর ২৲।

ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমের উৎসবে—

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় ২৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ১৲, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দে দ্রব্যাদি ও নগদে ৭॥০, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দে ১৲, শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র দে ১৲, শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র দাস ১৲, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর ধর ॥০, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী ২৲, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার ১৲ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সিংহ ২৲, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মোদক ২৲, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ অধিকারী ১৲, শ্রীযুক্ত আদিনাথ সূত্রধর ১৲, শ্রীযুক্ত রাজমোহন দে ১৲, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বসু ২৲, শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী ১৲, জনৈকা মহিলা নগদ ও দ্রব্যাদিতে ৩৲।

গ্রন্থপরিচয়

সমাজ সংরক্ষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্রমহোদয়ের প্রতি সম্মানার্থ কাশী ব্রাহ্মণরক্ষাসভার বিশেষ অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী এবং উক্ত সভাতে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর প্রদত্ত হিন্দী বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ। মূল্য ৵০ আনা। মিশ্রমহোদয় সমাজ সংরক্ষণকল্পে পুনঃ পুনঃ যে ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এই বক্তৃতাতে রাজা বাহাদুর মিশ্রমহাশয়ের কার্য্যকলাপের প্রশংসা ও প্রসঙ্গক্রমে অধুনা বিলাতী ফ্যাসনে সমাজ সংস্কারচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। রাজাবাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন—

"বহু শতাব্দীব্যাপী সমাজের ভিতরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন কিছুই নাই, এমন কথা আমি বলিতেছি না। দোষ অল্পবিস্তর সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই আছে। এই সকল নিরাকরণের প্রয়োজন হইছে এবং ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াও এ সময় এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবল সামাজিক কথা লইয়া নূতন নানা গোলযোগ সৃষ্টি করা যে এ দেশের পক্ষে কল্যাণজনক নহে, ইহাই আমি বলিতে চাহি। * * ভাঙ্গা সমাজ গৃহ মেরামত করিয়া লইতে যে যে মালমশল্লা সংগ্রহের প্রয়োজন, যতটুকু দেহবল লাভের আবশ্যক, আগে তাহাই আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। রাজনৈতিক শক্তি আয়ত্ত দ্বারাই এই বল আমরা লাভ করিতে পারি। ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন দ্বারাই কেবল ইহা সংঘটিতে পারে। এই দিকেই এখন আমাদের কর্ম্মশক্তি পূর্ণ মাত্রায় নিয়োজিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে, সমাজ সংস্কারের কথা লইয়া একটা বৃথা বাজে আন্দোলন তুলিয়া আমাদের চিত্তকে দ্বিধা বিভক্ত করা কখনই সঙ্গত নহে।"

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } আশ্বিন { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্ত্বা কুলপথং
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায়মহসা।
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং
স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনগিরিকন্যে তুলয়িতুং
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ।
যদালোকৌৎসুক্যাদমরললনা যান্তি মনসা
তপোভির্দুষ্প্রাপ্যমপি গিরিশসাযুজ্যপদবীম্॥

নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্ম্মসু জড়ং
তবাপাঙ্গালোকে পতিতমনুধাবন্তি শতশঃ।
গলদ্বেণীবন্ধাঃ কুচকলসবিস্রস্তশিচয়া
হঠাৎ ত্রুট্যৎকাঞ্চ্যো বিগলিতদুকূলা যুবতয়ঃ

মূলাধারে রহে ধরা, স্বাধিষ্ঠানে রয়েছে জীবন,
মণিপুরে হুতাশন, কণ্ঠে ব্যোম, হৃদয়ে পবন;—
ভ্রূমাঝারে আছে মন ;—কুলপথ ভেদিয়া সকল
সহস্রার পদ্মে, মাগো, শিব-সহ বিহর কেবল।

চরণযুগল হ'তে বিগলিত সুধাধারাসারে
সিঞ্চিয়া প্রপঞ্চ, মাগো, পুনরায় ফির মূলাধারে ;—
বেষ্টিয়া বলয়াকারে দীপ্তরূপা ভুজগের মত—
কুলকুণ্ডকুহরে মা সুখসুপ্তা রয়েছ সতত।

হিমগিরিসুতা, হেরি ওই তব সৌন্দর্য্য-পাথার,
বিরিঞ্চি কবীন্দ্র, তবু তুলনার নাহি পায় পার ;
অনুরাগে সুরবালা ধ্যান করি ওই রূপ তোর,
শিবের সাযুজ্য লভে—তপে যার নাহি মিলে ওর।

অরসিক বৃদ্ধ নর—চোখে যারে নাহি লাগে ভালো,
তারো 'পরে পড়ে যদি দেবি তব অপাঙ্গের আলো—
কত যে তরুণী ধায়—সরে যায় বুকের অঞ্চল—
টুটে কাঞ্চী, বেণীবন্ধ—খসে পড়ে দুকূল চঞ্চল।

মাতৃপূজা

বোধন

মা, তুই আজ জাগ্‌বি মা—এ কথা কি সত্য? তুই জাগ্‌বি না আমরা জাগ্‌ব? এতদিন আমরাই তো ঘুমিয়েছিলাম—আজ তোর ডাকেই না জেগে উঠ্‌ব! তুই যে চিরকাল আমাদের মোহশয্যার পাশে বিনিদ্র করুণ আঁখি দুটী নিয়ে বসে অনুক্ষণ আমাদের নিরাশার আঁধারে আশাদীপটীর মত জ্বল্‌ছিস্—তার স্নেহনিষিক্ত কিরণ-সম্পাতে আমাদের মুগ্ধদেহে আনন্দ ফুটিয়ে তুল্‌ছিস্—এই না তোর প্রকৃত লীলা? তবে আমরা তোকে জাগাতে যাই মা কোন্ সাহসে?

একদিন ডাকব বলে চিরদিন তোকে আড়ালে রেখে রেখে এসেছিলাম। তাও যদি "আড়ালে রেখেছি" এ কথাটুকু মনে থাকৃত—তবুও প্রাণে একটা তৃপ্তি পেতাম। কেননা তোকে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছে, এ কথা যে জান্‌তে পারে—তার মত সৌভাগ্যবান্, তার মত আনন্দময় এ বিশ্বে আর কেউ নয়। কিন্তু আমাদের যে সে ভাগ্য নাই, মা—আমরা যে মাকে পেয়েছি, পেয়ে হারিয়েছি—হারিয়েও আবার একেবারে ভুলে গিয়েছি। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, এর চেয়ে নিরানন্দ আর জগতে কি থাকতে পারে?

কিন্তু এই নিরানন্দই যে আনন্দময়ীকে পাবার পথ আমাদের বলে দিয়েছে। তোকে ভুলে গিয়েছিলাম বলেই আজ আপ্তজনের বোধনগীতিতে প্রাণে আমাদের স্পন্দন উঠেছে—কোন্ অজানা অচেনা হারানিধিকে আবার ফিরে পাবার জন্ম ব্যথাতুর হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে। এ আকুল আবেগের ফল তুই-ই আমাদের দিয়েছিস্ মা—আজ আমাদের মোহের ঘোর কেটে গিয়েছে—তাই আমরা জান্‌তে পেরেছি মা, তুই আছিস্। তুই না থাকলে এই যে আবেগ, এই যে প্রাণভরা আকর্ষণ—এ আস্‌বে কোথা হতে? আমাদের সকল আবেগ-আকাঙ্ক্ষার চরম যে তুই মা—তাই যে মুহূর্ত্তে তোর আকর্ষণ বুঝেছি, সেই মুহূর্ত্তেই জেগে উঠেছি।

এরই নাম মা তোর বোধন। তুই আমাদের হারানো নিধি, ভুলে-যাওয়া নিধি, তোর সন্ধান আমরা পেয়েছি—তাই এর নাম দিয়েছি মা তোর "বোধন।" এ আনন্দের জাগরণ আমাদেরই—কিন্তু আমরা যে কখন জাগি, কখন ঘুমাই, জানি না মা—তুই যখন আমাদের নিরানন্দনিদ্রিত দেহের মাঝে আনন্দের জাগরণ এনে দিস্, তখনই আমরা তোকে দেখে বলি—"মা মা, এই তো তুই জেগেছিস্—এতদিন কি তবে তুই ঘুমিয়ে ছিলি মা?"

সপ্তমী

মা সকলের মনেই আনন্দ দেন—তবে কেন সকলেই তা অনুভব করে না?…নিজের মনকে যে ঐ ধ্যানে মিলিয়ে দেয়, সেই সে আনন্দলোকে গিয়ে উপস্থিত হয়। যে তা পারে না, কাজের মাঝে শুধু কাজেরই দেখা যে পায়—সে-ই সে আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়। তাই তার কর্ম্মের শক্তি ফুরিয়ে যায়—তখন

কর্ম্মে বিরক্তি আসে। কর্ম্মের মাঝ দিয়ে তোকে না পেলে যে শ্রান্তি আমাদের ঘুচে না মা—তাই আমরা কর্ম্মময়ী মূর্ত্তিতেই তোকে অনুভব করতে চাই।

কাজ করতে করতে কাজ তো আপনা হতেই অভ্যাসযোগে দেহের অধীন হয়ে আসে। তখন চেষ্টা করতে হয়, মনটাকে কাজ থেকে সরিয়ে মায়ের ধ্যানে নিবিষ্ট রাখতে। এমনি করে ধ্যান করতে করতে যখন মা ছাড়া আর কিছুই জ্ঞান থাকে না, তখনই পূর্ণ আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে তিনি অন্তরে ফুটে ওঠেন—তখন শুধু একটা আনন্দের অনুভূতি ছাড়া আর কোন বস্তু আমার মাঝে থাকে না। বিশ্ব ব্যাপে তখন শুধু ঐ ধ্যানমূর্ত্তি—বিশ্বধারিণী বিশ্বজননীর আনন্দজ্যোতিঃ—নিরন্তর যার স্পর্শপুলকে জগতে আনন্দের ফুল ফুটে উঠছে। মা গো, এই তো তুই আমাদের মাঝে অন্তরের অন্তরে গোপন হয়ে আছিস মা! তবে কেন এমন করে তোকে বাইরে খুঁজে বেড়াই?

আজ জগতের শোভার তুলনা নাই—যা দেখবে, তাই তোমার কাছে আনন্দের প্রতীক হয়ে দেখা দিবে। আজ একটী ফোটা ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখ, তাতে তোমার মনে যেমন ভাব আসবে, তেমন ভাব আর কোন দিন হয়ত তোমার ভিতর আসেনি। কেননা দৃষ্টি তোমার আজ মায়ের স্পর্শ পেয়েছে—ইন্দ্রিয় তোমার আজ মায়ের তেজে শক্তিময় হয়ে উঠেছে—তাই ভোগের জিনিষে আজ আর মোহ আসবে না—জাগবে শুধু তাঁর স্মৃতি আর আনবে শুধু আনন্দ! এ শুধু ভাবের কথা নয়—এ কথার মাঝে প্রাণের সাড়া আছে। মায়ের শক্তির বিকাশ আজ আপনা হতেই দশদিক পূর্ণ করেছে। তাঁর ধ্যানে নীরব নিথর হতে পারলে তাঁর সন্ধান পাবে। খাঁটী মন নিয়ে যদি মজতে পার—তবে এই বিশ্বভরা সৌন্দর্য্যের মাঝ দিয়েই মায়ের পূজার সার্থকতা উপলব্ধি করবে।

দশদিকে যে "মায়ের পূজা" বলে আজ একটা আনন্দের কোলাহল উঠেছে—এর মাঝে একটা অনির্দ্দেশ্য ভাষাও আছে। যে মায়ের ধ্যানে মনকে লয় করে দিতে পারবে—সেই ঐ অব্যক্ত বাণী শুনতে পাবে। যদি সাহস থাকে, ধৈর্য্য থাকে—তবে আমরা ঐ অব্যক্তকে ব্যক্ত দেখতে পাবে—নিজের মাঝে এবং জগতের মাঝে। নির্ব্বিকার থাকলে সারা বছরই শুনতে পাবে—তবে একদিন তার সহজই বিকাশ, অতি অল্প চেষ্টাতেই ভিতরে তা স্ফূর্ত্ত হবে—এই হল মায়ের পূজার বিশেষত্ব।

মায়ের সেবা করে সার্থক হতে চাও—না তাঁর কাছে বসে জীবন সার্থক করতে চাও? তাঁর সেবা করে যে সার্থক হয়, সে-ই বীর সাধক—নইলে কাছে বসে থাকতে থাকতে মনে হতে পারে, তুমি কর্ত্তব্যের কাছে বন্দী। কর্ত্তব্য ভেবে তাঁর পূজা করলে যে প্রাণে তৃপ্তি আসে না—যখন শুধু-শুধুই প্রাণ মন তাঁর পায়ে ঢেলে দিতে পারি, তখনই অসীম আনন্দে জগৎ আমার কাছে পূর্ণ হয়ে উঠে। আমরা যে কর্ত্তব্যের মাঝ দিয়েই তার পরপারে তোর সাক্ষাৎ পেতে চাই মা—তাই কর্ম্মের পথও তোকে এসে আচ্ছাদন করে রইতে হয়।

অষ্টমী

আমার কাছে যা আছে, সবই তো তোর মা;—তবে কেন আমার অভিমান দিয়ে তাদের তুই আগলে রাখতে দিস্? তোর জিনিষে কি আমারও মা তোরই মত অধিকার?—সেইটুকুই যে অনুভব করতে পারি না—নইলে কে আর তোর অপেক্ষায় থাকত?—তোর মাঝে যে আমি লীন হয়ে যেতাম—তুজনের মাঝে কি আর আড়াল থাকত কিছুর?

তোর রাঙ্গা পায়ে যে আজ আমি আমাকে অঞ্জলি দেব মা—তুই কেন তাতে বাধা দিস্? তুই যদি অধিকার না দিলি, তবে শক্তি কোথা পাব বল্? তুই আমায় সবই দিয়েছিস্—সে "সব" আমি চাই না—আমাকেও আমি চাই না—তোর ধন তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা—আর আমায় তাতে বাঁধিস্ না মা! বুঝি মা, এ তোর পরীক্ষা—পরীক্ষা নইলে তোর মহিমা অনুভব করতে আমরা পারব না। কিন্তু আজ কি সে সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে—যাতে সকল বন্ধন ছেদ করে মুক্ত হয়ে সকলকে নিয়ে তোর পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারি। আমি কিছুই জানি না, কিছু বুঝতেও পারছি না—তোর যা খুসী তা তুই আমাকে দিয়ে করিয়ে নে—আর আমি তোকে কিছু বলবার পথ রাখতে চাই না;—সব পথ অপথ মিশিয়ে একাকার করে তার মাঝে ছড়িয়ে পড়বার অধিকার দে শুধু—একবার তোকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বপ্রাণের ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে অনুভব করি মা!

আজ আমার জীবন ধন্য মা—তোরই পূজার তরে রাঙ্গাজবা আজ আমি আর বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে পারলাম না—আমার হৃদয়ে, আমার আঁখিতেই তা তুই ফুটিয়ে তুললি! তুই সে অঞ্জলি নিলি কি না নিলি, তা তুই-ই জানিস্; শুধু আমার এ তৃষিত হৃদয়ের মাঝে ক্ষণেকের তরেও যে আনন্দটুকু তুই ঢেলে দিয়েছিলি, তাই আমি জানি। মা গো, শক্তি দে, ধৈর্য্য দে—দিনে দিনে তোকে যেন এমনি করে অশ্রুধারার মাঝ দিয়ে ক্ষণেকের তরেও হৃদয়ে অনুভব করতে পাই—বাইরের অভিমান এসে যেন এ গৌরবের অঙ্গসজ্জা হয়ে না দাঁড়ায়!

তুই-ই তো মা অভয় দিলি, তোর বরাভয়কর স্পর্শে আমার হৃদয়ের সকল গ্লানি হরে নিলি! বাইরের অঞ্জলি তোকে আজ দিইনি, সেই এক দুঃখ ছিল, তাও তুই আশা দিয়ে আনন্দ দিয়ে প্লাবিত করে দিলি। আমি অনধিকারী ছিলাম, তাই না মা আমার উপর আজ তোর এত পরীক্ষা? কিন্তু সে বাঁধনও যে আবার তোরই পরশে মুক্তি পেল। এত দয়া তোর মা, তবুও কেন তোর এ অভাগা সন্তান এতে অবিশ্বাসী? মাগো, প্রাণে বিশ্বাস দে, ভক্তি দে, শক্তি দে—তোর বর্ষ-বিদায়ের দিনেই মা তোকে আমি আমার হৃদিপদ্মাসনে আবাহন করে বসাব। মনপ্রাণ শুদ্ধ করে দে, তাই দিয়ে তোর আরতি করব এ অশুদ্ধ দেহকে ফুলের মত নিষ্কলুষ করে দে, তাই নিয়ে ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে তোর রাঙাপায়ে আমি অঞ্জলি হব মা!

*

নবমী

আজ ভক্তের আহ্বানে মা আমার পাগল হয়ে ছুটে এসেছেন—বিশ্বরূপে বিশ্ব আলো করে আজ স্বপ্রকাশ হয়েছেন। আজ আমার জন্ম সার্থক মা—ক্ষণেকের তরেও যে তোর দেখা পেয়েছি, তাতেই আমি ধন্য, তাতেই আমি পূর্ণ! কোথায় ছিলি মা তখন —যখন তোর অভাগা সন্তান তোর ধন পেয়ে তোকে ভুলে ব্যসনে মত্ত হয়ে ছিল? মাগো, ধন্য তোর লীলাখেলা—এমনি করেই তুই বুঝি তৃষিত মরুতে রসাল পারিজাত ফুটিয়ে তুলিস্, নন্দনের আনন্দধারা বইয়ে দিস্ মা? জয় মা তোর আনন্দের জয়!

মা গো আনন্দময়ী, আজ অন্তরে-বাইরে সকল দিকের সকল সুখ দুঃখকে প্লাবিত করে অসীম আনন্দে আমার তুই ডুবিয়ে দিয়েছিস্—এমন আনন্দ যে আর কোথাও কখনো পাইনি মা! মাগো আজ আহারে-বিহারে, সাধনে-ভজনে, স্তুতিতে-নামগানে, সকল সময়েই যেমন সঙ্গীরূপে তোর আনন্দকে পেয়েছি, এমনি করে জীবন ভরে তোর অরূপ রূপে যেন অন্তরকে আমার পূর্ণ দেখ্‌তে পাই—অভাব এসে, দৈন্য এসে যেন সে আনন্দকে কখনো আচ্ছাদন না করে মা।

মাগো, এমনি করে জ্ঞানে-অজ্ঞানে সকল অবস্থাতেই তুই আমাদের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে থাক্ মা—নইলে যে অবস্থাবিপাকে পড়ে তোর কথা আমরা ভুলে যাই। জ্ঞান-অজ্ঞান সবই তো মা তোর হাতেগড়া খেলার পুতুল—কেন তাদের মাঝে আমাদের মজিয়ে দিয়ে তুই আড়াল হয়ে থাকিস্ মা? চাই না তোর জ্ঞান, চাই না তোর অজ্ঞান—জ্ঞানে অভিমান আছে, অজ্ঞানে মোহ আছে—এদের হাত থেকে উদ্ধার করে শুধু তোর ঐ অভয়চরণ দুটীকেই বক্ষে ধারণ করবার অধিকার দে—এ ছাড়া আর কিছুই তোর কাছে চাই না মা। আমার সকল চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়ে তার মাঝে অসীমরূপে তুই বিরাজ কর্ মা—আমি যে চাইতে জানি, পেতে জানি, এ কথা আমায় ভুলিয়ে দে! যা দিয়ে তোকে চাইব, তাও যে তুই-ই মা—যা চাইব, তাও যে তুই মা—যে চাইবে, সেও যে তোরই মা! তবে আর ভাব ছাড়া অভাব কোথায় বিশ্বে, যার জন্য আমাদের ভাব্‌তে হবে?

বিজয়া

জয় মা আনন্দময়ী, তোরই আজ জয় হোক্। সারাদিনের খেলা ধূলার পর তোরই জয়গাথা হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলতে বসেছি;—সার্থক যেন করিস মা এ খেলা। তোরই লীলার মাঝে যেন এ খেলার অবসান হয়।

সারা দিন আজ রাশ ছেড়ে দিয়ে চলেছি—অথচ বাধা পাইনি কিছুতেই। তুই দেহে মনে-প্রাণে যা জাগিয়ে দিয়েছিস্ মা, তাইতে আজ নিজকে এলিয়ে দিয়ে নির্ব্বিকার হয়ে তোর আনন্দ স্রোতে ভেসে চলেছি—তোর পূজার উপচার সংগ্রহ করেছি। প্রাণ ভরে আজ তোর তরে সকলি জুটিয়ে রেখেছিলাম—তুই সবি নিয়েছিস্। কিন্তু মা আমার হৃদয় রিক্ত হয়নি কিছুতেই—অসীম পূর্ণতা এসে সকল রিক্ত স্থান অধিকার করে তোর অপার মহিমা প্রচার করছে।

তুই এসে আপনা হতে বুকে করবি, এই তো মা চাই—এ নইলে তোকে পূজা করবার অধিকার কি আমাদের? যে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

অন্তরে বাহিরে পূর্ণভাবে তোকে মা পেয়েছি, কি উৎকণ্ঠায় যে সময়টুকু কেটেছে বলবার নয়। সমস্ত সময় কেবল প্রাণে মনে খুঁজে বেড়িয়েছি—কোথা গেল সেই আনন্দময়ীর আনন্দস্পর্শ—আমার প্রেমাশ্রুসিধৌত মৌন ভাবরাশি দিয়ে যাকে অনুভব করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছিলাম। বুঝেছি—এত ব্যাকুলতার মাঝেও এতদিন আমার চঞ্চলতা ছিল, আত্মনিবেদনে আমার শিথিলতা ছিল—তাই মা আজ আমার সকল শক্তি হরে নিয়ে অকূল পাথারে ভাসিয়ে আমার হৃদয় পরীক্ষা করছেন। তুই-ই জানিস্ মা এ পরীক্ষার চরম কি—আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তোর পায়ে সঁপে দিয়ে, আমার আমিকে বিসর্জ্জন দিয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই মা—আমায় এমনি করেই তুই নীরব নিশ্চিন্ত করে দিস্ শুধু। এর বেশী আর কিছু আমি তোকে বলতে পারি না মা।

আজ ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেকবুদ্ধি—সকলের মূলে জলাঞ্জলি দিয়ে তোর পূজা করতে বসেছি মা; প্রাণে একান্ত আশা তোর পূজা করতে তুই-ই আমাকে ভক্তি দিবি, শ্রদ্ধা দিবি, একাগ্রতা দিবি—আজ তোকে দিয়েই তোর পূজা করব, এই আমার প্রাণের আশা। মা গো, আমি যে আত্মহারা হতে পারিনি আজও, তাই বলে কি আমায় তুই কর্ত্তব্যহারা করবি? আমি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বুঝি না মা, ন্যায় অন্যায় বুঝি না মা—আমায় দিয়ে যেমন করে পারিস্, তেমন করে তোর সেবা করিয়ে নে। আমি বিবেক দিয়ে তোকে বিচার করতে চাই না—প্রমাণ দিয়ে তোকে বুঝতে চাই না—আমি শুধু তোকে জানি—জানি না জানি, তোকে ভালবাসি। তোকে ভালবাসি—সে ভালবাসাও তুই-ই—যেদিকেই বিচার করতে যাই, সেদিকেই গিয়ে দেখি—চরমে আছিস্ শুধু তুই—জগতের সকল ভালবাসা, সকল জ্ঞান বিচার, সকল ভাবের মূর্ত্তি ধরে এক হয়ে আছিস্ শুধু তুই। তাই আজ শুধু তোকেই চাই মা। অন্য কিছু চাইতে গেলেও দেখি তোকেই চাওয়া হয়ে যায়—তাই অন্য কিছু চাইতেও জানি না। চাওয়া-পাওয়া সবই যে তোর মাঝে মা—তাই জগতে তোকে যে চায়, তার আর কিছু পাবার থাকে না, আর তোকে যে পায়, তার আর চাইবার কিছু থাকে না।

তুই আছিস্—এ কথা যদি বুঝতে পারি, তবে আর তোকে আবাহন করবার প্রয়োজনই বা কি, বিসর্জ্জন দেবারই বা প্রয়োজন কি? আজ যখন না ডাকতেই আপনা হতে এসে কোলে করেছিস্—তখন চিরদিন এমনি কোলে করেই রাখিস্—যেমনি সহজ আনন্দের মাঝ দিয়ে তোকে অনুভব করতে পেরেছি—এমনি করে চিরদিন যেন সকল অবস্থার মাঝে সহজে তোকে অনুভব করতে পাই, নিজকে যেন তোর অনুভূতিতে হারিয়ে ফেলতে পারি। জয় মা আনন্দময়ী, তোর আনন্দেরই জয় হোক্।

জগতে যে বেশ নিয়ে তুই এসেছিলি—সে বেশ নিয়ে হয়ত আজ তুই চলে যাবি—কিন্তু তোর এ আনন্দের আবেশ এ জগৎ হতে মুছবার নয়—তোর আবেশই জগতের প্রাণ;—আবেশে আমরা বেঁচে আছি বলেই তোর বেশের আবাহন করছি, আবার বেশকে বিসর্জন দিচ্ছি। খণ্ডবেশের মাঝে তোর এই অখণ্ড আবেশকে চিরদিন যেন জাগ্রত দেখতে পাই—ছায়ার মত চিরদিন যেন তোর সে অখণ্ড কায়ার অনুগত হতে পারি। মা আনন্দময়ী, তোর আনন্দই আমার প্রাণ—তোর আনন্দই আমার সব। ওঁ শান্তিঃ ওঁ।

বেদান্ত-সার

—*—

[ষষ্ঠ খণ্ড—বিবৃতি—অধ্যাসবাদ]

—*—

জগৎ মিথ্যা

ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান খণ্ডের মোটামুটী একটা তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে কয়েকটী প্রশ্নের বিচার প্রয়োজন।

বস্তুতে অবস্তুর আরোপের নাম অধ্যাস, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অবস্তু যে মিথ্যা, ইহাও সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এক্ষণে সংশয় এই, অবস্তু তো বস্তুগত্যা সত্তাহীন; যাহার সত্তা নাই, তাহার আরোপ হয় কি করিয়া? যে রজ্জু-সর্প বা শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাতে সর্প বা রজতের তৎকালীন বাস্তব সত্তা না থাকিলেও, কখনও না কখনও তাহাদের সত্তা নিশ্চয়ই ছিল। সর্প কি, বা রজত কি, ইহা যদি আমার কখনও না জানা থাকিত, তাহা হইলে কখনও কি রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম হওয়া বা শুক্তি দেখিয়া রজত ভ্রম হওয়া সম্ভবপর ছিল? এইরূপে দেখি, যেখানেই অধ্যারোপ বা অধ্যাস, সেখানেই দুইটী কোটীই সত্য হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই মীমাংসকেরা কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আকাশ-কুসুমের মত যাহা অসৎ, তাহাকে কেমন করিয়া অধ্যস্ত করা যাইতে পারে? তোমরাই বল, যাহার সত্তা জানি, গুণ জানি—এমন বস্তুই আমরা অধ্যাসিত করি কি না।"

সংশয়ীর এই আপত্তি মানিয়া লইলে বেদান্তীকে স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্মে যে জগৎ অধ্যস্ত হয়, তাহা মিথ্যা নয়, তাহারও একটা সত্তা আছে। সুতরাং "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত টিকিতে পারে না। কেননা যেমন করিয়াই হোক্, জগৎকে সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে, নতুবা অধ্যাস টিকিবে না।

যাহারা এই আপত্তি তোলেন, তাঁহারা সত্তা বলিতে কি বুঝেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাঁহারা বলিবেন, জগৎ যখন দেখিতেছি, তখন নিশ্চয়ই উহার সত্তা আছে। অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তাহারই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের বিষয় হওয়াই সত্তার প্রমাণ। এ কথা স্বীকার করিতে বেদান্তীর আপত্তি নাই। অবিদ্যায় হউক, ভ্রমে হউক, জগৎ বলিয়া যখন একটা জ্ঞান জন্মিয়াছে, তখন উহাকে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, সত্তা বিচার করিতে গেলে এই জ্ঞানের দৌড় কতটুকু, তাহাও কি বিচার করিবার প্রয়োজন হইবে না? আমি স্বপ্নে দেখিলাম, রাজা হইয়াছি। জাগিয়া দেখি, জীর্ণ কুটীরে ছিন্ন শয্যায় শুইয়া আছি। রাজসিংহাসন আর ছিন্ন শয্যা, দুইটাই তো আমার জ্ঞানের বিষয় ছিল, সুতরাং দুইটাই তো সত্য। তবে জাগিয়া উঠিয়া রাজার মত ব্যবহার করি না কেন?

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, জ্ঞানেরও তারতম্য আছে, এবং সেই সঙ্গে সত্তার সত্যতারও তারতম্য আছে। বেদান্তীও এই কথাই বলিতে চাহেন। এই জন্ম তিনি দুইটা জগৎ মানিতেছেন—একটা ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক জগৎ, আর একটা পারমার্থিক জগৎ। সেই অনুসারে সত্তাও দুই প্রকার, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে দেখিয়াছিলাম, জাগ্রদবস্থায় ছিন্ন শয্যাকেই আমি সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম, স্বপ্নাবস্থার রাজ-সজ্জা লোভনীয় হইলেও তাহার সত্যতায় আমার আস্থা হয় নাই। স্বপ্নও তো হুবহু জাগ্রৎ ঘটনার মত সুস্পষ্ট হইতে পারে। তবুও আমরা স্বপ্ন ছাড়িয়া জাগ্রৎকে বিশ্বাস করি কেন? এর একটা কারণ এই যে, আমাদের স্বপ্ন অল্পকালস্থায়ী—জাগ্রদবস্থাতেই আমরা বেশী সময় কাটাই। দ্বিতীয়তঃ স্বপ্নাবস্থার ঘটনার বিপর্য্যয়, চঞ্চলতা, পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি অনেক দেখিতে পাই; কিন্তু জাগ্রদবস্থার ঘটনা তাহার তুলনায় সুবিন্যস্ত, সুস্থির ও সুসঙ্গত। তৃতীয়তঃ স্বপ্নাবস্থার দৃশ্য সুস্পষ্ট হইলেও জাগ্রদবস্থার প্রতীতিসমূহ এত বলবান্, এত নিশ্চয়াত্মক যে তাহারা স্বভাবতঃই মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের স্বপ্নজ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। স্বপ্নরাজ্য হইতে জাগ্রতের রাজ্যে নামিয়া আসিলে আমরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি, মনে হয় এইবার স্বধামে ফিরিয়া আসিয়াছি।

বেদান্তী বলেন, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান আর জগৎজ্ঞানের মধ্যেও ঠিক জাগ্রৎ আর স্বপ্নের পার্থক্য। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ স্বপ্নই সত্য, কিন্তু জাগিলে আর তাহা কস্মিনকালেও সত্য নয়। তেমনি যতক্ষণ ব্যবহারিক ভূমিতে থাকিয়া জগৎ দেখিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু একবার পরমার্থভূমিতে ব্রহ্মজ্ঞানে অবগাহন করিলে তৎক্ষণাৎ জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা হইয়া যায়। তখন জগৎ বাস্তবিক উড়িয়া যায়, না গুঁড়াইয়া যায়, সে সব বিচার না হয় থাক্—বেদান্তী শুধু বলেন, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়—ইহা অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য। কোথায় না কোথায়ও একটা জগৎজ্ঞান পড়িয়া থাকে কি না—এ বিচারের তো প্রয়োজন নাই; কেননা প্রথম হইতেই তো তুমি বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে সত্য মাপিতে বসিয়াছ। সুতরাং বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের দিকে চাহিয়াই তোমাকে সত্যাসত্য বিচার করিতে হইবে। তুমি বলিয়াছিলে, আমি জগৎ দেখিতেছি, কাজেই জগৎ আছে। আবার তুমিই যদি ব্রহ্ম দেখিয়া আস, তাহা হইলে তুমিই আবার বলিবে, ব্রহ্মজ্ঞান যেন জাগ্রৎজ্ঞান, তাহার কাছে জগৎজ্ঞান মিথ্যা—স্বপ্নের মত। (অবশ্য এই খবরটা দিবার জন্য ফিরিয়া আসার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে। কিন্তু সে কথা যাক্, কেননা উহা সাধনফলের তারতম্যের কথা।)

আনুভবিক প্রমাণ

যাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, তাহাকে শুদ্ধ যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝিতে গেলে সন্দেহ থাকিয়াই যায়, সব সময় ঠিক ঠিক বুঝিতেও পারা যায় না। এই জন্য দর্শনকে দর্শন অর্থাৎ দেখিবার উপায় বুঝিয়াই গ্রহণ করা আমাদের সনাতন রীতি—উহা কেবল মাত্র তর্কের মার-প্যাঁচ নয়। বেদান্তের পক্ষে এই কথাটা

নিশেষ করিয়া থাকে। অহরহঃ যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, বেদান্ত একেবারে তাহাকে উল্টাইয়া দিতে আসিয়াছে—সুতরাং তাহার কথায় বিশ্বাস করা তো কাহারও পক্ষে সহজ হইতে পারে না। এইজন্য বেদান্তী অধিকারী নির্ণয় করিবার সময় এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা—শুধু প্রতিপন্ন করা নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে এই সংস্কার প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দ্বারা এই জগৎজ্ঞান হইতে মানুষকে মুক্ত করা—ইহাই বেদান্তের ব্রত। জগতের উপর বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিতে, বিন্দুমাত্র ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা থাকিতে কি ইহা সম্ভব? তাই বেদান্ত বিবেকী, বৈরাগী, সাধনসম্পন্ন, মুমুক্ষু প্রমাতাকেই অধিকারী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

সাধারণ বুদ্ধিতে বেদান্তের দুরূহ তত্ত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছিলেন, অবিবেকীর পক্ষে অদ্বৈততত্ত্ব ভীতির কারণ। ভয় হইবারই তো কথা। সংসারকে আমরা কত ভালবাসি, মমতার শত বাহু দিয়া স্ত্রী-পুত্র, ধন-জনকে জড়াইয়া ধরিয়াছি, এই দেহটার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট আশঙ্কাতে অস্থির হইয়া পড়ি—এই সাধের সংসারের একেবারে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, এই কথা মনে হইলেই তো জন্মজন্মান্তরের সংস্কারবশতঃ প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তাই মূঢ় মানব বিহ্বল চিত্তে প্রশ্ন করে, "অদ্বৈততত্ত্বে যদি সব লীন হইয়া যায়, তবে আমাদের আশ্রয় থাকিবে কি?" পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেন, "আমাদের ব্যক্তিত্বের নাশ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অদ্বৈত যদি আমাদের ব্যক্তিত্বটুকু কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে আমাদের রহিল কি? মহাশূন্য কাহার প্রাণের পিপাসা মিটাইবে?"

এই সকলের উত্তরে আমরা বলিতে চাই, এই দৃষ্ট জগতের বিনিময়ে বেদান্ত আমাদিগকে কি দিতে চায়, তাহাই ভাবিয়া দেখ। বেদান্ত বলিতেছে—"জগৎ মিথ্যা—ব্রহ্ম সত্য।" কিন্তু সেই ব্রহ্ম বস্তু কি? উহা কি মোহকর, নিরানন্দ, চঞ্চল কোনও বস্তু? বেদান্ত বলিতেছে—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞান ও আনন্দের আধার। মানুষ খুঁজিতেছে কি?—জ্ঞান ও আনন্দ। এই জগতে পূর্ণমাত্রায়, শাশ্বতভাবে তাহা কোথায় পাইয়াছে কি?—না। তবে বেদান্ত যদি নিত্যকাল ধরিয়া সেই জ্ঞান ও আনন্দ মানুষকে বিলাইয়া দিবার জন্য আহ্বান করে, তবে তাহার লক্ষ্য কি জগতের কোনও লক্ষ্য অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন হইবে? এই জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া, এই বাসনা কামনায় সঙ্কুক্ষিত দুঃখতাপে বিজড়িত জগৎকে ছাড়িয়া যদি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় আনন্দসাগরে অবগাহন করিতে পারি; যে অবস্থায় চির-প্রশান্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম—জগৎ-স্বপ্ন ভুলিয়া যদি অনন্তকালের জন্য সেই সর্ব্বাবগাহী, বিদেহভূমিতে জাগিয়া থাকি, তবে শত শত জগতের বিনিময়ে তাহা চাহিব না কেন? ব্যক্তিত্বনাশের আশঙ্কায় তুমি ব্যাকুল হইয়াছ? জিজ্ঞাসা করি ব্যক্তিত্ব বলিতে তুমি কি বোঝ?—এই জড়-জগতের মাঝে একটী কেন্দ্রবিন্দু—যাহা শক্তি, জ্ঞান আনন্দের উৎসারকরূপে সাক্ষাৎভাবে তোমার সঙ্গে যুক্ত, তাহাই না তোমার ব্যক্তিত্ব? কিন্তু এমন একটী বিন্দুর বিনিময়ে অনন্ত

বিন্দুর সমষ্টি সিন্ধুতে যদি মিশাইয়া যাইতে পার, তবে তাহাতেই তোমার ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ হইবে না কি?

আমরা তর্কপথ ছাড়িয়া বহুদূর চলিয়া আসিয়াছি। আবার যুক্তি-তর্কের পথে আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই—ভারতীয় দর্শনের আলোচনা করিতে গিয়া কেহ যেন তাহার একদেশমাত্র দেখিয়াই দোষদর্শনে ধুরন্ধর হইয়া না উঠেন। প্রত্যেক দর্শনের গোড়াতেই উহার লক্ষ্য কি, তাহা সুস্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে। তারপর কি করিয়া সেই লক্ষ্যে পৌছান যাইতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিবরণ দেওয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দর্শনে কোথায়ও অস্পষ্টতা নাই। "দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ" আজকাল পাশ্চাত্য সমাজে তথা পাশ্চাত্যভাবাপ্রাণিত ভারতীয় সমাজে একটা ধুয়া হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সাধনসহায়ে সত্য সাক্ষাৎকার করিবার কোনও কথা নাই, কাজেই মতের অস্পষ্টতা আর তর্কের ধূলিজালেরও অভাব নাই। ভারতীয় দর্শনের এই ভাবে আলোচনা না করিয়া প্রাচীনেরা যেরূপ পবিত্রভাবে জিজ্ঞাসু হইয়া ইহার অনুশীলন করিতেন, সেইরূপ ভাবেই আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। অবশ্য যুক্তিতর্কের স্থান একটা আছেই—কিন্তু তাহার চেয়েও সত্য আমাদের পক্ষে মর্ম্মান্তিক প্রয়োজন, এই কথা যেন ভুলিয়া না যাই। এই শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেমন প্রশমিত হইবে, তেমনি সত্যের স্পর্শে আমাদের জীবনও দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ভাবের অঙ্কুর

[স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ]

ইতিপূর্ব্বে ভক্তি. ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে ভাব অঙ্কুরিত হইলে কি কি চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহারই আলোচনা করা যাউক। এই সমস্ত চিহ্ন ভাবের তটস্থ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, যাহা স্বরূপ লক্ষণ, তাহা, বস্তুটী যে আস্বাদন না করিয়াছে, সে ছাড়া আর কেহ ধারণা করিতে পারে না। স্বরূপলক্ষণ অপরোক্ষ অনুভূতি ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই—উহার অনুমান করা চলে না। যেমন ভাবের স্বরূপ লক্ষণ—"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা"; অথবা উহা "হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সারস্বরূপ।" এই তত্ত্বটী বুঝিতে হইলে স্বরূপে অবগাহন করা ছাড়া আর কোনও উপায়

নাই। যে সমস্ত শব্দ-পরিভাষা সহায়ে এই স্বরূপ-লক্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—উহার প্রত্যেকটী স্বয়ং সংবেদ্য,—অনুমানগম্য নহে। এই জন্য স্বরূপকে এখানে বাস্তবিক সাধ্য বলা যায় না, কেননা সাক্ষাৎ অনুভবের অভাব না হইলে সাধ্য-সাধনভাব থাকিতে পারে না। স্বরূপ লক্ষণ সাধকের কাছে সর্ব্বদাই অনাস্বাদিত মধুবৎ লোভের বিষয় বা আদর্শ হইয়া থাকে মাত্র। তাঁহার কৃপা হইলে বিনা সাধনেও স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি ঘটিতে পারে।

যিনি স্বরূপতঃ একটা ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কার্য্যজগতে তাঁহার যে সমস্ত আচার বা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া যদি উপরিউক্ত স্বরূপের সদ্ভাব অনুমান করিতে যাই, তাহা হইলে উহারা হইবে তটস্থ লক্ষণ। এই তটস্থ লক্ষণ আমাদের বুদ্ধিগম্য, ইহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সাধনা করিতে পারি এবং সেই সাধনা দ্বারা স্বরূপকে হৃদয়ে প্রকট করিতে পারি। যেমন রুচি ও চিত্তের মসৃণতা—এই দুইটী হইল ভাবের তটস্থ লক্ষণ। এই দুইটী আমাদিগের কার্য্যজগতের কথা—সুতরাং আমরা ইহাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি, ইহাদিগের অনুকরণ ও অনুশীলন করিতে পারি।

তটস্থ লক্ষণ আছে বলিয়াই সাধনা সম্ভবপর হইয়াছে। এই জগৎ অপূর্ণ—আমরাও অপূর্ণ; ভগবান পূর্ণস্বরূপ। সুতরাং অপূর্ণ হইয়া তো আমরা কখনও সেই পূর্ণ স্বরূপকে লাভ করিতে পারিতাম না। কিন্তু ভগবান পূর্ণস্বরূপে অচ্যুত থাকিয়াও এই অপূর্ণ জগতে তাঁহার পূর্ণত্বের নানা ইঙ্গিত, নানা সঙ্কেত নিত্য আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছেন। এই সমস্ত সঙ্কেত ধরিয়াই না আমরা বিরূপ ছাড়িয়া স্বরূপের সন্ধান পাইতেছি। কি জ্ঞানী, কি ভক্তের পক্ষে, তটস্থ লক্ষণই হইল সাধনার প্রধান অবলম্বন—স্বরূপ ও বিরূপের মাঝে সংযোগ সেতু।

বাস্তবিক তটস্থ লক্ষণে তিনি প্রকাশ না হইলে আমাদিগের উপায় কি হইত? আমরা ভক্তের আস্বাদ পাই নাই, ভাব কাহাকে বলে জানি না, অথচ সাধু-শাস্ত্রের কাছে শুনিয়া সে বস্তু পাইবার লালসা জন্মিয়াছে। স্বরূপ জানি না, এখন পাই কি করিয়া? ভাগ্য-বশে ভক্ত বা ভাবুকের চরিত্রে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখিলাম, যাহা কথঞ্চিৎ আমার আয়ত্ত। ভক্ত নামগানে মাতোয়ারা—আমি অভক্ত, নামগানে মাতাল না হইতে পারি, কিন্তু অন্ততঃ দুই চারিবারও তো ভগবানের নাম লইতে পারি।—তবে আর কি! ইহাতেই তো অকূলে কূল পাইব। ভক্তের আচরণের অনুকরণ করিতে করিতে একদিন ভক্তির স্বরূপতঃ আস্বাদনও হয়ত মিলিতে পারে।

তাই বলি, ভগবান আর আমাদের আড়াল হইয়া রহিলেন কোথায়? তিনি যে স্বরূপতঃ অগম্য থাকিয়াও আমাদের মনবুদ্ধির গম্য হইয়া কত রূপে ফুটিয়া রহিয়াছেন—আড়াল থাকিয়াও যে হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন—আমরা তাঁহাকে ধরিব বলিয়া। বাস্তবিক রূপে আর অরূপে তিনি ঠিক এক, নতুবা তাঁহাকে পাইবার আর পথ থাকিত না।

প্রাণের টানটুকু সেই অরূপের পানে রাখিয়া যদি রূপকেও আঁকড়িয়া ধরি, তবে নিশ্চয় তাঁহাকে পাইব। অন্তরে ব্যাকুলতা রাখিয়া বাহিরের আচারের অনুকরণ

করিলেও নিশ্চয়ই তাঁহার দেখা মিলিবে। তাই তো বলি, আচারের প্রয়োজন আছে, সাধনভজনের প্রয়োজন আছে। শুনিয়াছিলাম, ও দেশের একজন পাকা অভিনেতা আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত মৃত্যুর অভিনয় করিতে পারিত—মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণগুলিই নাকি তাহাতে অবিকল প্রকাশ পাইত। একদিন অভিনয়ের চূড়ান্ত হইয়া গেল, বেচারী মৃত্যুর অভিনয় করিতে গিয়া যে পড়িল, আর উঠিল না—সকলে গিয়া দেখে, সত্য সত্যই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তটস্থের অনুশীলন করিতে করিতে এইরূপে স্বরূপ মিলিয়া যায়।

অতঃপর ভাবাঙ্কুরের যে চিহ্নগুলি আমরা আলোচনা করিব, তাহাদিগকে যেন আমরা এইভাবে গ্রহণ করিতে পারি—নকল করিতে করিতে যেন আসল মিলিয়া যায়। এইজন্যই এতগুলি কথা বলা।

[ক্ষান্তি]

ভাবাঙ্কুরের অনুভাবসমূহ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ক্ষান্তির্ অব্যর্থকালত্বা বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

প্রথম অনুভাব হইল ক্ষান্তি। যাঁহার হৃদয়ে এই নবপ্রীতির অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, প্রাকৃত ক্ষোভ তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাকৃত ক্ষোভকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—শোক এবং মোহ। প্রাকৃত মানুষের মাঝে প্রতিকূল বিষয়ের উপস্থিতিতে শোক উপস্থিত হয়, আবার অনুকূল বিষয়ের সংস্পর্শে মোহের সঞ্চার হয়। দুঃখ এবং সুখ, এই উভয়ই সাধকের পক্ষে ত্যাজ্য। যিনি সুখ দুঃখের অতীত, তাঁহার চিত্তেই যথার্থ ক্ষান্তি উৎপন্ন হইয়াছে। বিকারের হেতু নিকটে থাকিলেও তাঁহার চিত্ত কখনও বিকৃত হইবার নহে।

ভাবের স্পর্শে যে চিত্তে ক্ষান্তির উদয় হইবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। পূর্ব্বে গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, ভাবে চিত্ত মসৃণ হইয়া যায়। এই মসৃণতাই ক্ষান্তির নিদান। অভিমানই চিত্তে বৈষম্য আনিয়া দেয়। যাঁহার চিত্ত নবনীর মত সুকুমার, অভিমানের লেশমাত্র যাঁহার মাঝে নাই, জগতের সকল বস্তুই তাঁহার কাছে প্রীতির আস্পদ। নিরভিমান চিত্ত সুখ-দুঃখে বিকৃত হয় না। অভিমান গেলে তবে চিত্ত মসৃণ হয়। যতক্ষণ অহংবুদ্ধি প্রবল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে পারে না। "এই দুঃখকে পরাজয় করিব—এই সুখ লাভ করিব"—এই প্রকার রাজসিক ভাবে তাহার চিত্ত সর্ব্বদা আন্দোলিত। সাত্ত্বিক চিত্তে এরূপ বিক্ষোভ স্থান পায় না—সংসারের সকল সুখদুঃখ, অভিমান-অহঙ্কার পদ্মপাতায় জলের মত তাহার উপর দিয়া গড়াইয়া যায়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্ষান্তির জ্বলন্ত উদাহরণ। মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া বিষয় প্রসঙ্গ ছাড়িয়া শ্রীহরির কীর্ত্তিগাথা শুনিতে যখন তিনি সমুৎসুক, তখন তিনি বলিতেছেন—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥

—হে বিপ্রগণ, হে দেবি জাহ্নবি, আমি

শরণাগত—আপনারা আমাকে আশ্রয় দিন; আমার চিত্ত ভগবানকে সঁপিয়া দিয়াছি। ব্রাহ্মণের অভিশাপজনিত মায়া, অথবা তক্ষক—যাহাই আমাকে দংশন করুক না কেন, আমি আর তাহার জন্য চিন্তা করি না। আপনারা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করুন।" মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও পরীক্ষিৎ নির্ভীক, তদ্গতচিত্ত। ইহাই ক্ষান্তির লক্ষণ।

[অব্যর্থকালত্ব]

অব্যর্থকালত্ব দ্বিতীয় অনুভাব। ভগবানে যাঁহাদের মন মজিয়াছে, তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন না। বিষয় চিন্তায় আকণ্ঠ ডুবিয়া রহিয়াছে, মাঝে মাঝে দু' এক দণ্ডের জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলাম—ইহাতেই যদি ভাবভক্তির উদয় হইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। ঠিক ঠিক ভাবের উন্মেষ হইলে আর ভগবানকে ছাড়িয়া বিষয়ের দিকে মন মোটেই যাইতে চাহিবে না—বিষয়ের স্মৃতি তখন বিষবৎ মনে হইবে। বিষয়কর্ম্মে যাহারা আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারাও অব্যর্থ-কালত্বের সাধনা করিতে পারে। হাতে কাজ করিব, কিন্তু মনটী থাকিবে তাঁহার পানে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "নষ্টা মেয়ে যেমন ঘরকন্নার সকল কাজই করে অথচ মন পড়িয়া থাকে উপপতির সঙ্গে, তেমনি সংসারের কাজ করিয়া যাও।"

কাহারও সংশয় হইতে পারে, "সংসারের কাজ তো শুধু হাতে করিয়া গেলেই কুলায় না—তাহার জন্য ভাবনা-চিন্তারও তো প্রয়োজন। সুতরাং সকল সময় ঈশ্বর চিন্তা নিয়া থাকি কি করিয়া?" কিন্তু এটা একটা মহাভ্রম। নিজের দৈনন্দিন চিন্তাগুলি যদি কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তবে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে—বৃথা চিন্তায়, এলোমেলো চিন্তায় মানুষের কত সময় কাটিয়া যায়। হয়ত মন কখনও যাহা হইয়া গিয়াছে, বার বার তাহা আওড়াইতেছে, কিম্বা নূতন নূতন কার্য্যকারণ বা পারিপার্শ্বিক মনে মনে উদ্ভাবন করিয়া আকাশ-কুসুমের কল্পনায় মাতিয়া গিয়াছে। ইহাদের মাঝে শতকরা নব্বইটা চিন্তা বর্ত্তমানকালের পক্ষে কোনও প্রয়োজনেই আসে না। বিষয়ি-চিত্তকে কি এই সমস্ত বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত করা যায় না? সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইবে দৃঢ়তার সহিত এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া। "এইটা এইরূপ করিব"—এ কথা একবার ভাবিলেই তো যথেষ্ট; তার পর যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করিলেই হইল। ইহার মাঝে আর বার বার "এই করিব—এই করিব" বলিয়া একটা সঙ্কল্পেরই রোমন্থন করার কি প্রয়োজন? আবার কাজ হইয়া গেলে বার বার ফলকল্পনারই বা কি প্রয়োজন?

এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, বিষয়ের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করিয়াও আমরা বিষয়চিন্তা কত কমাইয়া দিতে পারি। বিষয়চিন্তা কমিয়া গেলে আপনি ভগবানে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও নির্ভর আসিবে। তখন দেখিব, আমি যদি তাঁহার কথা ভাবি, তবে আমার বিষয়ের ভাবনা তিনিই ভাবেন। তখন বিষয় কর্ম্মের মাঝেও পদে পদে তাঁহার করুণার নিদর্শন পাইব। এইরূপে অনাবশ্যক বিষয়চিন্তা ছাড়িলে যে সময়টুকু বাঁচে, তাহাও কি ভগবানকে দিতে পারি না?

তখন তো হাতে সংসারের কাজ আর মনে তাঁহার চিন্তা নিয়া থাকা চলে।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তাহলে হয় আবোল-তাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকৃতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস খেল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল!" কি ভয়ানক! এই সব অপব্যয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইলে তবে না ভাবভক্তি হইবে।

আর যাঁহার "কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়", তাঁহার স্বভাব কেমন?—

বাগ্‌ভিস্তবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমস্যোপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সম-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥

—ভক্ত বাক্যদ্বারা অহর্নিশি তাঁহারই স্তব করিতেছেন, মনদ্বারা স্মরণ করিতেছেন, তনুদ্বারা নমস্কার করিতেছেন—সর্ব্বদা তাঁহার চোখে প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। ভগবানের জন্য তিনি সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

এই অবস্থার জন্য সকলেরই ব্যাকুলতা চাই। এখন এতটা পারি না—তা যতটুকু পারি, অকপট হইয়া ততটুকুও তো করি। সময় হইলে তিনি আপনা হইতেই কর্ম্ম কমাইয়া দিবেন। (ক্রমশঃ)

শুকদেবের জন্মকথা

—*—

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান। পাদমূলে বসিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, মহাবীর্য্যের আধার, আকুমার ব্রহ্মচারী মহাপুরুষের নিকট রাজধর্ম্ম ও মোক্ষ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ লইতেছেন। কি সুগম্ভীর বৈরাগ্যোদ্দীপক চিত্র! বাস্তবিক কুরুক্ষেত্র মহাসমর নিখিল মানবজাতির জীবন যুদ্ধের ইতিহাস। ইহার প্রারম্ভে গুরুরূপী পার্থ-সারথির শ্রীমুখনিঃসৃত অভয়বাণী—অমোঘ প্রেরণা, আর অবসানে শান্তিপর্ব্বে কুরুবৃদ্ধ পিতামহের অপূর্ব্ব শান্তিবাণী—কর্ম্ম ও জ্ঞানের—রাজধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশ। জীবনযুদ্ধের এমনই আরম্ভের—আর এমনই অবসানের কল্পনায় কাহার না চিত্ত নাচিয়া উঠে?

ভীষ্ম গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির, দীর্ঘ কাল ধরিয়া তপস্যার ফলে যখন ধর্ম্মবলে সমস্ত অধর্ম্মের গ্লানি মুছিয়া যায়, তখনই বাস্তবিক মানুষ যাহা খুঁজিতেছিল, তাহার সন্ধান পায়। নিরবলম্বন হইয়া পথ চলিতে পারিতেছ কিনা—ইহাই তোমার জীবনের লক্ষ্য। আকাশে পাখী উড়িয়া যায়—মাছ জলে সাঁতার কাটে, চতুষ্পদের মত কঠিন মৃত্তিকায় ভর দিয়া তাহা-দিগকে চলিতে হয় না। ধার্ম্মিককেও এই-রূপ নিরালম্ব ভাবে অনায়াস পণ্ডিতে

বিহার করিতে হইবে। তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে। তুমি অপরের দোষের নিন্দা করিবে কেন? সত্যের পথে চলিতে গিয়া কাহার কোথায় স্খলন হইয়াছে, তাহারই বা আলোচনা করিবে কেন? তোমার পক্ষে যাহা রুচিকর, যাহা তোমার প্রকৃতির অনুকূল, এমন আত্মহিতে প্রবৃত্ত হও।"

পিতামহের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির চিন্তামগ্ন হইলেন। নিঃস্পৃহ, নিরালম্ব হইয়া সত্যের পথ অনুসরণ করা—এ তো ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর আদর্শ। এমন আদর্শ তিনি কোথায় পাইবেন? সহসা তাঁহার ব্যাসপুত্র শুকদেবের কথা স্মরণ হইল। আগ্রহসহকারে তিনি পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে আদর্শ আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, বোধ হয় মহাতপস্বী শুকদেবের জীবনে তাহার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। আপনি আমাকে তাঁহার জন্মকথা ও জীবনকথা বুঝাইয়া বলুন। শুকদেবের সম্বন্ধে আমি সবিশেষ কিছুই জানি না। বিশেষতঃ তাঁহার জননী কে, তাহা আমরা জানি না। শুক বালক হইয়াও কি করিয়া দিব্যজ্ঞানের পথে আকৃষ্ট হইলেন, তাহারও ইতিহাস জানি না। শুধু এইটুকু শুনিয়াছি, তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় মহাপুরুষ এ জগতে আর কেহ জন্মায় নাই।"

পিতামহ মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির, তুমি শুককে বালক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ। তুমি কি জানিয়া এই ইঙ্গিত করিয়াছ, তাহা জানি না। কিন্তু, বৎস, একটী কথা স্মরণ রাখিও, বয়স দেখিয়া, পক্ক কেশের আধিক্য দেখিয়া বা ধনজনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ঋষিরা কাহাকেও ধার্ম্মিক বলিয়া স্থির করেন নাই। যিনি তত্ত্বদর্শী, তিনি যেমনই হউন না কেন, তিনিই আমাদের পূজ্য। তুমি শুকের জন্মকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাঁহার জননী কে? তপস্যাতেই শুকের জন্ম, ব্যাসদেবের তপশ্চর্য্যাই তাঁহার জননী। ইন্দ্রিয়সংযমই একমাত্র তপস্যা। ভ্রমেও যদি একবার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহা হইলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। যিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছেন, সিদ্ধি তাঁহার করতলগত। সহস্র অশ্বমেধই কর, আর শত শত বাজপের যাগই কর, তপস্যার কণিকামাত্র ফলও তাহাতে লাভ হইবে না। কঠোর তপস্যার ফলে ব্যাসদেব শুকের মত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। শুকের আশ্চর্য্য জন্মকথা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কাছে আমি শুনিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, যে অসংযতচিত্ত সে কখনও শুকদেবের জন্ম ও তপস্যার কথা শুনিয়াও বুঝিতে পারিবে না।" এই বলিয়া পিতামহ ভীষ্ম সেই অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

—*—

সুমেরুশৃঙ্গে এক মনোরম কর্ণিকারপুষ্পের উপবন আছে। সেখানে মহাদেব শৈলসুতা উমা ও ভূতগণকে সঙ্গে লইয়া একবার বিহার করিতে আসিয়াছিলেন। সুমেরুশৃঙ্গে ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতির অসদ্ভাব নাই। দেবাদিদেব উপস্থিত আছেন জানিয়া পুত্রাকাঙ্ক্ষায় ব্যাসদেব এখানে তপস্যা করিতে আগমন করিলেন। সে কি সুকঠোর তপস্যা! ব্যাসদেবের অটুট সঙ্কল্প, তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এমন পুত্র মাগিয়া লইবেন, যে পুত্রের ধৈর্য্য ও বীর্য্য পৃথিবী, সলিল অগ্নি, বায়ু,

বা অন্তরীক্ষের মত হয়। এই সঙ্কল্প করিয়া যোগধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কেবলমাত্র বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক শত শত বৎসর ধরিয়া ব্যাসদেব নিদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় তাঁহার প্রাণহানি ঘটিল না—কিম্বা তিনি বিন্দুমাত্র গ্লানিও অনুভব করিলেন না। তাঁহার একাগ্রতাদর্শনে ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইয়া গেল। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলেন, এই সময়ে তীব্র তপস্যার ফলে ব্যাসদেবের শরীরে এমন তেজের সঞ্চার হইয়াছিল যে, সে তেজ যেন আর তাহার শরীরে ধরিল না—অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার জটাজালকে ব্যাপ্ত করিয়া উহা মস্তকের চারিদিকে শোভা পাইতে লাগিল। এখনও আমরা দেখি, ব্যাসদেবের জটামণ্ডল যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। উহা তাঁহার সেই তপস্যার ফল।

ব্যাসদেবের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহার নিকট বর প্রদানের জন্য উপস্থিত হইলেন। দেবাদিদেবের কণ্ঠে একগাছি কর্ণিকারফুলের মালা—যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত জড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাসদেবের হৃদয় জুড়াইয়া গেল। মহাদেব বলিলেন, "ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ যেমন শুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী ও নির্ম্মল, তোমার তেমনই শুদ্ধস্বভাব একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তোমার এই পুত্র সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে ভাবিত, ব্রহ্মার্পিতবুদ্ধি, ব্রহ্মাত্মা ও নিরন্তর ব্রহ্মলগ্ন রহিবে। ইহার তেজে ত্রিভুবন আপূর্ণ হইবে এবং ত্রিলোক তাহার যশোগান করিবে।"

মহাদেবের নিকট বরলাভ করিয়া ব্যাসদেবের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ইহার পর একদিন তিনি যজ্ঞের অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য দুইখণ্ড অরণী লইয়া মন্থন করিতেছেন, এমন সময় রূপে দশদিক আলো করিয়া ঘৃতাচী নামে অপ্সরা সেখানে উপস্থিত হইল। বনমধ্যে অপ্সরাকে দেখিয়া ব্যাসদেব সহসা কামে পীড়িত হইলেন। অপ্সরা ঋষিকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া শুকীর রূপ ধারণ করিল। ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখেই অপ্সরাকে রূপান্তরিত হইতে দেখিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার উদ্দাম মনোবেগ নিবৃত্ত হইল না—উহা যেন তাঁহার সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িল। ঋষি নিরতিশয় ধৈর্য্য সহকারে এই মনোভাবকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা করিলেন, বিক্ষিপ্ত মনকে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তথাপি—ব্যাসদেবের ভাষাতেই বলিতে গেলে—"ভাবিত্বাচ্চ ভাবস্য ঘৃতাচ্যা বপুষা হৃতঃ"—যাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়াই যেন ঘৃতাচীর রূপ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাসদেব তখনও আত্মশাসন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না—কিম্বা অরণিমন্থনও ছাড়িয়া দিলেন না। এইরূপ সংঘর্ষের ফলে ঋষির তেজ অধঃস্থিত অরণিতে সঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অরণি মন্থন করিতে লাগিলেন।

অরণি দ্বারা ব্যাসদেবের তেজ মথিত হওয়ায় মহাযোগী শুকদেব আবির্ভূত হইলেন। যজ্ঞভূমিতে যেমন পবিত্র যজ্ঞাগ্নির আবির্ভাব হয়, তেমনি বনভূমি আলোকিত করিয়া শুকদেব পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পিতার মতই তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর—ধূমহীন অচঞ্চল অগ্নিশিখার মত তাঁহার চিত্ত সমাহিত। শুকদেব জন্মিবামাত্রই মেরুবাহিনী সুরধুনী স্বরূপে আসিয়া তাঁহার অঙ্গ সংস্কার করিয়া দিলেন। তরুণ ব্রহ্মচারীর জন্য সহসা অন্তরীক্ষ হইতে

দণ্ড ও অজিন ভূমিতে পতিত হইল। শুকের জন্মে সুমেরুপৃষ্ঠে যেন আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। গন্ধর্ব্বেরা গাহিতে লাগিল, অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল, পবনদেব দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন, গম্ভীর নাদে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ইন্দ্রাদি লোক-পালগণ ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি সকলেই শুককে দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। শুকদেবের জন্মমাত্রই স্বয়ং মহাদেব জগজ্জননী উমাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করিয়া দিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মচারীকে কমণ্ডলু ও দিব্য কাষায় বস্ত্র প্রদান করিলেন। তখন সহসা চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র শুক, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষী আসিয়া শুককে প্রদক্ষিণ করিয়া উড়িতে লাগিল।

জন্মমাত্রই শুকদেবের নিকট বেদ ও উপ-নিষদ্‌ সমূহ মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইল। দেবগুরু বৃহস্পতিকে তিনি আচার্য্য পদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস ও রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়া গুরু দক্ষিণা দিয়া আবার পিতার নিকট সমাবর্ত্তন করিলেন। তারপর বালব্রহ্মচারী শুকদেব সমাহিতচিত্তে সুমেরুতে উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বালক হইলেও তাঁহার সাধনা ও জ্ঞানের গুণে তিনি দেবতা ও ঋষিদের মান্য হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দৃষ্টি মোক্ষে আবদ্ধ থাকায় গার্হস্থ্যমূলক আশ্রমসমূহের প্রতি তাঁহার কোনও রূপ অনুরাগ দেখা যায় নাই।

এই তো শুকদেবের জন্মকাহিনী। আমরা সকলকে সমাহিত চিত্তে ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম আলোচনা ও ধারণা করিতে অনুরোধ করি। জগৎ-পাবন মহাপুরুষ আমাদিগের মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইবেন। কোন্ পিতামাতাকে তিনি ধন্য করিবেন, তাহা কে জানে? সুতরাং তপস্যা দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়া প্রত্যেক দম্পতী-রই ঋণজন্মা পুত্রের আবির্ভাবের জন্য সপ্রতীক্ষ হইয়া থাকা উচিত। এক পুরুষের তপস্যার ফল লাভ না হইলেও পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত তপস্যার ফলে একদিন বংশপাবন মহাপুরুষের আবির্ভাবে কুলসন্ততি সার্থক হইবে—এমন আশা সকল গৃহস্থই হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন।

পিণ্ডের জন্য মানুষ পুত্রকামনা করিয়া থাকে। পিণ্ডদাতা পুত্র পূর্ব্বপুরুষকে অধো-গতি হইতে রক্ষা করে। কিন্তু মোটেই অধোগতি না হয়, কিম্বা চিরকালের জন্য ঊর্দ্ধগতি হয়, এমন একটী বংশপাবন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে আর পিণ্ডার্থ-পুত্রের প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়া থাকেন, বংশে একজন আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিলে পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যায়। ইহা অবৈজ্ঞানিক কথা নহে। ব্যক্তি-গত জীবনের সাধনা বংশসন্ততিতে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। পূর্ণ মানুষ একেবারে জন্মায় না। বংশসন্ততির ধারা ধরিয়া পূর্ণতার ক্রমিক অভিব্যক্তি হইতেছে, ইহা আমরা প্রকৃতিতে নিত্য দেখিতে পাইতেছি। পূর্ণতাই প্রয়োজন। বংশের যে পুরুষে মানবজীবনের এই পূর্ণত্ব বিকশিত হইবে, সেই পুরুষ হইতেই প্রয়োজনাভাববশতঃ বংশসন্ততির উচ্ছেদ ঘটিবে—ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা। মহাপুরুষদিগের বংশাবলী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। প্রত্যেক পুরুষে এক একটী ব্যক্তির উদ্ভব হইতেছে বটে, কিন্তু বংশধারার সহিত উহারা বিচ্ছিন্ন নহে। সমস্ত ব্যক্তিধারার সমষ্টিতে একটী পূর্ণ ব্যক্তিত্বের কল্পনা করা যাইতে পারে। এই জন্যই হিন্দু পিতৃপুরুষের সহিত সম্বন্ধ ছেদ করিতে চায় না এবং এই জন্যই পূর্ণজ্ঞানী পুত্রের জন্মদান করা সমস্ত বংশধারারই লক্ষ্য। বংশধারার প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই লক্ষ্যের জন্য তপস্যা ও আত্মত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বেদান্তীর সাধন

—*—

আত্মস্বরূপের কখনো বিকার হয় না—বিকার হয় শুধু সূক্ষ্মদেহের। ব্রহ্ম সমস্ত বিকারের অতীত। ব্রহ্মাণ্ড আমার দেহ, বায়ু আমার প্রাণ, বৃক্ষসমূহ আমার কেশ, নদীসমূহ আমার শিরা, পর্ব্বতসমূহ আমার অস্থিপঞ্জর।

কোনও কোনও জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে পূর্ব্বসন্ধ্যা থাকে, কোথায়ও বা সহসা সূর্য্য চক্রবালরেখার উপরে উঠে পড়ে। তুমি মধ্যাবস্থায় থেকে যেতে পার, কিম্বা একেবারে উঠে যেতেও পার—সে শুধু নির্ভর করছে তোমার ইচ্ছার উপর। যা খুসী তা কর না কেন! বাসনাই হচ্ছে শক্তি—আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, শব্দ—সকলের শক্তি। শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ এ সব। জড় যে শক্তিরই বিকাশ, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। লাইব্‌নিট্‌স্ বলেন, পরমাণুগুলি শক্তির কেন্দ্র মাত্র। আমি বলি, কঠিন জড় পদার্থও আমার ইচ্ছার বিকাশ। বরফও জল—জলও জল। আমি রূপ, আবার আমি রূপী।

তুমিই তো সব!—এই ভাবে জেগে ওঠ! যোগদর্শন যে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে—সব্বাইকে তোমার কাছে আসতে হবে। সুষুম্নাপথ নিয়ে মানুষ বড় গণ্ডগোলে পড়ে—তারা আসল পথ ছেড়ে অলিগলিতে ঢুকে পড়ে। ৪—এই সংখ্যাটীকে যদি উপর্য্যুপরি সাজিয়ে যাও, তাহলে একটা মালার মত হবে—তার দুধারে দুটো ছিদ্রপথ থাকবে। এই পথ দুটী খুলবার জন্য শাস্ত্র বার বার বলছেন। এক ব্যক্তি বার বছর ধরে শাস্ত্র পড়ে আর ক্রিয়াকর্ম্ম করে এ দুটী খুলবার চেষ্টা করছিল। রাম তাকে একটা সঙ্কেত বলে দিলেন। আজ সে এসে তাঁকে বলছে, এই অল্প সময়ের মাঝে সে প্রায় কাজ শেষ করে এনেছে—এতদিন যে জায়গায় পৌছুতে পারেনি, আজ প্রায় তার কাছাকাছি এসেছে।

যারা সুষুম্নাপথ খুলতে চায়, তারা প্রায়ই বিপথে পরিচালিত হয়। খেলে পরেই খাদ্য বস্তু গলনালী দিয়ে গলে পড়ে, পাকস্থলীতে যায়, অম্লজানের সঙ্গে যুক্ত হয়, পাচক রস সংগ্রহ করে, সমস্ত শরীরময় ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে কিসে কি হয়, তা বুঝবার তো কোনও দরকারই পড়ে না। ভুক্তবস্তুর ব্যবস্থা আপনা থেকেই হয়। তেমনি যদি আত্মানুভূতি চাও, তবে কেবল রাজযোগ সাধন করলেই চলবে না। ঠিক ঠিক খাটতে পার যদি, তা হলে সুষুম্নামার্গ আপনি খুলে যাবে।

প্রাণসংরোধ করতে হবে বটে। কিন্তু কতকগুলি নিরর্থক অনুষ্ঠান করে সময়ের অপব্যয় করছ কেন? কেবল অনুষ্ঠানেই কি সব হয়? তুমি বায়ুধারণের দিক মন দিচ্ছ—চিত্তস্থৈর্য্যের দিকে তাকাচ্ছ না। এমনি করে কি একাগ্রতা লাভ করবে? প্রাণসংযম করে মনঃসংযম হবে;—কিন্তু তার উলটো দিকটাও যে আছে। সকল যোগীই তোমাকে বোঝাতে চাইবেন যে প্রাণ স্থির হলেই মন স্থির হবে। আমি বলি, মন স্থির কর, প্রাণ আপনি স্থির হয়ে আসবে।

রাম আরম্ভ করেছিলেন উলটো দিক হতে। অনেকে অনেক কথা বলা সত্ত্বেও ব্যাপারটা তিনি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখছেন

পারেন নি। তিনি চিত্ত-সংরোধ করলেন, প্রাণ-সংরোধ আপনা হতেই হয়ে গেল। একবার তিনি স্নান করতে গিয়ে ডুব দিলেন। তাঁর সঙ্গীরা স্নান করছিল, স্নান সেরে তারা রামকে খুঁজতে গিয়ে দেখে তিনি নাই। সবাই মনে করল, তিনি হয়ত ডুবে মরেছেন, নয়তো কুমীরে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর রাম যখন উঠে এলেন, তখন সবাই অবাক্ হয়ে গেল। কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে প্রাণসংরোধ করা যায়। তুমি যেন আত্মস্বরূপে সমাহিত—ব্রহ্মের সহিত তুমি এক হয়ে গিয়েছ—এই ভাবটী ধারণা করতে চেষ্টা কর দেখি। প্রাণবায়ু তো তোমার দাসানুদাস—তুমি যে বিশ্ব-প্রাণের নিয়ন্তা! তুমি সম্মোহিত হয়ো না—নিজকে অপমোহিত কর! মা যখন ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে বলতে থাকে, "ওরে আমার মণি—ওরে আমার যাদু"—তখনি ছেলেকে সম্মোহিত করে ফেলে। সে ছেলে তখন থেকে হাড়ে-হাড়ে, "মণি" আর "যাদু" হয়ে ওঠে।

জাগো ব্রহ্মস্বরূপ! বিশ্বরাজ! ব্রহ্মাণ্ড-পতি!—আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে আসল কথা। সবিতার সবিতা—জ্যোতির জ্যোতিঃ—তাই যে তুমি! তুমি স্ত্রী কি পুরুষ, রাজা কি ফকির, ধনী কি গরীব—এ সব কি কথা? তুমি নিজকে যা ভেবেছ—তাই হয়েছ। নিজকে ব্রহ্ম বলে ভাবনা কর। তাই হবে। একটা ঘড় খাড়া করতে বহুক্ষণ লাগে, কিন্তু তাকে মাটীতে ফেলতে কতক্ষণ? তুমিই কতদিন ধরে এই কারাগার গড়ে তুলেছ—আজ ধূলায় লুটিয়ে দাও ওকে। তুমি যে দেবাদিদেব! আত্মস্বরূপে জেগে ওঠ—জ্যোতির জ্যোতিতে ঝাঁপ দাও! দেখ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার সামনে বিস্তার লাভ করছে!

সূর্য্য ওঠেনি কিন্তু উঠবে—এই সময়টী ভারতবর্ষে বড় মনোরম—প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় গম্ভীর। এই সময়ে একবার চিত্ত স্থির করতে পারলে অনুভূতির তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করা যায়। ডাণ্ডাগুলি খেলতে হলে আগে গুলিটা মাটীতে থাকতেই আস্তে আঘাত করতে হয়। সেটা যখন একটু লাফিয়ে ওঠে, তখন কসে এক ঘা দিতে হয়, আর অমনি বোঁ করে সেটা শূন্যে উঠে পড়ে। তেমনি কোনও রকমে মনটাকে একটু চাঙা করে তোল, তার পর তাকে উধাও করে ছুটিয়ে দাও—শেষে একেবারে প্রপঞ্চাতীত ধামে ব্রহ্ম হয়ে যাও। ভোরের হাওয়া, পাখীর তান, নদীর গান—এই সব হল উদ্দীপন। তার পর সূর্য্য উঠতে থাকুক—তুমিও প্রণব-গান কর—ভাবে মত্ত হয়ে গাও শুধু! সূর্য্যের দিকে তাকাও, সে যেন তোমার দর্পণ। কোনও দ্বৈত নাই সেখানে। সবার উপরে আমি—সোঽহম্! ওদেশের মেয়েদের আংটীতে ছোট ছোট আয়না বসান থাকে। মেয়েরা তাতে তাকালে আয়না দেখতে পায় না—দেখে নিজেদেরই মুখ—যদিও সেটা বাইরে। কিন্তু বাইরে দেখেও তারা জানে, এ তাদেরই মুখ। তেমনি বেদান্তী সূর্য্যকে বাইরে দেখেও জানেন, এ তাঁরই প্রতিরূপ। আমি সবিতারও সবিতা! ও সূর্য্য তো আমার ছায়া মাত্র। আমি প্রণবের বাচক—ভাষায়, ভাবে, কাজে আমি সেই!

ছেলেকে ডাকছ, "বাছা, এসো তো!"—কথায় কোনও জোর নেই। একটা ছেলে

বহুদিন কাছছাড়া হয়ে ছিল, তাকে দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল ছিলে, সে যখন আসে, তখন তুমি বলে ওঠ—"ওরে বাছা, আয়রে আয়।"—সে ডাক যেন তোমার শিরায় শিরায়—রোমে রোমে। তুমি আকুল হয়ে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর। এই হচ্ছে হৃদয়ের ভাষা। এমনি প্রাণ দিয়ে প্রণবগান করতে হবে। আচ্ছা, আস্তেই সুরু হোক না। প্রথম স্বর বেরুবে কণ্ঠ থেকে, তারপর বুক থেকে, তারপর ক্রমে আরও নীচে—শেষে মূলাধার থেকে। তার পর বিদ্যুন্ময় স্পন্দন—সুষুম্নাপথ খুলে গেল! নিশ্বাস ছন্দোবদ্ধ হয়ে এল—সকল ব্যাধির বীজ দূর হল! চন্দ্রের সঙ্গে সূর্য্যের যে সম্পর্ক, বেদান্তী জানেন, সূর্য্যের সঙ্গে তাঁর সেই সম্পর্ক। চন্দ্রের আলো নিজস্ব বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তার আলো সূর্য্যের কাছ থেকে পাওয়া। তেমনি সূর্য্য নিজের আলোতে জ্যোতিষ্মান মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তার মহিমার মূলে আমি।

স্বপ্নে তুমি কত কিছু দেখ। মনে কর একটা বিজলী বাতি দেখ্‌লে। আলো না হলে তো তুমি কিছু দেখ্‌তে পাও না—স্বপ্নে তো আলোও ছিল না। তাহলে বিজলী-বাতি দেখ্‌লে বা হীরার টুকরা দেখ্‌লে কোন্ আলোকে? সে আত্মারই আলো—তোমারই আলো। স্বপ্নে যে সূর্য্যের দীপ্তি দেখ, সে তোমারই দীপ্তি। আমার মহিমাতেই সূর্য্যের মহিমা—এই হচ্ছে বেদান্তীর অনুভূতি। জড়জগতে সূর্য্য হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক। তাই সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝ্‌তে পারি—আমিই জ্ঞান-জ্যোতিঃ। সূর্য্য শক্তির প্রতীক, তার শক্তিতেই গ্রহমণ্ডল আবর্ত্তিত, জগৎ প্রাণময়।

আর একরকমে প্রণবের অনুভূতি করা চলে। অ অর্থে সত্তা—প্রাণ; উ অর্থে জ্যোতিঃ, জ্ঞান; ম অর্থে আনন্দ। এই ওঙ্কারেরই সুবর্ণময় সঙ্কেতলিপি হচ্ছে সূর্য্য। ওম্ হচ্ছে শব্দ, সূর্য্য হচ্ছে তার স্থূল প্রতীক—দুই-ই আমার প্রতিবিম্ব।

সূর্য্যের মাঝেই তো শোভা, শক্তি, জ্যোতিঃ! কি উজ্জ্বল, কি মহান!—এই তো আনন্দের রূপ! অনুভব কর—আমিই সত্য—আমিই জ্যোতিঃ! সকলই আমার—সবই আমি!

সৎ, চিৎ, আনন্দ! সূর্য্য আমার ক্ষুদ্র, স্থূল বিকৃতরূপ মাত্র। আমি প্রণবের উপাসক নই—প্রণব আমার উপাসক। আমিই সূর্য্য—স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমস্ত পিণ্ডই আমায় প্রদক্ষিণ করছে। নির্ব্বিকার—অনন্ত! আমার সম্মুখে বিশ্বজগৎ আবর্ত্তিত—তার রূপের পসরা মেলে দিয়েছে—আমি যেন দেখি, তার সব দেখি! আমার জন্যই তো সূর্য্যের আলো! খৃষ্টের হৃদয়, সেক্ষপীরের প্রতিভা, প্লেটোর মনীষা—আমার মহিমাতে এরা সঞ্জীবিত—আমার জ্যোতিঃতে পরিতৃপ্ত। সূর্য্য আছে বলে লোকে জীবনীশক্তি অনুভব করে; বাস্তবিক আমার উপস্থিতিতেই প্রাণ উৎসারিত।

জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, সবিতার সবিতা আমি—আমাকে আশ্রয় কর, আমি রাজাধিরাজ। আমার সত্তা-সমুদ্রে তরঙ্গ এই সব। আমি কুসুমের শোভা—উষার হাসি; বীরের বীরত্ব আমি। আমার ইচ্ছাতেই জগৎ চলছে—আমার রাজমহিমাতেই সকল জীবের অন্ন-সংস্থান হচ্ছে—আমার ইচ্ছায় পৃথিবী আবর্ত্তিত হচ্ছে।

বাসনা কামনা, ক্ষুদ্রত্বের অভিমান আমার সামনে এসে দাঁড়াবে? আমার শুদ্ধসত্তায় বাসনা কামনার স্থান নাই। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি আঁধারের বস্তু—আলোকের নয়। আমি সূর্য্যে মণ্ডলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছি—আমি সাক্ষিস্বরূপ। জেনো, যীশুতে আমি—আবার অধ্যাত্তম পাষণ্ডেও আমি। তোমার যা কিছু কামনা—সবই তো আমি! বজ্রের গর্জ্জনে আমি—সমুদ্রের তরঙ্গে আমি! ফ্রাঙ্কলিন নিউটন, কেলভিনের মনীষায় আমি—প্রবঞ্চকের হৃদয়ে আমি। রূপের প্রস্রবণ আমি—আবার অখিল দৃশ্যের মূলীভূত আমি।

এমনি আবেগ নিয়ে প্রণবে এই সমস্ত ভাবের আরোপ কর। দেখবে—সাধন সহজ। এই গাও, এই নিয়ে বাঁচ—ব্রহ্মবীর্য্যে দীপ্ত হয়ে চল। যে কামনা মহৎ নয়, তার কাছে নতি স্বীকার করলে কেবল আত্মসম্মান বোধেরই অভাব প্রমাণিত হয়। লোকোত্তর মহিমা ও অনুভব নিয়ে বিচরণ কর। এর মাঝে সংসারবাসনা যদি এসে উঁকি দেয়, তবে কি ছাই প্রণব জপ করছ? সুষুম্না পথ নিয়ে বা সহস্রার পদ্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না—সবই তোমার আপনি হবে। একদিন আশ্চর্য্য ফল পাবে। কেবল ভয়, ভাবনা, অশান্তি—এইগুলি ছেড়ে দাও। পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও। জগৎ আপনি তোমার কাছে ছুটে আসবে। আঁকাবাঁকা গোলক ধাঁধার পথ ধরোনা—তাহলে পস্তাতে হবে।*

* স্বামী রামতীর্থ

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

[অনুমান-বিবৃতি]

কারিকাকার বলিতেছেন, "অনুমান লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বক।" মোটামুটি এই লক্ষণের তাৎপর্য্য কি, বলিতেছি। লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন, হেতু। যদি দুইটী ব্যাপারের মাঝে আমরা এমন একটা সম্বন্ধ দেখিতে পাই, যাহাতে একটী থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটীও আছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারকে শেষোক্ত ব্যাপারের চিহ্ন বা পরিচায়ক বলিতে পারি। অনেক সময়ে দূর হইতে আগুন দেখা যায় না। কিন্তু ধোঁয়া উপরে উঠে বলিয়া দেখা যাইতে পারে। ধোঁয়া দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারি, উহার মূলে আগুন আছে। আমাদের এই জ্ঞানের কোথায়ও বিপর্য্যয় হয় নাই। সুতরাং ধোঁয়াকে আমরা অনায়াসে আগুনের পরিচায়ক, চিহ্ন বা লিঙ্গরূপে ধরিয়া লইতে পারি। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের যে এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ, ইহা একটা সার্ব্বভৌম ব্যাপার—বার বার দেখায় এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে। কারিকাকারের ভাষায় এ সম্বন্ধে আমাদের "লিঙ্গ"-জ্ঞান জন্মিয়াছে।

কিন্তু এমন একটা সাধারণ জ্ঞান থাকি-

সেই বড় কিছু আসে যায় না। আমাদের কারবার সাধারণকে নিয়া নয়, বিশেষকে নিয়া। আমাদের নিত্যকার কাজকর্ম্ম চলে সাধারণ জ্ঞানের এক একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত বা প্রয়োগস্থল লইয়া। ধোঁয়া আর আগুণের মাঝে যে একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই সাধারণ জ্ঞানটাকে বিশেষ একটা ব্যাপারে প্রযুক্ত হইতে দেখিলে তবে আমাদের জ্ঞানের কার্য্যগত সার্থকতা। যদি কোথায়ও ধোঁয়া দেখি, তাহা হইলে অমনি পূর্ব্বদৃষ্টের সংস্কার বশতঃ আগুণের কথা মনে পড়িয়া যাইবে। তখন হয়ত বলিব, যখন ধোঁয়া দেখিতেছি, তখন নিশ্চয়ই আগুণ আছে। আগুণ আমার প্রত্যক্ষের সামিল নয়, তবুও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অমার সংশয় নাই—আমি নিশ্চয় জানি, আগুণ আছে। এই আগুণের জ্ঞান অনুমানবলে সিদ্ধ হইল। কিন্তু অনুমান কেমন করিয়া হইল? প্রথমতঃ আমার মাঝে ছিল, আগুণ আর ধোঁয়ার স্বাভাবিক সম্বন্ধের সাধারণ জ্ঞান বা "লিঙ্গ"-জ্ঞান। তার পর সেই আগুণের লিঙ্গ ধোঁয়াকে বিশেষ একস্থানে প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন সেই বিশেষ স্থলের প্রত্যক্ষ হইল আমার "লিঙ্গি"-জ্ঞান। (লিঙ্গ যাহাতে আছে, তাহাই লিঙ্গী।) তারপর পূর্ব্বসঞ্চিত "লিঙ্গ"-জ্ঞান আর বর্ত্তমানলব্ধ "লিঙ্গি"-জ্ঞান—এই দুইটাকে মিলাইয়া আমাদের নূতন একটা জ্ঞান হইল—বর্ত্তমান বিশেষস্থলীয় আগুনের জ্ঞান। এই হইল অনুমান। ইহাই বুঝাইতে আচার্য্য লক্ষণ করিলেন, "অনুমান লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বক।"

কৌমুদীকার এই কথাটাকেই ন্যায়ের পরিভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অনুমানবিচার ন্যায়ের বৃহত্তম অংশ—ভারতীয় প্রতিভার চূড়ান্ত নিদর্শন। আমাদের এত খুঁটিনাটী বিচারের প্রয়োজন নাই, অল্প কথায় আচার্য্যের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট। এই জন্য, আচার্য্যের উল্লিখিত পারিভাবিক শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমানের মূল। ব্যাপ্য ও ব্যাপকে যে সম্বন্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি। কথাটা এই। পূর্ব্বোক্ত আগুন আর ধোঁয়ার দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাউক। আমরা যেখানে যেখানেই ধোঁয়া দেখি, সেখানে সেখানেই আগুনও দেখি। তাহা হইলে বলিতে পারি, ধূমের যত স্থল, আগুনেরও তত স্থল। এমন স্থল খুঁজিয়া পাইব না, যেখানে ধোঁয়া আছে, অথচ তাহার মূলে আগুন নাই বা ছিল না। তাহা হইলে একথাও বলিতে পারি, আগুন ধোঁয়াকে যেন **ব্যাপিয়া** রহিয়াছে—আগুনের কবল ছাড়াইয়া যাওয়া ধোঁয়ার সাধ্য নয়। আগুন, ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া উহার নাম রাখিলাম **ব্যাপক**। আর আগুন ধোঁয়াকে ব্যাপিয়া থাকে; ধোঁয়া আগুনের এলাকার ভিতরে থাকে বলিয়া তাহার নাম রাখিলাম **ব্যাপ্য**। এই ব্যাপক আর ব্যাপ্যের যে অবিনাভাব সম্পর্ক, অর্থাৎ একজন যে আর একজনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহারই নাম হইল **ব্যাপ্তি**।

কিন্তু এই ছাড়িয়া না থাকা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝিতে হইবে। ব্যাপ্য আর ব্যাপক দুই ই ঠিক সমান পরিসরের নয়। সুতরাং কেহই যে কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এমন কথা নয়। উহাদের মাঝে এক জনের যতটা একনিষ্ঠতা আছে, অপরের ততটা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যাপ্য ব্যাপকের

এলাকার মাঝে—যেমন ধোঁয়া আগুনের এলাকার মাঝে। এ কথা হইতে এই বুঝি, ধোঁয়ার অবশ্য গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইবার উপায় নাই, কিন্তু আগুন ধোঁয়ার গণ্ডীতে বাঁধা নয়। যার এলাকায় আমি থাকি, সে আমার চেয়ে বড়; আমি তাহাকে ছাড়িতে পারি না বটে, কিন্তু সে আমাকে ছাড়া অন্যত্রও থাকিতে পারে। যেমন উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে, ধোঁয়া আগুন ছাড়া থাকিতে পারে না, কিন্তু আগুন ধোঁয়া ছাড়াও থাকিতে পারে। যেমন একটা তপ্ত লোহার গোলা; সেখানে আগুন আছে, কিন্তু ধোঁয়া নাই। ব্যাপ্য আর ব্যাপকের সম্বন্ধটা যেন স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মত। স্ত্রী বহুস্বামিক হইতে পারে না, তাহা হইলে ব্যভিচার ঘটিবে, কিন্তু পুরুষ উপরিউক্ত একটী স্ত্রী ছাড়া অপর স্ত্রীকেও আশ্রয় দিতে পারে—স্ত্রী ছাড়াও তাহার গতি আছে।

ব্যাপ্য আর ব্যাপকের সম্বন্ধ তাহা হইলে দুইরকমে বুঝিতে পারি। উভয়ের মাঝে অবিনাভাব সম্বন্ধ; কিন্তু সে কেমন? যেখানে ব্যাপ্য আছে, সেখানে তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্যাপকও আছে—এই একদিক দিয়া দেখিতেছি, দুজনের ছাড়াছাড়ি নাই। ইহাকে বলে **অন্বয়-ব্যাপ্তি**। আবার দেখি, ব্যাপক যেখানে নাই, আশ্রয় অভাবে ব্যাপ্যও সেখানে নাই; দুইয়ের মাঝে যে স্বাভাবিক যোগ বা অবিনাভাব, এ-ও তাহার একটা দৃষ্টান্ত স্থল, একজনকে ছাড়িয়া আর একজন থাকিতে পারে না। ইহাকে বলে **ব্যতিরেক ব্যাপ্তি**।

কিন্তু এই দুই প্রকার ব্যাপ্তির মাঝে কাহার আনুগত্য আমাদের বেশী চোখে পড়ে? সকলেই বলিব, ব্যাপ্যের। সে যেন পতিব্রতা স্ত্রীর মত। আমরা ব্যাপ্যকে দেখিলেই বুঝিব, সঙ্গে ব্যাপক আছেই। কিন্তু ব্যাপককে দেখিয়া সে কথা বলিবার যো নাই; সে ব্যাপ্যকে সঙ্গে করিয়া থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। সুতরাং ব্যাপ্য দেখিয়া ব্যাপকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন নিঃসংশয় হওয়া যায়, ব্যাপক দেখিয়া ব্যাপ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন নিঃসংশয় হওয়া যায় না। অতএব, বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, প্রমা বা নিঃসংশয়জ্ঞানের পক্ষে ব্যাপ্যই কারণ। এই জন্য ব্যাপ্যের আর এক নাম **লিঙ্গ** বা **হেতু** বা **সাধন**। হেতু ধরিয়া যাহাকে জানি, সে হইল ব্যাপক বা **লিঙ্গী** বা **সাধ্য**। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে, ধূম ব্যাপ্য, লিঙ্গ, হেতু বা সাধন; আর অগ্নি ব্যাপক, লিঙ্গী বা সাধ্য। দুইয়ের যে সহচারভাব, তাহাই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিবলেই অনুমান হইয়া থাকে।

তারপর উপাধির কথা। আমরা উপরে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুমানের পক্ষে হেতুই গুরুতর কারণ। হেতু নির্দ্দোষ না হইলে অনুমান নির্দ্দোষ হয় না। আমরা ব্যাপ্তি দেখিয়া হেতু নির্ণয় করিয়া থাকি—যেমন ধোঁয়া আর আগুনের মাঝে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ দেখিয়া ধোঁয়াকে হেতু বলিয়া ধরিয়া লইলাম। কিন্তু আসলে ব্যাপ্তি নিরূপণ করা বা হেতু নির্ণয় করা নির্ভর করে ভূয়োদর্শনের উপর। যেমন আগুন আর ধোঁয়ার সম্পর্ক **বারবার** দেখিয়া আমাদিগকে স্থির করিতে হইয়াছে। এই ভূয়োদর্শনের কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা বা সঙ্কেত হইতে পারে না। কাজেই হয়ত

ইহার মাঝে কোথায় কোথায়ও ভুল থাকিয়া যাইতে পারে। ভূয়োদর্শনে যদি ভুল থাকে, তবে উহা হেতুতেও বর্ত্তাইবে। সেরূপ স্থলে হেতু নির্দ্দোষ না হওয়াতে অনুমানও নির্দ্দোষ হইবে না। অনুমানের আকার ও প্রণালীতে কোনও দোষ ঘটিবে না বটে, কিন্তু উহার সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষবিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। তখন অনুসন্ধান করিলে হয়ত দেখিতে পাইব, হেতুটী যে আকারে আমরা উপস্থিত করিয়াছিলাম, উহাকে সে আকারে ধরিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি না, উহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়া দিলে তবে উহা দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাইতে পারে। তখন বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিব, সিদ্ধান্তের পক্ষে পূর্ব্বনিরূপিত হেতু তো প্রয়োজক হয় নাই, নূতন যাহা জুড়িতে হইয়াছে, তাহাই প্রয়োজক হইয়াছে। এই প্রয়োজকের নাম উপাধি। হেতু যদি নিজেই সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, উপাধি জুড়িয়া দিলে তবে যদি তাহার দ্বারা নির্ণীত সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে সে হেতুকে নির্দ্দোষ বলিতে পারি না। এই জন্য হেতু নির্ব্বাচন করিবার সময় সাবধান হইতে হয়—যাহাতে হেতুর কোনও উপাধি প্রয়োজন না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইয়া বলিব।

পূর্ব্বে আগুন ও ধোঁয়ার দৃষ্টান্তে ধোঁয়াকে আমরা হেতু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের অনুমিতিতে কোনও গোলযোগ হয় নাই। এক্ষণে এই দৃষ্টান্তেরই সাধ্য ও সাধনকে বিপর্য্যস্তভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আগুনকে হেতু আর ধোঁয়াকে সাধ্য ধরিয়া লইয়া অনুমান করিতে গেলে যে ফল দাঁড়াইবে, তাহাতেই আমাদের উপরিউক্ত বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। আমরা দেখিব, এরূপভাবে অনুমান করিতে গেলে শুধু ওই হেতুতে কুলায় না—আমাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং উপাধি দিয়া হেতুকে বিশিষ্ট করিয়া লইতে হয়।

ব্যাপারটা এই। মনে কর আগুন আর ধোঁয়ার সম্পর্ক ভূয়োদর্শনদ্বারা নিরূপণ করিতে যাইয়া আমি যেন বুঝিলাম, যেখানেই আগুন, সেখানেই ধোঁয়া। ধোঁয়া ছাড়াও যে আগুন থাকিতে পারে, হয় আমি তাহা দেখি নাই, অথবা ব্যাপ্তিস্মরণের সময় সে কথা আমার স্মরণ হয় নাই। এইরূপভাবে দেখিলে আগুনই হেতু হইয়া দাঁড়ায়, ধোঁয়া হয় সাধ্য। ইহার পর সমস্ত বিশেষ বিশেষ স্থলেই আগুনের প্রসঙ্গমাত্রেই আমি ধোঁয়ার অস্তিত্ব অনুমান করিব। এরূপ অবস্থায় যদি কেহ আমাকে এক খণ্ড জলন্ত অঙ্গার বা উত্তপ্ত লোহার পিণ্ড দেখায়, তখন কিন্তু আমাকে গোলে পড়িতে হইবে। এরূপ স্থলে আগুন প্রত্যক্ষ করিতেছি, সুতরাং সেই হেতুবাদে ধোঁয়াও থাকার কথা। কিন্তু এখানে আগুন থাকিল, অথচ ধোঁয়া থাকিল না কেন? এইরূপ বিচারে আমাকে বাধ্য হইয়া স্থির করিতে হয়, কেবলমাত্র আগুনই তাহা হইলে তো ধোঁয়ার পক্ষে পর্য্যাপ্ত কারণ নয়। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, অবশ্য ধোঁয়া হইতে হইলে আগুন থাকা চাই বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র ইন্ধনও থাকা চাই। আগুনের সঙ্গে আর্দ্র ইন্ধন থাকিলেই তবে ধোঁয়া হইবে। তাহা হইলে বাস্তবিকপক্ষে ধোঁয়ার প্রয়োজক আর্দ্র ইন্ধন, শুদ্ধ আগুন নয়। ইহাকেই বলিব উক্ত হেতুর উপাধি। এরূপ ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ করিতে হইলে হেতুরও সংশোধন আবশ্যক। আমাকে বলিতে হইবে, ধূম যদি সাধ্য হয়, তবে আর্দ্রেন্ধনযুক্ত বহ্নিই তাহার হেতু। তখন আর সিদ্ধান্তে গোল হইবে না। এই জন্যই আচার্য্য বলিতেছেন, হেতু নির্ব্বাচন করিতে সাবধান! এমন হেতু হওয়া চাই, যাহাতে কোনও উপাধি না থাকে, যে নিজেই সাধ্য-সাধনে পর্য্যাপ্ত।"

আলোচনা

—*—

সৃষ্টি আর প্রলয় চক্রাকারে মহাকালের বক্ষে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সংবৎসর কালেরই কণামাত্র। তাহার বুকে প্রকৃতির যে সৃষ্টি-প্রলয়ের লীলা, তাহা বিশ্বধারিণীর বিশ্বমূর্ত্তিরই প্রতিরূপ। বসন্তে প্রকৃতির জাগরণ—প্রকৃতি তখন সুকুমারী বালিকা, গ্রীষ্মে তাহার যৌবনের খরদীপ্তি, বর্ষায় তাহার গর্ভভারমন্থরা নারিকার মূর্ত্তি—আর শরতে তাহার কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িত পরিপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি। বাহিরে এই রূপ যে দেখিয়াছে, সে অন্তরের সঙ্গেও তাহাকে মিলাইয়া দেখিতে চায়। সাধকের সেই ধ্যানতন্ময়তায় প্রকৃতির মাঝে, হৃদয়ের মাঝে বিশ্বজননীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে—মৃণ্ময়ী প্রতিমা তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। অন্তরের আনন্দ উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠে—নিভৃত সাধনায় যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা একা ভোগ না করিয়া ইচ্ছা হয় সকলকে বিলাইয়া দিই। তাই ছোট-বড় সকলে মিলিয়া মাতৃপূজার আয়োজন। অতীতের দুঃখজ্বালা ভুলিয়া, ভবিষ্যৎ সুখের আশা তুলিয়া, অধিকার-অনধিকার বিচার না করিয়া ভাববিগলিত কণ্ঠে তারস্বরে সকলে ডাকি—"মা—মা—মা।"

—•—

মহাশক্তির পূজায় সকলে একত্র হইয়াছি বটে, কিন্তু চারিদিকে যখন অশক্তি আর দৈন্যের অসংখ্য পরিচয় পাই, তখন স্তব্ধ হইয়া ভাবি, বাস্তবিক আমরা পূজার অধিকারী কি? আজ কয় বৎসর ধরিয়াই প্রাকৃতিক বিপ্লব দ্বারা মায়ের আগমন সূচিত হইতেছে। অজ্ঞান, ব্যাধি, দারিদ্র্য—এ তো আমাদের সম্বৎসরের সহচর, বোধ হয় এতদিনে ইহাদিগকে নিয়তি বলিয়া অভ্যাস করিয়া লইয়াছি—কিন্তু তাহার পরেও মায়ের এমন প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি কেন? একি শাস্তি, না প্রেরণা? জানি না—বোধ হয় দুই-ই। মা যেন এই প্রলয়ের মূর্ত্তিতে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ম্যায় ভুখা হুঁ—ওঠ্ তোরা অলস নিদ্রাতুর পরোপজীবির দল! দেখ্ কিসে আমার ক্ষুধা মিটাইবি! শুধু চালকলার নৈবেদ্যতে আর কুলাইবে না, ছাগশিশুর রক্তপানে তৃষা মিটিবে না। বুকের রক্ত দিয়া আমার তর্পণ কর্—সাহস কর্, ধৈর্য্য ধর্। আত্মোৎসর্গ নহিলে আমার বরদা মূর্ত্তি দেখিবি কি করিয়া? প্রাণ ঢালিয়া দে আমার সেবায়—দেখ্ এক প্রাণের আহুতিতে সহস্র প্রাণের আশীর্ব্বাদ ফিরিয়া পাস্ কি না। শক্তিতে ভক্তিতে বীর্য্যবন্ত হ—তবে না তোদের মা বলা সার্থক।"

—•—

আমাদের জড়ত্ব সব দিক দিয়াই—তাই সব দিক দিয়াই আমাদিগকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। আর সকল বড়াই অতীতের তলায় তলাইয়া গেলেও ধর্ম্মের বড়াইটা এখনও আমরা আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছি। ঐটুকু আমাদের জীবনের সম্বল। কিন্তু আমাদের জড়ত্বের ফলে ধর্ম্মেরও এখন মুমূর্ষু অবস্থা। সমস্ত দেশ ঘুরিয়া দেখ, ধর্ম্ম কেবল প্রাণহীন গতানুগতিক আচারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেমন নির্ব্বীর্য্যভাবে চিরাভ্যাস মত আমরা সংসার করিয়া যাইতেছি, তেমনি অভ্যাসমত

ধর্ম্মের মাঝেও কতকগুলি কসরৎ মাত্র করিয়া যাইতেছি। অথচ আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতার সন্দেহ করিবার যো নাই—তাহা হইলে সনাতন ভারতবর্ষ আকুমারিকা হিমাচল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে—গালাগালিতে তোমার চৌদ্দপুরুষান্ত করিয়া দিবে। রকম দেখিয়া কোনও কোনও বিজ্ঞ দেশহিতৈষী মনে করেন, ধর্ম্মের বাতিকটা আরাম না করিলে আর এ দেশের ভরসা নাই। ইহারা সকলের উপর এক কাঠী উঁচাইয়া গিয়াছেন। এ কথা কি কেহ বোঝে না যে ধর্ম্ম কাপুরুষতার নামান্তর নয়, স্বাণুত্ব লাভ করা উহার আদর্শ নয়। অর্থ, ভোগ, মোক্ষ সমস্তই ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—এই তো ভারতবর্ষের চিরন্তন শিক্ষা। অন্তর্নিহিত শক্তিই বহির্জ্জগতে রূপান্তর ঘটাইতেছে—এই শাশ্বত ধর্ম্মের উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা। এই জন্তই অন্তর্মুখী হইয়া শক্তিকে আয়ত্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। শক্তিমন্ত হইয়া ধর্ম্ম সাধনা কর—চতুর্ব্বর্গ তোমার অনায়াসেই করায়ত্ত হইবে।

—•—

বর্ত্তমান তারকেশ্বরঘটিত ব্যাপারে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে একটা নূতন সাড়া আনিয়াছে। আর্য্যসভ্যতার আদিতীর্থ পঞ্চনদে যে শুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের মন্ত্র প্রচারিত হইতেছে, জাহ্নবীর ধারা বাহিয়া আজ বুঝি তাহা বাঙ্গালার বুকে নামিয়া আসিল। ধর্ম্মরক্ষায় বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতে যে বাঙ্গালী কুণ্ঠিত হয় নাই—ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়, আশার কথা। বাঙ্গালীর সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষা—মায়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে সে উত্তীর্ণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। ধর্ম্মের নামে তীর্থস্থলে যে সমস্ত অনাচার-ব্যভিচার ঘটিতেছিল, সে কি আজকার কথা? কিন্তু কই, এতদিন তো কেহ তাহার প্রতীকার করিবার চেষ্টা করে নাই। যাহারা কিল খাইয়াছে, তাহারা বুদ্ধিমানের মত কিল চুরী করিয়াছে—নিজের অপমানকে একটা ব্যক্তিগত ঘটনা বা নিয়তির 'লেখা' বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, ইহাতে ধর্ম্মের অপমান বা দেশের অপমান ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হয় নাই। এই নির্ব্বীর্য্যতা কি ধর্ম্ম সাধনের ফল? অযোগ্যকে পূজার বেদীতে বসাইয়া রাখি, অত্যাচারীকে অত্যাচার করিতে দিই—সে তো আমরাই। আমাদের অধর্ম্মের আশ্রয়েই না তাহার অধর্ম্ম পরিপুষ্ট হইয়া পুণ্যস্থানকে কলুষিত করে। তা ছাড়া আমরা উৎপীড়ন সহি, কেবল একতার অভাবে। পরস্পরের বিচ্ছেদের অসংখ্য হেতু আমাদের মাঝে বর্ত্তমান। যেখানে একের ব্যথায় অপরের প্রাণ কাঁদে না, সেখানে সবলের অত্যাচারের প্রতিরোধ কি করিয়া হইবে? আবার এ কথাও বলি, বৈচিত্র্য থাকিলেই তাহা বিচ্ছেদ ও বিনাশের হেতু হয় না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত থাকে। প্রত্যেককে স্বাতন্ত্র্য দিয়াও মৈত্রীর বন্ধনে সকলকে এক করিয়া রাখা—ইহাই যথার্থ জীবনীশক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয়। আজ ধর্ম্মাচরণ প্রাণহীন হইয়াছে বলিয়াই আমাদের সমাজ ভাঙ্গিয়াছে, সংহতি ভাঙ্গিয়াছে—ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র আমাদিগকে অপমান সহিতে হইতেছে।

—•—

তারকেশ্বরের মোহান্ত সন্ন্যাসী—সুতরাং সমাজের আদর্শ ও গুরু। তাহার অনাচারে সমাজের মর্ম্মবেদনার প্রচুর কারণ আছে, এবং অনাচারীর অপসারণ নিশ্চয়ই আজ

কর্ত্তব্য। কিন্তু এই ক্ষোভ যখন কোথায় কোথায়ও নির্ব্বিচারে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষের আকারে ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তখন সত্যের অনুরোধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারি না। প্রায়শঃই দেখি, সন্ন্যাসীর নিন্দুক গৃহস্থ। নিজেরা পালন করুন আর না করুন, সন্ন্যাসীকে ত্যাগের উপদেশ দিতে গৃহস্থের রসনা নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে। অবশ্য কোনও সদ্‌গৃহস্থ আমাদের উক্তির লক্ষ্য নহে, কিম্বা যেখানে শাসন ও উপদেশের অধিকার আছে, সেখানকার কথাও আমরা বলিতেছি না। বাঙ্গালায় তন্ত্র ও বৈষ্ণবমতের প্রাধান্য বেশী। তাই এ দেশে বৈদান্তিক ধর্ম্ম বা সন্ন্যাসের আলোচনা ততটা নাই। ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছে শুনিয়া সকলেই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা করিয়া রাখিয়াছে। সন্ন্যাসী লেংটা হইয়া গায়ে ছাই মাখিয়া গাছতলায় ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া থাকে, মাথায় জটা, হাতে চিমটা—ইত্যাকার মূর্ত্তিই বাঙ্গালীর সন্ন্যাসীর আদর্শ। পরিধেয়ের স্বল্পতা ও জটার দৈর্ঘ্য দিয়া এ দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের পরিমাপ হইয়া থাকে। যেখানে এই সমস্ত উপকরণের কিছুমাত্র ত্রুটী লক্ষিত হয়, সেখানে ভণ্ড বলিয়া গালি খাওয়া অনিবার্য্য। আমরা যে ধর্ম্মের শাঁস ছাড়িয়া কেবল ছোবড়া কামড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছি—এ কথা ভাবিতে গেলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়।

—*—

সন্ন্যাসিশিরোমণি শঙ্করাচার্য্য মণিরত্নমালায় লিখিয়াছেন, ত্যাগ কি ?—আসক্তিপরিহার। কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত বিষয়ভোগ-ত্যাগও সন্ন্যাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাও গুণাতীত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রবিধি না মানিয়া কঠোর তপস্যায় দেহ নষ্ট করাকে তামস ত্যাগ, সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি আশায় ফলমূলাহারে তপস্বী হওয়ার নাম রাজস ত্যাগ এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য যে বিধিবিহিত সংযম, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কিন্তু এই সকল ত্যাগ গুণময় বিধায় সন্ন্যাসীর অবলম্বনীয় নহে। সন্ন্যাসের ত্যাগ নির্গুণাত্মক। প্রলুব্ধ না হইয়া অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্ব স্ব বিষয় ভোগ করার নাম গুণাতীত ত্যাগ। নতুবা লেংটি পড়িয়া বা লেংটা হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকার নাম ত্যাগ নহে। লেংটীতে আসক্তি আর গরদে বিরক্তি, কুটীরে আসক্তি আর কোঠায় বিরক্তি, শাকে আসক্তি আর মিষ্টান্নে বিরক্তি, কম্বলে আসক্তি আর গদীতে বিরক্তি নির্গুণ ত্যাগের লক্ষণ নহে। আসক্ত বা বিরক্ত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করাকেই গুণাতীত ত্যাগ বলে। এইরূপ নির্গুণ ত্যাগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

—*—

ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কি, তাহা আজকাল একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। কেহ ধর্ম্মের এলাকা হইতে রাজনীতিকে তাড়াইতে চাহেন। আবার কেহ বা রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিতে চাহেন। উভয়ের স্বরূপ এবং লক্ষ্য বিচার না করিলে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। অবিবেচকের মত উভয়কে মিশাইয়া ফেলিলে ফল কখনও ভাল হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। আবার এ কথাও মানি, ধর্ম্ম আমাদের জীবনের ভিত্তি; আমরা যে কোনও কর্ম্মই করি না কেন, তাহা যদি ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া না করি, তাহা

হইলে তাহার ফল কখনই পরিণামে শ্রেয়স্কর হইবে না। রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক নিরূপণ করিতে হইলেও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহা করিতে হইবে। রাজা রাজধর্ম্ম মানিয়া চলিবেন, প্রজাও প্রজাধর্ম্ম মানিয়া চলিবে—উভয়েই আবার একই সত্য ধর্ম্মের আশ্রিত রহিবে—ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন রাজনীতি। ধর্ম্মসংহিতাকার রাজধর্ম্মকে বাদ দিয়া সংহিতা রচনা করেন নাই। ধর্ম্মের বৃহত্তর আবেষ্টনের মাঝে রাজনীতিরও একটা স্থান আছে। মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক চালবাজীর স্থানে যদি সত্য, সরলতা, সংযম, তপস্যা ও মৈত্রীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়া থাকেন, তবে উহা দোষের কিছু হয় নাই—তিনি ভারতবর্ষের সনাতন ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই উহা করিয়াছেন। কেবল আমাদিগকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, কোথায়ও অধিকারবিভ্রাট না ঘটে। রাজনীতি ধর্ম্মের শাসন মানিয়া চলিবে। কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম্ম কিছুতেই রাজনীতির ক্রীড়নক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের যে অত্যুচ্চ সাধনা দ্বারা পারমার্থিক বস্তু লাভ হয়, তাহাকে ইহলৌকিক কোনও সিদ্ধির অর্জ্জনে নিয়োজিত করাও শ্রেয়স্কর হইবে না। এই দুই বিষয়ে আমাদিগকে ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে।

—•—

দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না। মাঝে খিলাফতের অজুহাতে একটা মিলের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কারাগমনের পর তাহাও চাপা পড়িয়া যায়। আর এখন তো খিলাফত চুকিয়া যাওয়ায় মিলনের উপলক্ষ্যও নষ্ট হইয়া গেল। ইহার মধ্যে দেশবন্ধুর "চুক্তির" বাতিক উঠিয়াছিল, কিন্তু একই দেশে বাস করিয়া ধর্ম্মের নামে চুক্তি করিয়া দুইটা জাতি কি কখনও এক হইতে পারে? রাতারাতি মিলন ঘটাইতে পারিলে একটা রাজনৈতিক "মেওয়া" মিলিত বটে, কিন্তু হাজার বছরের ভাঙ্গন কি দশ বৎসরেই জোড়া লাগে? মূলতঃ বিবাদটা উভয়ের ধর্ম্ম লইয়া। শিক্ষার ফলে যদি উভয় জাতির দৃষ্টি উদার না হয়, পরস্পর যদি পরস্পরের শিক্ষা-সভ্যতার মর্ম্মবেত্তা না হইতে পারে, তবে কি মিলন কখনও স্থায়ী হইবে? ধর্ম্মের নামে হিন্দু শত শত ছাগ মহিষ বলি দিতে পারেন, কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান যদি একটা গোহত্যা করেন, হিন্দু দশটা নরহত্যা করিয়া আপন ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেন। আবার ধর্ম্ম ব্যপদেশে হিন্দু যদি মসজিদের নিকট দিয়া বাদ্যভাণ্ড লইয়া যান, তবে মুসলমান তাঁহার মাথায় লাঠি মারিয়া স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করেন। শিক্ষা ভিন্ন কি এই সংস্কারান্ধতা কখনও দূর হইবে? এ বিষয়ে হিন্দুর কর্ত্তব্যকে আমরা অধিকতর গুরুতর মনে করি। হিন্দুর ধর্ম্ম এবং আচারে এমন কতকগুলি সার্ব্বভৌম ভাব আছে, যাহা জগতের যে কোনও জাতির গ্রহণীয় হইতে পারে। আমরা খৃষ্টিয়ানকে বেদান্তবাদ শিখাইতে ও যোগাচার গ্রহণ করাইতে আমেরিকা ইউরোপ ছুটিয়া যাই, কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানের মাঝে এ সমস্ত ভাব প্রচারের কোনও চেষ্টা করি না। ঠিক এই পথ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বঙ্গসমাজ হিন্দু-মুসলমানের একতাকে কতখানি দৃঢ় করিয়াছিল, ইতিহাস হইতে আজও সে কাহিনী লোপ হয় নাই। এখনও বোধ হয়, এ দেশে

হিন্দুর সাধনায় দীক্ষিত মুসলমান সাধকের অভাব হইবে না। যে বাঙ্গালাতে এই মিলন-মঙ্গলের প্রথম সূত্রপাত হয়, সেখানেই ইহার উদ্‌যাপন হইবে বলিয়া আমরা খুবই আশা করি।

—•—

নারীসমস্যা দিন দিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া কেহ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, কেহ বা স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ইত্যাদি নানা কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু গুপ্ত হউক আর ব্যক্ত হউক, নারীর উপর পাশবিকতায় বোধ হয় কোনও সম্প্রদায়ের পুরুষই পশ্চাৎপদ নহে। আর পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার যে অপ্রতুলতা নাই, ইহা তো নব্যেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেইখান হইতেই তো আমরা প্রকাশ্য নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ পাইয়া থাকি। সীতার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে লঙ্কা পুরী দগ্ধ হইয়াছিল, দ্রৌপদীর অশ্রুজলে কুরুকুল নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। নারীর অপমানেই যে জাতির ধ্বংসের সূচনা—ইহা একটা অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক সত্য। এখন হইতে সংযম শিক্ষা ও প্রচার না করিলে ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা ভাবিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। মা দাক্ষায়ণি, তোমার জ্ঞানহীন রিপুতাড়িত দুর্ব্বল সন্তানকে রক্ষা কর মা!

—•—

আরণ্যক

—•—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৩

নিজের মাঝে মজে গিয়ে তাঁর সন্ধানে ফির—নইলে শুধু বাইরের নিমিত্ত যদি খুঁজতে যাও, তবে দেখবে সেখানে প্রতিকূলতার অন্ত নাই। অন্তরের মাঝে যদি তলিয়ে যাও, তবে কোনটা তোমার আদর্শের অনুকূল, কোনটা প্রতিকূল, সহজেই ধরতে পারবে। যেখানে বসে রয়েছ, সেখানে থেকেই সকল চিন্তা হতে মনকে একবার নিস্তার দাও, সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হোক—শুনবে চারদিকে কত পাখীর কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন, কত অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দসম্ভারে দিগ্বিদিক পরিপূর্ণ, তার নাই। অন্তরেও তেমনি। যতক্ষণ বাধা খুঁজতে তুমি ব্যস্ত, ততক্ষণ সব বাধা তোমার বিবেকে ধরা পড়বে না। কিন্তু যেই তুমি বাধার সন্ধান ছেড়ে, যাঁর জন্য বাধা দূর করছ, তাঁর দিকে মনকে একাগ্র করে রাখবে—অমনি সব বাধা এসে পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তখন তাদের বিচার কর আর না কর—সবই তোমার হাতে। এমনি করে প্রত্যেক কাজের মাঝে আগে নেমে পড়ে তারপর বাধার

বিচার করো—আর আগে বিচার করলেও ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ো না।

*

আইনতঃ যতক্ষণ আমরা কাজ করি, ততক্ষণ কাজ যেন শেষ হতে চায় না—নিজকে সেখানে খণ্ড মনে হয়। কিন্তু প্রাণ হতে প্রেরণা নিয়ে আনন্দে যখন কাজ করি, তখন দেখি, অফুরন্ত কাজ যিনি দিয়েছেন, অফুরন্ত কর্ম্মশক্তিও তিনিই দিয়েছেন। প্রত্যেক কাজের মাঝে তাঁকে খোঁজ—কর্ম্ম-কর্ম্মীর ভেদ ঘুচে যাবে, নির্ম্মল আনন্দ ছাড়া আর কিছুই সেখানে থাক্‌বে না।

*

নিজে কি করছি না করছি, সম্পূর্ণভাবে তা জেনেশুনেও নিজে অক্ষত থাকার নাম আত্মপ্রতিষ্ঠা। তারপর সেই প্রতিষ্ঠিত আত্মাতে তাঁকে অনুভব করার নাম ব্রহ্মচর্য্য। নিরন্তর এই ব্রহ্মবিহারে অভ্যস্ত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সারাদিনের মাঝে কতটুকু সময় তাঁকে আমরা নিজের মাঝে পাই, তা ভাবি কি ?

*

কল্পনাপ্রবণ আমরা—কল্পনারাজ্যে যখন থাকি, আবেগে উচ্ছ্বাসে নিজকে তখন কেবল কাঁপিয়ে তুলি। কিন্তু কাজের আসরে যখন নাম্‌তে হয়, তখন সে উচ্ছ্বাস আর আমাদের চালিয়ে নিতে পারে না। তাই দেখি কল্পনা যেখানে অসংযত, কেবল উচ্ছ্বাস ছাড়া কোন সংহতভাব কল্পনার মূলে যেখানে নাই—প্রকৃত কর্ম্মশক্তি সেখানে খুবই কম। কাজেই প্রকৃত কর্ম্মনিষ্ঠ হতে হলে কল্পনা আর উচ্ছ্বাসকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখ্‌তে হবে। উভয়েরই প্রয়োজন আছে—কাজেই মূল ঠিক থাকা চাই।

*

বুদ্বুদ যখন সাগরে মিশায়, তখন সে কি তার অস্তিত্ব হারায় ?—আর তখন যদিই বা তার নিজকে পৃথক বলে ভাববার প্রয়োজন পড়ে, তবে কি সাগর হতে তাকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় ? যদি সে ভাবে, আমি বিচ্ছিন্ন, তবে তার মনের কল্পনা নিয়ে তো সে বিচ্ছিন্নই। কিন্তু বাইরে থেকে অপরে যখন তাকে দেখে, তখন তো আর তার বিচ্ছিন্নত্ব তাদের চোখে ঠেকে না। আমাদেরও তেমনি—আমরা বুদ্বুদ, তিনি সাগর। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েও সকলে সেই অবিচ্ছিন্ন তাঁর মাঝেই রয়েছি—তাঁতে জন্মাচ্ছি আবার তাঁর মাঝেই চরমে লীন হচ্ছি। এই যে অবিচ্ছিন্নের বিচ্ছিন্নত্ব-কল্পনা, এরই নাম লীলা। এই হল অরূপের রূপে অবতরণ। যে মনে প্রাণে তাঁকে জানছে, সে-ই এ লীলার মাধুর্য্য উপলব্ধি করছে—অরূপকে কল্পনার সাহায্যে রূপে নামিয়ে এনে অনুভূতির সাহায্যে রূপের মাঝেই আবার অরূপে যাবার পথ পাচ্ছে। কেননা নিজে সে রূপের অধীন—তাই তার মনের মতন করে কল্পনায় তাঁকে তার গ্রাহ্যরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে না নিলে হঠাৎ তাঁকে সে অনুভব করবে কি করে ? চারদিকে এই রূপের রাজ্য—এর মাঝেই রসরূপে, আনন্দরূপে, অরূপ হয়ে তিনি লুকিয়ে রয়েছেন—এই তাঁর লীলা। এই লীলার প্রকৃত মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে হলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে হলে প্রথমে রূপকেই ধর্‌তে হবে। তারপর রূপকে ছেড়ে (কল্পনাকে ছেড়ে) অরূপের ধ্যানে

(অনুভূতিতে) আমাদের তন্ময় হয়ে যেতে হবে। এমনি করে কল্পনাকে ধরে অনুভূতিতে তার পর্য্যবসান ঘটাতে হবে—এই হল সাধনার মূল কথা। অন্তরে তিনি রসঘন অনুভূতি—বাইরে তাঁর লীলাস্বরূপ কল্পনার মূর্ত্ত বিকাশের মাঝেই তিনি আমাদের কাছে অবিকশিত রয়েছেন—অনুভূতিতে তাঁকে আমরা বিকশিত দেখ্‌ব।

*

দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করে যে কেবল সুখ খোঁজে, সে কাপুরুষ, বীর্য্যহীন। আবার যে সুখকে সইতে না পেরে বৈরাগ্যসাধনার জন্য দুঃখকেই চায়, সে-ও যে সত্য জিনিষ পায়, তা তো নয়। চাই শান্তম্‌, শিবম্‌, অদ্বৈতম্‌। তরঙ্গের আন্দোলন, বিক্ষোভ—সবই তো আমারই মাঝে। এই নিয়েই আমার প্রশান্ত মহিমা। আকাশের মাঝে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট্‌ বিক্ষোভ চলছে, আকাশ তাতে উদ্বিগ্ন হয়েছে কি? তার সুনীল, সুগভীর স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে কি? এই অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই। এ তো শূন্য নয়—এ যে অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। সে শক্তি প্রলয়ের শক্তি—সেই অচঞ্চল অমৃতের উৎস হ'তেই সৃষ্টি উৎসারিত হচ্ছে। এই শিবের শক্তি—তাই তার মাঝে চাঞ্চল্য দেখ্‌ছি না কোথাও। এই শিব-স্বরূপকেই চাই।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

সারস্বত-মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমান মাসের ৮ই তারিখ পুরীধাম হইতে রওনা হইয়া মাসের মাঝামাঝি অত্র মঠে পদার্পণ করিবেন।

গ্রাহকগণের প্রতি

কার্ত্তিক সংখ্যা আর্য্যদর্পণ যথানিয়মেই প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা পূজার ছুটী উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রয়োজন বুঝিয়া স্থানীয় ডাকঘরেই ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া লইবেন, অথবা আশ্বিন মাসের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আর্য্যদর্পণের পাঠকগণ পত্রিকার মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "নিবেদনে"র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বাধিত হইব।

আর্য্য-দর্পণ
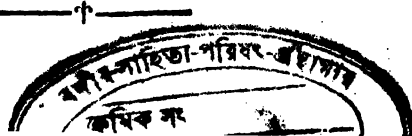
(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ	কার্ত্তিক	৭ম সংখ্যা

বরুণঃ প্রণেতা

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৩।৬]

ইদং কবেরাদিত্যস্য স্বরাজো
বিশ্বানি সান্ত্যভ্যস্তু মহ্না।
অতি যো মন্দ্রো যজথায় দেবঃ
সুকীর্ত্তিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ॥
তব ব্রতে সুভগাসঃ স্যাম
স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ।
উপায়ন উষসাং গোমতীনা-
মগ্নয়ো ন জরমাণা অনুদ্যূন্॥
তব স্যাম পুরুবীরস্য শর্ম্মন্
উরুশংসস্য বরুণঃ প্রণেতঃ।
যূয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধাঃ
অভিক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্
উতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্ব্বতে ন শ্রিতা-
ন্যপ্রচ্যুতানি দুলভ ব্রতানি॥

ধর এই উপহার, হে আদিত্য, হে স্বরাট্ কবি!
সুমহান্ বীর্য্য তব বিশ্বভূতে রহে অভিভবি'।—
দিয়েছ যে যজমানে, হে দেবতা, আনন্দ প্রচুর—
সাধ যায় প্রভো তব গাহি কীর্ত্তি—কণ্ঠে দাও সুর।

হবে কি সৌভাগ্য হেন, তব ব্রত পালি নিতি নিতি,
রহিব মগন ধ্যানে, হে বরুণ, গাব তব গীতি;—
জ্যোতির্ম্ময়ী উষা যবে প্রাচীমূলে বাড়াবে চরণ—
অগ্নিসম দীপ্ত হব তব গাথা করি উচ্চারণ!

বিশ্ববন্দ্য নেতা তুমি, বীর্য্য তব ধরে না ধরায়,
করুণার দিঠি-পাতে, হে বরুণ, রেখো দীনে পায়।
অক্রোধ আদিত্যগণে তাই আজি যাচি পরসাদ,
ছিঁড়িও না প্রীতিডোর, কভু যদি ঘটে পরমাদ।

অতীতে ও অনাগতে, বর্ত্তমানে বলি বার বার;
"বিশ্বনাথ বহুজাত, নমো দেব নমো নমস্কার!"
অচল অটল সম তোমাতেই লভেছে আশ্রয়—
শিখাহতে ব্রত যত নিখিলের অসাধ্য, অক্ষয়।

কাল ও কালী

—*—

কালের শক্তি কালী। আবার ঘুরাইয়া বলিতে গেলে শক্তিরূপিণী কালীর অধিষ্ঠান কাল। কালী বুঝিতে হইলে, অধিষ্ঠান কি, শক্তি কি, কাল কি, তাহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, এই ভাণ্ডেও তাহা আছে। বাহিরে সর্ব্বত্র যাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতেছি, তাহাব আমার ভিতরেও আছে। সুতরাং আমাকে ধরিয়া সকল তত্ত্ব বোঝাই সম্ভব।

জগৎকে সাধারণতঃ দুইভাবে দেখি। কখনও মনে হয়, উহা যেন স্থির হইয়া রহিয়াছে—জগতের সমস্তই যেন চিত্রার্পিত। চিত্ত যখন স্থির থাকে, তখন এই ভাবের অনুভূতি সকলেরই প্রবল হয়। আবার কখনও কখনও মনে হয়, জগতের সকলই চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ—এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ দাঁড়াইতেছে না—কোথা হইতে কোন্ শক্তিস্রোতে অগণিত বস্তুপুঞ্জ ভাসিয়া আসিতেছে, আবার চোখের সম্মুখে ক্ষণেক নৃত্য করিয়া কোথায় কোন্ যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। যে জগৎব্যাপার হইতে নিজকে দূরে রাখিয়া দর্শকের আসনে বসিয়া আছে—সে এই চঞ্চলতা দেখিয়া আনন্দ পায়। আর যে এই চঞ্চলস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, সে তরঙ্গের আঘাতে সন্তাড়িত হইয়া কখনও ভাসে, কখনও বা ডুবিয়া যায়;—তাহার আর অস্বস্তির সীমা নাই।

বিচার করিতে গেলে জগতে তাহা হইলে দুইটী ভাব আছে—একটী চঞ্চল, একটী অচঞ্চল। আমাদের দৃশ্যজগতে এই দুইটী ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া রহিয়াছে—কাহারও কাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। যাহা চঞ্চল হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, তাহারও একটা অচঞ্চল রঙ্গপীঠ থাকা চাই, নতুবা শূন্যে নৃত্য হইবে কি করিয়া? সুতরাং জগৎ চঞ্চল, এ কথা মানিলেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অচঞ্চল একটা আধার মানিতেই হইবে। আবার স্থূলদৃষ্টিতে চঞ্চলের অপেক্ষা না রাখিয়া অচঞ্চলকেও তো বুঝিতে পারি-না। অচঞ্চল স্থির শান্ত একটা কিছু আছে—তাহাই অদ্বৈত তত্ত্ব। অপর কাহারও অপেক্ষা রাখিয়া যাহার সত্তা প্রমাণিত করিতে হয় না—এমন কোনও আপনাতে আপনি পূর্ণ বস্তু আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারি না। আমরা অচঞ্চলকে বুঝি, চঞ্চলের সহিত তুলনা করিয়া। যদি চঞ্চল কিছু না থাকে, তবে অচঞ্চলের ধারণাও আমাদের লুপ্ত হইয়া সমস্তই একটা শূন্যে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। যেমন জাগ্রৎ ও স্বপ্নের চঞ্চলতা যখন থামিয়া গেল, তখন অচঞ্চলকে ধারণা করিতে গিয়া আমরা সুষুপ্তিতে ঢলিয়া পড়িলাম, অদ্বৈতের ধারণা মোহে বা অজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইল। তাই বলিতেছিলাম, প্রাকৃতবুদ্ধিতে চঞ্চল আর অচঞ্চল এই দুইটী সংস্কার ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া আছে।

এই অচঞ্চলকে বলি অধিষ্ঠান, আর চঞ্চলকে বলি শক্তি। দুইয়ের মাঝে কি সম্পর্ক তাহা নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে হয়, অটল টলিতেছেন—এইটীই তত্ত্ব। অচঞ্চল না হইলে চঞ্চলা প্রকৃতির তত্ত্ব বোঝা যায় না।

যে অচঞ্চল, সে চঞ্চলকে বুঝিতে পারে, কিন্তু চঞ্চল হইয়া অচঞ্চলের স্বভাব বোঝা যায় না—এইটুকু হইল সাধনজগতের সঙ্কেত। স্থূলদৃষ্টিতে বহির্জগতে দেখিতেছি, দুইটী ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু অন্তর্মুখী হইয়া বিবেকদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, অচঞ্চলের মাঝেই চঞ্চল আত্মসমর্পণ করিয়াছে—অধিষ্ঠানের মাঝে শক্তির সমাধি—দুয়ের মিলনে পরিপূর্ণ অদ্বয় আনন্দের বিলাস। এইটুকু বোঝার নামই জ্ঞান। বহির্দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছি, তাহার নাম অজ্ঞান। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। শক্তি জ্ঞানে ধরা দেয়, আর কিছুতে নয়। জ্ঞানই অধিষ্ঠান।

কাল জ্ঞানেরই বিভাব। বহির্জগতে যে চঞ্চলতা দেখিতেছি, তাহাকে বলি পরিণাম। জগতে সমস্তই পরিণমিত হইতেছে—এই হইল শক্তিরূপ। কিন্তু কাহার আশ্রয়ে পরিণাম?—কালের আশ্রয়ে। যখন কালবোধ থাকে না, তখন পরিণামও থাকে না। অধিষ্ঠানরূপী কালের সাক্ষাৎ আমরা স্থূলভাবেও কখনও কখনও পাই। মনে কর, তন্ময় হইয়া একজনের কথা শুনিতেছি। তখন আর কালের খণ্ডবোধ হয় না—বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ মিলিয়া একটা একটানা স্রোত বহিতে থাকে—কিছুক্ষণের জন্য চৈতন্য যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এইটুকু হইল আমাদের অচঞ্চলের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা তো সকল সময় থাকে না। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া যায়, আবার চঞ্চল জগতে ফিরিয়া আসি, পরিণামস্রোতে ভাসিয়া চলি। রহস্য এই যে, যখন পরিণামের সাক্ষাৎ পাই, তখনই অপরিণামী অচঞ্চল স্থিতির কথা বুঝিতে পারি—তন্ময়তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহার সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মে—সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিতে অস্বস্তিও অনুভব করিয়া থাকি। যতক্ষণ তন্ময় ছিলাম, ততক্ষণ স্বরূপে ছিলাম, আনন্দে ছিলাম; সে আনন্দ একরস, অখণ্ড, তাহা জানাইয়া দিবার কেহ নাই, সুতরাং তাহা স্বয়ংই বিজ্ঞান-স্বরূপ। এই স্বরূপানন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়াই দুঃখ পাই, অচঞ্চল আনন্দের স্মৃতি সমস্ত চঞ্চল বস্তুর উপরই বিতৃষ্ণা ও অতৃপ্তি আনিয়া দেয়।

এই অধিষ্ঠানরূপী কালে অবস্থান করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। যে তন্ময়তা বা সমাধি সাংসারিক ব্যাপারে সময় সময় আসিয়া দেখা দেয়, সেই তন্ময়তা কি করিয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই সাধনা। এখন দেখিতে হইবে, তন্ময়তা ভাঙ্গে কিসে?

ধর, যে কোনো বিষয়ে মন স্থির হইয়াছিল; আবার অস্থির হইল কেন?—বাসনার টানে। প্রকৃতির বহির্মুখীনতাই বাসনা। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া প্রকৃতির এই স্বভাব পাইয়াছি। একটাতে আমাদের তৃপ্তি হয় না—আমরা অনেক চাই। মন একটা; যুগপৎ অনেক বিষয়ের ভোগ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তাই একটার পর একটা সে চাখিয়া দেখিতে চায়। আবার যে কোনও একটা বিষয়ের ভোগ যত মধুরই হউক না কেন, তাহা চিরস্থায়ী হইবার উপায় নাই। অতি মিষ্ট জিনিষেও শেষে মানুষের অরুচি ধরিয়া যায়। নিত্য নূতন বিষয় চাই—নিত্য নূতন ভোগ চাই। যাহা একবার ভোগ করিয়াছি, আবার তাহা ভোগ করিতে চাই। আবার, ভোগ করিতে করিতে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া নূতন ভোগের আস্বাদন চাই।

এইরূপে বাসনার চর্চ্চায় বাসনাই কেবল স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে—কোথায়ও তৃপ্তি নাই, মুক্তি নাই। বাসনার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ছাড়া ইহার আর কোনও প্রতিকার নাই। রক্তবীজের বিনাশ না হইলে দেবশক্তি বিজয়ী হইবার আশা নাই।

তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, বাসনা বশেই প্রকৃতির এই অধোমুখী পরিণাম ঘটিতেছে। ইহাই শক্তির অবিদ্যারূপ। অবিদ্যা বশেই এই জগৎরূপী ইন্দ্রজালের সৃষ্টি। অবিদ্যা কবলিত হইয়াই আমরা অধোগতির পথে নামিয়া আসিয়াছি। এখন এই অবিদ্যাকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে। তাহার জন্য বিদ্যার উপাসনা প্রয়োজন। অবিদ্যা-রূপে শক্তি যেমন বন্ধনের হেতু, বিদ্যারূপে তেমনি মোক্ষেরও হেতু। শক্তির স্বরূপ জানি না বলিয়াই বদ্ধ হইয়াছি—এ-ও তাঁহারই ইচ্ছা; আবার তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হইব—এ-ও তাঁহারই ইচ্ছা। মোক্ষের হেতুরূপে শক্তিতত্ত্ব যখন আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠেন, তখনই তিনি মহাবিদ্যারূপিণী। কালী মহাবিদ্যারূপিণী।

অচঞ্চল অধিষ্ঠানতত্ত্ব কালস্বরূপ—তিনি গুণাতীত। তাঁহারই একদেশে তাঁহার বাসনা গুণ দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া শক্তিরূপে বিকশিত হন। শক্তি শক্তিমান অভেদ। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ শক্তি বা মূলা প্রকৃতি নির্গুণা সমাধিস্বরূপা আর বাসনা-শক্তি বা স্থূলা প্রকৃতি গুণময়ী—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। সৃষ্টিতে বাসনার বিকাশ—প্রলয়ে বাসনার সংহরণ। আমাদের মাঝেও বাসনার উত্তেজনাবশতঃ নিত্য সৃষ্টি হইতেছে, আবার বাসনার উপশমে প্রলয় ঘটিতেছে। বাসনার সৃষ্টিতে বন্ধন, আর প্রলয়ে মুক্তি। বন্ধন ও মোক্ষ—এই উভয় ব্যাপার শক্তিরই অন্তর্গত। বন্ধনবোধ থাকিলেই মুক্তির প্রয়োজন—নতুবা স্বরূপাবস্থা বন্ধ মোক্ষ ব্যাপারের অতীত। শক্তির উপাসনায় আমরা বন্ধন বাড়াইতেও পারি, আবার তাঁহার উপাসনাতেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেও পারি। তাই বলিয়াছি, শক্তি অবিদ্যা ও বিদ্যারূপিণী। অবিদ্যারূপের উপাসনায় বাসনার বৃদ্ধি, ফলে বন্ধন সৃষ্টি; আর বিদ্যারূপের উপাসনায় বাসনার প্রলয় বা মোক্ষ। মুক্তির পথ প্রলয়ের পথ। তাই বিষয় বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে প্রলয়-রূপিণী বিদ্যাশক্তিরই উপাসনা করিতে হইবে। মুমুক্ষুর নিকট প্রলয়ঙ্করী কালীই আদ্যা মহাবিদ্যা।

কালশক্তিতেই সৃষ্টি, আবার কালশক্তিতেই লয়। সৃষ্টি অবিদ্যামূলে, তখন আমরা শক্তিকে জানিতে পারি না। অবিদ্যার স্বভাব এই, উহা জ্ঞানকে তো আবৃত করেই, উপরন্তু স্বরূপানন্দের একটু আভাস মাত্র জানাইয়া দিয়া অনিত্যে নিত্য বিভ্রম জন্মাইয়া দেয়। অনিত্যে নিত্য বিভ্রমবশতঃই সৃষ্টি হইতেছে—স্থিতি ভ্রম সম্ভব হইয়াছে। আমরা মনে করিতেছি, জগৎ স্থির আছে, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া প্রবাহের উপর বালি দিয়া ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু জগতে কিছুই তো ক্ষণকালের জন্যও স্থির থাকিতেছে না। যে কোনও বস্তুও দেখি না কেন, সমস্তই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই মুহূর্ত্তে যাহা সৃষ্ট হইল, পরমুহূর্ত্তেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়া গেল, আবার তাহার স্থানে নূতনের আবির্ভাব হইল। আবার সে নূতনও পরমুহূর্ত্তে লুপ্ত হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে জগৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অথচ আমরা ক্ষণের বিশ্লেষণ না করিয়া কতকগুলি ক্ষণের

সমষ্টিকে স্থির কল্পনা করিয়া তাহারই উপর ব্যবহারিকজ্ঞানের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতেছি। কিন্তু এই স্থিরত্ব বা নিত্যত্ব কালেরই স্বভাব, অনিত্য ক্ষণসমষ্টিতে তাহা অধ্যস্ত হইতেছে মাত্র। আমার এই ক্ষণিক নিত্যত্বও কো টিকিয়া থাকিতেছে না—আমাদের নিত্যত্ব-কল্পনাকে উপহাস করিয়া চোখের সম্মুখেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এইরূপেই দিনের পর রাত্রি, ফুলের পর ফল, জীবনের পর মৃত্যু, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য-সর্ব্বত্রই আমাদের ক্ষণিক নিত্যত্ববুদ্ধি পরাভূত হইতেছে। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব এই প্রলয়ঙ্করী কালশক্তিকে চিনে না—তাই অনিত্যকে নিত্য ভাবিয়া সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী দেখেন জগতের সর্ব্বত্রই শ্মশান-রঙ্গিণীর নৃত্য—সর্ব্বত্রই প্রলয়ঙ্করীর প্রলয় লীলা। শুধু যুগান্তে প্রলয় নয়, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের সর্ব্বত্র প্রলয় ঘটিতেছে—বিষয় বলিয়া যাহাকেই আমাদের বাহিরে রাখিয়া দেখিতেছি, তাহাই মৃত্যুস্পৃষ্ট, বিনশ্বর, ক্ষণিকের মায়া। একমাত্র সত্য, অমৃত ও ধ্রুব এই মায়ার সাক্ষী মহাকাল—যাঁহার মাঝে পরিণাম নাই, সুতরাং বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎরূপে কালের বিচ্ছেদ নাই—অতএব যিনি ত্রিসময়ে পরিপূর্ণ, নিত্য বিজ্ঞান স্বরূপ এবং অনিত্যের দ্রষ্টা বলিয়া আনন্দ-স্বরূপ।

মুমুক্ষুকে জগতের সর্ব্বত্র কালশক্তি মহাবিদ্যা কালীকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। জগতের সর্ব্বত্রই ধ্বংসের লীলা—সর্ব্বত্রই প্রলয়—সর্ব্বত্র শ্মশান। অতএব, হে বৈরাগী, তোমার আসক্তির বস্তু এখানে কোথায়? ওই দেখ, তোমার ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গখর্পরধারিণী কালী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভোগাসক্ত চিত্ত জগন্মাতার এই বাস্তবমূর্ত্তি একবার দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে—সমস্ত জগৎ তাহার কাছে আঁধার হইয়া যাইবে। কিন্তু জ্ঞানী দেখিবেন, ওই তো জননীর করে বরাভয়, অধরে স্নেহমাখা মৃদু হাসি, ললাটে অমৃতক্ষরিণী স্নিগ্ধ চন্দ্রকলা। কে বলে মা আমার কালো? এ যে "অন্ধকারের বক্ষ হতে উৎসারিত আলো"—মা যে আমার মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী—তাই বিষয়ীর দৃষ্টিতে তিনি কালো; অনিত্যলুব্ধ বিষয়ীর কাছে তিনি ভয়ঙ্করী, আবার নিত্যস্বরূপপ্রয়াসী বিবেকীর কাছে প্রসন্নাননা বরাভয়করা। এমন ভীষণ-মধুরে সম্মিলন কোথায়ও দেখিয়াছ কি? নিত্যস্বরূপ মহাকালে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিলে, এই মহাবিদ্যারূপিণী, বাসনারক্তবীজহন্ত্রী, প্রলয়ঙ্করী কালশক্তি কালীর উপাসনা কর।

নালিশের জবাব

—❋—

ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করাবার জন্য, আমি তোমাদের যে ধ্যানযোগের কথা বলেছিলাম, তাতে তোমরা কেউ কেউ সন্দেহ করেছ। আমার আসল কথাটা হয়ত তোমরা সবাই জান; এক এক করে এখন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমতঃ তোমরা আপত্তি করেছ, "আপনি যে সাধনপথ নির্দ্দেশ করেছেন, ও তো কাল্পনিক; তাতে কেবল চিন্তাগঠন আর কল্পনা ছাড়া কোনও বাস্তব জিনিষের সঙ্গে তো যোগ নাই।"

যারা এমন আপত্তি করে, বেদান্ত তাদের জবাব দিচ্ছেন, "হে আত্মস্বরূপ, হে প্রিয়তম, কথাগুলো একটু ভেবে দেখ দেখি। এই জগৎটা, তোমাদের এই দেহপিণ্ডগুলো—এ সকলের মূলে কল্পনা ছাড়া আর কি আছে? তোমরা কল্পনা আর চিন্তার ধারাকে যখন বিপরীত মুখে পরিচালনা কর, তখনই না তোমাদের যত দুঃখ, যন্ত্রণা, ভয়, ভাবনা এসে উপস্থিত হয়। চিন্তা আর কল্পনাকে ভুল পথে চালিয়েই তুমি বদ্ধ, আর ওদের ঠিক পথে চালাতে পারলেই মুক্ত। "সমঃ সমং শময়তি।"

যে সিঁড়ির ওপর থেকে পড়ে গেলে, সেই সিঁড়ি বেয়েই তো উঠ্‌তে হবে। যে রাস্তা ধরে দুঃখ জ্বালার খাদে এসে নেমেছিলে, সেই রাস্তা ধরেই যে আবার চড়াই করতে হবে। বেদান্ত মুক্তির জন্য তোমাকে যে কল্পনা করতে বলছেন, ঠিক তার বিপরীত কল্পনা করেই যে তুমি বদ্ধ হয়ে রয়েছ। সুতরাং "বিষমঃ বিষমং শময়তি"—ঠিক এই সূত্র ধরে তুমি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবে।

বেদান্ত বলেন, এই জগৎটা আর কিছুই না—এ শুধু তোমার ভাব, চিন্তা ও কল্পনা। এই চিন্তাকে পরিশুদ্ধ কর, ঠিক পথে পরিচালিত কর—তা হলে তুমিই হবে জ্যোতির জ্যোতিঃ—বিশ্বের সর্ব্বময় প্রভু হবে তুমি!

একজনের পেটের অসুখ হল। ডাক্তার তাকে জোলাপ দিল, আর সে আরাম হয়ে গেল। পেটের অসুখের দরুণ তাকে বার বার ঘটী হাতে দৌড়াতে হয়েছিল। এখন ইচ্ছা করে যদি কেউ জোলাপ নেয়, তবে তবে তারও ঠিক ওই রকমই হবে—অথচ দুজনের মাঝে আকাশপাতাল তফাৎ থাকবে। সংসারচিন্তা তোমাকে দাস করে রাখে, হাতে পায়ে বেঁধে তোমাকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে বেড়ায়। একটু দমকা হাওয়াতেও তখন তোমার বিপদ। তোমার ভাবরাজ্যেও অতিসার ব্যাধি ঘটেছে। বেদান্তী তার জোলাপের ব্যবস্থা করছেন—তাঁর কথা শোন। বেদান্তীর প্রতিষেধকটাও একটা কল্পনা বটে। কিন্তু তা বলতে গেলে সমস্তটা জগৎই তো একটা কল্পনা। মানুষ যে সংসারের ভাবনা চিন্তা নিয়ে মরছে—ওই তো অতিসারের ব্যামো গো! আর বেদান্তী তার মাঝে যে ভাবনাটা ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে তার প্রতিষেধক। এই ওষুধটা খেয়ে দেখ, তোমার রোগ আরাম হয়ে যাবে, সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে সাফ মুক্তি পাবে।

ভারতবর্ষের মানুষ এ দেশের মত সাবান দিয়ে হাত পা পরিষ্কার করে না—তারা ছাই ব্যবহার করে। ছাইও তো এক রকম ময়লা; আর যে ময়লা ছুটাবার জন্য ছাই দিয়ে মাজাঘসা, তাও তো ময়লা'। হাতে ছাই মেখে হাত কচলিয়ে জলে ধুয়ে ফেললে হাতের ময়লা তো ছুটে যায়ই—ছাইটাও ধুয়ে যায়।

তাই বেদান্ত বলছেন, তুমি যে বৈদান্তিক ভাব নিয়ে থাকবে, তা যেন ছাইয়ের মত। এ তোমার সমস্ত অশুচি আর দুর্ব্বলতা ঘসে মেজে পরিষ্কার ক'রে দেবে। যে চিন্তার ফেরে তুমি এই সব জঞ্জাল জমিয়েছিলে, তা হতে তোমাকে উদ্ধার করবে।

মানুষ স্বপ্নে কত কি দেখে, কিন্তু স্বপ্নে দেখা সমস্ত বস্তুই তো নিছক্ কল্পনা। স্বপ্নে হয়ত একটা সাপ বা বাঘ বা সিংহ দেখ্‌লে। স্বপ্নের বাঘও একটা বিভীষিকা—তা দেখে তুমি আতঙ্কে জেগে ওঠ। কিন্তু স্বপ্নের বাঘ তোমারই কল্পনার সৃষ্টি হলেও এ এক অদ্ভুত কল্পনা বটে। স্বপ্নে একটা বাঘ দেখলে তোমার আর সকল চিন্তা ছুটে যায়। এই যে একটু আগে প্রকৃতির শোভা, নদীর প্রবাহ, পর্ব্বতের মহিমা, আরও কত কি দেখছিলে, বাঘ দেখার পর কিন্তু সব ছুটে গেল। বাঘ কোনও দিন ঘাস-পাথর খায় না বটে, কিন্তু তোমার ওই স্বপ্নের বাঘটা এক আশ্চর্য্য জানোয়ার, কেননা ও তোমার দেখা পাহাড়-পর্ব্বত শুদ্ধ গিলে ফেলেছে—সব তখন ওই বাঘের মূর্ত্তিতে ঢুকে গিয়েছে। স্বপ্নের বাঘ স্বপ্নের মাঝেও তোমাকে চঞ্চল করে তুলেছে—অবশেষে সে নিজেই নিজকে খেয়ে ফেলেছে। কেননা জেগে ওঠে দেখ, কোথায়ও তো কিছু নাই।

তেমনি আমি যে সব ভাবনার কথা বলেছিলাম, সেগুলোর স্বপ্নের বাঘের মত। সমস্তটা জগৎই স্বপ্ন। এই বাঘটা এসে তোমার সমস্ত মিথ্যা কল্পনা আর অবিদ্যাকে গ্রাস করে ফেল্‌বে, অবশেষে তার নিজের কবল হতেও তোমাকে মুক্তি দেবে। চিন্তার যেখানে ইতি হয়েছে, ভাষা যেখানে পৌঁছায় না—সেই অপরূপ রহস্যের মাঝে সে তোমায় পৌঁছিয়ে দেবে।

তার পর আপত্তি হয়েছে, "যেখানে সমস্ত চিন্তার বিরতি, চেতনার কোনও লক্ষণ যেখানে নাই, এমন অতি-চেতন ভূমিতেই যদি আমরা পৌঁছাই, তাহলে কি শূন্যরাজ্যে গিয়া পড়্‌লাম না? ওটা কি বোধহীন ভূমি নয়? এমন করে অচেতন হয়ে যাবার জন্য এত সাধ্য-সাধনা কেন? ও আমরা চাই না।"

এর উত্তরে বেদান্ত বলছেন, ভাই—না ভাই-ই বা বল্‌ছি কেন, হে সৎ-স্বরূপ, একটু ভেবে চিন্তে কথা কও, এত তাড়াতাড়ি কেন? অপরোক্ষানুভূতির সঙ্গে মূর্চ্ছার আকাশ পাতাল তফাৎ আছে যে। তবে দুয়ের মাঝে এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বটে, দুয়েই চিন্তার বিরতি। মূর্চ্ছাতেও চিন্তা নাই, অপরোক্ষানুভূতিতেও চিন্তা নাই, কিন্তু তবুও দুয়ে আসমান জমীন ফারাক্।

মূর্চ্ছাতে মন চিন্তা করা ছেড়ে দিল, আর চিন্তা-স্রোত বন্ধ হওয়াতে নিদারুণ জড়ত্ব এসে উপস্থিত হল। এই জড়ত্ব হতেই মূর্চ্ছার উৎপত্তি। মূর্চ্ছাতে ক্রিয়ার অভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই সেটা মৃত্যুর মত অবস্থা। কিন্তু সমাধিতে ফুটে ওঠে—পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ।

তোমরা বল, আলোর অভাবই অন্ধকার। যে ঘরে আলো খুব কম, সেখানে গেলে আমরা কিছুই দেখ্‌তে পাই না। আবার তেমনি আলোর আতিশয্যও মানুষের চোখে আঁধার। দুপুরবেলায় সূর্য্যের দিকে তাকাতে পার কি? এখন সূর্য্যের তেজ যতটা আছে, তার চেয়েও যদি তেজ বেশী হত, ধর দশগুণ বেশী তেজ যদি হত, তাহলে কেউ চোখে দেখতে পেত না। বিজ্ঞানে একটা রহস্য আছে—তাকে বলে polarisation of light; আলোর দুটা রশ্মি যদি দুদিকে যায়, তাহলে মানুষের চোখে সেখানে কিছু দেখা যায় না—সেখানটায় অন্ধকার। আলোর অভাবও মানুষের কাছে যেমন অন্ধকার, আলোর অতিশয্যও তাই। তবে কিনা আলোর অভাবে যে অন্ধকার, সে হল আর এক জিনিষ।

তেমনি সমাধিতে যে চিন্তার বিরতি হয়, সে মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তির দরুণ চিন্তা-বিরতির ঠিক বিপরীত। ফল দেখে দুয়ের স্বরূপের পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি

এক জনের মৃগী রোগ হয়েছে; রোগে আক্রমণ করবা মাত্র সে শক্তিহীন, বেহুঁস হয়ে যায়। যতক্ষণ রোগের ভোগ থাকে, ততক্ষণ তার হুঁস থাকে না। আবার যিনি সমাধিস্থ হন, তাঁরও তখনকার মত মনের সকল ক্রিয়া যেন রুদ্ধ হয়ে যায়; আর এই চিন্তা-রোধের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁকে মৃগী রোগীর সঙ্গে তুলনা করা চলে বটে। কিন্তু দু'য়ে কত বড় পার্থক্য, তা ও দেখ। মৃগী রোগী দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তার যেন সকল সামর্থ্য লোপ পেয়ে যায়, সে একেবারে জড়পদার্থ হয়ে পড়ে। আর সমাধির তুঙ্গ-শৃঙ্গ থেকে, আনন্দের প্রস্রবণ থেকে যিনি জগতে নেমে আসেন তাঁর শক্তি সামর্থ্য, জ্ঞান, আনন্দ পরিপূর্ণ মাত্রায় থাকে। তিনি অপরকে নীরোগ করতে পারেন, শক্তি সঞ্চার করতে পারেন, উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর মাঝে তো দুর্ব্বলতার চিহ্ন বিন্দুমাত্রও দেখতে পাই না। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, মূর্চ্ছায় চিন্তালোপ আর সমাধিতে চিন্তালোপে কত পার্থক্য।

তার পর তৃতীয় আপত্তি হল, "মশায়, আমরা প্রাণ চাই, প্রাণ চাই—জড়তা চাই না।"

বেদান্ত বলছেন, বেশ তো, জড় হবে কেন? কেবলি বাসনার স্ফুরণ করতে থাক, থেমো না কোথায়ও! সত্যে বড় স্বতো-বিরোধ থাকে, বিচার করতে হলে দুটা দিকই দেখতে হয়। যারা বলে বেদান্ত দুঃখবাদ শিক্ষা দেয়, তারা ভুল করে। বেদান্ত তোমাকে কর্ম্মের ঠিক পথটা দেখিয়ে দেয়, কি করে জগৎকে তোমার অধীন রাখতে হবে, এই শিখায়।

আচ্ছা, বাসনার কথাই ধর না কেন, বেদান্ত কস্মিন্‌কালেও বলে না যে জড় হয়ে যাও। এ কথা বেদান্ত কিছুতেই বল্‌বে না। সর্ব্বদা কর্ম্মরত হও—এই কথাই সে বলে। বেদান্ত বলছে, তুমি যে বাসনা-কামনা নিয়ে আছ, আসলে সেগুলো মন্দ নয়, কিন্তু তাদের তুমি ঠিক্ ঠিক্ খাটাতে পারছ না। কামনা কি? প্রেম ছাড়া কিছুই না। প্রেম বল্‌তেই, সাধারণতঃ একটা কিছুর প্রতি তীব্র আসক্তি বুঝি। প্রেম যদি কোনও বস্তুর প্রতি তীব্র বাসনা হয়, তাহলে কামনামাত্রেই তো প্রেম ছাড়া কিছু নয়। আর তোমরাই বল, ভগবান্ প্রেমস্বরূপ—কাজেই সমস্ত কামনাই ভগবান্।

তাই যদি হয়, তাহলে যে নিখিল-কামনার সঙ্গে নিজের জীবনকে একাত্ম বলে অনুভব করেছে; তার পর যে জেনেছে, তারই আত্মস্বরূপ বাসনার আকারে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই কামনাই জগৎ শাসন করছে—তার কত আনন্দ! সর্ব্বশক্তিময়ী বাসনার সঙ্গে যে নিজকে এক বলে জেনেছে, 'আমিই সমস্ত কামনার মূল—আমা হতেই কামনার সৃষ্টি—আমিই জগতে বাসনার জনক, নিদান, উৎসমুখ, আত্মস্বরূপ—বাসনার রশ্মি ধরে আমিই জগৎ পরিচালনা করছি"—তার কি আনন্দ। আমার হাতেই তো লাগাম, আমিই তো লাগাম ধরে সকলকে চালিয়ে নিচ্ছি। এই অবস্থায় এসে পৌছালে আর ঘৃণা থাকে না, বৈরিভাব থাকে না। শত্রু মিত্রের বাসনাও তো আমারই বাসনা। আমি অনন্তশক্তিরূপে সমস্ত ক্ষুদ্র বাসনার নিয়ন্তা। এর কামনা—ওর বাসনা—সব আমারই। আমি আত্ম-স্বরূপ—আমি বিশ্ব-বিধাতা! কি আনন্দ! *

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা, —জানুয়ারী, ১৯০৩)

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

—*—

[অনুমান-বিবৃতি]

অল্প কথায় উপাধির একটী লক্ষণ করা হয়—"যাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়া সাধনের অব্যাপক, তাহাই উপাধি।" সাধন দ্বারাই সাধ্যের নিরূপণ হইয়া থাকে। সাধ্য যে সাধনের ব্যাপক, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—যেমন অগ্নি ধূমের ব্যাপক। এই স্থলে সাধ্যের প্রত্যেকটী দৃষ্টান্ত দিয়া সাধনকে বেড়িয়া পাওয়া যায়, সাধন কখনও সাধ্যকে ছাড়াইয়া যায় না। এখন এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া উপাধির লক্ষণ আলোচনা করা যাউক। উপাধি সাধ্য ও সাধন ছাড়া একটা অতিরিক্ত বস্তু। সাধ্য ও সাধনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কিরূপ?—না সে সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নয়। অর্থাৎ উপাধি সাধ্যের সমস্ত দৃষ্টান্তগুলি গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সাধনকে সে এমনভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহাকে বেড়িয়া পায় নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, যে জায়গায় অনুমিতি খাটী হইবে, সেখানে সাধ্য সাধনকে বেড়িয়া পাইবে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে যাহা সাধ্যকেও বেড়িয়া পায়, তাহার সাধনকে বেড়িয়া পাওয়া তো আরও সহজ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু উপাধি যখন সাধ্যকে বেড়িয়া পায়, অথচ সাধনকে পায় না, তাহাতে প্রমাণ হয়, সাধনকে আমি যে আকারে উপস্থিত করিয়াছি, তাহা নির্দ্দোষ নহে। সুতরাং অনুমিতি বিশুদ্ধ করিতে হইলে সাধনকে স্বরূপে উপস্থিত না করিয়া যে উপাধির কথা উত্থাপন করিয়াছি, তাহার সহিত জুড়িয়া প্রকাশ

করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রমাণ হয়, অনুমিতি বিশুদ্ধ করিতে হইলে নিরুপাধিক সাধন বা হেতু মিলিয়াছে কিনা, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উপাধি আবার দুই প্রকার—শঙ্কিত ও সমারোপিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূয়োদর্শনের মাঝে কোনও ন্যূনতা থাকিলে ব্যাপ্তি নির্দ্দোষরূপে নিরূপিত হইতে পারে না ও তজ্জন্য হেতুও নিরুপাধিক হয় না। সুতরাং উপাধির সম্ভাবনা উপস্থিত হয় ভূয়োদর্শনের ন্যূনতা হেতু। ভূয়োদর্শনের ন্যূনতা পরিহার করা সকল সময় সম্ভব নয়। কেন না আমরা তো সর্ব্বজ্ঞ নহি, কিম্বা আমাদের ইন্দ্রিয় যে অবিকল, এমন কথাও বলিতে পারি না। কোনও কোনও স্থলে আমরা নিশ্চিত বুঝিতে পারি, আমাদের ভূয়োদর্শনে কোনও ত্রুটী নাই। যেমন অগ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ। ইহাদের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা সহজ এবং আমরা নিঃসংশয়ে এ কথাও বলিতে পারি যে, সম্প্রতি যে বিধি বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া জগৎ চলিতেছে, এই বিধান বজায় থাকিলে অগ্নি ও ধূমের সম্পর্ক আমরা দশবার যেমন দেখিয়াছি, বিশবার দেখিলেও তেমনই দেখিব —চিরকাল সকলেই তেমনি দেখিয়া আসিয়াছে। এস্থলে ব্যাপ্তি নিরূপণ নির্দ্দোষ হইতে পারে। যেথানে নির্দ্দোষ ব্যাপ্তি নিরূপণ সম্ভব, সেথানে যদি ভ্রমক্রমে কেহ দুষ্ট হেতু সহায়ে অনুমান করিতে যায়, এবং আমরাও ব্যাপ্তির দোষ ধরিয়া উক্ত সাধনের বা হেতুর উপাধিটী চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে বলিব, এইটী সমারোপিত অথবা নিশ্চিত উপাধি। পূর্ব্বোক্ত অগ্নি হইতে ধূমের অনুমানে আর্দ্রেন্ধন একটী সমারোপিত উপাধি।

শঙ্কিত উপাধির দৃষ্টান্তস্থল কিরূপ বলিতেছি। মিত্রা বলিয়া একটী কালো মেয়ে আছে। এ যাবৎ তাহার সাতটী সন্তান জন্মিয়াছে—সকল কয়টাই কালো। এইবার তাহার অষ্টম গর্ভ। গর্ভস্থ শিশুটী কি বর্ণের হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় কেহ যদি এইরূপ অনুমান করে যে, "অষ্টম শিশুও কালই হইবে, কেননা সে ত মিত্রারই ছেলে (শ্যামঃ, মিত্রাতনয়ত্বাৎ)"—তাহা হইলে আমরা ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতে পারি। অবশ্য ভূয়োদর্শনে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, অষ্টম শিশুর যে শ্যামত্ব (সাধ্য), তাহার হেতু মিত্রাতনয়ত্ব। কিন্তু কেবল মিত্রার ছেলে বলিয়াই কালো হইবে, এটা নিতান্ত গায়ের জোরের কথা। একটু সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিয়া বলিতে পারি যে, জননীর গর্ভস্থ ভ্রূণের সহিত তাঁহার আহারাদি ও দেহস্থ রসের বিকারের নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। সুতরাং জননীর ভুক্ত দ্রব্যের বিশিষ্ট পরিণতির সহিত সন্তানের বর্ণের সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব। তাহা হইলে অষ্টম গর্ভের শ্যামত্বরূপ সাধ্যের পক্ষে তুমি যে মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতু বা সাধন উপস্থিত করিয়াছ, আমি তাহার উপাধি উপস্থিত করিলাম—"বিশিষ্ট আহারপরিণতি।" আমার ধারণা, বিশিষ্ট আহারপরিণতিই মিত্রাতনয়ের শ্যামত্বের প্রয়োজক। কিন্তু এই উপাধিদ্বারা মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতু সংশোধিত করিয়া লইলেও আমরা অনুমিতির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। কেননা এ স্থলে বিশিষ্ট আহারপরিণতিই যে শ্যামত্বের প্রয়োজক —ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। জননীর দেহের কিরূপ বিকারে যে সন্তানের দেহে বর্ণবিকার হয়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। ইহার কার্য্যকারণভাব

আবিষ্কার করা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও সম্ভবপর হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তবে বিশিষ্ট আহারপরিণতি যে শুদ্ধ মিত্রা-তনয়ত্ব অপেক্ষা শ্যামত্বের বলবত্তর প্রয়োজক, ইহা সুস্পষ্ট। এই জন্য বিশিষ্ট আহার-পরিণতিকে উপাধি বলিতেছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কার্য্য-কারণ আমাদের অজ্ঞাত বলিয়া ইহাকে শঙ্কিত উপাধি বলিতে চাহি। হেতুতে যাহাতে এইরূপ শঙ্কিত উপাধি জুটিবারও অবসর না থাকে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আচার্য্যের আর একটী কথা বুঝিতে বাকী। আচার্য্য বলিতেছেন, অনুমানের পক্ষে পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান আবশ্যক। এক্ষণে পক্ষ কাহাকে বলি?—যেখানে সাধ্যের সন্দেহ হইতে পারে, তাহাই পক্ষ। যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিলাম; দেখিয়া সন্দেহ হইল এখানে অগ্নি আছে কিনা। সর্ব্বত্রই অনুমানের পূর্ব্বে সন্দেহ থাকে। এরূপস্থলে নিশ্চয় জ্ঞান হওয়ার উপায় নাই—তাহা হইলে প্রত্যক্ষই হইয়া যাইত, অনুমানের আর অবকাশ থাকিত না। ইহার পর ব্যাপ্তি স্মরণ করিয়া পর্ব্বতে ব্যাপ্তিজ্ঞানসংস্কৃত ধূমের পরামর্শ করিয়া অগ্নির অস্তিত্বসম্বন্ধে কিরূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এরূপস্থলে পর্ব্বতই পক্ষ। পর্ব্বতে অগ্নি আছে কিনা ইহাই সন্দেহ হইয়াছিল। সাধন ধূম পর্ব্বতেই দৃষ্ট হইয়াছিল। ফল কথা, সার্ব্বভৌম ব্যাপ্তির বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়, তাহাই পক্ষ। অগ্নি ও ধূমের সার্ব্বভৌম ব্যাপ্তি জানি—পর্ব্বতে তাহার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত পাইলাম; এই পর্ব্বতই পক্ষ। অবশ্য এই লক্ষণ প্রাচীন নৈয়ায়িকের। নবীনেরা সংশয়কে অনুমিতির গুরুতর কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। বিচার জটিল হইবে আশঙ্কায় আমরা এখানে প্রাচীন লক্ষণই উপস্থিত করিলাম।

হেতুর, পক্ষে বর্ত্তমান থাকাকে বলে পক্ষ-ধর্ম্মতা। শুধু ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেই অনুমান হয় না, বিশেষস্থলীয় ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমানের কারণ, ইহাতেই আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু হেতুকে সেই বিশেষস্থলে আবির্ভূত না দেখিলে তো তৎসংসৃষ্ট সাধ্যের অনুমান হইতে পারে না। তাই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান অনুমানের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়।

অনুমানের ভেদ

[মোটামুটী অনুমানের পরিচয় দেওয়া হইল। এখন অনুমান কয় প্রকার দেখা যাউক।] অন্যান্য শাস্ত্রেও অনুমানের প্রকার-বিশেষ কথিত হইয়াছে। উহা সাংখ্য-শাস্ত্রকারেরও অভিমত। তাই তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কারিকাকার বলিতেছেন—"তিন প্রকার অনুমানের কথা বলা হইয়া থাকে।" অর্থাৎ পূর্ব্বে আমরা অনুমানের সামান্য লক্ষণ করিয়াছি মাত্র, কিন্তু বিশেষভাবে দেখিলে অনুমান তিন প্রকার—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

আবার বীত ও অবীত ভেদে অনুমানকে দুইভাগেও ভাগ করা যাইতে পারে। যাহা অন্বয়মুখে প্রবর্ত্তিত হইয়া একটা কিছু বিধান করে, তাহাকে বীত বলে। আর যাহা ব্যতিরেকমুখে প্রবর্ত্তিত হইয়া একটা কিছু নিষেধ করে, তাহা অবীত অনুমান।

তাহার মধ্যে অবীত অনুমান শেষবৎ। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই শেষ বলে। এই শেষই যেখানে অনুমানজ্ঞানের বিষয়, সেখানে শেষবৎ অনুমান। তাই ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, "কোনও স্থলে একটা কিছু প্রসক্ত হইলে (অর্থাৎ সে স্থলে তাহার অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইলে), যদি তাহাকে সেস্থলে প্রতিষিদ্ধ করা যায়, এবং অন্যত্রও তাহার প্রসঙ্গ যদি প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধের পর অবশিষ্ট স্থলে উক্ত বস্তুর অস্তিত্বের যে সম্যক্ প্রত্যয় জন্মে, তাহাকেই পরিশেষ বলা হয়।" অবীত ব্যতিরেকি অনুমানের উদাহরণ পরে বলিব।

বীত অনুমান দুই প্রকার—পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ব্ব অর্থে প্রসিদ্ধ; যে সামান্যধর্ম্মের স্বলক্ষণ (স্বরূপাশ্রয়) পক্ষ ছাড়া অন্যত্রও রহিয়াছে, তাহাকে পূর্ব্ব বলা যাইতে পারে। এই প্রকার পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ বস্তু যেখানে অনুমান জ্ঞানের বিষয় হয়, সেখানে পূর্ব্ববৎ অনুমান হইয়া থাকে। যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নিত্বরূপ ধর্ম্মবিশেষ পর্ব্বতে অনুমিত হইল; এই বহ্নিত্বরূপ ধর্ম্মবিশেষের স্বরূপাশ্রয় বহ্নিবিশেষ ইতঃপূর্ব্বে পাকশালাতেও দেখা গিয়াছে। [ইহাই পূর্ব্ববৎ অনুমানের স্থল।]

আর একপ্রকার বীত অনুমান আছে, উহা সামান্যতোদৃষ্ট। এরূপ স্থলে যে বস্তুধর্ম্মের স্বরূপাশ্রয় অন্যত্র দৃষ্ট হয় নাই, এই প্রকার বস্তুই অনুমানজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। যেমন ধর, ইন্দ্রিয়বিষয়ক অনুমান। আমাদের রূপাদিজ্ঞান হইয়া থাকে। উহা ক্রিয়া সুতরাং তাহার করণ আছে এইরূপ তর্কসহায়ে আমরা ইন্দ্রিয়ের অনুমান করিয়া থাকি। যদিও "ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠার" ইত্যাদি স্থলে আমরা করণত্বরূপ ধর্ম্মের স্বরূপাশ্রয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তথাপি রূপাদি জ্ঞানের যে জাতীয় করণত্ব অনুমান করিতে চাহিতেছি, সে জাতীয় করণের স্বরূপাশ্রয় আমরা কোথায়ও প্রত্যক্ষ করি না। এই করণ ইন্দ্রিয় জাতীয়। ইন্দ্রিয়ত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের স্বলক্ষণ বা স্বরূপাশ্রয় হইল ইন্দ্রিয়বিশেষ। কিন্তু বহ্নিত্বসামান্যের স্বলক্ষণ বহ্নি যেরূপ আমাদের মত মর্ত্ত্য জীবের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় তো সেরূপ হয় না। [এইরূপ স্থলেই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের অধিকার।] পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট—এই উভয়ই বীত অনুমান হইলেও এইখানেই ইহাদের পার্থক্য।

সামান্যের দর্শনকেই সামান্যতোদৃষ্ট বলা হইয়াছে। সামান্য শব্দের উত্তর সার্ব্ববিভক্তিক তসিল্ প্রত্যয় করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেখানে শুধু সামান্যধর্ম্ম দেখিয়া অনুমান করিতে হয়, উহার স্বলক্ষণ বা স্বরূপাশ্রয় কোথায়ও দেখা যায় না, সেখানেই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান, ইহাই ফলিতার্থ। এই সমস্ত কথা আমরা ন্যায়বার্ত্তিকের তাৎপর্য্যটীকায় বুঝাইয়া বলিয়াছি, পুঁথি বাড়িবার ভয়ে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

সাধন-নিষ্ঠা

—✱—

আমরা ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারি নাই—তাঁহার কথা শুনিয়াছি মাত্র। ভালবাসিলে তাঁহাকে অনুভব করিবার জন্য প্রাণ নিয়তই আকুলি-বিকুলি করিত। ঐকান্তিক আকুলতা যার আসিয়াছে, তার মন অন্যদিকে যাইতে পারে না। তবুও যে ভালবাসা ভালবাসা করি, সে শুধু শোনা কথার প্রতিধ্বনি মাত্র—তাহা হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে ইহাতেও লাভ আছে। ক্ষণেকের জন্যও যে তাঁহার কথা মনে হয়—ইহা হইতেই অখণ্ড অনুভূতি একদিন আসিয়া পড়িবে। ক্ষণেকের সাধনাই অনুশীলনের ফলে চিরন্তন হইয়া শান্তির সুধাধারায় একদিন হৃদয়কে আপ্লুত করিবে। এর জন্য নিষ্ঠা চাই।

নিষ্ঠাসহকারে অনুষ্ঠান মানিয়া চলিলে যাঁহার জন্য অনুষ্ঠান, তাঁহাতে রুচি আসিবে। ক্ষণিক উচ্ছ্বাসবশে যে রুচি, সে রুচি হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দিনের পর দিন যদি তাঁর নামে একটা নিয়ম মানিয়া চলি, সেই নিয়মপালনের উদ্দেশ্য যদি তিনিই হন, তবে আপনা হইতেই নিয়মে রসের সঞ্চার হইবে। এই রস বা আনন্দই তিনি—জগৎকে নিয়মে বাঁধিয়া তার মাঝে রস-স্বরূপে অরূপ থাকিয়া সকলের মাঝে তিনি প্রাণসঞ্চার করিতেছেন। নিয়মের ভিতর তাঁহাকেই অনুভব করিতে হইবে—তবেই সাধনা যদি দেহের পক্ষে মনের পক্ষে কঠোরও হয়, তবুও তাহাতে প্রাণে অহৈতুকী তৃপ্তি আসিবে,—ভগবানে রুচি হইবে।

এ রুচির আস্বাদন যে পাইয়াছে—সে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না—তার আর ভুল পথে পা পড়িবে না। তাঁহাতে রুচি হইলেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের যোগ সুস্পষ্ট হয়। জগতে কিছুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্পষ্ট হয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। চোখ মেলিয়া থাকিলেই একটা কিছু দেখিতে পাইব—কিন্তু চোখ বুজিলে তো সবই অন্ধকার।

কিন্তু তাঁহাতে রুচি হইলে তাঁহার সঙ্গে যে যোগ অনুভূত হয়, তাহা অতীন্দ্রিয়—কাজেই তাহা অবিচ্ছিন্ন এবং অতি সুস্পষ্ট। মহৎ একটা কিছু অন্তরে পাইলে বাইরের ক্ষুদ্র বস্তুকেও মানুষ প্রেমের দৃষ্টি নিয়া দেখিতে শিখে—এ দৃষ্টি যেমন সত্য, তেমন শিব, তেমনি সুন্দর। তাঁহাতে রুচি হইলে এই দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তখন সাধকের কাছে বিষম বা অসুন্দর কিছু থাকিতে পারে না—থাকিলেও দৃষ্টিগুণে তাহা সুষম এবং মঙ্গলপূর্ণ হইয়া উঠে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সকল বিক্ষোভ যখন মিলাইয়া যায়, তখন একটা বিরাট্ প্রশান্তি আসিয়া অন্তরকে নিয়তই তাঁহার ধ্যানে জাগাইয়া রাখে।

নিরত ধ্যাননেত্রে তাঁহাকে যখন অনুভব করিতে পারিব, তখনই নিষ্ঠার প্রয়োজনের আবরণ খসিয়া যাইবে—তাহার ভিতর যে সত্যটুকু, তাহা তখন আমার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। নিষ্ঠাই মনকে প্রশান্ত এবং সংযত করে। প্রথমে ইহা হয়ত জোর করিয়া করিতে হয়। কিন্তু এই প্রশান্তি বা সংযতভাব যখন স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, তখন আপনা হইতেই

তিনি প্রকাশিত হন। প্রশান্ত মনেই তাঁর বিকাশ। পবিত্র দেহ মন লইয়া এই বিকাশকে ধারণা করিলে প্রাণে প্রেম জাগে—সঙ্কীর্ণ কামনা প্রেমাম্বুধিতে তখন বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যায়।

কামনা জয় হইয়া গেলে ব্যর্থ মরুময় জীবন স্বরসে সার্থক হইয়া উঠে। তখন প্রত্যেকটী পদবিক্ষেপ আনন্দের, প্রত্যেক দৃশ্য আনন্দের—সব কাজের মাঝেই মনের একটা অসীম তৃপ্তি তখন সর্ব্বদা অব্যাহত থাকে। এ ভাব যে আভাসে পাইয়াছে—তার প্রাণও কি জানি কি পাইয়া বিপুল আবেগে আকুল হইয়া উঠে। এ আবেগকে সে ধরিয়া রাখিতে পারে না বটে—কিন্তু ক্ষণেকের তরেও সে যে একটা অজানা পুলক জাগাইয়া দেয়, তাহার স্মৃতিতেই সাধনপথ সাধকের পক্ষে মধুময় হইয়া উঠে। এই স্মৃতিই আমাদের নিষ্ঠার মূল—ধৈর্য্যের আশ্রয়।

———
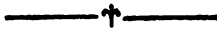
মনোলয়

—*—

(ভক্তিমার্গ)

জগতের সমস্ত ধর্ম্মের মূলে এক মহাসত্য—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সেই এক ব্রহ্মবস্তু; তিনি মনের অনুভূতিগম্য নহেন। মনোলয় হইলে ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশিত হয়। মন থাকিলেই রূপ আছে, কারণ মনের সহিত রূপের নিত্য সম্বন্ধ। তাই সাকার ও নিরাকার উপাসনায় অধিকারিভেদ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব পুষ্ট না হইলে সাকারবাদে বা সগুণোপাসনায় পূর্ণ রসাস্বাদন হয় না। উত্তম অধিকারী বিচার দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া এই অনন্ত জগৎকে এক অখণ্ডভাবে দেখিতে চেষ্টা করিবেন এবং যোগানুষ্ঠানে হৃদয়ে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার পর ভক্তিতত্ত্বের অধিকারী হইবেন।

ত্রিতত্ত্ব ও ভক্তের স্থান

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী, জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ।

—অর্থাৎ যোগী তপঃপরায়ণগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—শাস্ত্রজ্ঞানবানদিগের অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ ভক্তের স্থান দর্শাইতে বলিতেছেন—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

—যোগীদিগের ভিতর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও আমাতে তদ্গতচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন, এতাদৃশ ভক্তই শ্রেষ্ঠ—অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি আমার ভক্ত হও।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহা পিতা বসুদেবের সম্যক্ বুঝিবার সামর্থ্য না থাকায়—নারদমুখে ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়া তৎপরে তিনি ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব একান্ত প্রয়োজন। এই তিন তত্ত্বেরই উদ্দেশ্য

এক হইলেও এক ভগবত্তত্বেই সর্ব্ব তত্ব পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

উক্ত ত্রিতত্ব কি ভাবে ভগবত্তত্বকে স্পষ্ট করিয়াছে তাহা প্রেমের মহাজন শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন—

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভক্তি ত্রিবিধ প্রকাশে॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি মার্গে ভজে সেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তারে করে অনুভব॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥"

সুতরাং ভাবতত্ব বুঝিতে এই ত্রিতত্বের একান্ত আবশ্যক। এই ত্রিতত্ব বুঝিলেই মানব ভক্ত পদবাচ্য হয় এবং প্রকৃত ভক্তির বিমল স্রোত তাহার হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় নিভৃতে বহিতে থাকে।

বর্ত্তমানে কালের প্রভাবে প্রকৃত শিক্ষার অভাবহেতু ভক্তির সহিত জ্ঞান ও যোগের সংস্রব নাই। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-রাশি পশ্চাতে থাকায়, শিক্ষার অভাব হইলেও ভক্ত হৃদয়ে যেন কোনও এক অজানা অভাব অনুভব করেন। মন প্রাণ যেন কাহার দিকে ছুটিয়া যায় এবং একটা শক্তির উপর বিশ্বাস এবং বিশ্বাস-হেতু ভক্তির উদয় হয়। এতাদৃশ নিম্ন অধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রকারগণ প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন—বলিয়াছেন "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্।" কাজেই নিম্ন অধিকারিগণ ঠিক বিপরীত দিক দিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হন। তাঁহাদের বহু ক্লেশে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইতে হয়।

প্রতিমাপূজায় যোগানুষ্ঠান

স্বল্পবুদ্ধিগণ প্রতিমাই দেবতা, এইরূপ জ্ঞানে প্রতিমার অর্চ্চনা করেন না। চঞ্চল মনকে স্থির করিবার জন্য মনের অবলম্বনস্বরূপ কোন প্রতিমায় (ব্রহ্ম নয় এরূপ বস্তুতে) ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বা "তন্ময়ং সকলং জগৎ" জ্ঞানে প্রতিমাও ব্রহ্মময় মনে করিয়া তাহারই চিন্তায় তন্ময়তা লাভ করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রতিমার অর্চ্চনাপদ্ধতি আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিমাপূজায় সম্পূর্ণরূপে যোগানুষ্ঠান বর্ত্তমান। যোগ ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব। বিস্তৃত ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজা-অর্চ্চনা অর্থশূন্য। এই বিস্তৃত ভূতশুদ্ধির এক-মাত্র উদ্দেশ্য শিবশক্তির মিলন। ভগবানকে প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠান করিতে সম্ভাষণ করতঃ বিস্তৃত ভূতশুদ্ধি করিয়া জপাদি করিতে হয়। পরে জপ সমর্পণ বিধেয়। এইরূপ ভাবে ভক্তির সাধন করিতে করিতেও ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎকৃপায় অদ্বৈতজ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাদি ভক্ত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই শ্রেণীর সাধক সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ। কারণ ভাব মানুষের মজ্জাগত। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানুষের ভিতর একমাত্র ভাবেরই একটানা উন্মেষ হইয়া থাকে। শৈশব হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত বালক শুধু

ভাব

মাতাপিতাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করে। কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত সখ্য ভাব তাহাদের প্রবল হয়। যৌবনে মধুর ভাবের উন্মেষ হয়—প্রৌঢ়ে বাৎসল্য স্নেহের উদয় হয় বার্দ্ধক্যে শান্ত ভাব উপস্থিত হয়। মানবজীবনের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত একমাত্র ভাবেরই উন্মেষ

হইয়া থাকে। ভাব বলিতে প্রাণের টানকে বুঝিব। কিন্তু এই ভাব স্বার্থদুষ্ট বিধায় ইহা মিশ্রিত ভাব মাত্র। স্বার্থশূন্য ভাবই প্রকৃত ভাব—সে ভাবে ভাবিত হইলে জগন্ময় মনোময় মন্ত্রমূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দেন।

দ্বাপরযুগের শেষ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে জ্ঞানের ও কর্ম্মের সাধন এতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ভক্তিতত্ত্বের আংশিক ভাব বা শুদ্ধ দাস্যভাব মাত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভক্তিতত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ ভাব একমাত্র মধুরভাবেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই এক মধুর ভাব বা শুদ্ধ প্রেমলীলা প্রকাশ করিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বের আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীভগবান স্বীয় শক্তিত্রয়ের অন্যতম হ্লাদিনীশক্তির সহিত ইচ্ছাদেহ বা মায়িক দেহ ধারণ করিয়া জীবকে প্রেমানন্দ আস্বাদন করাইতে শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তির এই পঞ্চবিধ ভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে মনোলয়পদ্ধতি দেখাইলে সর্ব্ববিগ্রহের উপাসনায় মনোলয়-পদ্ধতি দেখান হইবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ং

কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি ও ব্রজের গোপীজনবল্লভকে বুঝিলেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের সাধনাশক্তি দিতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম। তিনি

> ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
> শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

—অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মের ঘনীভূত মূর্ত্তি। বা প্রকাশ (জড় বা ক্ষুদ্রবস্তুর সহিত তুলনায় দেখাইতে গেলে—যেমন সূর্য্য জ্যোতির প্রকাশ)। আমিই সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের একমাত্র আবাসস্থান। আমাতেই নিত্য মোক্ষ—সনাতন ধর্ম্ম ও অনন্ত সুখ বিরাজ করিতেছে।

পুনশ্চ বলিতেছেন—

> দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
> উত্তমপুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
> যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
> অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

—এক সৎস্বরূপ পরমাত্মা তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। পঞ্চকোষাত্মক যে দেহ, তাহাই ক্ষর, এবং যিনি এই সমস্তের অধিষ্ঠাতা বা মায়াশক্তি-সম্বদ্ধ অথচ নির্লিপ্ত, তিনিই কূটস্থ অক্ষরপুরুষ বা জীবচৈতন্য বা জীবাত্মা। কিন্তু পরমাত্মা ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অতীত বা উত্তম কারণ। তিনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—এই পঞ্চকোষময় ক্ষর পুরুষ বা শরীর ও তন্মধ্যস্থিত বা মায়াশক্তিতে সম্বদ্ধ কূটস্থ জীব চৈতন্য বা অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম—যেহেতু তিনি এই উভয়কেই স্বীয় চৈতন্যশক্তি দ্বারা প্রকাশিত করিতেছেন। তজ্জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন—"আমি বেদে পরমাত্মরূপে কথিত হইয়াছি। যেহেতু আমি জড়সমূহের অতীত ও চৈতন্যের নিয়ামক—তজ্জন্য বেদে ও লোকে উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত।"

আবার বলিতেছেন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"—আমি কাল—কত দ্যুলোক ভূলোক আমাতে "উদ্ভন্তি সন্তি শৈলিন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ"—কত কত সৌরজগত আমাতে

উঠিতেছে—অবস্থান করিতেছে, লয় হইয়া যাইতেছে। দুর্য্যোধনাদি ত অতি তুচ্ছ। কেবল আমিই আছি সাক্ষি-স্বরূপ।"

কৃষ্ণলীলা

তত্ত্বমসি-প্রতিপাদক

শ্রীকৃষ্ণই মহাকাল, কারণ "কর্ষয়েৎ কালরূপেণ যঃ স কৃষ্ণঃ।" তাহা হইলেই দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমাত্মরূপী "তৎ" পদার্থ। এই "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থের "অসি" পদের দ্বারা মিলন উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে একে একে একাদশ প্রকার যোগ যথা: কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, রাজযোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপদর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, মোক্ষযোগ উপদেশ দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, ইহার যে কোন যোগ দ্বারা জীবাত্মা শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপোপাসনা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে সম্যক্ পায় না। পাইলেও যে শান্তিলাভ করিতে পারে নাই—তাহা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া-ছিলেন যে, সগুণ ব্রহ্মও ধারণার অতীত এবং তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥"

এর মধ্যেই শ্রীভগবান পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তপস্বী অপেক্ষা জ্ঞানী, জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী এবং যোগী অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশেষেও তাহাই বলিলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ বলিলেন অর্জ্জুন, আমার সহজ সরল এবং শেষ কথা এই যে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় এবং দেহধর্ম্ম, লৌকিক প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক আমাকেই ভজনা করিলে মোক্ষলাভ হইবে।

শ্রীভগবান্ কথাটা ঠিক স্পষ্ট ভাবে না বলিয়া ঘুরাইয়া ইহাই বলিলেন যে, বৃন্দাবনে আমার শক্তিত্রয়ের অন্যতম হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধা যেরূপ ভাবে আমাকে ভজনা করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন—সেইরূপ প্রেম চাই। তাহা হইলেই মোক্ষের অধিকারী হইবে।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম কি আর এমনি সহজ জিনিষ? অভিমানশূন্য হতে হবে। বৃক্ষের যেমন বীজ না পচ্‌লে তা হতে অঙ্কুর বের হয় না, মানুষেরও অভিমানটী একেবারে নষ্ট না হলে ধর্ম্মের অঙ্কুরই জন্মায় না। অভিমান যতকাল আছে, ততকাল প্রকৃত ধর্ম্মের নাম-গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্‌বে, জীয়ন্তে মৃত হতে হবে।

—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ব্যাকুলতা

—*—

ভগবানকে পেতে হলে আগে ব্যাকুলতা চাই। সাধন-ভজনের যোগাড় পরে হবে। মন-মুখ এক না করে শুধু আড়ম্বর করলে কি হবে?

আবার ব্যাকুলতাও তীব্র হওয়া চাই। ব্যাকুলতা অর্থে বিরহ। যার সত্য বিরহ জাগে, তার এক মুহূর্ত্ত ফাঁক যায় না। প্রাণের মাঝে তুষের আগুন জ্বলতেই থাকে। তখন সংসার বিষ বলে মনে হয়। তার মানে সবার উপর যে একটা বিরক্তি ধরে যায়, তা নয়। বিরক্তি হবে নিজের উপর। এই দেহের এত তোয়াজ করছি—এই ইন্দ্রিয়ের এত সেবা করছি—কিসের জন্য? যদি তাঁকেই না পেলাম, তবে এ দেহ পাত হয় না কিসের জন্য? তবুও এই দেহ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে হবে?

নিজের উপর এমনি গ্লানি এলেই বৈরাগ্য জন্মে। তখনই বাস্তবিক সংসার বিষ হয়ে যায়। কারুর উপর রাগ করে নয়; রাগ করবে কার উপর? তখন কি আর অন্যজ্ঞান থাকে যে তার উপর বিরক্তি আসবে? তখন যত জ্বালা সব নিজের বুকে!

সময় বুঝে ভগবানও তখন জ্বালা আরও বাড়িয়ে দেন। জঞ্জাল দিন দিন বাড়তেই থাকে—আর মনের সকলগুলি শিকড় ধরে কে যেন টান দেয়। একটুও মাটীর সঙ্গে যোগ থাকবার উপায় নাই—সব উপড়ে ফেলতে হবে। বিষয়চিন্তা একটু থাকলেও তো তাঁকে পাওয়া যাবে না।

যার জলুনি যত বেশী, সে তত সহজে ত্যাগ করতে পারে। ধীরে সুস্থে ত্যাগ করতে গেলে চলে না। তবে বিচার করেও ত্যাগ এক সময় করতে হয় বটে। ওটা প্রথম অবস্থার কথা—পশুভাবের সাধনা। ত্যাগ তখনি সত্য হবে, যখন জানতেও পারবে না যে ত্যাগ করেছ। গরম লোহার উপর হাতুড়ীর ঘা পড়লে আগুনের ফুলকি যেমন ছিট্‌কে পড়ে, তেমনি তখন সংসার থেকে মানুষ ছিট্‌কে পড়ে। তার কি আর বিচার করবার সময় থাকে? আগুনের তাতে যার শরীর জ্বলে গেছে, সে পাগলের মত জলের পানে ছুটে যায়।

রঘুনাথ দাসের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু উদয় হলেন। ঘরে আর মন টিকে না—বারবার পালিয়ে যান। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য—সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিলেন—কিন্তু তবু ছেলে পোষ মানে না। মা বললেন, ও পাগল হয়েছে, ওকে বেঁধে রাখ। বাবা বললেন,

> ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্যভোগ স্ত্রী অপ্সরাসম,
> ইহাতে বান্ধিতে যার নারিলেক মন—
> দড়ির বাঁধনে তারে রাখিবে কিমতে?
> জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে।
> চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হ'য়াছে ইহারে—
> চৈতন্যপ্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে?

এই ব্যাকুলতা—এই বিরহ তাঁর জন্য যাতে হয়, তার জন্য দিনরাত প্রার্থনা কর। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবার যো নাই।

তিনিই কৃপা করে সংসারের বাঁধন ঢিলা করে দেন—তখনই তাঁকে মনে পড়ে। কিন্তু কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়লে তো হবে না—একটানা স্মৃতি চাই। তার জন্য কেবল প্রার্থনা কর—কেবল বল, "হে প্রভু, আমার সব সুখ হরণ করে শুধু বিরহের দুঃখ দাও।" বিরহই তো ভক্তি। ভক্তি ছাড়া মুক্তি কোথায়? "মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"—জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যও এ কথা বলেছেন।

ঐকান্তিকতা যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ নিজে নিজে একটা কিছু বাহাদুরী করতে যেও না। শুধু আয়োজন করলে কি হবে, শক্তি থাকা চাই—তাঁর দিকে মনটী দেওয়া দেওয়া চাই। শরৎকালে মেঘ গর্জ্জে কেবল, বর্ষে না। অহঙ্কার করে সংসারে একটা কিছু করা যায়, কিন্তু ভগবানকে অহঙ্কার দিয়ে পাওয়া যায় না। তাঁর ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন করতে হবে। "আমি শরণাগত—কি করতে হবে না হবে, তা তিনিই জানেন। তিনিই সব আয়োজন করে দেবেন। আমি আয়োজন করতে চাই না—আড়ম্বর করতে চাই না—আমি চাই তাঁকে।"

"সংসারের জ্বালা বাড়িয়েছেন বলে নালিশ করব কার কাছে? আমার মতলব মত সাধন ভজন করতে পারছি না বলে যদি জ্বালা মনে করে থাকি, তবে ও তো বিরহের জ্বালা নয়—ও হচ্ছে অভিমানের জ্বালা। আর সংসারে ভাল হোক্, মন্দ হোক্—সুব্যবস্থা হোক্, কুব্যবস্থা হোক্—তবুও তাঁকে পাইনি বলে যদি জ্বালা বেড়ে থাকে—তবে সে জ্বালা আমার মাথার ভূষণ। জন্মজন্মান্তর এই জ্বালাতেই যেন জ্বলে মরি। সংসার থাকবে কি না থাকবে—তা তিনিই জানেন—আমি চাই আত্মহারা হতে।"

এমনি ব্যাকুলতা যার মাঝে জেগেছে—সেই যথার্থ বৈরাগী। ঘর আর বন তার কাছে এক। মোড়লী ছাড়—বাহাদুরী ছাড়—আগে তদ্‌গত হও। ভগবানের জন্য এক দিন একটু কেঁদেই বলো না, আমার বৈরাগ্য হয়েছে। জন্মভরা কাঁদা চাই—নিরন্তর কাঁদা চাই। একটানা বিরহ হলে তবে সে অসাধনের ধনকে পাওয়া যাবে।

একনাথ

—*—
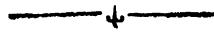
ইতিপূর্ব্বে আমরা দাক্ষিণাত্যের তিন জন মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়াছি। আজ দাক্ষিণাত্যের আর একজন মহাপুরুষ শ্রীশ্রীএকনাথের জীবনকথা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

রাজা যে নগরে যান, সেখানে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অভ্যর্থনা ও অবস্থানের আয়োজন চলিতে থাকে। মহাপুরুষেরাও যে কুল ধন্য করিয়া আবির্ভূত হন, সে কুলে প্রায়শঃই কিছু না কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। একনাথ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের

প্রতিষ্ঠানপুর বা পৈঠান সহর আমাদের অপরিচিত নহে। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, নিবৃত্তিদেব ও জ্ঞানেশ্বরকে একদিন উপনীতগ্রহণের অনুমতির জন্য এই পৈঠানের পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল। পৈঠানকে দাক্ষিণাত্যের বারাণসী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৈঠানে ভানুদাস নামে এক পরম-ভক্তিসম্পন্ন সদ্গৃহস্থ বাস করিতেন। পন্ধর-পুরের বিঠোবা দেব তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। সে যুগে পন্ধরপুর ও তাহার বিগ্রহের খ্যাতি সমস্ত দাক্ষিণাত্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় একবার তীর্থভ্রমণোপলক্ষ্যে পন্ধরপুরে আসিয়া বিঠোবা ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়া যান যে, বিগ্রহকে তাঁহার রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজার ত ধনবল জনবলের অভাব নাই, তাই ভক্তের কাতর মিনতি উপেক্ষা করিয়া প্রাণারাম ঠাকুরটীকে তাঁহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে তাঁহার কোন সঙ্কোচ হইল না। নিরুপায় হইয়া সকলেই নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু ভানুদাসের প্রাণ রাজার এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শক্তিতে রাজার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবার সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? তবে যেমন করিয়াই হউক ঠাকুরকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সঙ্গোপনে রাজার পিছু পিছু যাত্রা করিলেন।

রাজা বিগ্রহ আনিয়া মহাসমারোহে রাজধানীতে স্থাপন করিলেন, স্বর্ণালঙ্কারে বিগ্রহকে সাজাইলেন। ভানুদাস কেবল নির্জ্জনে একবার মন্দিরে প্রবেশ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা একবার তিনি ঠাকুরকে একলা পাইলে তাঁহার মনোভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন—কাঙ্গালের ঠাকুর কি রাজার রাজভোগ খাইয়াই ভুলিয়া থাকিবেন, না আবার তাঁহার অখ্যাত ভক্তদিগের পূজা লইতে পন্ধরপুর ফিরিয়া যাইবেন। সন্ধানে থাকিতে থাকিতে একদিন সুযোগ মিলিয়া গেল—ভানুদাস একদিন রাত্রে চুপি চুপি মন্দিরে প্রবেশ করিতে পাইলেন। বহুদিনের প্রবাসী প্রিয়জনকে পাইলে বিরহী যেমন সংজ্ঞাহারা হইয়া আকুলভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, ভানুদাসও আজ তেমনি নির্জ্জনে ঠাকুরকে পাইয়া প্রাণের আবেগে জড়াইয়া ধরিলেন—কি যে তাঁহাকে বলিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না, কেবল ঠাকুরের বুকে মুখ রাখিয়া চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিলেন।

ভক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। ভক্তপ্রাণের আবেগে পাষাণপ্রতিমার মাঝে প্রাণের সঞ্চার হইবে, ইহা অসম্ভব কিছুই নয়। আমরা অজ্ঞানে অন্ধ, অথচ অভিমকায় পাবপূর্ণ, তাই এ সমস্ত ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিই। পাষাণে প্রাণসঞ্চার যদি মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিই, তাহা হইলে এই যে সংসারে নিত্য চোখের উপর কত জড় দেহে প্রাণের খেলা দেখিতে পাইতেছি, ইহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করি কেন?—এ ও তো মায়া। বৈজ্ঞানিকও বলেন, প্রাণ মৌলিক শক্তি—সর্ব্বত্রই প্রাণ হইতে প্রাণের উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণের উদ্ভবের যে ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাহা ছাড়া কোনও উপায়ে যে প্রাণসঞ্চার অসম্ভব, এমন কথা বলিয়া বসি কোন যুক্তিতে? ঐকান্তিকতাতে

সমস্ত সম্ভব—ইহার বলে যে কোনও রূপান্তর ঘটিতে পারে। বিশ্বপ্রাণের ঐকান্তিকতায় বা ধ্যানে, ব্যষ্টি জড়দেহে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে; ভক্তির তন্ময়তায় ভক্তও এই সঞ্চারিণী শক্তি লাভ করিতে পারেন, ইহা অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে।

ঠাকুর ভানুদাসের মনোবেদনা বুঝিতে পারিলেন। তাই ভানুদাস কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই বিঠোবা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "ভানু, তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়া আমিও যে সুখে আছি, তাহা মনে করিও না। এখানকার এই সমস্ত রাজসিক উপচারে আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, পন্ধরপুরের ভক্তদের সাত্ত্বিক পূজা পায়ে ঠেলিয়া আমি কি এখানে পড়িয়া থাকিতে পারি? তুমি যাও, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।" ভানুদাস কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর, তোমার কথায় আমার মন মানিতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে, এখনই তোমাকে লইয়া ছুটিয়া পালাই। তুমি যে সত্যই আসিবে, আমাকে এমন কোনও নিদর্শন দাও—তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পারি।" বিঠোবা হাসিয়া সস্নেহে তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া নিজের কণ্ঠ হইতে রাজার দেওয়া স্বর্ণ-হারগাছি খুলিয়া ভানুদাসের গলায় পরাইয়া দিলেন। ভানুদাস এই নিদর্শনে খুসী হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া মন্দির ছাড়িয়া আসিলেন।

পরদিন হারগাছি লইয়া ভানুদাসের বিপদ ঘটিল। বিঠোবার কণ্ঠহার চুরী গিয়াছে—সন্ধান করিতে করিতে রাজপুরুষেরা ভানুদাসের গলায় সে হার দেখিতে পাইল। তাহারা ভানুদাসকে বাঁধিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা রক্তচক্ষু হইয়া তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া ক্ষমা করিলেন না। ভানুদাস বরাবরই চুপ করিয়া আছেন—কি করিয়া হার পাইলেন, তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না। যদি মরিতে হয় মরিবেন, তাঁহার ভয় কি আছে?—তাঁহার যে বিঠোবা আছেন!

সেইদিন রাত্রে বিঠোবার নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর যদি ভক্তি ভালবাসায় বশ হইয়া কাহারও ঘরে না থাকেন, তবে জোর করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিলেই তিনি থাকেন না। নিজের অসঙ্গত ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া তিনি পরদিন ভানুদাসের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, তাঁহাকে মুক্তি দিলেন এবং বিঠোবাকেও আবার তাঁহার সহিত পন্ধরপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

এই ভানুদাস আমাদের একনাথের প্রপিতামহ। ভানুদাসের পুত্রের নাম চক্রপাণি; তাঁহার পুত্র সূর্য্যনারায়ণ একনাথের পিতা। অতি শৈশবেই একনাথের পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার পিতামহ চক্রপাণি ও পিতামহীর আদর-যত্নে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। বংশের এই একটী মাত্র পিতৃমাতৃহীন সন্তানের উপর তাঁহাদের মায়ামমতা যে কত প্রগাঢ় ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

একনাথ ছেলেবেলায় অন্যান্য ছেলে-পিলের মত খেলা-ধূলা লইয়া মত্ত থাকিতে ভালবাসিতেন না। তিনি প্রায়ই গোদাবরীর তীরে যাইয়া পাথরের নুড়ি কুড়াইয়া তাহাতে শিবপূজা করিতেন। তাঁহার আর একটা খেলা ছিল, কাঁধে একটা বাঁশ লইয়া "হরিদাস

সাধু" সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। স্বভাবতঃই একটু গম্ভীরপ্রকৃতির হইলেও একনাথ বড় আনন্দময় ছিলেন। বৃদ্ধোচিত গম্ভীর মুখে একটী আধফোটা গোলাপের মত হাসিটী লাগিয়াই রহিয়াছে—ইহা যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলেরই মনে হইত, এ ছেলে বুঝি এ জগতের নয়। ঠাকুরদাদার ঠাকুরমার আদর পাইয়া ছেলেপিলে যত বিগড়াইয়া যায়, মা বাপের আদরেও তত বিগড়ায় না। একনাথের তো মা বাপ নাই— ঘরে একমাত্র ছেলে বলিয়া তিনি বুড়োবুড়ীর চক্ষের মণি; কিন্তু তাই বলিয়া এত আদরেও একনাথ কখনও অবাধ্য বা অশিষ্ট হন নাই।

ছেলেবেলা হইতেই একনাথের লেখা-পড়ার প্রতি বড় অনুরাগ। অসীম বিদ্যানুরাগ ও আশ্চর্য্য মেধা দেখিয়া চক্রপাণি ছয় বৎসর বয়সেই তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করিয়া দিলেন। উপনয়নের পর হইতে আর তিনি নুড়ি কুড়াইয়া শিবপূজা করিতেন না বা লাঠি কাঁধে হরিদাস সাজিতেন না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি বৈদিক আচার ও বেদাধ্যয়ন তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। শাস্ত্রে বলে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বিদ্যা এ জন্মে সঙ্গে সঙ্গে আসে। একনাথের যেন তাহাই হইল। এই বয়সেই তিনি যেমন তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত বেদ-বেদাঙ্গ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার অধ্যাপকেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মনে হইত, এ সমস্তই যেন তিনি পড়িয়া আসিয়াছেন—এ জন্মে কেবল একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া মাত্রই যেন সমস্ত তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যায়, বারবার আবৃত্তি করিয়া কিছু অভ্যাস করিতে হয় না।

বেদ অধ্যয়ন করিয়া একনাথ বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বেদান্তের দুরূহ ও গম্ভীর তত্ত্বসমূহ যেন তাঁহাকে আরও গম্ভীর ও নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিতে লাগিল। পড়িয়া তো তিনি শুধু পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন না, তিনি যাহা পড়েন, তাহা যেন সংস্কাররূপে তাঁহার অন্তরে অন্তরে মুদ্রিত হইয়া যায়। বেদান্তের তত্ত্বসমূহ এইরূপে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকায় তিনি শীঘ্রই বিদ্যায় তাঁহার অধ্যাপকগণকেও ছাড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পাণ্ডিত্য দিয়া যাহা বুঝিতে যান, তিনি তাহা হৃদয় দিয়া বুঝিয়া লন। কাজেই একটা সত্য তাঁহার হৃদয়ে এত বিচিত্ররূপে আলোকপাত করে যে, সাধারণ পাণ্ডিত্যবুদ্ধি কখনও তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য সময় সময় তাঁহার অধ্যাপকগণকে ঠকিয়া যাইতে হইত। একনাথ তাঁহার স্বভাবস্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠে এমন প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, যাহার জবাব দিতে গিয়া পণ্ডিতেরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন।

ছেলেবেলা হইতেই ধ্যান করা একনাথের অভ্যস্ত ছিল। বেদান্তের তত্ত্বনিরূপণে তিনি এই অভ্যাসটীকে বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করিতেন। গ্রামে একটী শিবমন্দির ছিল। যেদিন একনাথ কোনও তত্ত্বের মীমাংসা খুঁজিয়া পাইতেন না, অধ্যাপকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও মনঃপূত উত্তর মিলিত না, সে দিন তিনি শিবের মন্দিরে গিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন। ধ্যানে সত্য যখন আপনি ফুটিয়া উঠিত, তখন ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপকদিগের নিকট তাহা বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিতেন। একনাথের এমন সর্ব্বাবগাহী প্রতিভা থাকা

সত্ত্বেও তিনি কোনও দিন দুর্বিনীত বা অহঙ্কারী ছিলেন না। বিদ্যাকে তিনি অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন বলিয়াই উহা তাঁহার স্বভাবের মাধুর্য্যে সার্থক হইয়া ফুটিয়া উঠিত। তিনি যে এত জানেন, নিজেই তাহা জানিতেন না বলিয়া জ্ঞান তাঁহার স্বভাবগত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান স্বভাবে পরিণত হইলে অহঙ্কার কোথায় স্থান পাইবে?

এইরূপে একমাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম অতিক্রম করিলেন।

শাসনের স্বরূপ

—*—

"শাসনে দ্বিধা" প্রবন্ধে আমরা বলেছিলাম, প্রকৃতির অনুবর্ত্তনের দোহাই দিয়ে শাসনকে শিক্ষাক্ষেত্র হতে একেবারে নির্ব্বাসন করা চলে না; আবার নির্ব্বিচার শাসননীতিকেও শিক্ষার নিয়ামক বলে গ্রহণ করা চলে না। এই দুই কোটীর মাঝে একটী সুসঙ্গত মধ্যপথ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। সেই জন্য প্রকৃত শাসনের স্বরূপ কি, তার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার স্বরূপ কি, তা না বুঝলে শাসনের স্বরূপ কি, তা বোঝা যাবে না। কেননা শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, শাসন তার একটা উপায় মাত্র। সাধারণতঃ শিক্ষাকে আমরা একটা বহিরঙ্গ ব্যাপার বলে কল্পনা করে থাকি। আমরা ধরে নিই যে, শিক্ষার্থীর মাঝে যেন কিছুই নাই, অথচ শিক্ষকের মাঝে সবই আছে; এখন শিক্ষক যে তাঁর পূর্ণ ভাণ্ডার থেকে শিক্ষার্থীর শূন্য ভাণ্ডার পূরণ করেন, তারই নাম শিক্ষা। হতে পারে, লেখাপড়া বা কতকগুলি আচারব্যবহারের সম্বন্ধে এই সূত্রটা খাটতে পারে—যদিচ এখানেও সব জায়গাতেই খাটে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু আসলে এমন বিশ্বাস নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে অবিবেচনা ও আত্মম্ভরিতায় সমস্ত কাজই পণ্ড হয়ে যাবে। শিক্ষাকে জীবনের একটা অন্তরঙ্গ ব্যাপার বলে মনে করতে হবে, তাকে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। ব্রহ্মবীজ সবার মাঝেই নিহিত রয়েছে, আত্মার শক্তি সকলের মাঝেই স্ফুরণোন্মুখ হয়ে আছে—অনুকূল অবস্থার সহায়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার অপসারণে এই বীজকে অঙ্কুরিত করা, আত্ম-শক্তিকে স্ফুরিত করার চেষ্টার নামই শিক্ষা। মহর্ষি পতঞ্জলির ভাষায় বলতে গেলে, শিক্ষা অর্থে একটা জাত্যন্তর পরিণাম ঘটানো; প্রকৃতির আপূরণ দ্বারাই তা সম্ভব। তা করতে হলে আমাদের কেবলমাত্র আবরণ ভেদ করতে হবে—বাধা সরিয়ে দিলেই আত্মশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠবে।

ধীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, মানবশিশুকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে যখন শিক্ষার ভার গ্রহণ করি, তখন অন্তঃ-

প্রেরণাবশতঃ তাড়ননীতিকে বর্জ্জন করতেই হয়। বাগানের মালী ফুলগাছকে "লালন" করেই ফুল ফোটায়, "তাড়ন" করে নয়। আগাছাগুলিকে তাড়ন করতে হয় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র আগাছা-তাড়ানই কোনও মালী তার একমাত্র কর্ত্তব্য বলে বুঝবে না। সে জানে, গাছগুলোকে লালন করাই মুখ্য কাজ, লালনকে সহজ করবার জন্য তাড়ন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি পোষণকে মুখ্য স্থান দিয়ে শাসনকে গৌণ স্থান না দিলে কিছুতেই সুফল ফলবে না। আর এই লালন আর তাড়ন, পোষণ আর শাসন এক হাতে না থাকলেও ফল ভাল হবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ছেলেদের যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাতে এ বিষয়ে বেশ শ্রমবিভাগ করে নেওয়া হয়েছে। মা বাপ প্রভৃতি স্নেহময় আত্মীয়েরা নিয়েছেন লালনের ভার এবং এ বিষয়ে তাঁরা যথাসাধ্য কর্ত্তব্যের কোনও ত্রুটী করছেন না; আর স্নেহসম্পর্কশূন্য অন্নচিন্তাপীড়িত অর্থদাস মাষ্টার নিলেন তাড়নের ভার। এমন অবস্থায় শিক্ষায় যে কি ফল ফলবে, তা সহজেই অনুমেয়।

৯ প্রাচীন আদর্শ অনুসারে শিক্ষা ছিল ব্রহ্মযজ্ঞ—"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ।" নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে এই যজ্ঞই ছিল শ্রেষ্ঠ; এই যজ্ঞফলে মানুষ ঋষি-ঋণ হতে মুক্ত হত। এই অর্থে শিক্ষা আর সেবা এক—শিক্ষাদানই হচ্ছে আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠ সাধনা। আজকাল এ আদর্শ আমরা ভুলে গিয়েছি। এখন গণ-মতের প্রাবল্য, তাই গণ-শিক্ষার উপর মানুষের খুব ঝোঁক পড়েছে। সে শিক্ষার আদর্শ মোটামুটী একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দুটো করে খাওয়ার উপায় করে দেওয়া। এমন শিক্ষা সারা দেশময় বাধ্যতামূলক করলেও আপত্তি নাই, কেননা একেবারে কিছু না হওয়ার চেয়ে অন্ততঃ এটুকু হওয়াও ভাল। কিন্তু সকলকেই যে এক হাড়িকাঠে কোপ দিতে হবে, এমন কথা মানি না। সমাজের কল্যাণের জন্য, জাতির বলাধানের জন্য কতকগুলি লোককে এই বৈশ্যশূদ্রতন্ত্র শিক্ষা হতে পৃথক রেখে শিক্ষায় ব্রাহ্মণ্য আদর্শই প্রচার করতেই হবে। তারা সংখ্যায় অল্প হলেও ক্ষতি নাই—কিন্তু তাদের চাই-ই চাই।

এমন শিক্ষার সঙ্গে শাসনের কি সম্পর্ক, তা "শাসন" শব্দটী এবং সেই ধাতুমূলে আরও কয়েকটী শব্দের আলোচনা করলে বোঝা যাবে। শাসন আর "শাস্ত্র" মূলে এক অর্থ-জ্ঞাপক। আমরা শাস্ত্র বল্‌তে যা বুঝি, বৌদ্ধ-পরিভাষায় শাসন বল্‌তে ঠিক তাই বোঝায়। বুদ্ধদেব অজ্ঞানান্ধজীবকে শাসন করতেন বলে, তাঁর এক নাম ছিল "শাস্তা" এবং তাঁর এই নামই তার অন্তরঙ্গমণ্ডলীতে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করবার পূর্ব্বে সকলকে বলেছিলেন, "আমি চলে গেলেও তোমরা কেউ মনে করো না যে আমাদের শাস্তা কেউ রইল না; আমি যে ধর্ম্ম ও বিনয় উপদেশ করেছি, আমার অভাবে তারাই তোমাদের শাস্তা হবে। যে শাস্তার শাস্ত্র বা শাসন মেনে নেয়, তাকে বলে "শিষ্য।" এই শিষ্যের ভাব কেমন, তা গীতায় অর্জ্জুনের উক্তিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে—"কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব উপহত হয়ে আছে, কোনটা আমার ধর্ম্ম, সে বিষয়ে আমার চিত্ত সংমূঢ়; আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি, তা তুমিই নিশ্চয় করে বল। আমি তোমার

কাছে প্রপন্ন, তুমি আমাকে শাধি—শাসন কর।"

শিক্ষা ও শাসনের এই পবিত্র ও গম্ভীর প্রাচীন আদর্শ সর্ব্বদা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। বাইরে আমরা যে উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, অন্তর সর্ব্বদা এইভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। জানতে হবে—শিক্ষা ব্রহ্মযজ্ঞ—আত্মোৎসর্গের সাধনা; তার উপায় আবরণভেদদ্বারা প্রকৃতির আপূরণ। এই হচ্ছে ধর্ম্ম; আর ধর্ম্মের অনুকূল যে আচার, তাই বিনয়। যিনি শিক্ষক, তিনি শাসন করবার সময় এই ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিনয় অনুসারেই শাসন করবেন। শুধু নির্ব্বিচারে শাস্তি দিয়ে শাস্তা হলে চলবে না; স্বয়ং প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত থেকে মূঢ় চিত্তকে শ্রেয়ঃপথে পরিচালিত করতে হবে। তাই শাসনের আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ।

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ থেকে কার্য্যকালে শিক্ষক বা শাস্তা কেমন ব্যবহার করবেন, এখন তারই আলোচনা করা যাক।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, শাসনের উদ্দেশ্য তিনটি—সংশোধন, সংরক্ষণ ও উদ্বোধন। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ কেবল সংশোধনকল্পেই শাসনের অপব্যবহার করে থাকি। যে অন্যায় বা অনাচার হয়ে গিয়েছে, তার বর্ত্তমান কুফল হতে শিক্ষার্থীকে রক্ষা করতে হবে। এটা যেন রোগের চিকিৎসা-স্থানীয়। শাসনের এই অঙ্গটা দূরদৃষ্টি অভাবে এবং কতকটা পরিস্থিতির স্বাভাবিক প্রতিকূলতাবশতঃ শিক্ষার্থীর কাছে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে। রোগ হলে তিক্ত ওষুধ খেতেই হয়—সুতরাং সংশোধনকল্পে শাসন একটু অপ্রীতিকর হবেই। তবে চিকিৎসক কেবল ওষুধের ব্যবস্থাই করেন না, পথ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন; রোগী যাতে প্রাণশক্তির প্রেরণায় স্বভাবতঃই রোগের বীজগুলি দূর করে আরাম হয়ে যেতে পারে, সেইজন্যই সুপথ্যের প্রয়োজন। সুতরাং সংশোধনের জন্য যে শাসন করা হবে, তাতেও দৃষ্টি রাখতে হবে, এই শাসন শিক্ষার্থীর পক্ষে পথ্য হচ্ছে কিনা, এর ফলে অন্যায়কে নির্জ্জিত করবার জন্য সে ভিতর থেকে স্বভাবতঃই শক্তি পাচ্ছে কি না!

প্রাচীনকালের দুটী কথা তুলনা করলে সংশোধনমূলক শাসনের তাৎপর্য্য বোঝা যায়। একটী হচ্ছে দণ্ড, আর একটী প্রায়শ্চিত্ত। অপরাধ করলে রাজা যে শাস্তি দেন, তা দণ্ড; আর শাস্ত্র যে শাস্তি দেন, তা হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। রাজা সমাজশৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যই শাস্তি দিয়ে থাকেন, সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তবুও তাঁর শাসনকে আমরা অন্তর দিয়ে স্বীকার করি না—স্বীকার করি ভয়ে। রাজা আমার অন্তরে প্রবেশাধিকার পাননি, তাই তাঁর শাসন দণ্ড বা তাড়না। আর শাস্ত্র আমার অপরাধের বিচার করেন ধর্ম্মদৃষ্টি দিয়ে, প্রজ্ঞাচক্ষু নিয়ে। তাই শাস্ত্রের শাসন আমাদের অন্তর স্পর্শ করে; আমরা অপরাধ বুঝে অনুতপ্ত হই এবং স্বেচ্ছায় শাস্ত্রের শাসন স্বীকার করি। এরই নাম প্রায়শ্চিত্ত। কনেষ্টবলের শাসনের চেয়ে পিতার শাসন যে সুসহ ও হিতকর, এ কথা কে না স্বীকার করবে?

সুতরাং সংশোধনকল্পে যে শাসন হবে, তাতে যেন শুদ্ধ তাড়না না থাকে। এখানেও শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, লজ্জা ও ভয়ের ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে, শাসকের প্রতি নয়। শাসন দিয়ে অন্যায়কে বাধা দেবার শক্তি

ও ইচ্ছা শিক্ষার্থীর মাঝে জাগিয়ে তোল। তার উপায় হচ্ছে দণ্ডবিধান নয়—স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ।

শাসনের দ্বিতীয় অঙ্গ হচ্ছে সংরক্ষণ। এটা একটা গুরুতর কর্ত্তব্য, আর এর জন্যই মাথা খাটাতে হবে সব চেয়ে বেশী। অনেক শিক্ষক হয়ত বেতের চোটে এটা সংক্ষেপে সারতে চান। ছেলে অন্যায় করেছে, তার জন্য হয়ত পাঁচ ঘা বেত সে পেতে পারে; সে জায়গায় বুদ্ধিমান শিক্ষক পনের ঘা বসিয়ে দিলেন—উদ্দেশ্য পাঁচ ঘা'তে বর্ত্তমান অন্যায়ের সংশোধন হল, আর বাকী দশ ঘা'তে ভবিষ্যৎ অন্যায় থেকে সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু অন্যায়দণ্ডে যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই কতটা মানসিক হীনতা জন্মে, তা কেউ ভেবে দেখেন না।

সংরক্ষণের শাসন লাঠির মধ্যস্থতায় একদম করতে নাই। শাসনকে যে ব্যাপক অর্থে আমরা গ্রহণ করেছি, তা বুঝতে পারলেই আমরা সংরক্ষণের যথার্থ উপায় কি, তা বুঝতে পারব। সংরক্ষণের মূলে ভবিষ্যৎ-চিন্তা। তার জন্য স্নেহ থাকা প্রয়োজন। একটা কথা আছে, "স্নেহঃ পাপশঙ্কী"—যেখানে স্নেহ, সেখানে অনিষ্টের আশঙ্কা। শিক্ষক যদি যথার্থই স্নেহশীল হন, তাহলে শিক্ষার্থীর হিতচিন্তা সর্ব্বদাই তাঁর মনে জেগে থাকবে, আর সেই হিতচক্ষু দিয়ে তিনি কোথায় অনিষ্টের কারণ বর্ত্তমান, তা স্পষ্ট দেখতে পাবেন এবং অনিষ্ট ঘটবার পূর্ব্বেই তার প্রতীকার করতে পারবেন। তিনি এমন নিঃশব্দে কাজ করবেন, এমন অতর্কিতে সমস্ত বিধিব্যবস্থা করে রাখবেন, যাতে শিক্ষার্থী অজ্ঞাতসারেই অকল্যাণ হতে নিবর্ত্তিত হয়ে কল্যাণের পথে চলবে। সংরক্ষণকল্পে পূর্ব্ব হতেই ব্যবস্থা না থাকার দরুণ কত যে অনিষ্ট ঘটে, তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে প্রথম হতেই ব্রহ্মচারীকে কতকগুলি বিধি নিষেধের অধীন করে দেওয়া হত। বুঝুক আর না বুঝুক, আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সরল বিশ্বাসে ব্রহ্মচারী তা পালন করে যেত। তার ফলে তার মাঝে প্রলোভন হতে আত্ম-রক্ষার একটা স্বাভাবিক শক্তি জন্মাত। অত আগে থেকে এই ব্যবস্থা না থাকলে প্রলোভন সামনে এসে পড়লে পর তা হতে আত্মরক্ষা করা কি সহজ হয়? এই সমস্ত বিধিব্যবস্থাই সনাতন ধর্ম্মের আচার। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কারু কাছে তা নিরর্থক মনে হতে পারে, কিন্তু কল্যাণকামী ঋষিরা অধ্যাত্ম দৃষ্টি দিয়ে মানুষের পরিণাম দেখেই এই সমস্ত বিধান করে গিয়েছেন। যে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঋষিপ্রদর্শিত পথে চলেছে, সেই এগুলির সার্থকতা বুঝতে পেরেছে।

সংরক্ষণ করতে হলে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে, প্রতিকূল কারণগুলি দূর করতে হবে, আচার নিষ্ঠা সহ আদর্শের অনুসরণ করতে হবে। এর কোনটাই সহজ নয় বা বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করলে এতে সফলকাম হওয়া সম্ভাপর নয়। শিক্ষকের যা কিছু শিক্ষানৈপুণ্য, এই সংরক্ষণনীতিতেই তা ফুটে উঠবে। একটা বিদ্যালয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখেই তার মর্য্যাদা নিরূপণ করা যেতে পারে। দূরদর্শিতা, নেতৃত্বশক্তি, প্রতিভা ও মমতার উপর সংরক্ষণের শাসন যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। সংরক্ষণে সুদক্ষ হলে শিক্ষককে আর সংশোধনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোরতার শাসন গ্রহণ করতে হয় না।

সংশোধন আর সংরক্ষণকে শিক্ষার বহিরঙ্গ বলতে পারি। এর জন্য যে শাসনের প্রয়োজন ছিল, তার প্রাচীন পারিভাষিক নাম ছিল বিনয়। এই জন্য শিক্ষকের নাম ছিল বিনেতা আর শিক্ষার্থীর নাম ছিল বিনেয়। ভগবান্ বুদ্ধদেব এই বিনয়মূলক শাসনকে ফলপ্রসূ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য আজীবন যেরূপ প্রাণপাতী চেষ্টা করেছিলেন এবং শিক্ষার্থীদিগের জীবন যেরূপ সংহত ও সুশৃঙ্খল করতে পেরেছিলেন, শিক্ষাজগতের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

তারপর তৃতীয় অঙ্গ বা অন্তরঙ্গ হচ্ছে—উদ্বোধন। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে পরিভাষা ব্যবহার করেছি, তারই অনুবৃত্তিস্বরূপে একে ধর্ম্মমূলক শাসন বলতে পারি। ধর্ম্ম এখানে খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যা আমাদের ধারণ করে, আমাদের ধীবৃত্তিকে কল্যাণের দিকে প্রচোদিত করে, তাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মমূলে শাসন করাই হল প্রকৃত শাসন। হিন্দু এই শাসনবিধিকেই শাস্ত্র বলে জানেন। যিনি এই শাসন মেনে নেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। শিক্ষা আর এখানে নৈতিক জগৎ বা মনোজগতের বিচার্য্য বিষয় নয়—এখানে শিক্ষা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। যথার্থ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হতে না পারলে ধর্ম্মমূলক শাসন করা একেবারেই অসম্ভব। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাশাস্ত্রে এই জন্য আচার্য্য ও গুরু একই অর্থ প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীরা যেমন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, আচার্য্যও তেমনি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত—"ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ।" এই আচার্য্য বা গুরুর শক্তিসম্বন্ধে ব্যাসদেব পাতঞ্জল সূত্রভাষ্যে বলেছেন, "দুর্ব্বল ধানুকীর তীর যেমন চর্ম্ম মাত্র ভেদ করে, কিন্তু মর্ম্মভেদ করে না, অব্রহ্মচারী আচার্য্যের উপদেশও তেমনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু লব্ধবীর্য্য ব্রহ্মচারী আচার্য্যের উপদেশ একেবারে শিষ্যের মর্ম্ম বিদ্ধ করে।" এমনি শক্তিসঞ্চারের ক্ষমতা না থাকলে ধর্ম্মমূলক শাসন অসম্ভব। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে এরই সব চেয়ে প্রয়োজন। শুধু কতকগুলো কসরত শেখালেই তো হবে না, শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যে স্বয়ং অপ্রবুদ্ধ, সে অপরকে কি করে প্রবুদ্ধ করবে?

এই অন্তরঙ্গ শাসনে শিষ্যের বা শিক্ষার্থীর প্রপন্ন থাকা চাই। পূর্ব্বে যে অর্জ্জুনের উক্তি উল্লেখ করেছি, তাতে প্রপন্নভাবটী সুন্দর ফুটে উঠেছে। অর্জুন বলছেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁর চিত্ত মোহগ্রস্ত। মোহের স্বভাব—সে তো সত্যকে জানতে দেবেই না, উপরন্তু তার একটা বিকৃত রূপ দেখিয়ে দেবে। অর্জ্জুনেরও প্রথমটায় তাই হয়েছিল—শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমতঃ তিনি খুব লম্বা এক লেকচার ঝেড়েছিলেন—ধর্ম্ম কি তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, "পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে! কিন্তু তুমি অনার্য্যের পথ ধরেছ। দূর কর এ ক্লীবত্ব, দূর হোক্ এ তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য!—ওঠ, জাগ!" তখন অর্জ্জুনের খেয়াল হল। বললেন, "আমি ধর্ম্ম বুঝ্‌তে পারছি না—স্বভাব চিনতে পারছি না—শ্রেয়ঃ কি তা জানছি না, আমি প্রপন্ন, তুমি আমায় শাসন কর।" তারপর শ্রীকৃষ্ণের শাসন সুরু হল।

এ চিত্র অতি বাস্তব। আজকাল আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিষাদযোগের আবির্ভাব হয়েছে। আমরা বুলি ঝাড়্‌ছি খুব—অথচ কাজ কিছুই

হচ্ছে না। পার্থসারথি অন্তরালে থেকে হাসছেন আর বলছেন, "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।" কিন্তু কই, এখনও তো তিনি শাস্তারূপে দেখা দিলেন না। দেখা আর কি দেবেন—আমাদের প্রপন্ন ভাব জাগলে তো তিনি শাসন করবেন। পার্থের মত শিক্ষার্থী আর শ্রীকৃষ্ণের মত আচার্য্য—এই হল শিক্ষার জাতীয় আদর্শ।

একটা মজা এই, শিক্ষার্থীর মাঝে প্রপন্ন ভাবটা নিয়ে আসতে শিক্ষক খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন—কারণ ওটা বিশেষ উপভোগ্য বস্তু কিনা। কিন্তু প্রপন্নভাব যদি স্বাভাবিক না ফোটে, তা হলে জোর করে ফোটাতে গেলে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটাই মাটী করে ফেলা হবে। আজকাল এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু এতে যে নিজেরই অপদার্থতা প্রমাণ হয়, আনাড়ী শিক্ষক সেদিকে খেয়াল করে না। প্রাণ আকর্ষণ করে আনতে হবে—ও কি সাধ্য সাধনায় বা চালাকীতে মিলে? সংস্কৃতে ওই শক্তিতে বলে অনুভাব। অনুভাব থাকলে শাসন সহজ হয়ে যায়। শাসন সহজ হলেই শিক্ষা সার্থক। একদিকে শ্রদ্ধা, প্রণিপাত, প্রীতি, সেবা; আর একদিকে মমতা, বীর্য্য, শীল, প্রজ্ঞা। এই মণিকাঞ্চনের যোগ হলে তবে শাসন সফল হবে। ধর্ম্ম আর বিনয়—শাসনের এই দুটী পরিভাষা মনে রাখতে হবে।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭১।৩

আকুলতাই তাঁকে পাবার প্রধান উপায়। প্রাণ তাঁর জন্য যতই কাঁদতে থাকবে, ততই তিনি কাছে এসে প্রাণের ভিতর সাড়া দিবেন। যখন এমনি হবে যে, তাঁর ভাব ছাড়া প্রাণ আর কিছু চায় না—তখনই তাঁর সন্ধান মিলবে। সর্ব্বদা আকুল প্রাণে তাঁকে স্মরণ কর, তাঁর মনন কর—এই তোমার সাধনা।

*

যাহা শুদ্ধ, নির্ম্মল, জগতে তাহাই প্রকৃত সুন্দর। মন যখন শুদ্ধ হয়, তখনই ধ্যানে সেই অব্যক্তমধুর চিরসুন্দরের রূপ ফুটিয়া উঠে। সাধনার গোড়ার কথা হইতেছে চিত্ত শুদ্ধ করা। যাহার চিত্ত সূর্য্যের আলোর মত শুদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ হইয়াছে, সে বিশ্বের সর্ব্বত্রই ভগবানের দেখা পায়।

*

তাঁকে যে তুমি ভালবাস—সে তো কোন কামনা নিয়ে নয়। তিনি তোমার, তুমি তাঁর —তাই তুমি তাঁকে ভালবাস। ভালবাসি বলেই ভালবাসি, কেন ভালবাসি জানি না— এই হচ্ছে খাঁটী ভালবাসা। ভগবানকে এই

তাবে যে পেতে চায়, জগতের কাউকেই সে পর দেখে না।

*

নিজের চিত্তের উপর অধিকার জন্মানই সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য। নিজের মনকে যে অধীন করতে পেরেছে—আহার নিদ্রা জয়ের জন্য তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, ইন্দ্রিয় সংযম তার করতলগত। ইন্দ্রিয় সংযত হলে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত শক্তি বা লক্ষ্য যে আনন্দ, তাই এসে সাধককে ইন্দ্রিয় কামনার ঊর্দ্ধে নিয়ে যায়।

*

প্রলোভন তোমার নিকট আসিবেই। তোমার আত্মশক্তি দিয়া তাহাকে জয় করিতে হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া, জয় পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া তোমায় যুদ্ধ করিতে হইবে। যদি যুদ্ধে জয়ী হও, তবে এখনই অমৃত লাভ করিবে; যদি তা না হয়, যুদ্ধে আত্মবলি দিতে হইবে—নশ্বর অহমিকার বিসর্জ্জনে অমর আত্মা লাভ একদিন হইবেই হইবে।

*

ইচ্ছা যার সৎ, ভগবান তার সহায়—এ একেবারে অভ্রান্ত সত্য। কামনা হইতেই অসৎ ইচ্ছার জন্ম। নিষ্কাম হৃদয়ে তাঁহার সেবা জ্ঞানে সকল কাজ করিয়া যাও—সত্যের অমল জ্যোতিঃতে অন্তর উদ্ভাসিত হইবে, হৃদয় দিন দিন শক্তিপূর্ণ হইবে, লক্ষ্যপথ সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে।

*

ভগবান ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা। একাগ্রতার পূর্ণ আকর্ষণে তিনি কি কখনও স্থির থাকিতে পারেন? একাগ্রমনে তাঁকে ডাক, তিনি তোমার সকল অভাব তাঁর ভাব দিয়া পূর্ণ করিবেন। মনপ্রাণ খুলিয়া, আত্মহারা পাগলপারা হইয়া একবার যদি তাঁকে "প্রাণের ঠাকুর এস" বলিয়া ডাকিতে পার, তবে তাঁর সাধ্য কি যে দূরে থাকেন। তিনি যে ভক্তগতপ্রাণ—ভক্তের জন্য সবই তিনি করিতে পারেন।

*

তপস্যা করতে হলে আড়ম্বর চলবে না। অকুণ্ঠ আত্মদান যেখানে নাই, তপস্যা সেখানে লোকদেখান মাত্র। তুমি যাঁর জন্য তপস্যা করছ, তোমার মন পড়ে থাকবে তাঁর কাছে—আয়োজন তো তোমার লক্ষ্য নয়। প্রকৃত মিলনাকাঙ্ক্ষী যদি হও, তবে দশে মিলে হৈ চৈ করে তা হবে না—তোমায় মিলতে হবে একা একা। হৃদয়ের প্রেমভরা অন্দরেই তাঁর দেখা মিলবে—বাইরের আয়োজন-আড়ম্বরে নয়।

*

সংযম প্রতিষ্ঠা হলে সব কাজের মাঝেই তা ফুটে উঠবে। মন সংযত হলেই সব দিক সংযত হয়ে আসে। ইন্দ্রিয়সংযম মনের সংযমের উপরই নির্ভর করে। সংযম তোমার স্বভাবে পরিণত হোক—সংযমের কৃচ্ছ্র তার মাঝেও তুমি আনন্দ লাভ কর—তাতেই সংযম সার্থক।

*

যা করছ, তারই যে একটা মূল্য বা ফল পাবে, এমন আশা করতে নাই। যে কোনও কর্ম্ম তুমি যখন তখন কর, বা সারাদিন বসেই কাটাও—তাতে কিছু আসে যায় না। আসল হচ্ছে তোমার মনের ভাব। ভাবকে পবিত্র কর—ভাব ঠিক থাকলে তুচ্ছ কাজও মহৎ ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

*

তুমি সেবক—অভিমান তোমার আসতেই পারে না। কার উপর কিসের জন্য তুমি

অভিমান করবে? তুমি যে দিকে তাকাবে, সেইদিকেই যে দেখ্‌তে পাবে, তোমার প্রাণের ঠাকুরকে। তোমার কাজ যে তাঁরই সেবা—তবে আর অভিমান কেন? তোমাকে ধুলি হতে হবে, তাঁর চরণ স্পর্শ পাবার জন্য—এই তো তোমার গৌরব।—এতে আত্মম্ভরিতার স্থান কোথায়?

*

তুমি যাকে পেতে চাও, জানতে চাও—তোমার মনকে ঠিক তার মত করেই তৈরী কর্‌তে হবে। তুমি যদি সত্যকে জান্‌তে চাও, তোমায় তবে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। আধার-আধেয়ে সামঞ্জস্য না থাক্‌লে ঠিক যেমনটী চাইবে, তেমনটী পাওয়া তোমার হবে না। অন্তর বাহিরকে এক সুরে বাঁধ—তবেই প্রকৃত বস্তু লাভ কর্‌বে।

*

শুধু নিরলসভাবে চল্‌বার অধিকার আমার আছে—এর বেশী যা আমি কর্‌তে চাইব, তাই আমার পক্ষে বন্ধনস্বরূপ হবে। শত কল্পনা কর্‌লে তিনি আর আমি যে এক, তা উপলব্ধি করতে পারি না; তাঁর চেয়ে যে ছোট নই, এও স্বীকার না করে পারি না;—কাজেই আলাদা যখন আছি, ছোটও যখন আছি—তখন তাঁর সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করাই তো শ্রেয়ঃ—তাতেই তো আমি তাঁর হলাম। আগে তাঁর হতে চেষ্টা করব—তাঁতে মিলিয়ে যাওয়া পরের কথা।

*

বাঁশীর সাতটী পর্দ্দা পরস্পর পরস্পর হইতে বিশিষ্ট বটে, কিন্তু সঙ্গীতের সুরে তাহারা যখন প্রকাশিত হয়, তখন শুধু অখণ্ড সৌন্দর্য্যকেই তাহারা প্রকাশ করে। এ জগতের মূলেও তেমনি একই অরূপ ছন্দঃ—বাস্তব অনেক রূপের ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ। কিন্তু রূপে রূপে যখন বিরোধ লাগে, একে অপরের বৈশিষ্ট্যকে যখন গ্রাস করিতে চায়, তখন বুঝিতে হয়, তাহারা মূল ছন্দঃ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই আগে মূল ভাব ঠিক রাখিয়া তারপর বাইরের কাজ কর্ম্ম।

*

প্রেমময়ের প্রেমে চিত্ত যার মজিয়াছে—তাহাকে কর্ত্তব্যের বাঁধনে বাঁধিতে হয় না—কেননা কর্ত্তব্যের স্বরূপই তখন তাহার করতলগত। কর্ম্ম তখন তাহার কাছে শুধু দৈহিক শক্তিচালনামাত্র বলিয়া মনে হয় না—কর্ম্ম তখন তাহার কাছে ভগবানের সেবা—আনন্দের প্রতীক।

*

আত্মহারা হইয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া—নিরলস চেষ্টার সহিত ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন উদারভাবের সমন্বয় ঘটাইয়া কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। আমি যে আমার নই, আমি শুধুই তাঁর—এটুকু ভাবিয়া যে কাজে নামে, কর্ম্মে তাহার, চিত্তে কোনদিন অবসাদ আনিতে পারে না। দৈহিক শ্রান্তিকে সে কোনদিন আত্মনিবেদনের আনন্দ হইতে বড় মনে করিতে পারে না। দেহ, মন, প্রাণ সকল বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে চরম কালেও যদি তাঁহারি দেওয়া প্রাণে তাঁহারি দেওয়া আনন্দকে সকলের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত জানিতে পারি—তবে আর ভয় কি?

*

সংসারের খুঁটিনাটী নিয়ে দিনরাত মনের মধ্যে ঘাটাঘাটি করছ, ওতে কোন দিন

কেউ শান্তি পেয়েছে? নিজের মনের মধ্যে গুমরিয়ে মরাই সার। ওতে বড় জিনিষের স্বাদ কোনও দিন পাবে না—স্বাদ না পেলে লাভের জন্য ইচ্ছা হবে না। ইচ্ছা না হলে চেষ্টা জন্মায় না—বিনা যত্নে কি অমনি ঘাটে-পথে সব পেয়ে বস্‌বে?

*

জ্ঞানী বলেন, আমি মহতো মহীয়ান্—রাজার রাজা মহারাজা বা সর্ব্বেশ্বর। ভক্ত বলেন, তুমি বঁধু, তুমি মোর সব। আর নিজে অণোরণীয়ান—ধূলিকণা—বঁধুর পদরজঃ। মধুর্ম্ময় দুইই। নিষ্ঠা রেখে চল, পাবেই পাবে। বিশ্বাস চাই উভয় পথেই। দুর্ব্বল তো নও তুমি—তোমার যে তিনি আছেন।

*

আবেগভরে ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে চলো না। উচ্ছ্বাসভরে রাজার রাজা হতেও যতক্ষণ, দীন ভিখারী সাজতেও ততক্ষণ। অবশ্য তুমি "মহতো মহীয়ান্ অণোরণীয়ান্", কিন্তু সাধন জীবনে একটা ভাবের নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই। এখন যে ভাব নিয়েই চল না কেন, আগাগোড়া চাই শুধু নিষ্ঠা। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্—কথাটা মনে রেখো।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ১৫ই আশ্বিন অত্র মঠে পদার্পণ করিয়াছেন। নানাস্থান হইতে ভক্তসমাগমে এবার পূজার কয়দিন আনন্দে কাটিয়া গেল। শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমান মাসে মঠেই থাকিবেন।

দানপ্রাপ্তি-স্বীকার

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমে নিম্নলিখিত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস ২৫৲, গোয়ালপাড়া-বাসী দুইটী ভদ্রলোক ৪৲, রাজগঞ্জবাসী জনৈক ভদ্রলোক ।৶০, সাধবচন্দ্র খালুয়া ১৲, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ১৲।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীবিহারীলাল বসু নামক এক ব্যক্তিকে আমরা বগুড়াস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের সেবকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে তাহার ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া আমরা তাহাকে আশ্রম হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হই। উক্ত ব্যক্তির সহিত সারস্বত মঠ কিম্বা তদধীনস্থ কোনও আশ্রমের কোনও প্রকার সম্পর্ক নাই। উহার কার্য্যের জন্য মঠ কিম্বা কোনও আশ্রম দায়ী হইবে না। শ্রীমৎ পরমহংসদেবের শিষ্য ভক্ত ও সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা ইহা বিজ্ঞাপিত করিলাম।

শ্রীহরপ্রসাদ রায়
কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির সভাপতি
বগুড়া—শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রম

ওঁ তৎ সৎ
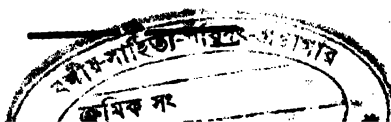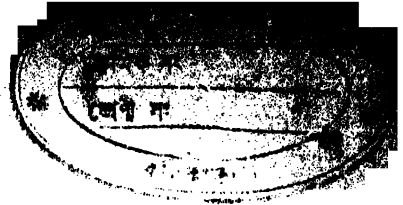
(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ { ৮ম সংখ্যা

ভয়হারী

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৩।৬]

বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগঃ
ঋধ্যাম তে বরুণ স্বামৃতস্য।
মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে
মা মাত্রাশার্য্যপসঃ পুর ঋতোঃ॥

অপো সুম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং
মৎ সম্রাড়্ ঋতাবোনু গৃভায়।
দামের বৎসাদ্ বিমুমুগ্ধ্যংহো
নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে॥

মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টা-
বেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম
বিষু মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ॥

যো মে রাজন্ যুজ্যো বা সখা বা
স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহ্যমাহ।
স্তেনো বা যো দিপ্সতি নো বৃকো বা
ত্বং তস্মাদ্ বরুণ পাহ্যস্মান্॥

বেঁধেছে পাপের রজ্জু, হে বরুণ, শ্লথ কর তারে—
ঋদ্ধিমন্ত হব তব অমৃতের দিব্য অধিকারে;
বুনি যে চেতনা-জাল, তন্তু তার ছিঁড়িও না প্রভু—
কালোচিত কর্ম্ম-মাত্রা শীর্ণ যেন নাহি হয় কভু।

আসে ওই বিভীষিকা—দূর তারে কর হে বরুণ—
হে সম্রাট্, ঋতবান্, দৃষ্টি তব বিতর করুণ;
বৎস হতে রজ্জু হেন, কর দেব পাপবিমোচন—
তুমি ছাড়া নিমিষের তরে আর কে দিবে শরণ?

যজ্ঞে তব কোন দিন করি যদি পাপ আচরণ,
তার লাগি হে অসুর, রুদ্র রোষে হেনো না মরণ;—
হারায়ে তোমার জ্যোতিঃ আঁধারের প্রবাসে না যাই—
শ্লথ হোক্ দণ্ড তব—দাও প্রাণ—এই ভিক্ষা চাই।

হোক্ সে আত্মীয় মম, কিম্বা সখা—শোন মহারাজ,
স্বপনেও বিভীষিকা দেখায় যে ভয়াতুরে আজ;
বিত্তহারী, কিম্বা অরি—আমাদের নিতে চায় প্রাণ—
এ সবার ভীতি হতে, হে বরুণ, কর পরিত্রাণ।

অকামঃ সর্ব্বকামঃ

—*—

মানুষ কামনা-বাসনার যথাযথ ব্যবহার জানে না। তাই তারা সব ওলটপালট করে ফেলে। কামনা যদি প্রেম হয়, আর ভগবান যদি প্রেমস্বরূপ হন, তা হলে বেদান্তের মতে তুমিই যে কামনাসমষ্টি, এইটী অনুভব করতে হয়। কিন্তু তা বলে কামনার অপব্যবহার করো না—এমন ভুল ধারণা রেখো না যে এই একটা কামনা তোমার, আর ওগুলি অপরের। যখন কামনায় কামনায় ঠোকাঠুকি লাগে, তখনই সর্ব্বনাশ। সমস্ত কামনাই হচ্ছে প্রেমসমুদ্রে তরঙ্গের মত, আবর্ত্তের মত। সমস্তটা জগৎ কেবল একটা অনন্ত প্রেমের পারাবার—এই তো প্রেমের স্বরূপ। মাধ্যাকর্ষণবলে নক্ষত্রমণ্ডল বাঁধা রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ তো আকর্ষণ শক্তিই—সুতরাং তা প্রেম। যত রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, তার মূলে একটা আসঙ্গলিপ্সা আছে, রাসায়নিকেরা একথা বলে থাকেন। অণুতে অণুতে যে প্রেম, এ হতেই তো তাদের পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিকতা বা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। একটা গ্রহের সঙ্গে আর একটা গ্রহের যে ভালবাসা, তার নাম মাধ্যাকর্ষণ। বইয়ের পাতাগুলো সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে বলে বইখানাকে এই আকারে দেখতে পাচ্ছি। সংশ্লেষণ প্রেমেরই নামান্তর।

সমস্তটা জগৎ এক অনন্ত অপার প্রেম-সমুদ্রে তরঙ্গের মত। লর্ড কেলভিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, জড়, শক্তির রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতে শক্তি মাধ্যাকর্ষণ, সংশ্লেষণ, রাসায়নিক আসঙ্গলিপ্সা, বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো, তাপ এই সমস্ত আকারে প্রকাশ পাচ্ছে।

তড়িৎ শক্তি আর চুম্বক শক্তির মাঝে কি দেখছ?—আকর্ষণমাত্র। তাপ যেন বিয়োজন ঘটায় বলে মনে হয়। দুটী অণুকে তা যেন বিশ্লিষ্ট করে, কিন্তু আর এক দিক থেকে বিজ্ঞান আবার প্রমাণ করেছে যে এক ক্ষেত্রে যা বিয়োগ বা বিশ্লেষ, অপর ক্ষেত্রে তা প্রীতি বা আকর্ষণ ছাড়া কিছুই নয়।

সমস্তটা জগৎই শক্তিসমুদ্রে বীচিভঙ্গের মত। এই শক্তি, এই বেগ বেদান্তের মতে তোমারই শক্তি—তুমি তার সঙ্গে এক। এইটী অনুভব কর। এই শক্তি—এই বিস্ফুরণকেই প্রেম বলে।

ডারুইন প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদীদের এই মত যে, জীবনসংগ্রামই জগতের ভিত্তি। ড্রামণ্ড প্রভৃতি দার্শনিকেরা এই মতের সংশোধন বা সংযোজন করেছেন। তাঁরা বলছেন, শুধু সংঘর্ষ আর সংগ্রাম থেকেই ক্রমবিকাশ হচ্ছে, তা নয়; বরং প্রেম, নৈতিক বল, আকর্ষণশক্তি—এইগুলিই সৃষ্টি বিকাশের মূল।

সমস্ত কামই প্রেম; প্রেম শিবস্বরূপ; আর তুমি সেই শিব। সেই শিবের সঙ্গে তুমি এক—এইটী অনুভব কর দেখি। সব ছাড়িয়ে ওঠ! বাসনার এই সমস্ত আবর্ত্ত আর তরঙ্গকে মানুষ সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন দেখে—এই তো ভুল।

ধর, সামনে একটা সরোবর রয়েছে। ছেলেকে ডেকে বললাম, ওরে, দেখসে—কি

সুন্দর, প্রশান্ত সরোবর! বলতে বলতে ঝড় এলো, সরোবরের প্রশান্ত বক্ষ আন্দোলিত আলোড়িত হয়ে তরঙ্গ আবর্ত্তের সৃষ্টি হল। ছেলেকে বললাম, দেখ্, কেমন ঢেউ উঠেছে, ওই দেখ্—জলের পাক! তখন আর পূর্ব্বের প্রশান্তির কথা মনে নাই—সরোবরের নূতন রূপের কথাই আমাদের মনে জ...ছে। কিন্তু তরঙ্গ, আবর্ত্ত ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও এখনও সেই সরোবর আগেকার মতই জলময়। যে জলে সরোবর, সেই জলেই ঢেউ।

সরোবর যখন প্রশান্ত ছিল, তখনও তাতে জলই ছিল। আর এখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও জলই সেখানে আছে—তবে কিনা জলটা এখন তরঙ্গ ইত্যাদির নূতন আকারে দেখা দিয়েছে। আমরা ছেলেকে ডেকে জল দেখ তে বল্ব না—বল্ব ঢেউ আর জলের পাক দেখতে। তরঙ্গ আর আবর্ত্তই যেন এখন জলকে আকার দিয়েছে। তরঙ্গের অন্তরালে সরোবর আচ্ছন্ন রয়েছে—তরঙ্গের ভাবে প্রশান্তির ভাব এখন চাপা পড়ে গিয়েছে। মানুষের ঠিক তাই হয়। বাসনা যেন একটা তরঙ্গের মত—শুধু একটা আকার মাত্র। এই বাসনার বিশেষ আকারে সত্যের অনুভূতি আচ্ছন্ন রয়েছে। বেদান্ত বলছেন, আকার দেখতে হয় দেখ, তাকে উড়িয়ে দিতে বলছি না; কিন্তু রূপ দেখতে দেখতে তার অন্তরালে যে অরূপ সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে মন ভুলে যেও না। কেউ যদি তোমাকে অপমান বা অত্যাচার করে, তোমার তখন বড্ড রাগ হয়। কিন্তু আইনটা কি, তা বোঝ। আইনটা হচ্ছে এই যে, স্বভাবের সঙ্গে তোমার আর ভাব নেই, আর ওই লোকটা এসে তোমাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিলে যে তুমি আর স্বভাবে নাই। নিজের খুঁতটী সার—দেখবে ও লোকটার সাধ্য কি যে তোমার অপমান করে। এই জানবে আইন। সাধুকে এই আইন মেনে চলতেই হবে। যখনই হতাশ হয়ে পড়বে বা স্বভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তখনি সমস্ত জগৎ তোমার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্বে।

শক্তির অনুশীলন কর, সৎ চিন্তায় চিত্তকে পূর্ণ রাখ—দেখবে, বাসনা তোমারই হোক কি অপরেরই হোক, কখনো তার অপব্যবহার হবে না। যদি তাল ঠিক রাখ্তে পার, তা হলে তোমার মনে যে সমস্ত বাসনার উদয় হচ্ছে, তা সব মিলিয়ে যাবে—এ একেবারে নিশ্চয় কথা। ঠিক ঠিক রুখে দাঁড়াতে পারলে, আশ্চর্য্য উপায়ে এ কথা তোমার কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে। বাসনাগুলোকে ঠিকভাবে দেখতে পার না বলেই সব গোলমাল হয়ে যায়, আর যত জঞ্জাল এসে তোমার ঘাড়ে চাপে।

মনে যে সমস্ত বাসনার উদয় হয়, তাদের যথাযোগ্য ব্যবহার কর। কেমন করে তা করবে? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর একজন ঘোড়ায় চড়ে কোথায়ও যাবে। ঘোড়াটা খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছে—ওকে কিছু খাওয়ানো দরকার; কিন্তু ঘোড়ার ক্ষুধা বা শ্রান্তিতে সওয়ারের ক্ষুধা বা শ্রান্তি হচ্ছে না। সওয়ার জানে ক্ষুধা পেয়েছে ঘোড়াটার— ঘোড়াটাকেই খাওয়াতে হবে; সে ক্ষুধা বা শ্রান্তি সে নিজের বলে ভাববে না। ঘোড়াকে সে খেতে দেয় বটে, কিন্তু তা বলে নিজে তো তখন ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে না।

সওয়ার যেমন ঘোড়াকে দেখে, বেদান্তী বা জ্ঞানীও তেমনি এই দেহটা দেখেন। যদি দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়ে বা উদর আহার চায়, তাহলে তিনি জুটলে পরে তাদের যথাযোগ্য পানাহার দিবেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

নিজেকেও ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত বলে জানবেন। কথাটা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যদি এর সাধনা সুরু কর, তাহলে সত্যতা বুঝতে দেরী হবে না। এ সব হাতে-নাতে পাবার জিনিষ।

ক্ষুধাতৃষ্ণা দেহের ধর্ম্ম—মন তা অনুভব করছে। কিন্তু জ্ঞানী আত্ম-স্বরূপ, তিনি তাতে ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হচ্ছেন না। যিনি নিজের চিদাস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা শ্রান্তিতে ব্যথিত হন না। ঘোড়ার ক্ষুধা তৃষ্ণা সওয়ারকে ক্ষুব্ধ করে না; তাদের অনুভব হয়, কিন্তু তা দুঃখের হেতু হয় না। তেমনি দেহটা যে অবস্থায় পড়েছে তাতে তার কতকগুলি বস্তু প্রয়োজন বটে। মনবুদ্ধি সেগুলো চায়—নইলে তাদের কাজ চলে না; তাই এগুলি বাসনার মত। বৈদান্তিক মনের এই বাসনাগুলি দেখছেন—কিন্তু এই দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এদের অতীত হয়ে আছেন—তিনি তলিয়ে যাননি, তিনি ভেসে আছেন। পাখী যদি একটা কঞ্চির উপর গিয়ে বসে, তা হলে তার ভারে কঞ্চিটা ওঠা নামা করবে। কিন্তু তাতে পাখীটার কিছু হয় না—সে জানে, সে ঠিক বসে আছে; যদি কঞ্চিটা ভেঙ্গে মাটীতে পড়েও যায়, তাতেই বা তার কি? তার যে পাখা আছে গো! সব সময়ই সে পাখার উপরই ভর করে আছে। মাঝে মাঝে কঞ্চিতে গিয়ে বসছে বটে, কিন্তু থাকছে না। তেমনি বেদান্তীকে দেখেও মনে হতে পারে সাধারণ মানুষের মত তাঁর বুঝি বাসনা কামনা আছে, কিন্তু জানবে, থাকলেও তিনি তার উর্দ্ধে।

ধর, এই পেন্সিলটা আছে। এটা তোমার নয়। যদি হারিয়ে যায়, দুঃখ করবে কি? না। হয়ত খুঁজতে পার, কিন্তু না পাওয়া গেলে কিছু যাবে আসবে না। আর যদি তোমার পাঁচহাজার টাকার তোড়াটা হারিয়ে যায়? ওঃ, তাহলে বুক ভেঙ্গে যাবে। পেন্সিলটাও খুঁজেছিলে, আর তোড়াটাও খুঁজছ; কিন্তু দুয়ের খোঁজাতে আকাশ পাতাল তফাৎ। টাকার তোড়াটা খোঁজ ভাঙ্গা বুক নিয়ে; কিন্তু পেন্সিলটা তেমনভাবে খোঁজ না। কিন্তু বেদান্তীর কাছে পেন্সিলটা হারালেও যা, পাঁচ হাজার টাকার তোড়াটা হারালেও তা। আচ্ছা, একটা গল্প বলে কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ওদেশে এক সহরের রাস্তা দিয়ে একজন সাধু যাচ্ছিলেন। একজন মহিলা এসে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। সাধুটী সঙ্গে গেলে পর, মহিলাটী তাঁর জন্য এক বাটী দুধ নিয়ে এলেন। দুধটা কড়াইয়ে করে উনুনের উপর চাপান ছিল, তাইতে বেশ পুরু একখানা সর পড়েছিল। সাধুর জন্য দুধ ঢালতে গিয়ে সবটা বাটীতে পড়ে গেল। মেয়েরা ঘি করবার জন্য সর তুলে রাখে। তাই সবটা সাধুর বাটীতে পড়ছে দেখে মহিলাটী ব্যাতব্যস্ত হয়ে হঠাৎ বলে ফেল্লেন, "আহাঃ, কি হল!" তারপর দুধে চিনি দিয়ে বাটীটী পরিপাটী করে সাধুর সামনে ধরে দিলেন। সাধু বাটীটী একপাশে একটু সরিয়ে রেখে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। মহিলাটী মনে করলেন, দুধটা গরম আছে বলেই বুঝি সাধু খাচ্ছেন না। কতক্ষণ পরে সাধু উঠে চলে যাচ্ছেন দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, দুধটুকু খেলেন না যে?" ভারতবর্ষে মেয়েদের দেবী বলে সম্বোধন করা হয়। সাধু বল্লেন, "দেবি,

এ দুধ সন্ন্যাসীর স্পর্শযোগ্য নয়।" মহিলা চম্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন বাবা, এমন কথা বল্লেন কেন?" সাধু উত্তর করলেন, "আপনি দুধ ঢালবার সময় সরটুকু দিয়েছেন, তারপর চিনি দিয়েছেন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটী জিনিষও দিয়েছেন। একটী 'আহাঃ কি হলো' ও দুধে মিশিয়ে দিয়েছেন। যে দুধের সঙ্গে "আহাঃ' দেওয়া আছে, সন্ন্যাসীরা তা স্পর্শ করেন না।" সাধুর কথা শুনে মহিলাটী খুব লজ্জিত হলেন, সাধুও চলে গেলেন।

সাধুকে দুধ খেতে দেওয়া ভাল কাজই হয়েছিল বটে, কিন্তু তার মাঝে "হায় কি হলো" থাকাটাই ভাল হয়নি। বেদান্ত তাই বলেন, কাজ করবে, বাসনা পূরণ করবে, কিন্তু যাই কর না কেন, "হায় কি হলো" করবে না। ওটী কখনও জুটিও না। কোনও কাজের সঙ্গেই ওটী জুড়ে দিও না—দিও না! কাজ কর—মনটী তাতে ফেলে না রেখে করবে। তাল কেটো না যেন। চারপাশের সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে চল, ক্ষতি নাই—কিন্তু ভাব ঠিক রেখে যখন কাজ করতে পারবে, তখনি দেখবে আশ্চর্য্যভাবে, অভাবনীয়রূপে, তোমার সকল কাজ সার্থক হচ্ছে।*

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা, —জানুয়ারী, ১৯০৩)

মনোলয়

—*—

(ভক্তিমার্গ)

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, সে রাধাপ্রেম কিরূপ? ভগবানের হ্লাদিনী বা আনন্দ-শক্তিই জগতে শ্রীরাধা নামে পরিচিত। শ্রীরাধিকা আরাধিকা, কারণ তিনি জীবাত্মরূপিণী। ব্রজের গোপীগণ শ্রীরাধিকার প্রেমলীলার সহায়। এইক্ষণ এই গোপীগণ কাহারা, তাহা বুঝিতে হইবে।

রাধাপ্রেম

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষিণীতে বলিয়াছেন—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন সুবিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতা হি গোকুলে।"

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ ব্রহ্মানন্দে দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন। তাঁহাদের ধ্যানের ফলস্বরূপ মূর্ত্তিমান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাহাদের হৃদগত ইচ্ছা বুঝিয়া দ্বাপরে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করিবার জন্য গোকুলে গোপীভাবে জন্মবিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা অভিন্ন। লীলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেহধারণ করিয়াছিলেন মাত্র—বস্তুতঃ তাঁহারা অভেদ। শক্তি ও শক্তিমানের

ভেদও অচিন্তনীয়, আবার অভেদও অচিন্তনীয় —উভয়ে এক ভেদাভেদ-তত্ত্ব। তাই একজন আরাধ্য, অপর আরাধিকা। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ আকর্ষণ করা। তিনি আকর্ষণ করিতেছেন আরাধিকার ভাব বা আনন্দকে। যোগে পরমাত্মার-জীবাত্মায় মিলন, তন্ত্রে শিবশক্তির মিলন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বেও তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের মিলন; বা ভক্ত ও ভগবানের মিলন। শ্রীরাধিকা আরাধিকা বা ভক্ত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিয়াছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনের অভিব্যক্তি এই লীলাতত্ত্বে স্ফুটতর। যোগে যেমন জীবাত্মা পরমাত্মায় অশেষপ্রকার রমণ হয়, তাহা শুধু যোগীর অন্তরে নিভৃত বৃন্দাবনে নিরন্তর সাধিত হইয়া থাকে, তাহারই সর্ব্বপ্রকার স্থূল প্রকাশ বৃন্দাবনের লীলায় প্রকট হইয়াছিল।

গুরুদীক্ষায় মন্ত্রের সরকম্পনে যেমন মানুষের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্র জপিতে জপিতে তনু অবশ হইল এবং পরে সখীজনের সাহায্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন—দেখিয়া ভুলিলেন। তিনি দেখিলেন—'রূপুরুষ ঐছন নাহি জগ মাঝ।' তাঁহার 'মল্লিকা চম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে'—সে চূড়া ময়ূরপাখা শোভিত। তাঁহার মুখখানি 'অলকাবলিত', 'চাহনি চঞ্চল বাঁকা', তাঁহার 'অধরের দুটী কূল, জিনিয়া বান্ধুলীফুল।' তাঁহার 'ললাটে চন্দন পাঁতি'—'গলে মালতীর মালা।' হাসি 'নবীন মেঘের কোরে বিজুরী প্রকাশ করে।' তাঁহার 'ভুরুযুগসন্ধান কামের কামান বাণ,—হাতের বাঁশের বাঁশী সোনাবান্ধা। বয়সে তিনি নব কিশোর, তাঁহার তনু রসে ঢর ঢর। তিনি পূর্ণরসের ঘনীভূত মূর্ত্তি। রমণীহৃদয়ের সমস্ত ভাব আকর্ষণ করিতে যে রূপের প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন রূপ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পর তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া নিজের অস্তিত্ববোধ হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি সেই চিরশান্তিময় রসের সাগরে ডুব দিলেন। তখনকার অবস্থা বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপন দেখি কালরূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল মোর নয়ন নাচনে॥

তখন তিনি সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। কাল জল দেখিলে কালা মনে পড়িতে লাগিল-নিজের কাল চুল দেখিলে, কাল মেঘ দেখিলে, কাল অঞ্জন দেখিলে শ্রীহরিকে মনে পড়িতে লাগিল—সর্ব্বত্রই তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই আপনার বলিয়া বোধ হইত না—বুঝিলেন যে তিনিই একমাত্র জীবনের সার বস্তু—তদ্ভিন্ন সবই অসার। বন্যায় যেমন নদীর জল উদ্বেলিত হইয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলে—তদ্রূপ শ্রীরাধার প্রেমবন্যা সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বহিতে লাগিল। তখন সমস্ত ব্রজবালাগণ পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রদর্শনের সংস্কারবশে শ্রীহরির রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নী দেবীর ব্রত করিলেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ ৫১ খণ্ডে খণ্ডিত হওয়ায় যে যেখণ্ড ভারতের যে অংশে পতিত হয়, সেই স্থানই একটী সিদ্ধপীঠে পরিণত হয়। ব্রজধামে এই ৫১ অংশের এক অংশ পতিত হওয়ায় তথায় দেবী কাত্যায়নীরূপে পূজিত হন। ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকাগণ ব্রত সমাপন করিয়া যমুনা অবগাহন করিতে

গেলে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান ক্রীড়াচ্ছলে বালিকাদের বস্ত্র অপহরণ করিয়া বৃক্ষশাখে রাখিলেন। কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বসন প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে উপরে নগ্ন অবস্থায় উঠিয়া বসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ষষ্ঠবর্ষদেশীয়া হইলেও স্ত্রীসুলভ লজ্জাবশতঃ বালিকাগণ প্রথমতঃ তাহাতে দ্বিধা করিলেন, পরে ব্রতভঙ্গ হইবে ভয়ে তাঁহার আদেশপালন করিলেন। যখন উঠিলেন, তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

"পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥

তাঁহারা সবাই "গৃহীতচিত্তা" অর্থাৎ তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণময় বা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন আর তাঁহাদের নিকট কিছুই বোধ হইল না। তখন তাঁহাদের দ্বৈতজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছিল। দ্বৈতবোধ থাকিলেই লজ্জা বোধ হইতে পারে—অদ্বৈতবোধে লজ্জা কোথায়? এক ভিন্ন দুই নাই যখন বোধ হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণময় জগৎ—তখনই তাঁহারা কাত্যায়নী বা শক্তি সাধনায় সিদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের নিকট পরীক্ষায় তাঁহারই কৃপায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার জন্মিল। অতঃপর ভগবান তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির বর প্রদান করিলেন এবং ব্রজবালাদিগকে ব্রজের নিবিড় বনমধ্যে সঙ্কেতস্থান বলিয়া দিলেন। তখন বালিকাগণ বাঁশরীর স্বর শুনিতে পাইলেই সেই বনমধ্যে উপনীত হইয়া ক্রীড়া, বংশী, নৃত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করিতেন। এই রূপে দিন ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীরাধার ভাবরাশি উদ্দাম বেগে বহিতে লাগিল—জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। তখন তিনি মনে মনে এক দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—

স্বরূপে দঢ়ায়্যু মনে, এ রূপ যৌবন সনে
আপনারে সাজায়ে দিব ডালি॥

এদিকে শ্রীরাধার ন্যায় অন্যান্য গোপীগণের ভগবদিচ্ছায় অতিদ্রুত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্দ্ধিতায়তন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবরাশি স্ফুটতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন বনমাঝে বাঁশী বাজিয়া উঠিলে শ্রীরাধার আর গৃহকর্ম্ম ভাল লাগিত না—প্রাণ ছুটিয়া পলায়ন করিত। সে বাঁশী যেন রহিয়া রহিয়া তাঁহাকেই "রাধা রাধা" বলিয়া ডাকিত এবং তাঁহারই কর্ণে যেন মর্ম্মবেদনার গোপনকথা বলিয়া যাইত। বৈষ্ণব কবি "শ্যামের বাঁশীটী দুপুরে ডাকাতি" বলিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, লজ্জা, ভয়, মান, অপমান ত্যাগ করিয়া ডাকাত যেমন দ্বিপ্রহরেই পরস্বাপহরণ করে, তদ্রূপ শ্যামের মুরলীধ্বনি যেন কোন্ দিন আয়ানগৃহে ডাকাতি করিয়া শ্রীরাধাকে হরিয়া লইয়া যাইবে। তারপর শ্রীরাধা বুঝিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মন প্রাণ—শ্রীকৃষ্ণই ধ্যান জ্ঞান, ইহকাল পরকাল, একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব। তিনি নিজ পতি ভুলিলেন—সমাজবন্ধন ছিন্ন করিলেন—মান-অপমান, লজ্জা সরম জলাঞ্জলি দিলেন এবং পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বৈষ্ণব কবি তখনকার অবস্থা শ্রীরাধার সখীর মুখে বর্ণনা করিয়াছেন—

"তুঁহু যৈছে নাগরী—কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুঁহু যদি কহসি করিয়া অনুষঙ্গ।
চোরী পিরীতি হয় লাখগুণ রঙ্গ॥"

চোরা পিরীতি লাখগুণ রঙ্গ হইলেও বিধাতার প্রতি অভিমান হইল—কেন আমার দেহ ভিন্ন

হইল—এক সঙ্গে হইলেই কি ভাল হইত না? সত্যই এই অভিমান শ্রীভগবানের বুকে বাজিয়াছিল—তাই দেশকালভেদে ও ভগবৎ ইচ্ছায় শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপিকা অতিক্রান্ত "কৈশোরবয়ঃপ্রাপ্তঃ" হইলেন। শ্রীরাধিকার নৈশোর বাঁধ ভাঙ্গিল—চোরা পিরীতি সত্যই তখন আরম্ভ হইল। এই চোরা পিরীতির রাধাপ্রেমের বিশেষত্ব।

তারপর সেই শুভ শারদীয় মধুর যামিনী আসিল। শারদীয় পুষ্পরাশি হাসিয়া উঠিল—নীল আকাশের কোলে পূর্ণিমার শশী তাহার জোৎস্নারাশি অমৃতধারায় ঢালিয়া দিল—বৃন্দাবনে যমুনার জল উছলিয়া উঠিল—অনন্ত হীরকচূর্ণ উর্ম্মিমালায় ভাসিতে লাগিল। তখন

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

এইরূপ রজনীতে শ্রীভগবান যোগমায়া অবলম্বনে গোপীগণের সিদ্ধির ফল দান করিতে মনন করিলেন।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভি-
রঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাম্॥

সহসা নিবিড় বনমাঝ হইতে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্যামের বাঁশরী বাজিয়া উঠিল। আকাশের শশীর গতি মন্থর হইল—জ্যোৎস্না পুলকিত বনের পাখী স্তব্ধ হইল—তরুলতা শিহরিয়া উঠিল—পাহাড়পর্ব্বত দ্রবীভূত হইল—যমুনা উজান বহিল—দেবগণ চমকিয়া উঠিলেন। সেই মধুর মুরলীর মহামন্মথমন্ত্রধ্বনিতে গোপীগণ বসনভূষণ ভুলিল—জাতিকুল ভুলিল। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া

বংশীধ্বনির গূঢ় তাৎপর্য্য

বৃন্দাবনের মহাজন সসখী শ্রীরাধা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন—জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইল।

পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের স্নিগ্ধ ভাস্বর জ্যোতিতে চন্দ্রালোক ম্লান হইল এবং তখন বৃন্দাবনান্তর্ব্বর্ত্তী স্বচ্ছগলিত পারদতুল্য জ্যোতিঃমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত হইল।

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈঃ
ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিন্নমুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ

গোপীগণ সেই রাসমণ্ডলে শ্রীভগবানের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সহাস্য ভ্রূবিলাস ও করচালন করিতে লাগিলেন। নৃত্যহেতু কটিদেশ দোলায়িত হইতে লাগিল ও বসনাঞ্চল স্খলিত হওয়ায় কম্পিত স্তনমণ্ডল রূপমাধুর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল, কর্ণে কুণ্ডল দুলিতে লাগিল, বদনে স্বেদবিন্দু নির্গত হইল, কবরী খসিয়া গেল, কাঞ্চীর গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল। তখন আত্মারাম শ্রীভগবান গোপীগণের প্রার্থনানুযায়ী যতগুলি গোপী ততভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিলেন। তখন সেই রাসমণ্ডলের ভিতর বর্ষণোন্মুখ নবীন মেঘচক্রে যেরূপ সৌদামিনী শোভা পায়, গোপীগণ শ্যামসুন্দরের পার্শ্বে তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অতঃপর যমুনার জলে শ্রীভগবান সগোপী ক্রীড়া করিলেন—সহসা যমুনার শত শত নীলকমলের পার্শ্বে শত শত স্থলকমল শোভা পাইল। রাত্রি প্রভাত হইল—রাস ভঙ্গ হইল।

তারপর হইতে যখনই শ্যামের বাঁশরীতে মহামন্মথমন্ত্র ধ্বনিত হইত, তখনই সসখী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন।

এখন হইতে চোরা পিরীতির পূর্ণবিকাশ হইতে লাগিল। চোরা পিরীতি স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের অনেক উপরের স্তরে প্রতিষ্ঠিত। এ প্রেমে গুরুত্ব লঘুত্ব বোধ নাই। এখানে প্রেমিকার প্রেমের টানের তীব্রতার তুলনা নাই। চোরা পিরীতির অপ্রতিহত টানে শ্রীভগবান স্থির থাকিতে পারেন না—তিনি সে প্রেমের শৃঙ্খলে নিতান্ত বালকের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া পড়েন, এবং নিজেই সেই প্রেমের প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করেন। তখনই ভক্ত ও ভগবানের বিলাস আরম্ভ হয়। এ প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বয়ং শ্রীভগবান হার মানিয়া সে প্রেমের যে কত গভীরতা—কত মধুরতা—কত তীব্রতা তাহা অনুভব করিবার জন্য মাঝে মাঝে নিজেই রাধাভাব গ্রহণ করিয়া প্রেমরসাস্বাদন করিতেন।—শ্রীরাধার মুখে কবি বলিয়াছেন—

আপনি চূড়ার বেশ বানায়ে আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কাহতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষধরম॥"

শ্রীভগবান নিজেই রাধা হইয়া তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। এ প্রেমেও শ্রীরাধার বিচ্ছেদ জ্বালা থাকিত, প্রাণনাথের সহিত একান্ত মিলন ঘটিত না।

মুখে কবি বলিয়াছেন—

"শিশুকাল হতে বঁধুর সহিতে,
পরাণে পরাণ নেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গড়ল
ভিন ভিন করি দেহা।"

তাই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলেন—কারণ সমাধিতে বিচ্ছেদ নাই। শ্রীভগবান ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে বলিয়াছিলেন—

"ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥"

—এ জগতে অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই যে মনুষ্যদিগের সুখ বা স্নেহ বৃদ্ধি পায়, এরূপ নহে। তোমরা আমাকে মন সমর্পণ করিয়াছ—অতএব আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার নামাদি শ্রবণ, আমাকে দর্শন, চিন্তা ও গুণ-কীর্ত্তন করিলে যে প্রেম জন্মে, কেবল আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ সম্ভাবনা নাই।

অন্যত্র গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাদের নয়নের মণি হইয়াও যে দূরে বাস করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য কেবল তোমরা আমাকে ধ্যান করিয়া মনের নৈকট্য পাইবে। প্রিয়তম প্রবাসে থাকিলে স্ত্রীর চিত্ত তাহাতে যেমন তন্ময় হইয়া থাকে, নিকটে ও দৃষ্টির গোচরে থাকিলে সেরূপ হয় না।"

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রস্থানের পর শ্রীরাধা সমাধিস্থ হইয়া কৃষ্ণসুখে দিনযাপন করিতেন। এ অবস্থায় তাঁহার পূর্ণ সুখের উদয় হইত। তখন দ্বৈতজ্ঞান রহিত হইয়া গিয়া অদ্বৈত কৃষ্ণানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ইহাই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন বা রাসলীলা—ইহা কৃষ্ণলীলার প্রাণস্বরূপ। (ক্রমশঃ)

একনাথ

—*—

একনাথ সম্প্রতি দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বেদপাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, যথাযোগ্য ভাবে বেদান্ত শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিয়াছেন। যাহাদের জন্মান্তরীণ সাধন-সংস্কার উন্নত নহে, তাহারা শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কখনও জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর হয় না। শুধু শাস্ত্রই পাঠ করিলাম আর তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কই করিলাম. কিন্তু শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর সাক্ষাৎ পাইলাম না—এমন শাস্ত্রপাঠ একান্তই নিরর্থক। বেদান্ত বলিতেছেন, উপনিষদ্‌বেদ্য তত্ত্ব কেহ প্রবচন, মেধা বা তর্ক দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে না। আবার বেদান্ত-সূত্রকার বলিতেছেন, "ব্রহ্মতত্ত্ব শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ শাস্ত্রসহায়েই তাহার তত্ত্ব জানা যায়; এবং এই জন্য গুরুসন্নিধানে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া শ্রবণ মননের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই দুইয়ের মাঝে একটা সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। একনাথের জীবনে আমরা তাহার পরিচয় পাই। অবশ্য প্রতিষ্ঠানপুরেই তাঁহার ব্রহ্মচারী জীবন পরিসমাপ্ত হয় নাই—এখানে জীবনের উন্মেষ মাত্র হইয়াছে। কিন্তু এইখানেই, কিরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় এবং শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলই বা কি, তাহা তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ-বর্ষীয় বালব্রহ্মচারীর নিষ্কলুষ পবিত্র জীবন, ব্রহ্মণ্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণ, আচার্য্য সন্নিধানে প্রশান্ত গম্ভীর, প্রসন্ন ও বিনীত আচরণ আর শাস্ত্রার্থ অধিগত করিবার জন্য আকুল ধ্যানতন্ময়তা—মনশ্চক্ষে এই চিত্রগুলি ভাসিয়া উঠিয়া আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

একনাথের শাস্ত্রপাঠ যে সফল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার সত্যের জন্য ব্যাকুলতা। তিনি কেবল কতকগুলি কথা আর যুক্তিতর্ক মুখস্থ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সত্যকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার পিপাসা জাগিয়া উঠিল। ইদানীন্তন তাঁহার পাঠের প্রয়োজন সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে—এখন বাকী আছে অধীত শাস্ত্রকে অনুভব করা। তাই একনাথ চতুষ্পাঠীতে আর বড় একটা যান না—প্রায়শঃই পূর্ব্বোক্ত শিব-মন্দিরে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। বৃদ্ধ চক্রপাণি পৌত্রের ভাবান্তর দেখিয়া বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু এ কথাও ভাবিলেন, একনাথ বালক মাত্র, সহসা একটা কিছু অকাণ্ড করিয়া বসিবে, এমন আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। একনাথ যে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, এমন কথা যে বৃদ্ধের মনে উদয় হয় নাই, তাহা নহে। তবে তিনি এই বলিয়াই মনকে বুঝাইলেন, শিশুকাল হইতে এত স্নেহ, মমতা, আদর—সকলই কি সে ভুলিয়া যাইবে? তাহা ছাড়া, ঘরে তাহার দুঃখ কিসের? একদিনের জন্যও যেমন তাহাকে কেহ দুঃখ দেয় নাই, সে-ও তো তেমনি কোনও দিন কাহাকেও দুঃখ দেয় নাই। তবে সে কোন দোষে ঘর ছাড়িয়া সকলকে কষ্ট দিবে?

বৃদ্ধ চক্রপাণি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়া-

ছিলেন যে লক্ষ্মীছাড়ার উপর কখনও ভগবানের কৃপা হয় না। যাহার ঘরে কোনও দুঃখ নাই, ভগবানের জন্য সেই যথার্থ ঘর ছাড়িতে পারে। সে তো সংসারজ্বালায় জ্বলিয়া ঘর ছাড়ে না—সংসারের সুখ দুঃসহ হয় বলিয়াই সে সংসার ছাড়িয়া যায়। যাহার সম্পদ্ আছে, সেই ত্যাগ করিতে পারে। লক্ষ্মীছাড়ার ত্যাগে যেমন কোনও মাহাত্ম্য নাই, তেমনি তাহা কখনও চিরস্থায়ীও হয় না।

একনাথের প্রাণে সত্য জানিবার পিপাসা জাগিয়াছে। কিন্তু, সে সত্য জানাইয়া দিবে কে? তাঁহার অধ্যাপকেরা বিদ্যা দিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞান দিবেন কে? শুধু বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তো জ্ঞান নয়, ইহা যে প্রাণবস্ত সত্য বস্তু। প্রাণকে যেমন তিনি অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করিতেছেন, জ্ঞান তাহার চেয়েও অন্তরঙ্গ ও সুস্পষ্ট—এই প্রাণ সেই জ্ঞানেরই জ্যোতিতে স্পন্দিত। উহা শুধু কথার কথা নয়—একটা অপ্রতিহত সত্যশক্তি। প্রাণ যেমন কাহারও উদ্ভাবিত নহে, পূর্ব্বসঞ্চিত প্রাণ হইতেই যেমন তাহা অপরে সঞ্চারিত হয়, জ্ঞানও তেমনি উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না—উহাও সঞ্চারের জন্য পূর্ব্বনিমিত্তের অপেক্ষা রাখে। এই জন্যই গুরুর প্রয়োজন। একনাথ ইহা বুঝিতে পারিয়া সদ্গুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

ব্যাকুলতা জন্মিলেই ইষ্টসিদ্ধির আর বিলম্ব থাকে না। একদিন শিবমন্দিরে ধ্যান করিবার সময় মহাদেব তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "দেওগড়ের জনার্দ্দন স্বামী তোমার গুরু, তুমি তাঁহার কাছে যাও। তিনি তোমাকে ইষ্ট বস্তু মিলাইয়া দিবেন।" এই আদেশ পাইয়া একনাথ আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

অবশেষে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক একনাথ সত্যলাভের পিপাসায় গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। "যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা লাভ-লোকসানের হিসাব খতাইয়া এই প্রব্রজ্যার বিচার করিও না। তীব্র বৈরাগ্যকে হিসাবে বেড়িয়া পাওয়া যায় না। বরং আসক্তির কারণ যেখানে যত বেশী, বৈরাগী সেখানে তত নিঃস্পৃহ, তত নির্ম্মম।

জনার্দ্দন স্বামীর জীবন বড় অদ্ভুত। তিনি গৃহী হইয়াও উদাসী। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার যুগে বাহমনী রাজ্যের মুসলমান রাজারা পণ্ডিত ও মেধাবী ব্রাহ্মণদিগের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। কালে জনার্দ্দন স্বামী একজন বিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তা ও সাধক হইয়া উঠিলেন। এই সূত্রে দেওগড়ের রাজা মালীক আহম্মদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। মালিক আহম্মদ যত্নপূর্ব্বক জনার্দ্দন স্বামীকে তাঁহার রাজসভায় স্থান দিলেন এবং দেওগড় দুর্গেই তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। রাজকার্য্যে মালীক সর্ব্বদাই জনার্দ্দনের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ক্রমে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কার্য্যতৎপরতা ও সত্যনিষ্ঠায় রাজা এত সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহাকেই মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজনীতির আবিলতার মাঝে থাকিয়াও জনার্দ্দন পদ্মপত্রের মত অনাসক্ত ও নিষ্কলুষ ছিলেন। অবধূত দত্তাত্রেয়ের মত এমন নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী এক শুকদেব ছাড়া আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার

রচিত অবধূতগীতা অদ্বৈত বেদান্তের মণি মুকুট। জনার্দ্দন স্বামী মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে হইবে, তিনি তাঁহার গুরু দত্তাত্রেয়ের একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ শিষ্য। তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে স্বয়ং মুসলমান রাজা তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দত্তাত্রেয়ের প্রতি সম্মানবশতঃ দুর্গমধ্যে বৃহস্পতিবার পুণ্য দিবস বলিয়া রাজকার্য্যাদি বন্ধ রাখিতে আদেশ দেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্তদেহে একনাথ যখন জনার্দ্দন স্বামীর গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। জনার্দ্দন স্বামীর গৃহে অভ্যাগতের অবারিত দ্বার; তথাপি বালক একনাথ আশা আশঙ্কায় আন্দোলিতচিত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। যাঁহার করুণা পাইবার আশায় এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, একবার তাঁহার দর্শন পাইলেই তিনি কৃতার্থ হন। কিন্তু আবার ভয়ও হইল, কি জানি বালক বলিয়া যদি জনার্দ্দন তাঁহাকে উপেক্ষা করেন, আবার যদি তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন? অবশ্য গুরুবাক্য তিনি লঙ্ঘন করিবেন না— কিন্তু গৃহে ফিরিবার কথা মনে হইতেই যে তাঁহার বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়।

ধীরে ধীরে একনাথ জনার্দ্দন স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জনার্দ্দনের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে একনাথকে কাছে টানিয়া আনিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বাছা, তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম। তুমি কে, তাহা আমি জানি। আজ সকালেই তোমাকে আসিতে দেখিয়াছিলাম।" একনাথ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। দুইজনের মধ্যে আর কোনও কথা হইল না। মুহূর্ত্তের মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লইলেন। একনাথ কিসের জন্য আসিয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলিলেন না, জনার্দ্দনও জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু মুখে না বলিলেও কাজে কাহারও ত্রুটী হইল না। যে যাহার আপন জন, সে তাহাকে এমন করিয়াই পায় বটে।

সত্যলাভ করিবার পিপাসা লইয়া একনাথ ঘর ছাড়িয়াছিলেন; অবশ্য সত্যলাভ করিতে হইলে কি করা প্রয়োজন, তাহার কোনও প্ল্যান তিনি ছকিয়া আনেন নাই। তিনি জানেন, "গুরুমুখ নাদা, গুরুমুখ বেদা।" গুরুর কাছে আত্মসমর্পণই হইল আসল কথা। গুরু বৈদ্যরাজ, চোখ মুখ দেখিয়াই তিনি রোগ চিনেন, ঔষধ বলিয়া দেন। কি ঔষধ দিতে হইবে, রোগী আবার তাহার কি উপদেশ দিবে? আপনার মনমত একটা সাধন করিবেন বলিয়া একনাথ গুরুর কাছে আসেন নাই—সাধনের চেয়ে সাধ্যবস্তু তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। গুরুকৃপা হইলেই সাধ্যবস্তু মিলিবে। সুতরাং তিনি কৃপার ভিখারী—সাধনপ্রয়াসী নন। গুরুকে সাধন বাৎলাইয়া দিবার ফরমাইস তিনি করিতে পারেন না।

পরদিন হইতে একনাথ জনার্দ্দনের গৃহকর্ম্মে লাগিয়া গেলেন। কেহ তাঁহাকে বলিয়াও দেয় নাই, তিনিও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষায় থাকেন নাই। কি করিয়া গুরুর সেবায় নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিবেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের কামনা। কাজেই কোথায় তাঁহাকে প্রয়োজন হইবে, নাড়ীর টানে যেন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন— হাসিমুখে ছুটিয়া গিয়া সেখানে দাঁড়ান

একদিনের মধ্যেই এই ছেলেটী—যে গৃহের সকলকে আপন করিয়া লইয়াছে, ইহা দেখিয়া গৃহের সকলের প্রাণ মমতায় ভরিয়া উঠিল। জনার্দ্দন নিঃশব্দে একনাথের এই সেবাতৎপরতা দেখিলেন; মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টি যেন একনাথের সর্ব্বাঙ্গে অমৃতবর্ষণ করিয়া গেল। একনাথ অন্তরে অন্তরে তাহা অনুভব করিয়া লজ্জায়, পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন।

এই ঐকান্তিক সেবায় একনাথের প্রাণ দিন দিন স্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। গৃহে থাকিতে এমন তৃপ্তি তো তিনি কখনও অনুভব করেন নাই। কি করিয়া সত্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইবেন, ইহাই ভাবিয়া সর্ব্বদা তাঁহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিত। সত্যের সন্ধানেই তিনি গুরুর কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু তো তাঁহাকে কোন তত্ত্ব উপদেশ দিলেন না—দিলেন তাঁহার সেবার অধিকার। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এই সেবাতেই তাঁহার অস্বস্তির জ্বালা জুড়াইয়া গেল—একটা অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এই কি সত্যের স্বরূপ? না ইহা সত্যের ভূমিকা? একনাথ সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন, প্রশান্ত চিত্ত না হইলে সত্যকে ধারণা করা যায় না—এমন কি জিজ্ঞাসুর অপ্রবুদ্ধ অস্বস্তিও সত্যানুভূতির প্রতিকূল। এই প্রশান্তি মিলে সেবাতে। তাঁহার জিজ্ঞাসার অস্বস্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনি পরমাশ্রয় লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হইয়াছেন। উৎকট সাধনা করিয়া মানুষ দিনে দিনে যে অনিশ্চিত ফল পাইবার আশা করে, মধুর সেবাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই যে তাহা সুনিশ্চিত হইয়া হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, একনাথ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন। সেবা এমনই আশ্চর্য্য সাধন

সুখের সংসার

সুখ সকলেই চায়—পশুতেও চায়, মানুষেও চায়। কিন্তু সকলেই একভাবে চায় না। মানুষ আর পশুর চাওয়ার মাঝে এই প্রভেদ দেখি, পশু একটা নির্দ্দিষ্ট রকমেই সুখ চায়, কিন্তু মানুষের চাওয়ার রকমারীর আর অন্ত নাই। পশুর চাওয়া পাওয়া নির্দ্দিষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহারা বেশ স্বস্তিতেই আছে। এই কথা স্মরণ করিয়া কখনও কখনও মানুষ পশুকে ঈর্ষ্যা করে। পশুপক্ষীর সকল ভার প্রকৃতি নিজহাতে তুলিয়া লইয়াছেন, কেবল মানুষের জন্যই আর এক রকম ব্যবস্থা—একমুঠা অন্নও তাহার সহজে জুটিবার উপায় নাই। নিজের এই অস্বস্তির কথা স্মরণ করিয়া এবং পশুপক্ষীর নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার সঙ্গে নিজের জীবন তুলনা করিয়া মানুষ, "বনের পশু মনের সুখে চরিয়া বেড়ায়" "পাখী আনন্দে আকাশে উড়িয়া যায়"—ইত্যাকার কল্পনায় ইতরপ্রাণীর প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু চরিয়া বেড়ানো আর উড়িয়া

যাওয়াটাই মনের সুখ ও আনন্দের পরিচায়ক কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এইটুকু বুঝি, ওই দুইটী চিত্রের মাঝে যে নিশ্চিন্ত ভাব আর স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস আছে, তাহাই মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছে। মানুষের ভাবনা চিন্তার অন্ত নাই; চলিতে ফিরিতে অষ্টপ্রহর তাহাকে বন্ধন যাতনা সহিতে হয়। এই দুইটাই দুঃখের—তাই ইহাদিগের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য মানুষ ব্যগ্র। কিন্তু কি করিয়া বাঁচা যাইবে, তাহাই তো সমস্যা। মানুষের মাঝে নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ কাহারা? সকলেই বলিবে, শিশুরাই নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ। অর্থাৎ মানবজীবনের ক্রমবিবর্ত্তনে শিশুর সঙ্গে পশুর সাদৃশ্য অত্যধিক। এই জন্য শৈশব-জীবনের সৌন্দর্য্য কল্পনায় মানুষ মুগ্ধ। সবাই বলিবে, শিশুর মত সুন্দর আর কিছুই নাই। কিন্তু কথা এই, শিশু সুন্দর আমার কাছেই—কিন্তু শিশুর নিজের কাছে কি? চিরকাল শিশুর মত অক্ষম থাকিতে কেহ চাহিবে কি? আমাদের পরিণতজীবনের ব্যস্ততা আর কোলাহলের আবেষ্টন যদি না থাকিত, তাহা হইলে শিশুজীবন আর পশুজীবনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সম্ভব হইত কি?

এইখানেই সমস্যা। ভাবনা চিন্তা ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দ হইতে পারিলে তো বাঁচিয়া যাই। কিন্তু সেটা যদি আমার পক্ষে জন্ম হইতেই আমরণ স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে সুখ হইত কিনা সন্দেহ। পশু নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ—কিন্তু তাহার দূরদৃষ্টি কোথায়? জীবনের প্রসার কোথায়? প্রকৃতি তাহাকে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছে—কিন্তু সেইটাই কি চরম সার্থকতা হইল? মধুটাই দেখিয়াছি, হুলটা দেখিতে পাইতেছি না। পশুই বল আর শিশুই বল, যদি দুঃখ বা ভয়ের কারণ আসিয়া উপস্থিত হইল—আর প্রকৃতির এমন ব্যবস্থা যে এগুলি আসিবেই—তাহা হইলে অমনি তাহারা সাত হাত জলে পড়িয়া গেল। উপস্থিত দুঃখ আর ভয়ের চিত্র ছাড়া মনে আর কোনও বৃত্তিই তখন জাগিবে না। দুঃখের কারণ থাকা সত্ত্বেও সুখ অনুভব করা, ভয় কারণ থাকা সত্ত্বে তাহাকে জয় করিবার বীর্য্য অনুভব করা—প্রাকৃতজীবনে এই ভাব-দ্বৈত কোথায়? প্রকৃতি হাসিতে বলিলেই হাসিল, কাঁদিতে বলিলেই কাঁদিল—এমনি করিয়া চিরকাল ধরিয়া তাহার খেলার পুতুল হইয়া থাকিতে কেহ চাহিবে কি? প্রকৃতি কাহাকেও হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে—সে বেচারী তাহার তুড়িতে বাঁদরনাচ নাচিতেছে—এ দৃশ্য দেখিয়া আমার সুখ আছে। কিন্তু অমন বাঁদরনাচ নাচিতে আমি রাজী নই। তাই বলিতেছিলাম, পশুত্ব বা শিশুত্ব যদি আমাদের স্বাভাবিক হইত, আর এই কথাটা যদি কোনও ক্রমে আমরা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত বড় শাস্তি বহন করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। তবে না জানিয়া বাঁদর নাচ নাচাতে সুখ দুখ কতটুকু আছে, তাহা জানি না—নিশ্চেষ্ট নিব্বীর্য্যের আফিংখুরী আরাম যে একটা আছে, তাহা মানি।

আসল কথা, শিশুর স্বাচ্ছন্দ্য আর নির্ভাবনা আমরা শক্তি দিয়া অর্জ্জন করিতে চাই—অস্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে থাকিয়াও আত্মশক্তিবলে তাহাকে পরাভূত করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অর্জ্জন করিতে চাই, ভাবনার জালে বেষ্টিত হইয়াও বীর্য্যবলে সে জাল ছিন্ন করিতে চাই—ইহাতেই যথার্থ পৌরুষ। আর এই পৌরুষই হইল সংসারের যথার্থ সুখ।

পশুর বা শিশুর স্বাচ্ছন্দ্য চাই—কিন্তু অজ্ঞানে নয়—পূর্ণ জ্ঞানে। শিশুর মত নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দ স্বভাব যদি জ্ঞানের ফল হয়, তাহা হইলেই বলিব, জীবন সার্থক। শাস্ত্র বলিবেন, এই তো পরমহংস অবস্থা—মানব জীবনের চরম আদর্শ। তাহা হইলে দেখ, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে, তাহার কান্নাহাসির তরঙ্গে আপনাকে সঁপিয়া দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু একটা কেন্দ্রে আমি নিশ্চল হইয়া থাকিতে চাই—সেখানে কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করিব না। হাসিব কাঁদিব—কিন্তু জানিব, ও আমার ছায়া আমি; আসল আমি নির্ব্বিকার—স্বাধীন।

মানুষের জীবনে আমিটা এই রূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটা প্রকৃতির অধীন—তাহার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, সুখ আছে, দুঃখ আছে। আর একটা কেবলই এই সমস্ত বিকার অস্বীকার করিয়া স্বরাট্ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে। এই দ্বন্দ্ব নিয়াই তো মানব জীবনের ভিত্তিপত্তন। দুঃখ পাইয়াও, এই দুঃখ চিরকাল থাকিবে না—এই আশা বা বিশ্বাস একমাত্র পরিণত মানুষেরই আছে; পশুর নাই, শিশুরও নাই—তাহারা বর্ত্তমান অবস্থার দাস মাত্র। একমাত্র পরিণত মানুষই বর্ত্তমানের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া উদার ভবিষ্যতে জীবনকে বিস্তার করিয়া দিতে পারে। এই দূরদৃষ্টি, এই ব্যাপ্তিবোধই মনুষ্যত্ব।

সংসার এই মনুষ্যত্ব উন্মেষের স্থান। সুখের সংসার হউক, এ কে না চায়? কিন্তু সে সুখ তো জড়ত্বের সুখ নয়—পশুর সুখ বা শিশুর সুখ নয়, মানুষের সুখ। মানুষের সুখ বলিতেই বুঝি—তাহা প্রকৃতির পরাভবে আত্মার বিজয়োল্লাস। শুধু দেহ তুমি নও, বা মনের কতকগুলি বিকারেই তোমার মনুষ্যত্বের সার্থকতা নয়—তুমি দেহের অতীত, মনের অতীত, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে সংসার এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে চায়। এই হইল সংসারে সুখের সন্ধানের নিদান তত্ত্ব। এই কথা ভুলিয়া শুধু পশুর মত যে সংসারে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়, সে সুখ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু স্বস্তি কোথায়ও পাইবে না।

পশুর দেহের প্রয়োজন মিটিলেই হইল। দেহরক্ষার জন্য ভয়, দেহপুষ্টির জন্য আহার ও ও নিদ্রা, আর দেহসৃষ্টির জন্য মৈথুন—এই হইলেই পশুর জীবন পূর্ণ। কিন্তু কেবল এই কয়টা বৃত্তি হইলেই তো মানুষের চলে না। অতি জঘন্য মানুষের মাঝে পশুবৃত্তিগুলি নিতান্তই প্রবল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ছাড়াও আরও কিছু থাকে। সেইটুকুই হইল মনুষ্যত্বের বীজ। এমন মানুষও কল্পনা করি, যাহার মাঝে ওই পশুবৃত্তিগুলি মোটেই নাই অথবা দেহরক্ষার জন্য দুই একটা থাকিলেও ভিতরের পশুটাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া শক্তিরূপিণী দুর্গার আবির্ভাব যাহার মাঝে হইয়াছে। সংসার সুখের করিতে হইলে ভিতরের পশুটাকে নিহত করিবার জন্য শক্তির আবাহন করিতে হইবে।

মানুষের জীবনব্যবস্থাও তাই স্বভাবিকতঃই কতকটা উহার অনুকূলই হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। একটা পশুর আর একটা পশুর জন্য আত্মত্যাগ প্রয়োজন হয় না। সময় সময় তাহাদের মাঝেও আত্মত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা না করিলেও ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের কোনও ক্ষতি হইত

না। কিন্তু মানুষের বেলা আলাদা ব্যবস্থা। মানুষ যত পশুবৃত্তই হউক না কেন, তাহার একটা সমাজ চাই। আর সমাজটি টিকিতে হইলে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতে থাকিলে জাতিধ্বংস অনিবার্য্য। তাই স্বার্থরক্ষা করিবার জন্যই মানুষকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিতে হইয়াছে। এই স্বার্থত্যাগকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্যাগবৃত্তি হইল মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের প্রথম উন্মেষ—পশুবৃত্তির পরের পৈঠা। যেখানেই ত্যাগ—সেখানেই নিজকে বড় করিয়া জানা বা জ্ঞান, অথবা নিজকে বড় করিয়া পাওয়া বা প্রেম। ত্যাগের মাঝে যে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি রহিয়াছে, যাহা পাশববৃত্তির চেয়েও বড়—মানুষ একবার যখন তাহার সন্ধান পায়, তখন তাহাতে মজিয়া যায়—স্বার্থরক্ষার জন্য আর তখন ত্যাগ প্রয়োজন না—ত্যাগমাত্রই তখন ত্যাগের প্রয়োজন। এই নিঃস্বার্থ ত্যাগকেই বলি মনুষ্যত্ব—উহাই মানুষের ধর্ম্ম। এই হইল সনাতন ধর্ম্ম; সম্প্রদায়ভেদে, দেশভেদে ইহারই রূপান্তর দেখিতেছি; খুঁজিয়া দেখ, মূল কথাটা এক—সর্ব্বত্রই ত্যাগমূলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম—সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তি ত্যাগ।

সংসার যদি সুখের করিতে হয়, তাহা হইলে ত্যাগের উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পশুর সংসার সুখের নয়—মানুষের সংসারই সুখের। আর ত্যাগই হইল একমাত্র মানবধর্ম্ম। সুতরাং ত্যাগের সংসার, ধর্ম্মের সংসার না হইলে সুখের সংসার হইবে না। ইহা বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান।

ধর্ম্মের দুইটা দিক আছে—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। যে পর্য্যন্ত পরম পুরুষার্থ লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের দ্বারা শাসিত হইয়া আমাদিগকে জীবন পরিচালিত করিতে হইবে। জীবন ক্রম-বিকশিত—এক সত্য হইতে তদপেক্ষা মহত্তর সত্যে তাহা নিয়তই উত্তীর্ণ হইতেছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তাহার দুইটা সঞ্চালক পক্ষ। একটা কিছু হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে, এবং অপর একটা কিছুতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহাই জীবনের গতি, ধর্ম্মের গতি—যেমন আমরা এক পায়ে মাটীতে ভর দিয়া আর এক পা বাড়াইয়া দিই। নিবৃত্তিতে ভর দিয়া যখন উন্নততর প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হই, তখনই আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর হয়।

সংসারধর্ম্মে সংযম হইল নিবৃত্তির দিক, ত্যাগ হইল প্রবৃত্তির দিক। অবশ্য ত্যাগ বলিতে নিঃস্বার্থ ত্যাগই বুঝিব—যে ত্যাগ জ্ঞানের, প্রেমের, সেবার সোসর। সংযমে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ত্যাগ করা সহজ হয় না। পশুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ লইয়াই না সংসার। পশুকে পরাভূত করিতে হইবে—নিবৃত্ত করিতে হইবে; তাই সংযম বলিতে বুঝি পশুবৃত্তির সংযম। আর ত্যাগ বলিতে বুঝি মনুষ্যবৃত্তির উন্মেষ। পশুর পক্ষে ভোগ স্বাভাবিক; আর মানুষের পক্ষে ত্যাগ স্বাভাবিক। যে ভোগী, সে যেন নিজকে মানুষ বলিয়া পরিচয় না দেয়; সে পশুরও অধম, কেননা খাঁটী পশুত্বটুকুও তাহার মাঝে নাই। পশুর স্বাধীন ইচ্ছা নাই, সে নিতান্তই প্রকৃতির অনুগত, তাই তাহার বৃত্তিগুলি ধরিয়া পাপপুণ্যের বিচার করি না। কিন্তু মানুষের ত একটু না একটু স্বাধীনতা বা

আত্মভাব আছে। সে যখন পশুর মত ভোগী হয়, তখন নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বা আত্মার অপমান করিয়াই হয়। হাজার নিমিত্তের দোহাই দিলেও মনে মনে সে এটা বেশ জানে। তাই ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই তার অনুশোচনা আসেই আসে, ভাল-মন্দ, পাপপুণ্যের বিচার মনে জাগেই। সংসারে দুঃখ বলিতে এই অসংযমের দুঃখ। অনিচ্ছা থাকিলেও কতকটা নিজের স্বেচ্ছাতেই মানুষ যখন পশুবৃত্ত হয়, তখনই দুঃখ পায়। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাটা হেঁয়ালীর মত হইল বটে—কিন্তু যতক্ষণ অসংযম ও দুঃখ রহিয়াছে, পশুতে মানুষে যতক্ষণ জড়াজড়ি হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই হেঁয়ালীর মীমাংসা হইবে না। আর মীমাংসা হয় না বলিয়াই তো দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠে।

পশুবৃত্তিগুলি সংযত কর, সিংহবাহিনীকে হৃদয়ে পাইবে। শক্তি আসিলেই জ্ঞান আসিবে। সেই জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে ত্যাগে। প্রেম তখন হৃদয় জুড়িয়া বসিবে; কর্ম্ম ত্যাগের স্পর্শে সেবায় রূপান্তরিত হইবে। ইহাই সুখ—পশুর সুখ নয়, মানুষের সুখ। সর্ব্বাগ্রে চাই সংযম—তাহা হইতে আসিবে ত্যাগ। সংসারে এই দুইটীই সুখের সঙ্কেত। অন্য উপায়ে সুখ খুঁজিলে পাইবে না—এখন ঘরেই থাক, আর বনেই যাও। সিংহবাহিনী হৃদয়ে আসিলেই লক্ষ্মী-সরস্বতী অচলা হইয়া থাকিবেন।

বেদান্তসার

—*—

[ষষ্ঠ খণ্ড—বিবৃতি—অধ্যাসবাদ]

—*—

সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ

"ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা"—এই কথাটার মাঝে আর একদিক হইতে একটু বুঝিবার আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে সত্যমিথ্যার বিচারে যে সত্তার কথা উঠে, তাহার স্পষ্টতার তারতম্য আছে। সত্য মিথ্যার বিরোধী নয়—অধিকতর পরিস্ফুট ও ব্যাপক অনুভূতিকেই সত্য বলা হইতেছে। মিথ্যাকে অতিক্রম করিয়া, তাহাকে কুক্ষিগত করিয়া, তাহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়াও সত্য বস্তু বিরাজমান রহিয়াছে, সত্য-মিথ্যার বিরোধে এই কথাই বুঝিতে হইবে। ইহারা এমন বিরোধী সত্তা নয় যে, একের স্বীকারে অপরের উচ্ছেদ হইবে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে অদ্বৈত-তত্ত্ব স্থাপন করা সম্ভবপর হইত না। মিথ্যার বিরোধী (বিপরীতবৃত্তি) যে সত্য, তাহাকে অদ্বৈত স্বীকার করিলেও বিরোধী দ্বৈতসত্তাকে কখনও অস্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং ইহাতে কার্য্যতঃ

অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু সত্যকে মিথ্যার স্ফুটতর অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিলে আপাতপ্রতীয়মান মিথ্যাও সত্যের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে সমস্তটা জড়াইয়া এক নিবিড় অদ্বৈতানুভূতির আভাস পাওয়া যায়। সাধনাদ্বারা এই ব্যাপ্তিবোধকে জাগ্রত করিতে পারিলেই এই অনুভূতি সুস্পষ্ট হইবে। অনেকে সত্যের বা ব্রহ্মের এই সর্ব্বাবগাহিত্ব ও বিভুত্বের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া জগৎ হইতে তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে চান। তাহাতে বিশ্লেষণের সুবিধা হয় বটে, সাধনার প্রথমাবস্থায় কিছু উপকারও আছে বটে, কিন্তু উহাতেই সমগ্র সত্য ধরা পড়ে না। ব্রহ্ম সংশ্লেষণতত্ত্ব—এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে

আচার্য্যদিগের মধ্যেও অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু তত্ত্বে অবগাহন করিলে এই সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য হয়; তখন বোঝা যায়, এক একজন এক এক ভূমিকায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন বলিয়াই এই আপাতদৃষ্ট বিরোধের সৃষ্টি, নতুবা সকলেই এক বস্তুকেই লক্ষ্য করিতেছেন। সত্য নিরূপণ করিবার সময় আমাদিগকে সর্ব্বসমঞ্জসা দৃষ্টি নিয়া চলিতে হইবে, গোঁড়ামী করিয়া এক পক্ষ জয়ী করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না।

পূর্ব্বে সত্য কথার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম, উহা সত্তার স্ফুটতার তারতম্যের দ্যোতক। মিথ্যা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। মিথ্যা অর্থে শূন্য নয়, তুচ্ছ। সুতরাং এই কথাটাও সত্তাস্ফোটের তারতম্য মাত্র বুঝাইতেছে।

সত্তা ও প্রতীতি

এইখানে আমাদিগকে আর একটী বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আমরা 'বস্তুর' সত্তা বিচার করিতেছি বটে, কিন্তু যেখানে তাহার স্ফুটতার তারতম্য প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, বুঝিতে হইবে, সেইখানেই বস্তুর বহিঃসত্তা অপেক্ষা অন্তঃসত্তা বা বৌদ্ধ সত্তার উপরই আমরা জোর দিতেছি। বেদান্তের এই অন্তর্মুখীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বোধ হয় আমাদের বহু বিরোধের সামঞ্জস্য সহজেই হইয়া যায়। ব্রহ্ম 'বস্তু' বটে, কিন্তু বস্তু শব্দ এখানে সর্ব্বব্যাপক সত্তার ভাব বহন করিতেছে—শব্দটীর প্রকৃতিগত অর্থও তাহাই। ব্রহ্মবস্তু আনুভবিক —এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি ইহাই স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্মপ্রসঙ্গে বিচার্য্য জগৎও আনুভবিক; অর্থাৎ আমরা বিচার করিতেছি জগতের বহিঃসত্তা নিয়া নয়, আমাদের অন্তরে প্রতিভাত অন্তঃসত্তা লইয়া। বাস্তবিক আমার অন্তরে যে জগৎ, তাহারই সত্যত্ব মিথ্যাত্ব লইয়াই আমার সুখদুঃখ। বহির্নিরপেক্ষ হইয়া এই বিচার করিতে পারিলে তবে বেদান্তানুশীলনের একটা কার্য্যতঃ তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। স্থূলে জগতের যে পরিণাম ঘটিতেছে, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরিণাম আমার অন্তরকে স্পর্শ না করে। সুতরাং স্থূলতঃ জগতের কি বিকার, কি ইতিহাস, কি তত্ত্ব তাহা বেদান্তের বিচার্য্য নয়—অন্যান্য দর্শন সুষ্ঠুভাবে তাহা করিয়া গিয়াছে। এই বহিঃসত্তাযুক্ত জগৎ অন্তরে কি ভাব, কি প্রেরণা জাগাইতেছে, তাহা লইয়াই বেদান্তবিচারের সূত্রপাত। সুতরাং জগতের মিথ্যাত্ব

যদি জীবত্বের মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে বেদান্তীর আপত্তি করিবার কিছুই নাই, বরং উহাতেই তাহার মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। অতঃপর আমাদিগকে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যাহা কিছু লইয়া বিচার করিতেছি, তাহার আনুভবিক সত্তাই আমাদের বিচার্য্য। আমরা অনুভূতির জন্ম লইয়া বিচার করিতেছি, জড়ের বিচার-বিশ্লেষ করিতেছি না।

ভ্রম সংস্কার

এই কথার উপর নির্ভর করিয়া বেদান্তী অধ্যাসবাদের আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। বেদান্তী বলিতেছেন, ব্রহ্মে জগতের আরোপ; বস্তুতে অবস্তুর আরোপ; সত্যে মিথ্যার আরোপ; রজ্জুতে সর্পের আরোপ। প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতেছেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, যে বস্তুর আরোপ হইতেছে, তাহারও একটা সত্তা আছে। সত্তাবিচারে তাহার কি উত্তর হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও একটা উত্তর হইতে পারে। এই যে বস্তুতে অবস্তুর আরোপ, ইহা একটা ভ্রম মাত্র—ব্রহ্মে জগদ্ ভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রম ইত্যাদি। ভ্রম সংস্কার হইতে উৎপন্ন। যাহা ভ্রম প্রত্যয়ের বিষয়, তাহার সংস্কার মাত্র যদি চিত্তে থাকে, তবেই ভ্রম সম্ভব; উহার জন্ম ভ্রমবিষয়ের পূর্ব্ব প্রতীতি থাকিলেই হইল, উহারও যে পরমার্থ সত্তা থাকা প্রয়োজন, এমন তো নয়। ভ্রম বিষয়ের পরমার্থসত্তা না থাকিলে ভ্রম হয় না—এমন ব্যতিরেক ব্যাপ্তি আমরা দেখাইতে পারি না। সংস্কার থাকিলেই ভ্রম সম্ভব।

আর একটী কথা, স্মৃতিতে বিষয়ের জ্ঞান থাকে। কিন্তু এই স্মৃতি যেখানে সংস্কার হইতে উৎপন্ন, সেখানেও আমরা দেখি, বিষয়ের জ্ঞান রহিয়াছে। অথচ পূর্ব্বে বিষয়ের সত্তাপ্রতীতি ছিল না। যেমন সংশয়ের বা বিপর্য্যয়ের (ভ্রমের) স্মৃতি। যদি কেহ বলে, "এই যে উইয়ের ঢিপিটা, এটাকে দেখিয়া তখন আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এটা কি একটা গাছের গুঁড়ি না মানুষ?" এখানে গাছের গুঁড়ি বা মানুষের স্মৃতি প্রমাতার মনে বেশ সুস্পষ্ট হইয়াই আছে। অথচ দুইটীই বাস্তবিক পক্ষে তাহার সংস্কার হইতে উৎপন্ন, উপস্থিত বিষয়ের সহিত পরমার্থ সত্তা হিসাবে তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। তেমনি ভ্রমের বেলায় যদি কেহ বলে, "এই ঝিনুকটায় আমার পূর্ব্বে রূপার ভ্রম হইয়াছিল", তাহা হইলে স্মৃতিগত রূপার সংস্কারগত সত্তা ছাড়া পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না। এখানে কেহ এমন আপত্তিও করিতে পারে না যে, এই স্মৃতি সংশয় আর বিপর্য্যয়েরই স্মৃতি, বিষয়ের স্মৃতি নয়; কেননা, সংশয় আর বিপর্য্যয়ের যদি কোনও বিষয়ই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের স্মৃতি কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ উদাহৃত স্মৃতি তো সংশয়-বিপর্য্যয়ের সামান্যজ্ঞান নহে, বিশেষজ্ঞান।

তাহা হইলে স্থির হইল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রম হইতে উৎপন্ন সংস্কারপরম্পরার সাহায্যেই ভ্রমের প্রতীতি সমর্থিত হইতে পারে, ইহার জন্য ভ্রমবিষয়ের বাস্তব সত্তা স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই। অথচ এই বিষয় যে একান্ত অসৎ, তাহাও বলা চলে না; কেননা বাস্তব সত্তা না থাকিলেও আমাদের প্রতীতিতে তাহার সত্তা আছেই। এই কথাটুকুই বেদান্তের প্রাণ। জ্ঞান ও অজ্ঞান

রূপ প্রত্যয়মূলক ব্যাপারের বাস্তব ও অবাস্তব সত্তা লইয়া বেদান্তের বিচার—কোনও মূর্ত্ত বস্তু লইয়া নহে। ব্রহ্ম একটা মূর্ত্ত বস্তু এবং জগৎ তাহার বিরোধী আর একটা মূর্ত্ত বস্তু—এরূপ স্বকপোলকল্পিত অপব্যাখ্যা বেদান্তীর স্কন্ধে চাপানো সমীচীন হইবে না। মূর্ত্ত বস্তুর বিচারও পরে আসিতে পারে, কিন্তু তাহা ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পর্ক নির্ণয়ের বেলাতে নয়; অজ্ঞানপ্রসূত জগতেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লিষ্ট করিয়া বিচার করিবার সময় দেখিতে পাইব, গুণের পরিণামে অমূর্ত্ত হইতে মূর্ত্তের ক্রমিক অভিব্যক্তি হইতেছে। এই ব্যাপার সাংখ্যের বিচার্য্য, সুতরাং এখানে ইহার বিস্তৃতি প্রয়োজন নাই। তবে বেদান্তীর জগৎ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা থাকিতে পারে বলিয়াই কথাটা এখানে ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইল মাত্র।

অধ্যাসবাদে দোষবিচার

বর্ত্তমান ভ্রমদর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমদর্শনের সংস্কার হইতে উৎপন্ন; উহা আবার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয়ের সংস্কার হইতে উৎপন্ন। এইরূপ একটা ভ্রম-প্রতীতির সংস্কারপ্রবাহ স্বীকার করিলে, অধ্যাসবাদ আর শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হইবে না। কিন্তু এখানে আর একটা আপত্তি হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন, ভ্রমের প্রবাহ স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় ও অনবস্থারূপ দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। অন্যোন্যাশ্রয় কিরূপে হয়, প্রথমতঃ তাহাই বলি। বর্ত্তমান দৃষ্টজগতের সত্তা কিসের উপর নির্ভর করে? বেদান্তী বলিতেছেন, উহা জগৎসম্বন্ধীয় ভ্রমের সংস্কার হইতে উৎপন্ন। তাহা হইলে সংস্কার হইতে বাস্তব সত্তা উৎপন্ন হইল, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তব সত্তার প্রতীতি না হইলে সংস্কারই বা উৎপন্ন হইবে কি করিয়া? তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, সত্তা সংস্কারের উপর নির্ভরশীল, আবার সংস্কারও সত্তার উপর নির্ভরশীল। এইরূপ চক্রের সৃষ্টি হইলে কোনও ব্যাপারের তত্ত্ব মীমাংসিত হয় না, কেননা এখানে কার্য্যকারণ-ধারা আবিষ্কার করিবার কোনও সঙ্কেত পাওয়া গেল না।

তারপর বেদান্তী ভ্রমের প্রবাহ স্বীকার করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, বর্ত্তমান প্রতীতি পূর্ব্ব সংস্কার হইতে উৎপন্ন; উহা আবার তাহার পূর্ব্ব সংস্কার হইতে উৎপন্ন। এইরূপে একটা ধারা স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে আবার অনবস্থ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। একটার পূর্ব্বে আর একটা, তার পূর্ব্বে আর একটা—এইরূপ একটা শৃঙ্খল আসিয়া গেলে কোথাও আর আদি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং তর্কেরও বিশ্রাম হয় না। ইহাতেও জগৎ-তত্ত্বের কোনও সুমীমাংসা হয় না।

বিপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে বেদান্তী বলিতেছেন, ভ্রমের প্রবাহকে আমরা অনাদি বলিয়া স্বীকার করি। ইহাতে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আপত্তিটী একরূপ মানিয়াই লওয়া হইল। এরূপ উত্তরে সংশয় সহজে দূর হয় না; সুতরাং বেদান্তীর এই প্রবাহের অনাদিত্ববাদ একটু বিশেষ প্রণিধান সহকারে বিচার করিয়া ইহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, আমরা কোন্ ভূমি হইতে বিচার করিব। আমরা শুদ্ধ তর্কের সাহায্যে একটা কিছু দাঁড় করাইতে চাহি না। জগৎব্যাপার ঠিক তত্ত্বতঃ যেমনটী

চলিতেছে, তেমনটী দেখিতে শিখানোই দর্শনের তাৎপর্য্য। মনে রাখিতে হইবে, আমরা দর্শন আলোচনা করিতেছি, যুক্তিতর্কের কলা-কৌশল দেখাইতেছি না। পূর্ব্ব হইতেই আমি একটা ধারণা করিয়া রাখিব, এবং পরে যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহারই সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব, ইহা দর্শনের ধারা নহে। দর্শন যথাযথরূপে দেখাইতে শিখাইবে। সুতরাং একটা কিছু প্রমাণ করিবার চেষ্টা না করিয়া আসলে ব্যাপারটী কি, আমরা তাহারই অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। ইহাই যে বিচারের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী, তাহা আধুনিক যুক্তিবাদীও স্বীকার করিবেন।

অনবস্থা

প্রথমতঃই আমরা জিজ্ঞাসা করি, অনবস্থা দোষের স্বরূপ ফল ও অধিকার কি? সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাউক।

তত্ত্ববিচার বলিতেই পরিণাম বিচার বুঝি। বাস্তবিক পরিণামেরই বিচার। বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু অপরিণামী। স্বরূপতঃ তাহার বিচার চলিতে পারে না। এই অপরিণামী বস্তুর আলোকে আলোকিত পরিণামী বিষয়ের বিচারদ্বারা অনুগ্রাহক অপরিণামী বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করা—ইহাই বেদান্তীর ব্রহ্মবিচার।" "নেতি নেতি" বাক্য তাহার উদাহরণ স্থল। আবার দেখি, পরিণামের বিচার করিতে গেলেই কাল স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে কার্য্যকারণ-প্রবাহের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচারই প্রকৃত বিচার। আমরা কারণ দেখিয়া কার্য্যের বিচার বা কার্য্য দেখিয়া কারণের বিচার করিতে পারি। বেদান্তী বাহ্য দৃষ্টজগৎকে স্বীকার করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে বিলোমক্রমে বিচার করিতে হইবে। বিলোমবিচারে কারণের সাক্ষাৎকার হয়। কারণদর্শন যে পর্য্যন্ত ধ্রুব না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্ব নিরূপণ হয় না। আমি যাহাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলাম, যদি অনুসন্ধানে তাহারও কারণ আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে আরও সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণা হইল—বিচারও পিছাইয়া গেল। যখন চরম কারণে পৌঁছিয়া বলিতে পারিব, বিচার্য্য বিষয়ের ইহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্ম অনুশীলন হইতে পারে না, তখনই বুঝিব, বিচারে তত্ত্ব নিরূপিত হইল। এইরূপ নির্ণয় বা নিরূপণ সকল বাদীরই প্রয়োজন। কিন্তু কার্য্যকারণপরম্পরা দেখাইতে গিয়া কেহ যদি এমন তর্ক উপস্থিত করে, যাহাতে কার্য্যকারণের ধারা পৌনঃ-পুনিক দশমিকের মত কেবল আবর্ত্তিত হইয়াই চলে, তাহা হইলে কোনও তত্ত্ব নিরূপণ হয় না। এরূপ বিচার অবশ্যই নিরর্থক। বিচারের এই দোষকেই অনবস্থা বলে। অর্থাৎ আমরা ধ্রুবে পৌঁছাইতে চাই, অধ্রুবে থাকিয়া গেলেই তর্ক অনবস্থিত হইল। উহাই দোষের।

সাকার না নিরাকার ?

"ঈশ্বর নিরাকার না সাকার ?"

"দন্ত্য নয়ে হ্রস্ব ই-কার নয়, দীর্ঘ ঈকার। ঈশ্বর "নীরাকার" অর্থাৎ জলের আকার। 'নীর' মানে জল, তা জানিস্ তো ? জল যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রেরই আকার পায় ; ঈশ্বরও তাই ; যেমন আধারে থাকেন, তেমনই তাঁর আকার। তারপর তোকে আসল কথা শিখিয়ে দিই। তুই করবি কি জানিস্, প্রত্যহ বানান করবি ন-য়ে দীর্ঘ ঈকার দিয়ে নীরাকার। এই রকম বানান করতে করতে একদিন হঠাৎ দেখবি নীর বা জল শুকিয়ে গিয়েছে, সব শূন্য হয়ে গিয়েছে ; তোর দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হয়ে গিয়েছে। তোর মুখ দিয়ে বানান হচ্ছে নিরাকার ; দীর্ঘ একেবারে হ্রস্ব হয়ে গিয়েছে তোর অগোচরে। তখন কি করবি জানিস্ ? প্রত্যহ ঐ হ্রস্ব ইকার দিয়েই 'নিরাকার' বানান করতে থাকবি। বানান কিছুতেই ভুলিস্ নে, ছাড়িস্ নে। তারপর হঠাৎ একদিন তোর হ্রস্ব দীর্ঘ সব চলে যাবে ; তখন তোর মুখ দিয়েই বের হবে নরাকার—ন য়ে হ্রস্ব ইকারও নেই, দীর্ঘ ঈকারও নেই। সেই-ই আসল বানান ; বুঝলি. ঈশ্বর প্রথমে 'নীরাকার' তারপর 'নিরাকার' তারপর সকলের শেষে 'নরাকার।' সকল নরনারীতেই ঈশ্বর দর্শন হবে। মনে রাখিস্, তিনি নরাকার ; নরই নারায়ণ। নরের পূজা, নরের সেবাই নারায়ণের সেবা। চিরজীবন এই নর-নারায়ণের সেবা করিস্। মানুষের মুখেই তাঁর শোভা দেখতে পাবি ; অরূপী নারায়ণ নররূপেই বিরাজ করছেন। আমি তোকে বল্ছি সার কথা, মানুষকে ঘৃণা করিস্নে ; মানুষের জন্য প্রাণ দিস্, মানুষের সেবা করিস্। জীবনে আর কিছুর দরকার হবে না—সাধন-ভজনের সার কথা নর-নারায়ণের সেবা।" —কাঙ্গাল হরিনাথ

("খোকাখুকু" অগ্রহায়ণ)

সত্য ও সুন্দর

সেদিন সন্ধ্যার আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে—চার দিকে যেন রঙের হোরী খেলা সুরু হয়েছে। সতীর্থ বললেন, "আজ প্রকৃতি অমন করে সেজেছে-চল, যেতেই হবে, নইলে দেখবে কে ? তার সাজাটাই যে বৃথা হবে।" বাস্তবিক, দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু তখনি প্রশ্ন জাগল, এই তো সৌন্দর্য্যের মেলা জগৎ জুড়ে—এ দেখছে কে ? বাগানে দুটো চারটে ফুল ফোটে, দেখে খুসী হই বা তা দিয়ে দেবতার পূজা করি, কিন্তু বনে বনে কত ফুল ফুটে রয়েছে, যুগে যুগে কত ফুল ফুটেছে, —মানুষ তো তা দেখেনি। তবে তা ভোগ করেছে কে ? অন্তর হতে গম্ভীর সুরে কে বলে উঠল, "এই জন্যই ঋষিরা দেবগণ

মানতেন, শুধু তোর ভোগের জন্য জগৎ—এমন সংস্কার কোথায় পেলি?"

মানুষ সব জায়গায় নাই, কিন্তু দেবতা আছেন। যেখানে যে মাধুর্য্য ফুটে উঠেছে, সেইখানেই আছেন তার অধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তি—যিনি ফোটাচ্ছেন; আর তাকে জড়িয়ে আছেন অধিষ্ঠাতা চৈতন্য—যিনি দেখছেন। এ জগতের সর্ব্বত্র শক্তি আর চৈতন্য। মানুষের মাঝে ভগবান্ দেখবার শক্তি দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে আর কতটুকু? মানুষকে ওই দেবতার সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ করতে হবে—যিনি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের রূপরস সৃষ্টি করছেন, আর যিনি প্রেমের স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে, অবিচল অবিক্ষুব্ধ মমতা নিয়ে তা দেখছেন; তাঁদের মাঝে আত্মবিসর্জন দিতে হবে। ওরে পাগল, তুই কি রূপ দেখ্‌বি, ওই তোর দুটী চোখ দিয়ে? ওই যে চোখের সংস্কারে তোর রূপদৃষ্টি খণ্ডিত হচ্ছে—চোখ থাকতেও যে তুই অন্ধ, তা কি জানিস্?

বিজ্ঞানও বল্‌বে, চোখে আর কতটুকু দেখি? সবটাই তো একটা ছায়াবাজী মাত্র—স্নায়ু, মস্তিষ্ক আর ইথরের একটা স্পন্দন-বিনিময় শুধু! সেকেণ্ডে ইথরের চারকোটী স্পন্দন হতে আটকোটী স্পন্দনের মাঝে এই জগৎ—তার নীচেও আমাদের রূপদর্শন হয় না—উপরেও হয় না। জড় বিজ্ঞানেরই যখন এই রায়, তখন শুধু চোখের দেখাতেই তত্ত্ব মিলবে, রূপদর্শনেই তৃপ্তি হবে, এ কথা আর বলি কোন্ সাহসে?

তারপর আরও একটু তলিয়ে দেখি, দেখার মাঝেও মনের কত কারসাজি। একটা কিছু ভাল যে লাগে, তার কারণ তো খুঁজে পাই না। এই তো সূর্য্যাস্ত বড় সুন্দর লাগ্‌ল। কেন লাগ্‌ল? সৌন্দর্য্যবোধের নিদানতত্ত্ব কি? সোজাসুজি জবাব দিতে পারি, সুন্দর না লেগে উপায় ছিল না বলেই সুন্দর লাগল। সূক্ষ্ম সমালোচক হয়ত আর একটু গম্ভীর হয়ে, বলবেন, "ওই যে ভাল লাগা, ওটা তোমার পুঞ্জীকৃত সংস্কারের ফল। পূর্ব্বেও বহুবার সূর্য্যাস্ত ভাল লেগেছে, তার সংস্কারগুলো মনে গাঁথা ছিল, মস্তিষ্কে তার ছাপ বসে গিয়েছিল, তাই কান টান্‌লে যেমন মাথা আসে, তেমনি আজ সূর্য্যাস্তের সোণালী আলো চোখে পড়তেই ভাল লাগার সংস্কারগুলো হঠাৎ তোমার মাঝে সচেতন হয়ে উঠেছে।" কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা, তাহলে সকলের প্রথম দিনে ভাল লাগ্‌ল কেন?" এর জবাব দার্শনিক কি দেবেন? টেনেবুনে, অমন কথাও বল্‌তে পারেন' "দেখ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে utility বা প্রয়োজনের একটা সম্বন্ধ আছে। সারাদিন খেটে খুটে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, সমস্তটা দিনই স্নায়ুগুলো চড়া হয়ে বাঁধা ছিল—আকাশের উদার দৃশ্য, আলোর খেলা সেগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে, তুমি স্নায়ুতে একটু আরাম পেয়েছ, তাই বলছ—"ভাল লাগ্‌ছে।" এ কথায়ও কি আমরা আবার সেই গোড়ার সমস্যাতেই ফিরে যাচ্ছি না? ক্রমবিকাশবাদী বৈজ্ঞানিক হয়ত বলবেন, "বাপুরে এই ভাল লাগাটা শুধু তোমার একার খুসীর উপর নির্ভর করে না। তোমার ঊর্দ্ধতন হাজার পুরুষের ভাল লেগে লেগে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে; আমি তুমিও তাদেরই গড়া স্নায়ুগুলো বংশানুক্রমে পেয়েছি কি না, তাই সূর্য্যাস্ত তোমার ভাল লাগছে।" কিন্তু তবুও তো সেই প্রশ্ন থেকেই যায়—আদিম পুরুষেরই বা ভাল লাগল কেন, আর ভাল

লাগাট একটানা স্রোতে এই অধস্তন পুরুষ পর্য্যন্ত নেমে এল কেন? মোট কথা বিজ্ঞানের যুক্তি থেকে এর কোনও জবাব পাওয়া ভার। জগতের কোনও "কেন"-রই শেষ উত্তর কেউ দিতে পারে না।

এই "কেন"র কোনও উত্তর হয় না বলেই বৈদান্তিক "স্বভাব" মানছেন, আচার্য্য শঙ্কর "নিসর্গ-ব্যবহার" মানছেন। অর্থাৎ বৈদান্তিকের ভাব এই, যা হচ্ছে, তা মেনে নাও—অন্তরঙ্গ বলে তাকে গ্রহণ কর, তোমার মাঝে তাকে পুরে নাও। বাইরে থেকে শুধু কারণ খুঁজতে গিয়ে রসের ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে কেন? আজকার সূর্য্যাস্ত যখন তোমার কাছে অমন ভাল লাগছে, তখন জানবে, ভাল লাগাটাই তোমার স্বভাব; আর ভাল লাগানোটাই প্রকৃতির স্বভাব। এই দুটোই জগতে চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। তবে সব জিনিষই সমানভাবে তোমার ভাল লাগে না—এই যা দুঃখ। তাই কোনও সুযোগে আজকার এই ভাল লাগাটাকে যদি চিরকালের জন্য স্থায়ী করবার কোনও উপায় খুঁজতে চাও, তাতে আপত্তি নেই। চির স্থির একটা মাধুর্য্য ভোগ করবার জন্য আপাত-মধুর যদি কিছু ছাড়তে হয়, ছাড়। কারণ খোঁজাখুঁজি বৃথা। ভাল জিনিষটাকে ঠিক ভাল করে আস্বাদন করাই হচ্ছে সেয়ানার কাজ। যা কিছু যুক্তি-তর্ক, সব খাটাও ওই দিকে—কি করে মুহূর্ত্তের ভাললাগাটাকে চিরকালের করা যায়।"

বেদান্তীর কথা মানতে গেলে বলতে হয়, "চিরমঙ্গল, চিরসুন্দর একটা কিছু তাহলে আছে?" বেদান্তী বলবেন, "নিশ্চয়; এখানে যা কিছু অমঙ্গল দেখছ, যা কিছু অসুন্দর দেখছ, তা সেই পরিপূর্ণ মঙ্গল ও সুন্দরেরই খণ্ড রূপ। অপূর্ণকে যদি তুমি অসুন্দর বল, তাতে বাধা কি? একটা গোলাপের কুঁড়িও তোমার কাছে সুন্দর লাগে। ফোটা ফুল তো লাগেই! কিন্তু কুঁড়টাই গোলাপ হয়ে ফুটবে, এই কথাটুকু যদি তোমার জানা না থাকত—তবে কুঁড়ি অত সুন্দর লাগত না। শৈশব আর যৌবন পূর্ণতা আর অপূর্ণতার প্রতিরূপ। একটা মাংসপিণ্ডের মত কদাকার শিশুও তোমার কাছে সুন্দর, কেননা মানস চক্ষে শৈশবের কুশ্রীতার মাঝেও স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকে তুমি দেখতে পেয়েছ। যদি নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করতে হয়, তাহলে বলব, শিশুর চেয়ে যুবা সুন্দর, কুঁড়ির চেয়ে ফুল সুন্দর। সংসারে এমন অপূর্ণ শিশু আর অস্ফুট কুঁড়ির তো অভাব নেই। তাহলে নিরপেক্ষ বিচারককে মানতেই হবে, সংসারের এক অংশ কুৎসিৎ, আর এক অংশ সুন্দর। ছেলেপিলেকে ভালবাসে না, এমন লোকও সংসারে কম নয়। কিন্তু তা হলেও মোটের উপর আমরা জগৎটাকে সুন্দর বলে মানি কেন?—না জগতে পরিণতি আছে বলে। শিশু যদি চিরকালই শিশু হয়ে থাকত, কুঁড়ির যদি আর ফুটবার আশা না থাকত, তাহলে তাদের সহ্য করা কঠিন হত বটে। কিন্তু যা অপূর্ণ, তাও পূর্ণতার দিকে গতিশীল—এই বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা হতেই জগৎ ভাবুকের চোখে সুন্দর। সুতরাং অপূর্ণ জগৎও সুন্দর—যখন ভাবি, এ পূর্ণতার দিকে চলছে। তখন আর অপূর্ণকে লাঞ্ছিত করি না, পূর্ণের পূর্ব্বাভাস ভেবে তাকেও অভিনন্দিত করি। তখন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিই, পতিতকে উদ্ধার করি, অপরাধীকে

ক্ষমা করি ;—তাইতে জগৎ সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই তো বলি সেবা সুন্দর—সর্ব্বত্র সেবা সুন্দর। প্রকৃতির মাঝে অহরহঃ এই সেবা-ব্রতের সাধনা চলছে—অপূর্ণকে তিনি পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলছেন। এই হল প্রকৃতির আনন্দ-লীলা। মানুষও যখন সেই সেবার অনুকরণ করে, তখন তার মাঝেও একটা বিপুল আনন্দের অনুভূতি জেগে উঠে, সে যেন স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাতে পায়ে খাটতে না পার, সেবার দৃষ্টি নিয়ে জগতের দিকে তাকাও—দেখবে, সব কুৎসিৎই সুন্দর লাগ্ছে। এই মধুময়ী দৃষ্টিতে দেখবে, ঘোর পাষণ্ডেরও আশা আছে—সেও ক্ষমার যোগ্য, ভালবাসার যোগ্য ; কেননা সে যে অপূর্ণ, অথচ পূর্ণতার দিকে চলছে সে। তাকে তুলে ধর—এগিয়ে যেতে সাহায্য কর। এ ছাড়া আর তোমার কর্ত্তব্য কি আছে জগতে ?”

বেদান্তী বলবেন, আজ হতে তাহলে প্রতিজ্ঞা কর, জগৎকে আর কখনও কুৎসিৎ বলবে না—বলবে এ পূর্ণতার পথে অপূর্ণ যাত্রী। পূর্ণস্বরূপের ক্ষমাভিখারী, স্নেহভিখারী, সেবাভিখারী এই জগৎ। বেদান্ত বলেন, জগৎ মিথ্যা ; সেই তো ঠিক কথা—আনন্দের কথা। এই অপূর্ণ জগৎ তো সত্য নয়ই—কেননা এ তো ধ্রুব নয় ; এ যে চঞ্চল—তাই তো একে বলি মিথ্যা। আর এই তো সত্য কথা। সেই সঙ্গেই বল্ব, কুৎসিৎ কিছুই নাই জগতে—তা শুধু অপূর্ণতারই প্রতিরূপ। আর অপূর্ণ তো ধ্রুব নয়, শাশ্বত নয়—সে যে কেবলই পূর্ণতার দিকে বিকশিত হয়ে চলছে। তাই সে চঞ্চল, সে সুন্দর—যেমন মায়ের চোখে শিশুর নিত্য স্পন্দমান পরিণতিই সুন্দর—তার স্থাণুর মৃত্যু-বিভীষিকারই সূচক। কিন্তু অবিশ্বাসী নাস্তিক তা বোঝে না। সে মনে করে, যা কুৎসিৎ, যা অপূর্ণ, তা চিরকালই কুৎসিৎ থেকে যাবে। আজকে তোমার ওপর কেউ অন্যায় উৎপীড়ন করল। তুমি ভেবে নিলে, এই উৎপীড়নই বুঝি তার স্বভাব—তার ধ্রুব সত্তা। ভুল, ভুল—মহাভুল। এই ভুলেই তো প্রেমের রাজ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি কর। মৈত্রীর রাজ্যে শত্রুতার সৃষ্টি কর। আর তাতে শত্রুর উপর বিরূপ হয়ে নিজের মনাগুণেই পুড়ে মর। অতি বড় পাষণ্ডের মাঝেও যে কলুষ দেখ্ছি, তাও শুধু অপূর্ণতারই প্রতিরূপ। আর সে অপূর্ণতা স্থাবর (static) নয়, জঙ্গম (dynamic)।”

তাই তো বেদান্তী আরও বলেন, “সব জিনিষকে যথাস্থানে রেখে দেখ্তে শেখ। কারু সম্বন্ধে সত্যের অপলাপ করো না। এই অপূর্ণ জগৎ যে চঞ্চল, নশ্বর—এর অপূর্ণতা যে মিথ্যা, পূর্ণতার মাঝে যে তার অবসান হবে, এ একটা কত বড় আশার কথা, মৈত্রীর সঙ্কেত। আর এই কথাটাই সত্য। এই পরিণতির সৌন্দর্য্যকে না দেখে যে কুশ্রীতাকে স্থাবর কল্পনা করতে যায়, সে তার আপন মনের বিকারটাকেই দেখে শুধু—সত্যের সাক্ষাৎ পায় না।

অপূর্ণতার সৌন্দর্য্য কোথায় তা বলেছি—পূর্ণতার প্রতি অভিযানে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই। শুধু দেখাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় না, আমাদের নিজের মাঝেও যে নিজস্ব একটা অনুভূতি আছে, যা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে বাইরের বস্তুর সঙ্গে আমাদের বেদনার যোগ ঘটায়। সেটা যে সব সময় সুখ, তা তো নয় ; বরং আমরা অভিযোগ করি,

তার মাঝে দুঃখের ভাগটাই বেশী। দুঃখ কুৎসিৎ; তাকে কোন্ মন্ত্রে সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত করব?

যদি অস্ফুট এবং অপূর্ণের সৌন্দর্য্য বুঝে থাক, তবে এও বুঝবে। দুঃখেরও যে একটা মহৎ রূপ আছে, অপ্রতিম সৌন্দর্য্য আছে। কামনার পরপারে না গেলে সে সৌন্দর্য্য আস্বাদন করা যায় না। কামনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দুঃখ আছে: এই দুঃখে জগতের প্রাকৃত জন প্রপীড়িত। এই দুঃখ হতে নিস্তার পাবার জন্যই তাদের জীবনব্যাপী সাধনা চলছে। সত্যের পথে যে সাধনাকে পরিচালনা করে যদি কেউ নিজের দুঃখ দূর করে, তবুও জগতের দুঃখের বেদনা তার বুক জুড়ে থাকে; দুঃখ একেবারে দূর হয় না। অথচ সে দুঃখ কামনার দুঃখ নয় স্বার্থপরের অস্বস্তি-ব্যাকুলতা নয়। বিশ্বের প্রতি করুণার রূপে এই দুঃখের শতদল ফুটে ওঠে। তাই এই দুঃখ অমৃতময়ীর অমৃতস্তন্যের প্রস্রবণ।

নিজের কামনার দংশনজ্বালা ভুলে যাও, জগদ্ধিতায় জীবন উৎসর্গ কর, দেখবে, জগতে দুঃখের হেতু তো কোথায়ও নাই—আছে শুধু করুণা-মমতা। বিশ্বজননীর প্রাণে ওই ব্যথা—ওই এক মহৎ দুঃখ মর্ম্মপীড়নে তাঁর স্তন্য-সুধা ক্ষরিত করছে। যেখানে আঘাত, অত্যাচার, ভ্রান্তি, কলুষ—সেখানে দুঃখ নাই, আছে স্নেহ-ছলছল করুণা মাত্র। দুঃখ স্বার্থ-পরের ভাষা—এ ভাষা পঙ্গু, সঙ্কুচিত, দুঃখেরও সবটুকু সত্য এ ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাই যখন বলি, দুঃখে আছি, তখন বিশ্ব হতে বিযুক্ত হই, কেবল আপনার কামনা রচিত অন্ধ কারার মাঝে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হই। আর করুণা উদার মহৎ—প্রাণকে তা বৃহৎ করে, আঘাতের বদলে আঘাত করবার প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রেখে স্নেহ আর মৈত্রীর ভিতর দিয়ে অত্যাচারের প্রতীকার করে।

এই চোখ নিয়ে জগৎকে দেখ। এই তো সত্যিকার দেখা—এর মাঝে ফাঁকি কোথায়? অন্যায়কে অস্বীকার করছি না, ব্যাখ্যার তোড়ে জগতের বাস্তব দুঃখকে উড়িয়ে দেবার বিফল চেষ্টা করছি না—যা আছে, তাকেই স্বীকার করে তার যথার্থ রূপটী দেখতে চাইছি। নিজ হতে দুঃখ পাই, আমি অপূর্ণ বলে, আর অপর হতে দুঃখ পাই, আমার মাঝে মমতা নাই প্রেম নাই বলে। জ্ঞানের অভাবে আমি অন্ধ, প্রেমের অভাবে আমি প্রাণহীন। তাই তো আমার দৃষ্ট জগৎ আমারই সৃষ্ট কারাগার—তা তো কুৎসিৎ হবেই। কিন্তু অপূর্ণ পূর্ণ হয়ে ফুটছে, এই ক্রমবিকাশের জ্ঞান, আর সেই জ্ঞান হতেই উদ্বেলিত করুণার বেদনা—এই নিয়ে জগতের দিকে যে তাকাবে, তার চোখে সকল কালো আলো হয়ে উঠবে।

বলেছিলাম, চিরসুন্দরের কথা। এইভাবে দেখলে বুঝতে পারি, চিরসুন্দরের সঙ্গে জগতের বাস্তব অসুন্দরেরও একটা যোগ আছে যে। পিছনে চিরসুন্দরের দীপ্তিময়ী ভূমিকা—তার উপরেই এই বাস্তব দুঃখ শোক-অপূর্ণতার চঞ্চল নৃত্য—এই দুটী জড়িয়ে নিয়ে সত্য কি মধুর, কি সুন্দর! চিরসুন্দরের মাঝে ডুবে যেতে চাই, কিন্তু আমি মহাসাগর হলাম বলে তো তরঙ্গ-ফেন বুদ্বুদের সঙ্গে আমার কোনও বিবাদ নাই। ওই ভঙ্গীটুকু না থাকলে যে সমুদ্রের মাধুর্য্যই থাকত না। লীলারই নিত্য, নিত্যেরই লীলা—দুয়ে মিলে সত্য পূর্ণ, ব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপ।

* * *

একটা নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি—এ ও কাম্য বটে। কিন্তু সে যে আছে, তার প্রমাণ কি? বেদান্ত বলছেন, "জগতে তুমি যাকে সব চেয়ে সেরা প্রমাণ মনে কর, তাই তারও প্রমাণ। সে প্রমাণ চোখে দেখা নয়—অপরোক্ষানুভূতি। সে অনুভূতি বর্ত্তমানে তোমার নাই বটে, কিন্তু যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁরা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। প্রমাণ বলতে তো দুটো মাত্র—হয় চোখে দেখা, নয়তো অনুমান-বলে আন্দাজ করা। প্রত্যক্ষ নিশ্চয়ই অনুমানের চেয়ে প্রবল। তাই চিরসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করতে বলছি তোমায়, যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করে কি হবে? তোমার প্রত্যক্ষ না থাকে, যাঁদের ছিল তাঁদের কথা বিশ্বাস কর, সেই পথে চল—"যেনেব যাতা যতয়োঽস্য পারং, তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি।" ভয় কি বীর? অভিনবকে লাভ করবার তীব্র ঔৎসুক্য থাকা চাই। যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, সে পথে এগিয়েই দেখ না, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা। যদি মিথ্যাও হয়, তবুও পরখ করা তো হবে। এ পথটা যে মিথ্যা, সেটা প্রমাণ হলেও অন্ততঃ একটা বিষয়ে তুমি নিঃসংশয় হবে তো? বেদান্ত বড় practical; সে তর্কযুক্তিকে ফাঁকিবাজী মনে করে। সে বলে, সত্য আবিষ্কার করবি তো বীরের মত অজানার পথে ঝাঁপিয়ে পড়—কুঁড়েমী নয়, গলাবাজী নয়—রোখ থাকা চাই, তেজ থাকা চাই।"

* * *

সুন্দরের নিদান খুঁজতে খুঁজতে সত্যে এসে পড়েছি। বাস্তবিক দুই-ই এক। সত্যেরও স্থিতি আর গতির রূপ আছে। এই জগৎটাকে স্তরে স্তরে বুঝতে হবে, তবে এর সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখতে পাবে। সংক্ষেপে সে কথাটা বলছি।

ঋষি পাঁচটা স্তরের কথা বলছেন। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ। এর এক একটার সার্ব্বভৌম অনুভূতিতে সৌন্দর্য্য স্ফুটতর হয়ে উঠবে। সাধারণতঃ আমরা জগতের অন্নময় রূপ দেখেই খুসী। অন্নময়—যাকে আমরা বলি জড়। ধর বর্ণরাগ আর ধ্বনির বৈচিত্র্য—এ দুটোই সৌন্দর্য্যানুভূতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু কিন্তু এই বর্ণ গীতও তো স্থাবর নয়—এরা একটা স্পন্দনেরই অভিব্যক্তি। প্রাণ সেই স্পন্দন। যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে জড়ের মাঝেও একটা নবীনতা উন্মিষিত হয়; প্রাণ না থাকলে সব পূত হয়ে ওঠে। তাহলে এই প্রাণই হল সৌন্দর্য্যের আর একটা স্ফুটতর রূপ। জগতে সর্ব্বত্র প্রাণের লীলা।

বাইরে প্রাণ, ভিতরে মন;—চিন্তা, কল্পনা, হর্ষবিষাদের আন্দোলন—আরও কত কিছু! চলিষ্ণুরূপে এই মনোজগৎকে দেখ, সত্যকে, সুন্দরকে দেখতে পাবে। মনের পর বিজ্ঞান—পাশ্চাত্য দর্শন যাকে বলে Teleology of creation—intelligent Purpose. সে Purpose যে কি, তা তারা ঠিক বলতে পারে না। ঋষি বলেন—সে হচ্ছে ভুক্তি আর মুক্তি; উভয়ের সমন্বয়দৃষ্টিতে আনন্দ। আমাদের প্রত্যয়গ্রাহ্য জগতে বিজ্ঞান হচ্ছে প্রাণ আর মনের সমন্বয়—ঐক্যের ধারা—ইচ্ছাশক্তির আনন্দস্পন্দন।

সমস্তকে জড়িয়ে আছে আনন্দ—লীলায় যা প্রয়োজন, নিত্যের যা প্রাণ। আনন্দ নিষ্কারণ, অথচ সবার কারণ। আনন্দই সুন্দর, সুন্দরের জয় হোক্। তাতেই সত্যের প্রতিষ্ঠা।

——*——

দেবী-স্তোত্র

—*—

হে নিত্যে! অক্ষরে তুমি জননী আমার,
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা, তুমি বষট্‌কার।
উদাত্তাদি স্বররূপা তুমি গো জননী,
ত্রিধা মাত্রাত্মিকা তুমি অমৃতরূপিণী,
অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা, নিত্যা ও অব্যক্তরূপা,
পরমা জননী তুমি সাবিত্রীস্বরূপা।
ব্রাহ্মীরূপে সৃষ্টি তুমি করেছ ভুবন,
তুমিই বৈষ্ণবীরূপে করিছ পালন,
অন্তে তুমি রৌদ্রীরূপে করহ ভক্ষণ,
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের তুমিই কারণ।
সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা তুমিই জননি!
পালনে তুমিই পাল আপনা আপনি।
সংহাররূপিণী তুমি প্রলয় সময়ে,
নিকৃষ্ট নিজেকে লীন হও জগন্ময়ে!
মহাবিদ্যা মহামায়া তুমি মহাস্মৃতি,
মহামেধা মহামোহা বিরুদ্ধ গুণাদি
সকলি মা তুমি, সব তোমাতেই স্থিত —
মহাদেবী, মহাসুরী তুমিই নিশ্চিত।
সত্ত্বরজঃতমোময়ী ত্রিগুণা স্বরূপা
সবার প্রকৃতি তুমি, তুমি অপরূপা।
কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি আর
কি দারুণ রূপ মাগো প্রলয়ে তোমার।
তুমি শ্রী, তুমি হ্রী আর তুমিই ঈশ্বরী,
তুমি বুদ্ধি, শুদ্ধবোধ শান্তি শুভঙ্করী।
তুমি মাগো লজ্জারূপা তুমি মাগো পুষ্টি,
তুমিই মা কান্তি আর তুমিই মা তুষ্টি।
খড়্গ, শূল, ধনুর্ব্বাণ, শঙ্খ, চক্র, গদা,
লগুড়, মুদগর, মুণ্ড দশ অস্ত্র সদা
দশহস্তে দশভুজা দশপ্রহরণ
অসুর শাসনতরে করেছ ধারণ।
তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, তুমি সৌম্যতমা,
তব সৌন্দর্য্যের মাগো নাহিক উপমা।
ব্রহ্মা, দেব, মনুষ্যাদি পর ও অপরা,
সকলের পূজ্য তুমি তুমি পরাৎপরা।
এ জগতে সদসদ্ যাহা কিছু হেরি
সব তুমি, তা সবার শক্তি মা তোমারি।
অতএব বল তুমি হে অখিলাত্মিকে,
কিরূপে কি স্তব আমি করিব তোমাকে?
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা নারায়ণ
নিদ্রাপরবশ তব প্রভাবে যখন,—
তাদৃশ তোমাকে স্তব করিবারে বল
কে হবে সমর্থ মাগো, কার এত বল?
বিষ্ণু, আমি ও ঈশান এই তিন জন
তোমা হতে করিয়াছি শরীর গ্রহণ।
আমরা সকল মাগো তোমা ছাড়া নই.
তোমাকে করিতে স্তব সামর্থ্য কার কই?
এবংবিধ অসামান্য মাহাত্ম্যের দ্বারা
এতাদৃশ তুমি দেবী দয়া করে ত্বরা
স্বয়ংই সংস্তুত হয়ে অসুর দুর্জ্জয়
মধুকৈটভকে মুগ্ধ কর এ সময়।
আর মাগো জগৎপতি বিষ্ণুর সত্বর
নিদ্রাভঙ্গ কর, যাতে তিনি অতঃপর
তোমার প্রেরণ পেয়ে হয়ে প্রবোধিত
দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়ে করেন নিহত।*

---

* শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"
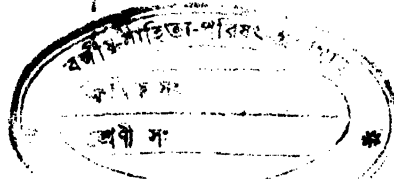
—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭১।৩

—•—

ভোগের বস্তু থেকে প্রথমতঃ দূরে থাকাই নিরাপদ। তবে যদি এমন হয় যে, বাধ্য হয়ে তার সংস্পর্শে আসতে হয়, নইলে সমাজধর্ম্মে বা সংসারধর্ম্মে বাধে কিংবা নিজের কামনার অতৃপ্তিবশতঃ মন নিতান্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাহলে মনকে যতদূর সাধ্য বিচার দ্বারা সংযত করে ভোগ কর। ভোগের পূর্ব্বেও যেমন বিচার চলবে, ভোগের সময়েও তেমনি বিচার চলবে, সংযমের সতর্ক পাহারা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে চিত্ত আর লোলুপ না হয়। এমনি করে সবিচার ও সংযত ভোগেই বাসনার নিবৃত্তি সম্ভব।

*

যতক্ষণ নিজের ভিতর পুরুষকার জাগ্রত করতে পারনি, ততক্ষণ নির্ভরও ঠিক হয়নি বলে জানবে। নির্ভরতা দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় নয়—পূর্ণত্বের সিংহদ্বার। আমার ভিতর যতক্ষণ আমি বিন্দুমাত্রও জোর পাচ্ছি, ততক্ষণ যদি সেই জোরকে কাজে না খাটাই, তাহলে অভিমান সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় না। নির্ভরের উদ্দেশ্যই পুরুষকারের সার্থকতায় অভিমান নিরসন—নির্ভর নিষ্কর্ম্মার সান্ত্বনা নয়।

*

জগতে ভালমন্দ বলিয়া কোনও জিনিষে ছাপ দিও না। ভালমন্দ নির্ভর করে তোমার মনের উপর। তুমি যদি ভালভাবে, সদুদ্দেশ্যে সকলকে গ্রহণ করিতে পার, তবে মন্দও তোমার স্পর্শে ভাল হইয়া উঠিবে। সংযতচিত্ত মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া কাম প্রেমে পরিণত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভালমন্দের দ্বন্দ্ব দূর করিয়া জগৎকে নিরপেক্ষভাবে সত্যস্বরূপে গ্রহণ করিতে শিখিলে সত্যলাভের পথে আর বাধা থাকে না।

*

নিঃসঙ্গ হও। আপন ইষ্টনিষ্ঠা ভিন্ন জগতে কিছুই চাইবার নাই। সেই ভাবে নিঃভাব হও, বাইরের উপকরণের অভাব আপনি ক্রমশঃ পূরণ হইবে। বাইরে একা একা থাকাই নিঃসঙ্গ হওয়ার লক্ষ্য নয়। মনের কোণে বসিয়া যত বাজে চিন্তার জাল বুনিতেছ কেন? জাল ছিঁড়িয়া সিংহের মত বাহির হইয়া পড়!

*

ভোগের বস্তু সামনে আসবেই। কিন্তু তাকে যে ভোগ করতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতাও যেমন নাই, তেমনি ভোগ করলেই যে তোমার সব গেল, এমনও নয়! ভোগেরও কৌশল আছে, তার জন্য শক্তি চাই। সংযম সেই শক্তি নিয়ে আসে; আর অনাসক্তিই হচ্ছে ভোগের কৌশল। যা

হচ্ছে, তা হয়ে যাচ্ছে, তুমি তার মাঝে স্থির থাকতে চেষ্টা কর।

*

এই যে দেহ পেয়ে এত আনন্দ, ইন্দ্রিয়ের সুখ এত মধুর, জানো, এই দেহের বন্ধন কাটলে এক একটী ইন্দ্রিয় তোমার সহস্রগুণে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তুমি যে এখন মাত্র কয়েকটী গবাক্ষবিশিষ্ট বন্দীশালায় রয়েছ। তবুও ওইটাই চাও?

*

রাজার রাজা তুমি! ছদ্মবেশে এসে ভ্রমণ পথে নিজেকে ভুলে গেলে চলবে কি করে? সান্ত্বনা নয়, সত্যই যে তুমিই সর্ব্বেশ্বর। এ তো কল্পনা নয় — তুমিই যে সত্যস্বরূপ — অনাদিমধ্যান্ত অনন্তবীর্য্যশালী তুমি। ছেড়ে দাও তোমার ঐ ক্ষুদ্র দেহের সংস্কার ভেঙ্গে দাও যত সব ক্ষুদ্র সংস্কারের বেড়া — ওগুলিই তো এতকাল গণ্ডীবদ্ধ করে ঘুরিয়ে মেরেছে আর কত?

*

জ্ঞান চাপতে শেখ, এখন যা পেয়েছ আধ্যাত্মিক রাজ্যে তা অতি ক্ষুদ্র, এ কথা সব সময় মনে রেখ। তাহলে বড় বিষয় পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মাবে। ঐটুকু পেয়েই যদি এত আস্ফালন কর, তবে এর চেয়ে বড় কিছু পাবে কি করে? এতটুকু ধরে রাখতে পার না — বেশী পেলে রাখবে কোথায়?

*

সত্যলাভ ভিন্ন অন্য বস্তু চাইলেই তার জন্য দুঃখ যাতনা সইতে হয়। আবার সে সওয়ার পরে যদিও তা লাভ হয়, তবুও তা রক্ষা করা যত্নসাপেক্ষ। রক্ষা হলেও তা নিয়ে চির সুখী হতে আমরা কখনই পারি না। কিন্তু এত যে দুঃখ কষ্ট পাই, তবুও মন আমাদের ওই ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েই মত্ত থাকতে চায় — তার জন্য পরের দ্বারে পথের কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায় — পরের উচ্ছিষ্টান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হতে লজ্জা বোধ করে না। এই কি মানুষ হওয়ার সার্থকতা?

*

অন্তরে তুমি হয়তো মহীয়ান্ কিন্তু বাইরে ব্যবহারে অণোরণীয়ান্ হয়ে থাকবে। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই আগে বিনীত শান্ত আত্মম্ভরিতাপরিশূন্য হলে তবে তাঁর মাঝে সত্য ও সুন্দর জিনিষ মিলে। গুরু চান বিনয় — ঔদ্ধত্য নয়। জ্ঞানী কখনও উদ্ধত হন না।

*

দ্রষ্টার ভাব নিয়ে থাকলে দুষ্প্রবৃত্তি আসলেও চোরের মত পালিয়ে যাবে, কেননা জাগা ঘরে চুরী হয় না। কিন্তু আগাগোড়া ভাব ঠিক রাখা চাই। মন বসিয়ে বাসনায় মজা লুটুক আর আমি দ্রষ্টা হয়ে বসে থাকব — এটা হচ্ছে ভাবের ঘরে চুরী। তাই প্রকৃত সহজ পন্থা হচ্ছে ত্যাগ। ক্ষুদ্র অলীক বিষয়-বাসনা ছেড়ে চিরশান্তি লাভই ত্যাগের উদ্দেশ্য। ত্যাগই যথার্থ লাভ।

*

কোনও মানুষের কাছে কিম্বা বিষয়ের কাছে নিজকে ধরা দিও না। এমন কোনও বাসনা নিজের ভিতর স্থান দিও না যার জন্য তোমার সত্যলাভের পথে বাধা ঘটবে। বাইরের বাধার চেয়ে অন্তরের বাধাই বেশী। কিন্তু সেগুলকে আমরা আগে তাড়াতে যাই না, তাই বাইরে পদে পদে বিরোধ ঘটিয়ে নিজের ও দশের অশান্তির কারণ হই।

*

নিজকে লালন করবার চেয়ে তাড়ন করবার ঝোঁকটা বেশী অভ্যাস করলে তবে আমরা ভোগ হতে, ত্যাগের দুঃখ হতে চির সুখের পথে অগ্রসর হব। নিজকে আরাম দেওয়ার ইচ্ছাটা প্রকৃতির সৃষ্টিরক্ষার একটা কৌশল। প্রকৃত আরাম কি, তা আমরা জানি না, তাই চতুরতায় ঠকে যাই।

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম-সংবাদ

সারস্বত-মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ মঠ হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে শ্রীহট্টের অন্তর্গত জগৎসী গিয়াছেন। তথা হইতে মৌলবী-বাজার হইয়া—সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম যাইবেন। তদনন্তর অগ্রহায়ণের শেষভাগে ঢাকা জয়দেব পুর সারস্বত আশ্রমে যাইবেন। তথায় কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ময়মনসিংহে আসিবেন। ময়মনসিংহ হইতে ভক্তসম্মিলনীর পূর্ব্বে কুমিল্লা ময়নামতী আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। সম্মিলনীর অন্তে বরিশাল যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বরিশাল হইতে খুলনা হইয়া পৌষের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় অথবা হাওড়ায় আসিয়া তথা হইতে পুরীধামে যাইবেন।

সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব

আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার অত্রত্য সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের ১৪শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ, আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য সাদরে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিতেছি।

ভক্তসম্মিলনী

আগামী পৌষমাসের ১১ই, ১২ই, ১৩ই তারিখে কুমিল্লা ময়নামতী আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর ১০ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আমরা আসামবঙ্গীয় সারস্বতমঠের শাখা আশ্রমসমূহের পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক ও ভক্ত-গণকে সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আবাহন করিতেছি। কাহাকেও পৃথক পত্র দেওয়া হইল না। সকলেই বিছানাপত্র সঙ্গে আনিবেন। অত্রত্য মঠাধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীমৎ পরমহংসদেব ঐ সময়ে কুমিল্লা ময়নামতী আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন। উত্তরবঙ্গবাসী ভক্তগণ পোড়াদহ চট্টগ্রাম মেইল ধরিয়া গোয়ালন্দ—চাঁদপুর হইয়া কুমিল্লা নামিবেন। ষ্টেশন হইতে আশ্রম পশ্চিমদিকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

দানপ্রাপ্তিস্বীকার

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দলুইর মারফতে বগুড়া-শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রম নিম্নলিখিত অর্থসাহায্য পাইয়াছে।—

শ্রীযুক্ত কমলেশ্বর রায় ২৲, শ্রীযুক্ত মহিম-চন্দ্র রায় ১৲, গ্রাম্য ভিক্ষা—৬৲, মুষ্টিভিক্ষা—৩।৹—মোট ১২।৹ মাত্র।

শ্রীমৎ গুরুদেবের ফটো

যাঁহারা মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের বর্ত্তমান সময়ের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কলিকাতা—২৫ স্কটস্ লেন, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহার নিকট কেবি-নেট্ সাইজের ব্রোমাইড্ ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়—মূল্য ১৲ টাকা। উক্ত চিত্রের ব্রোমাইড এন্‌লার্জ্‌মেণ্ট ও পাওয়া যাইবে—উহার দর পত্র লিখিয়া জানিতে পারা যাইবে।

———•———

ওঁ তৎ সৎ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } পৌষ { ৯ম সংখ্যা

শরণ্যাঃ

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৩।৭]

কিমু নু বঃ কৃণবামাপরেণ
কিং সনেন বসব আপ্যেন।
যূয়ং নো মিত্রাবরুণাদিতে চ
স্বস্তিমিন্দ্রামরুতো দধাত॥
হয়ে দেবা যূয়মিদাপয়ঃ স্থঃ
তে মৃলত নাধমানায় মহ্যম্।
মা বো রথো মধ্যমবাল্তে ভূন্
মা যুষ্মাবৎস্বাপিষু শ্রমিষ্ম॥
প্র ব একো মিময় ভূর্য্যাগো
যন্মা পিতেব কিতবং শশাস।
আরে পাশা আরে অঘানি দেবা
মা মাধিপুত্রে বিমিব প্রভীষ্ট॥

অর্ব্বাঞ্চো অদ্যা ভবতা যজত্রা
আ বো হার্দ্দি ভয়মানো ব্যয়েয়ং
ত্রাধ্বং নো দেবা নিজুরো বৃকস্য
ত্রাধ্বং কর্ত্তাদবপদো যজত্রাঃ ॥

হের দাস পদতলে—বল দেব, কোন্ প্রযতন
সাধিব এখনি, কিম্বা পরে—কোন্ কর্ম্ম সনাতন ?
হে বাসব, হে মরুৎ, শোন সবে মিনতি করুণ—
কর কৃপা—স্বস্তি হোক্, হে অদিতি, হে মিত্রাবরুণ !

তুমি ছাড়া ওগো দেব, বিশ্বে কেবা আছে আপনার—
আকুল হৃদয়ে ডাকি, হাসিমুখে চাহ একবার !
আস যবে যজ্ঞভূমে, রথগতি করো না শিথিল—
তোমাদের সখ্য ভুঞ্জি শ্রান্তি যেন নহে একতিল।

তোমাদেরি একজন হরিয়াছে মম পাপভার,
পিতা যথা শাসে পুত্রে ক্ষুব্ধ হেরি তার দুরাচার।
দূর কর পাপ-তাপ, ছিঁড় পাশ—দাও মুক্ত করি—
স্বজনের বক্ষ হতে পক্ষী হেন নাহি নিও হরি !

নিখিলের পূজাভাগী, এসো আজি এই গৃহমুখে,
ভয়ে কাঁপে সারা তনু—লুকাইব তোমাদেরি বুকে।
হে দেবতা, রক্ষা কর—আসে অরি করিতে বিনাশ—
রক্ষা কর, যজনীয়, কুটিলের ছিঁড়ে ফেল পাশ !

একনাথ

—*—

জনার্দ্দন স্বামীর গৃহে দাসদাসীর অভাব ছিল না। কিন্তু তথাপি একনাথই গুরুসেবার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। আর একনাথের সেবা না পাইলে জনার্দ্দনেরও মন উঠিত না। গুরুসেবায় শিষ্যের যে কি আনন্দ, পরবর্ত্তী কালে একনাথ নিম্নলিখিত ভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"শিষ্যের হৃদয় গুরুভক্তিতে পরিপূর্ণ; দিবারাত্র তিনি গুরুর নামগানে বিভোর। যদি গুরু দূরান্তরে চলিয়া যান, তাহা হইলে পক্ষিশাবক যেমন সতৃষ্ণভাবে মাতার আগমন প্রতীক্ষা করে, শিষ্যও তেমনি গুরুর পথপানে চাহিয়া থাকেন। গুরু যখন কাছে থাকেন, তখন তাঁহার পানে চাহিয়া শিষ্যের জগৎ ভুল হইয়া যায়। যে দেহ মানুষের এত প্রিয়, যাহার পানাহার নিদ্রার জন্য মানুষ এত ব্যস্ত, সে দেহও তাহার আছে কিনা সে বুঝিতে পারে না। পিতামাতা স্ত্রীপুত্রের কথা যে সে ভুলিয়া যাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? গুরু-সেবা যেন তাহার কাছে অমৃতের সমুদ্রে অবগাহনের মত। শ্রীগুরুকৃপা কামধেনু-স্বরূপিণী, শিষ্য নিরন্তর তাহার অমৃতধারাপানে পরিতৃপ্ত। গুরুর শ্রীচরণ যে ভূমিকে স্পর্শ করে, যে বায়ু হইতে তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন, তাহাদের সৌভাগ্যে শিষ্যের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয়। পিতার চেয়ে মাতার চেয়ে গুরু তাহার নিকট মমতার বস্তু, গুরু তাহার সর্ব্বস্বেরও অধিক।"

এইরূপে গুরুসেবার আনন্দে একনাথের দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে গুরুগৃহের সমস্ত কাজের ভারই তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। কৈশোর অতিক্রম করিয়া একনাথ এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। পণ্ডিত যুবক পুত্রের প্রতি স্নেহময় পিতা যেরূপ ব্যবহার করেন, জনার্দ্দন একনাথের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর একনাথের প্রতি মমতায় ও শুভানুধ্যানে যে কতখানি পূর্ণ ছিল, তাহা বাহিরের ব্যবহার দেখিয়াও অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার সমস্ত আধ্যাত্ম সম্পদ্ তিনি একনাথকে দিয়া যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন এবং তদনুসারে সময় বুঝিয়া তাঁহাকে সাধনাদিতেও নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। গুরুর আদেশে একনাথ মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতগুহায় গিয়া ধ্যানধারণাদি অভ্যাস করিতেন। শিষ্যের কতটুকু উন্নতি হইল, জনার্দ্দন তাহার দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং এই জন্য একনাথকে মাঝে মাঝে কঠোর পরীক্ষা দিতে হইত। কখনও কখনও সমস্তদিন কাজকর্ম্মের পর সন্ধ্যার নির্জন অবসরে গুরুদেব শিষ্যকে লইয়া বসিতেন—নানা তত্ত্বালোচনায় ও উপদেশে রাত্রি কাটিয়া যাইত।

শ্রীগুরুর কৃপায় ও উপদেশে একনাথের মনে আবার সেই প্রাচীন জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এই জিজ্ঞাসার মাঝে সংশয়ের আন্দোলন নাই, অস্বস্তি নাই—আছে শুধু গুরুবাক্যকে সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিবার একটী

আকুলতা। এই আকুলতাতে কর্ম্মের সহিত কোন বিরোধ ঘটাইল না, কিম্বা একটা কিম্ভূতকিমাকার সাধন করিবার আগ্রহ হৃদয়ে জাগাইয়া দিল না। একনাথ যেমন করিয়া শ্রীগুরুর সেবা করিতেছিলেন, তেমনি সেবা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর যেন কি এক অজ্ঞাতভাবে সর্ব্বদা উচ্ছ্বসিত হইয়া রহিল। তিনি জানেন, তাঁহার কি করিতে হইবে না হইবে, তাহা তাঁহার গুরুই জানেন। এই জিজ্ঞাসার আকুলতা তিনিই জাগাইয়া দিয়াছেন, তিনিই ইহাকে তৃপ্ত করিবেন। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝাইয়া বলি। মনে কর, পিতা পুত্রকে যেমন প্রাণ তুল্য ভালবাসেন, পুত্রও তেমনি কায়মনোবাক্যে পিতার অনুকূল থাকিয়া তাঁহার সেবা করে। পিতা পুত্রকে বলিলেন, "তোমাকে একদিন অমুক জায়গায় বেড়াইতে লইয়া যাইব। সে বড় সুন্দর জায়গা।" এই কথা শুনিয়া সুশীল পুত্রের যদিও এক দিকে ঔৎসুক্য উত্তেজিত হইয়া উঠে, তথাপি অনাবশ্যক ব্যগ্রতাদ্বারা পিতাকে সে উত্যক্ত করিতে চাহে না—সে জানে, পিতা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত স্থানে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন। তবে হয়ত কদাচিৎ ঔৎসুক্যসহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, কবে সেখানে যাইবে?" একনাথও তেমনি কখনও কখনও জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বাবা, কি করে সত্য লাভ হবে?" এই প্রশ্ন একান্ত নির্ভরশীলের ঔৎসুক্য ছাড়া আর কিছুই নহে—আপন খুসীতে পথ চলার ঔদ্ধত্য ইহার মাঝে নাই। জনার্দ্দন একনাথের প্রশ্ন শুনিয়া কিছু বলিতেন না, সস্নেহে তাঁহার দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন মাত্র।

একদিন জনার্দ্দন একনাথকে একটা হিসাব মিলাইতে দিয়া রাজবাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। একনাথ নিজের ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতে লাগিলেন। এক পাইএর জন্য হিসাবে কোথায় গোল হইতে লাগিল। একনাথ বার বার উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ভুল বাহির হইল না। একনাথও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যেমন করিয়াই হউক ভুল বাহির করিতেই হইবে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ভৃত্য ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল, কিন্তু তথাপি একনাথের হুঁস নাই। এক প্রহর রাত্রে জনার্দ্দন ফিরিয়া আসিলেন, খোঁজ করিয়া জানিলেন, একনাথ তাঁহার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছেন। কৌতূহলী হইয়া ঘরে গিয়া দেখেন, একনাথ নিবিষ্টচিত্তে বার বার হিসাব উল্টাইতেছেন। ব্যাপার কি, বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু একনাথ হিসাবে এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, গুরুদেব যে কখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা জানিতেও পারেন নাই। জনার্দ্দনও একনাথকে না ডাকিয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে দ্বিপ্রহর রাত্রে হিসাবের ভুল ধরা পড়িল। একনাথ আনন্দে অধীর হইয়া হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এতক্ষণে ধরা পড়েছ!" ফিরিয়াই দেখেন, জনার্দ্দন দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। একনাথ নিজের চপলতায় লজ্জিত হইলেন। জনার্দ্দন সস্নেহে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা, এই এতক্ষণের অবিশ্রাম চেষ্টায় যেমন হিসাবের ভুলটা আজ ধরিতে পারিয়াছ, এমনি অবিশ্রাম চেষ্টায় যেদিন সমস্ত জীবনের ভুলটা ধরিতে পারিবে, সেই দিনই সত্যের সাক্ষাৎ পাইবে।"

গুরুদেবের কথা শুনিয়া একনাথের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠোরতার সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া জনার্দ্দনও তাঁহাকে কাজকর্ম্ম হইতে অবসর দিয়া সাধন-ভজনেই নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। নিজে সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতে পারিবেন ভাবিয়া দুর্গের মাঝেই একটা নিরিবিলি জায়গায় একনাথের সাধনার জন্য একখানা কুটীর তুলিয়া দিলেন। গুরুর আদেশে একনাথ এখানে দিবারাত্র ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিত। প্রতিদিন একনাথ যখন ধ্যানে বসিতেন, তখন কোথা হইতে একটা সাপ আসিয়া তাঁহার গলায় প্যাঁচ জড়াইয়া মাথার উপর ফণা ধরিয়া থাকিত। আবার যখন তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিত, তখন সাপটা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত। ধ্যানে বসিলেই একনাথ একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন, সুতরাং সাপটা যে কখন আসিত আর কখন চলিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতেই পারিতেন না। দৈবাৎ একদিন এক রাখাল কুটীরে উঁকি দিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার চীৎকারে সাপটাও ধীরে ধীরে চলিয়া যায়, একনাথেরও ধ্যানভঙ্গ হয়। এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা একনাথ নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে জনার্দ্দন বুঝিতে পারিলেন, একনাথের দিন পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—এইবার তাহাকে বাহিরে পাঠাইতে হইতে হইবে। একদিন বৃহস্পতিবারে প্রত্যুষে জনার্দ্দন একনাথের কুটীরে আসিয়া দেখা দিলেন। গুরুদেবের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে একনাথ বিস্মিত হইলেন। জনার্দ্দন তাঁহাকে লইয়া দুর্গ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী এক গুহার দিকে চলিলেন। জনার্দ্দন এ যাবৎ কোনও কথা বলেন নাই, কিন্তু কি জানি কেন একনাথের মন এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে ভরিয়া উঠিল, কে জানি কানে কানে তাঁহাকে বলিয়া গেল, "আজই তোমার শেষ দিন।" গুহাদ্বারে আসিয়া একটী আসন দেখাইয়া জনার্দ্দন বলিলেন, "এই আসনে আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম—এইখানেই মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তুমি এই আসনে উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতে থাক। যদি অলৌকিক কিছু দর্শন কর, ভয় পাইও না। যদি কেহ আসিয়া তোমাকে কিছু করিতে বলেন, তবে অসঙ্কোচে তাহা পালন করিবে। আমি চলিলাম—তবে বেশী দূর যাইব না—নিকটেই তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

স্থানটী এতই রমণীয় যে, তাহা দেখিবামাত্র একনাথের হৃদয় ভাবে আপ্লুত হইয়া উঠিল। জনার্দ্দন চলিয়া যাইতেই একনাথ সেই আসনে উপবেশন করিয়া গুরূপদিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেদিনকার ধ্যানে তিনি যে শান্তি ও তন্ময়তা অনুভব করিলেন, এমনটী আর এতদিন পর্য্যন্ত কোথাও করেন নাই। * * *

সহসা একনাথ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ডদেহ ভীষণাকৃতি যবন, তাহার পরিধানে সদ্যোদ্ধৃত রক্তসিক্ত গোচর্ম্ম, সঙ্গে ভীষণদর্শনা এক কুক্কুরী। এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া একনাথ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তখনই গুরুর আদেশ স্মরণ করিয়া আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। যবন ভীষণকণ্ঠে

তাঁহাকে নানা বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিল, তিনিও অবিচলিত থাকিয়া তাহার উত্তর দিলেন। অবশেষে সে তাঁহাকে কুক্কুরী দোহন করিতে আদেশ দিল। একনাথ নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হইলেন। সহসা সকল বিভীষিকা অন্তর্হিত হইয়া গেল—মহর্ষি দত্তাত্রেয় প্রসন্ন হাস্যে ইষ্টমূর্ত্তিতে একনাথের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ব্যাখ্যা লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে আদেশ দিলেন।

জনার্দ্দন সমস্তই জানিতেছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া একনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, একনাথও কৃতকৃতার্থ হইয়া গদ্‌গদ-কণ্ঠে শ্রীগুরুর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে একনাথ যখন ইচ্ছা তখনই দত্তাত্রেয়কে দেখিতে পাইতেন। একনাথ নিজেই বলিয়াছেন, ভাগবতের ব্যাখ্যা রচনার সময় দত্তাত্রেয় সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত থাকিয়া তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যেজন্য একনাথ জনার্দ্দনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ইচ্ছা করিলে তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন, অথবা অন্যত্রও চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু একনাথের তেমন কোনও ভাবগতিক দেখা গেল না। তিনি আবার পূর্ব্বের মতই গুরুগৃহে আসিয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন। জনার্দ্দনও দ্বাদশবর্ষব্যাপী মমতার বন্ধন একদিনে ছিন্ন করিতে পারিলেন না; কিন্তু তথাপি তিনি জানিতেন, একনাথকে ছাড়িতে হইবে, বাহিরে তাহার অনেক কাজ আছে। তাই একদিন তিনি একনাথকে ডাকিয়া আনিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইতে আদেশ করিলেন। শুনিয়া একনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। গুরুকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহা যে তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না। তবুও তো জনার্দ্দন তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলেন নাই। জনার্দ্দন জানেন, একনাথের শিক্ষার আর এক অঙ্গ এখনও বাকী রহিয়াছে। তিনি অদ্বৈতজ্ঞানে নিত্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, এইবার লীলাতত্ত্ব জানিতে হইবে। তাহারই ভূমিকাস্বরূপ এই তীর্থযাত্রার প্রস্তাব। কিন্তু জনার্দ্দন যতই বলেন না কেন, একনাথ কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। অবশেষে শিষ্যবাৎসল্যে আবদ্ধ হইয়া গুরুদেব একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল, জনার্দ্দনও একনাথের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বাহির হইবেন। একনাথ তখন সানন্দে তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। (ক্রমশঃ)

বেদান্তীর সংসার ও সাধন

—*—

সংসারের সঙ্গে কি করে নিজকে খাপ খাইয়ে রাখতে হবে, কি করে তাল সামলে চলতে হবে—এইটাই হচ্ছে দারুণ সমস্যা। মুস্কিল হচ্ছে এই, মানুষ যে ভাবে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, সে তো অশুচি আর অবৈজ্ঞানিক হয়েছেই—তার বাঁধনটা পর্য্যন্ত আলগা হয়েছে। বেদান্ত বলছেন, সংসার সম্বন্ধ তোমাকে অধ্যাত্মপথে যাতে সাহায্য করে, তাই কর—তারা তোমার বাধা হতে যাবে কেন? জগতে যা কিছু দেখবে, তাই তোমাকে সত্যের পথে এগিয়ে দেবে, পিছু টেনে রাখবে কেন? চলতে গিয়ে যাতে হোঁচট্ খাচ্ছ, সেটাকে সিঁড়ি করে নাও।

জান তো, এই ঘরটায় যদি আলো না থাকত, তাহলে আমরা ঢুকে প্রথমতঃ কিছুই দেখতে পেতাম না; কিন্তু অন্ধকারের মাঝে একদৃষ্টে কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাকিয়ে থাকলেই সব জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খুব ধ্যান ধরে তাকিয়ে থাকতে হবে, তাহলে সবই দেখা যাবে।

বেদান্ত বলছেন, সংসারের যে সমস্ত বন্ধনে জড়িয়ে আছ, যারা তোমাকে আত্ম-স্বরূপ দেখতে দিচ্ছে না, একবার লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকাও দেখি, দেখবে, তোমার দৃষ্টিতে তারা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সংসারের আবরণ ভেদ করেও তখন দেখবে—তাদের পেছনে আছেন ব্রহ্ম। প্রথম প্রথম এটা বাধ বাধ ঠেকবে, কিন্তু অভ্যাসে ক্রমে সহজ হয়ে আসবে। নিজের জায়গাটী ঠিক রেখে, সত্য দৃষ্টি নিয়ে বিষয়ের দিকে তাকালে, সংসারের সকল জঞ্জাল একেবারে কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যাবে—কিছুতেই আর তোমার দৃষ্টি আটকাবে না। বেদান্ত তাই বলছেন, আপন আসনটী ঠিক করে নাও—তাহলে সবই স্বচ্ছ হয়ে যাবে, কেউ বাধা হবে না। এ অসম্ভব কিছু না। ঠিক ঠিক যদি বেদান্ত বুঝে থাক, তার উপ-দেশ যদি ঠিক ঠিক ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে পাথরকে কাচ করবে, এ আর কি বড় কথা? পাথর যে তখন তোমার চসমা হবে গো—তাতে দৃষ্টি বাধবে না, বরং সব জিনিষ আরো স্পষ্ট দেখা যাবে। অণুবীক্ষণের কাচে সব বড় দেখায়, দৃষ্টি বাধে না।

দশ মণ দানা যদি হাতীর পিঠে চাপিয়ে দাও, তাহলে বেচারীকে তার বোঝা বইতেই হবে। কিন্তু বইতে তার কষ্ট হবে, তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। হাতীর পিঠে দশ মণ দানা চাপিয়ে দিলে সেটা তার পক্ষে কষ্ট আর অস্বস্তির কারণ হয় বটে, কিন্তু ওই দানাই যদি হাতী পিঠে না নিয়ে পেটে নেয়, দশ মণ দানা খেয়ে হজম করে শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, তখন ওই আগের বোঝাটাই হাতীর পক্ষে শক্তির ভাণ্ডার হয়ে দাঁড়ায় না?—নিশ্চয়ই।

বেদান্ত বলছেন, তুমিও এমনি করে সংসারের বোঝা তুলে নাও না কেন? বোঝা যদি মাথায় তুলে নাও, তাহলে ভারে ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তাকে যদি নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পার, খেয়ে হজম করে

ফেলতে পার, অর্থাৎ বোঝাকে বাইরের কিছু মনে না করে তোমারই একটা প্রকাশ বলে মনে করতে পার, তাহলে সাঁ সাঁ করে তুমি চলে যাবে—তোমার প্রগতিতে বাধা পড়বে না, বরং আরও বেগ সঞ্চয় হবে।

বেদান্ত যখন উপলব্ধি করবে, তখন দেখবে, এ কি আশ্চর্য্য—এই যে ব্রহ্ম তোমার দৃশ্য, ব্রহ্ম অন্ন, ব্রহ্ম পান, ব্রহ্ম জীবন! ব্রহ্মোপলব্ধি হলে এ সব ঠিক ঠিক দেখতে পাবে। তোমার অন্ন তখন ব্রহ্মে রূপান্তরিত হবে। ব্রহ্মের দৃষ্টিতেই তো জগৎ ভাসছে। বেদান্তীর দৃষ্টিতে জগৎ ব্রহ্মময়! এ জগতে সকলই যে আমার প্রিয়তম—সকলই ব্রহ্ম। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাই, সে দিকেই যে তিনি—সর্ব্বত্র তাঁর জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি—সমস্ত জগৎ যে নন্দনকানন! ভেবেই দেখ, বেদান্ত তোমার বাসনার ঝুলি কেড়ে নিয়ে জ্বালা বাড়াচ্ছে না, বরং কামনা বাসনাগুলোকে কেমন করে চালালে তারা তোমার পদানত হয়ে থাকতে পারে, তারই পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তুমি নিজে বাসনাকামনার তাঁবে না থেকে তারাই তোমার তাঁবে থাক্—এইটাই ভাল নয় কি?

ধর একটা ঘোড়া রয়েছে। কেউ যদি গিয়ে তার লেজ চেপে ধরে, তাহলে সে পা ছুঁড়তে থাকবে, দৌড়ে পালাবে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকেও হিঁচড়ে নিয়ে যাবে। সেটা কি সহজ ব্যাপার হবে, না কারু পছন্দসই হবে? কিন্তু সংসারের লোক নিত্য এই কাণ্ড করছে। বাসনাকামনা হচ্ছে ঘোড়ার মত। মানুষ তার লেজ চেপে ধরেছে—সেও মানুষকে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে—যতদূর সম্ভব নাকাল করছে। বেদান্ত বলছেন, বাসনার লেজ চেপে ধরো না; তুমি প্রভু হও—অবস্থার দাস হয়ো না; রাজা হও। আত্ম-স্বরূপোপলব্ধি করতে পারলেই তুমি প্রভু—নইলে নয়।

কেউ কেউ বলেন, বেদান্ত যে ভাবে চিন্তাশক্তিকে সংযত করতে বলছেন, তাতে একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে না কি? এই রকম একটা অস্বাভাবিক চেষ্টায় মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়ে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হতে পারে না কি?

না, না! রাম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারেন, ওতে দিন দিন তোমার শক্তি বাড়বেই। দুর্ব্বলতা আসবে কেন?—অসীম শক্তি, অসীম বীর্য্য দিন দিন অনুভব করবে। তবে কি উপায়ে তা হতে পারে, সে সম্বন্ধে দুচার কথা বলা দরকার।

সকালেই হোক বা অন্য যে সময়ই হোক, বেদান্তের উপদিষ্ট সাধন যখন করতে যাবে, তখন আগে নিজকে একটা অতীন্দ্রিয় পরমানন্দভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বলে ভাবনা করবে। এই অবস্থায় যখন পৌছাবে, তখন আর প্রণব উচ্চারণ করো না। তখন চুপ করবে আর যতক্ষণ পার চিত্তের ঐ অবস্থাটা ধরে রাখতে চেষ্টা করবে। ক্রমে দেহজ্ঞান বা জগৎজ্ঞান আপনা হতেই ফুটে উঠবে। জোর করে কিছু করো না—এমন কি জোর করে প্রণবজপও না। ভয় নাই, দেহজ্ঞান আপনি ফিরে আসবে। এই অতীন্দ্রিয় ভূমিতে তোমাদের মাঝে কেউ হয়ত আধ ঘণ্টা থাকতে পারবে, কেউ হয়ত এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশী সময়ও থাকতে পারবে। আজ যতখানি পারলে, দেখবে, কাল তার চেয়ে বেশীক্ষণ পারছ। দিন দিন সময় বেড়ে যাবে আর

এমনি করে দিন দিন তোমার আধ্যাত্মিক শক্তিও বাড়বে।

যারা প্রথম শিক্ষার্থী, তারা আধ ঘণ্টার বেশী যেন এ সাধনা অভ্যাস না করে—এই রামের উপদেশ। তারা কুড়ি পাঁচশ মিনিট অভ্যাস করলেই যথেষ্ট। আর যারা আগে আগে কিছু করে এসেছে, তাদের সাধনকাল আপনা হতেই বেড়ে যাবে।

আসল কথা, আধ্যাত্মিক বিষয়ে যাদের মতিগতি আছে আর যারা আগে এ সম্বন্ধে একটু আধটু কিছু করে এসেছে, তারা প্রথম শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশী অনুভূতি তো পাবেই। তবে সারাদিন কাজকর্ম্মের মাঝেও এই সাধনের চিন্তায় চিত্তকে যত নিবিষ্ট ও উৎসুক রাখতে পারবে, সাধনার সময় ততই বেশীক্ষণ ধরে ধারণা হবে।

আর এক কথা। চিত্ত একাগ্র করে স্বরূপোপলব্ধি করতে গেলেই দেখবে, একটা না একটা চিন্তা মনে উদয় হচ্ছে। তখন এক তালে প্রণব জপ করতে থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে মনে যে চিন্তাটা জেগেছিল, তার সূত্র ধরে একেবারে তাকে শেষ করে দেবে।

সাধক যখন অনন্তের শুদ্ধ অনুভূতি নিয়ে প্রণব জপ করতে থাকেন, আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করতে যখন তিনি কৃতসংকল্প, তখন যদি চিত্তে কোনও বিষয়চিন্তার উদয় হয়, তা হলে সে চিন্তার এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে তা সাধকের বাস্তব ব্যবহারের একটা দিগ্‌দর্শন হয়। এখন মন দিয়ে রামের কথাগুলো শোন। তোমাদের মাঝে এখন এরকম হয়েছে কিনা জানি না, তবে কিনা জানবে, এ সব বাজে চিন্তা মনে উঠবেই—তারা সাধনায় বাধাও দেবে। তখন রামের কথাগুলো তোমাদের কাজে লাগতে পারে।

মনে কর, জপ করছ। জপ করতে করতে কোনও একটা বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের ভাব তোমার চিত্তে উদয় হল। এখন কথা হচ্ছে, একভাবে এক ধারা ধরে চলে যাচ্ছ; তার মাঝে একটা বাজে ভাব এসে বিঘ্ন ঘটাবে, এ তো ভাল নয়। তাহলে এই চিন্তাটা নিয়ে তোমার কি করা উচিত? নিশ্চয়ই মন থেকে ওটাকে একেবারে নির্ম্মূল করে উপড়ে ফেলাই উচিত। কেমন করে? একমাত্র জ্ঞানেই এর উচ্ছেদ সম্ভব। ধর, মনে ঘৃণার ভাব ঢুকেছে। বেশ, ওই ভাবটা ধরেই বিশ্লেষণ করতে থাক, ওর মূল কারণটা কি, তা বোঝ। সব জায়গাতেই দেখবে, বিদ্বেষের মূল কারণ হচ্ছে অবিদ্যা, দুর্ব্বলতা, দেহাত্মবোধ ইত্যাদি। এই সব অজ্ঞান বৃত্তি যতদিন থাকবে, ততদিন চিত্ত একাগ্র করতে গেলেই নানা বাজে চিন্তা এসে বিঘ্ন ঘটাবে। এমন অবস্থায় রাম বলছেন, "এই সব চিন্তাগুলিকে বিশ্লেষণ করে জ্ঞানসহায়ে তাদের উচ্ছেদ কর আর এক মনে প্রণব জপ কর। আর জপ করতে করতে নিজের মাঝে বীর ভাব নিয়ে এসে খুব তেজের সহিত দৃঢ় সংকল্প করতে থাক, ভবিষ্যতে কিছুতেই এ সমস্ত ভাবকে আর ঠাঁই দেব না—এ সব স্বার্থচিন্তা পরাভূত করবই করব!" এমনি বজ্রদৃঢ় সংকল্পেই তোমার চরিত্র গঠিত হবে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে। আর এই রকম একটা আধ্যাত্মিক শক্তি চিত্তে সঞ্চিত থাকলে সংসারে চলতে ফিরতে, কাজকর্ম্ম করতে তোমাকে কোনও বেগ পেতে হবে না।

ধর, একটা বাজে ভাব দূর করতে তোমার

আধ ঘণ্টা লাগল। প্রণব জপের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ভাবনা দিয়ে একটা কুভাব নির্জ্জিত করতেই তোমার সবটুকু সময় কেটে গেল আর সেদিন যেন অতীন্দ্রিয় ভাব ধারণা করবার সময় হল না। তাতে কোনও দুঃখ নেই, সেদিন যদি অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি না পেলে, তার জন্য ব্যস্ত হয়ো না—আর এক দিন নিশ্চয়ই তা পাবে। একটা কুভাব জয় করে যদি সেদিন চিত্তকে দৃঢ় করতে পেরে থাক; আর সারা জীবন ধরে এই ভাবটাকে জয় করবার শক্তি যদি সঞ্চয় করে থাক; তাহলেই খুব হল বলতে হবে। কেননা তোমার আজকার চিত্তশুদ্ধি তো ভবিষ্যৎ সাধনারই অনুকূল হবে। এমনি করে তোমার চরিত্র গঠিত হবে, আধ্যাত্মিক শক্তি দিন দিন বাড়বে। তখন একাগ্রতা হোক আর না হোক, তার জন্য ভেবো না। অনেক সময় অনুভূতি লাভের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ততাই অনুভূতির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ হয়ত বলবে, "মশাই আমরা চিত্ত স্থির করবার কৌশল জানতে চাই, কি করে ভগবান পাওয়া যায়, তার একটা পথ জানতে চাই—বই পড়তে বা বক্তৃতা শুনতে চাই না।" এরা ভুল করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা ভগবান পাচ্ছ না কেন? চিত্তস্থির করবার পক্ষে তোমাদের বাধা কি? অবিদ্যাই বাধা। অবিদ্যা কি?—সংশয়, হতাশা, সংসারচিন্তা, কুসংস্কার—এইগুলিই তো অবিদ্যা। এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তিতেই তো তোমার পথ আটকে রেখেছে। শ্রদ্ধার অভাবই হচ্ছে অবিদ্যা। ব্রহ্মাত্মৈক্যে যার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, তিনি সর্ব্বদাই সমাধিস্থ। অবিশ্বাস আর হতাশাই তো তোমার মনকে চঞ্চল করে রেখেছে—বিশ্বাস করতে পারছ না বলেই তো ঘুরে মরছ। যে শাস্ত্র পাঠ করে, তত্ত্ব অনুসন্ধান করে, আচার্য্যের কাছে তত্ত্বমীমাংসা করে নেয়, সে ধীরে ধীরে সংশয় হতে নিজকে মুক্ত করে—তার হতাশা দূর হয়ে যায়। অবিশ্বাসী যদি চোখ বুজে ধ্যান লাগিয়ে বসে থাকে, আর সত্যান্বেষী যদি তা না করে কাজকর্ম্ম করেও বেড়ায়, তবুও জানবে, অবিশ্বাসীর চেয়ে সে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বাসীর সাধারণ অবস্থা অবিশ্বাসীর অতি অসাধারণ অবস্থার চেয়েও বড় বলে জানবে।*

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা, —জানুয়ারী, ১৯০৩)

মনোলয়

—*—
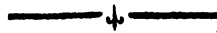
(ভক্তিমার্গ)

এইরূপ আমরা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও দেহাত্ম-বোধপ্রধান বিধায় এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উদয় হইতে পারে যে, যখন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

তখন শ্রীভগবানের এই পরদারাভিমর্ষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য কি?

শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—

রাসলীলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য

"নমু বিপরীতমিদম্। পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ। মৈবম্। যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ। আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ। আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্।"

শ্রীমৎ বিশ্বনাথ বলিতেছেন—

"রমণমিদমান্তরমেব নতু বাহ্যমিতি জ্ঞাপিতা।"

যোগে জীবাত্মায় পরমাত্মায় যতপ্রকার রমণ সম্ভব, ব্রজে রাসলীলায় গোপীগণের সহিত শ্রীভগবানের তত প্রকার রমণ হইয়াছিল। এ রমণ "আন্তর রমণ।" প্রাকৃত কাম-কলুষিত দৈহিক অঙ্গসঙ্গ নহে। ভগবান্ পূর্ণকাম—তিনি আত্মারাম। পৃথিবীতে কিছুই তাঁহার কাম্য নাই।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

শ্রীভগবান জগতের অন্তরে বাহিরে, কার্পাসের সহিত বস্ত্রের সম্বন্ধের ন্যায় ওত-প্রোত রহিয়াছেন। তিনি পূর্ণকাম। সুতরাং সিদ্ধগোপীগণের জন্মগ্রহণহেতু ত্রেতাযুগের লব্ধ জ্ঞান সাময়িক ভাবে মায়াচ্ছন্ন হইলেও পরে কাত্যায়নীব্রত সিদ্ধিতে তাঁহাদের জীবাত্মা মায়ামুক্ত হওয়ায় জীবভাব চলিয়া গিয়া মাত্র শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। "অরীরমৎ" অর্থে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় রমণ করাইয়াছিলেন বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মায়ামুক্ত আত্মা নিজে নিজেতেই রমমাণ হইয়াছিলেন।

পুরাণকার এই জীবাত্মায় পরমাত্মায় কি প্রকারে রমণ হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছেন—

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বভাসৈঃ॥

—আদর্শে বালক যেরূপ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করে, তদ্রূপ মায়ামুক্ত পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিবিম্বস্বরূপ গোপীগণকে দেখিতে লাগিলেন।

ইহা যদি দৈহিক কন্দর্পলীলাই হইত, তবে কেহ কেহ বনমাঝে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইল আর কেহ কেহ বা স্বামীদ্বারা গৃহে আবদ্ধ রহিল কেন? তাহাদের নিকট কি ভগবানের যোগমায়া পরাভূত হইল? সত্যই কি গোপীগণ তাহাদের ভৌতিক

অন্নময় জড়দেহ লইয়া শ্রীভগবানের সহিত বনমাঝে মিলিত হইতেন? এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? আর জড় জগতের কে-ই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই একমাত্র অবগত যে, রাসলীলা প্রাকৃত জগতের কামসাধনীভূত লীলা নহে। যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মানব স্বামী স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন ও শত্রুমিত্রকে বিভিন্ন ভাবে দর্শন করে এবং দেহাত্মবুদ্ধি ভিন্ন দেহাতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না; দেহই স্ত্রী দেহই পুত্রজ্ঞানে মোহিত হইয়া থাকে—সেই মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ জীবাত্মাপরিত্যক্ত স্থূল অন্নময় দেহ "স্বস্বপার্শ্বাবস্থিতান্" দেখিয়া মনে করিতেন যে, পত্নীগণ তাঁহাদের শয্যায় শায়িত। দেহাতিরিক্ত বস্তুর দেহত্যাগানন্তর দেহে পুনঃপ্রবেশ করা জড়চক্ষে দুঃসাধ্য বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নহে। যে সমস্ত গোপী ইচ্ছাসত্ত্বেও রাসে যোগদান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, রাসমণ্ডলবিহারিণীগণের সংস্পর্শে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইলেও, তাহা চন্দ্রের তুলনায় খদ্যোত মাত্র। তবুও যদি আমাদের জড় বুদ্ধি জড় ভিন্ন ধারণা করিতে না পারায় ইহাই মনে হয় যে, যাঁহার স্মরণে "স্মরগরল খণ্ডন" হইয়া যায়, যাঁহারই তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট হয়—সেই শ্রীভগবান পরদারাভিমর্ষণ করিয়াছিলেন, তবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পতি এবং জগতের যাবতীয় জীব তাঁহার পত্নী। তাহাতে কামে হউক, ভয়ে হউক, স্নেহে হউক, যে কোনও এক ভাবে মনোলয় করিতে পারিলেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অদ্বৈতজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে মুক্তিলাভ হইবে। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"অপি চেদসি সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥"

ইহাই কৃষ্ণলীলা। এই লীলা নিত্যলীলা। শুধু অন্ধ আমরা—তাই স্থূলদৃষ্টিতে সে লীলা দেখিতে পাইতেছি না। তৃতীয় নেত্র বিকশিত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রাসলীলা এখনও নিত্য হইতেছে.—সে মধুর মুরলীধ্বনি এখনও মহামন্মথমন্ত্রে সকলকে ডাকিতেছে,—এখনও নূপুর শিঞ্জিত হইতেছে। শুধু আমাদের সে প্রাণ নাই, হৃদয়ে সে ভাব নাই। এ লীলা শুধু এই সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নহে। অনন্তকোটী গ্রহনক্ষত্রে ইহা নিত্যই হইতেছে। প্রতি দ্বাপরে ইহা সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া থাকে। জীবাত্মারূপিণী গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা শ্রীভগবানের শক্তিত্রয়ের অন্যতমা হ্লাদিনীশক্তি। যখন জীবের বাসনাকামনা কিছুই থাকে না, তখন জীবের আর শক্তির প্রয়োজন কি? তখন যাঁহার শক্তি, তাঁহাতেই লীন হয়। ইহাই রাধাকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব।

সদ্গুরু কে?

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বে সমস্ত তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে। নিম্ন অধিকারীগণ জ্ঞানবিহীন হওয়ায় এ তত্ত্বের অধিকারী না হইলেও রাধাকৃষ্ণবিগ্রহের সেবা করিলে তাহারই প্রসাদে তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ও ক্রমে তাহাদের মনোলয় হয়। সাধক রাধাপ্রেম লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সদ্গুরু বলিতে শুধু সিদ্ধ ব্যক্তি নহেন। সিদ্ধ হইলেই গুরুপদবাচ্য হন না। পরীক্ষায় পাশ করিলেই শিক্ষকতা করা যায় না। গুরু বলিতে তাঁহাকেই বুঝিব, যিনি স্বীয় জ্ঞানালোকদ্বারা শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার

বিদূরীত করিতে সক্ষম। সিদ্ধিলাভের পর ব্রহ্মবিদ্যাদান ভগবদাদিষ্ট হইলেই গুরু হইবার ক্ষমতা হয়। এতাদৃশ ব্যক্তির দর্শন ও কৃপা লাভ একান্ত ভাগ্যসাপেক্ষ। তাঁহাদের দর্শন দুর্লভ বলিয়াই শাস্ত্রে তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র।

"দুর্লভে সদ্গুরুণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবাসরো মহান্॥
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি
আগচ্ছতি গুরু দৈবাৎ সদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া॥
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুসারতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানন্ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণঙ্কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ॥

সদ্গুরুর নিকট দীক্ষায় কালাকাল নাই, স্থানাস্থান নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই দীক্ষা লইবে। সচরাচর পূজা অর্চ্চনার পর গুরু দীক্ষা দিয়া থাকেন। উহা শুধু শিষ্যের চিত্তশুদ্ধির জন্য। কিন্তু সদ্গুরুর এ সব কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি যে স্থানে শিষ্যকে মন্ত্র দান করেন, সে স্থানই তীর্থে পরিণত হয়। যাহাকে শিষ্য স্বীকার করেন, তাহার স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষগণ আনন্দিত হন। কারণ তাঁহারা জানেন, সদ্গুরুর শিষ্য হইলে মানবের তিন জন্মের ভিতর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। জগদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার ভাগ্য পাইলে মুক্তি যে এক জন্মেই হইয়া থাকে। পিতা বল, মাতা বল, স্ত্রীপুত্র বল, ভ্রাতাভগ্নী আত্মীয়স্বজন যাহাই বল না কেন, গুরুর ন্যায় বন্ধু আর নাই। তাঁহার নিকট শ্রুত একটী শব্দের বিনিময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দানেও তাহার ঋণ শোধ হয় না। তিনি আমাদের হাত ধরিয়া আলোকময় চিরশান্তিনিলয়ে পৌঁছাইয়া দেন। তিনি আমাদের বুঝাইয়া দেন যে, আমাদের এই ছন্নছাড়া জীবনের উদ্দেশ্যবিহীন-তাই একমাত্র দুঃখের কারণ। তিনি আমাদের বুঝাইয়া দেন যে, জীবনের প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক ধারাবাহিক দুঃখের ভিতর ফাঁকে ফাঁকে সুখের রশ্মিপাত যদি বা হইয়া থাকে; তবে সে আষাঢ়ের ঘন মেঘবিচ্ছেদ-নিঃসৃত সৌরকরের ন্যায় ক্ষণিক। তাঁহারই কৃপায় হৃদয়ঙ্গম হয় যে, যেখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানেই যাইতে হইবে—ঊর্দ্ধশ্বাসে, সঙ্ঘ ভেদ করিয়া, বাহিরের আপাতরম্য দৃশ্যে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, ভিতরের রিপুনিচয়কে চোখ রাঙ্গাইয়া,—এই দেহ, যাহা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর ফিরিতেছে, তাহাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া। আমাদের অজ্ঞানে একান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি দৃষ্টির দ্বারা, শ্বাসের দ্বারা, চিন্তা কিংবা স্পর্শ প্রভৃতি উপায়ে শিষ্যে শক্তি-সঞ্চার করেন। যে শক্তি হয়ত কত শত জন্ম সাধনা করিয়া কত পাহাড়পর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিয়া অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত করেন। শুধু তাহা নহে। শুধু শক্তি সঞ্চার করেন বলিলে কিছুই বলা হইল না। তিনি শুধু শক্তিসঞ্চার করিয়া ক্ষান্ত হন না; সময় বুঝিয়া স্বীয় জ্ঞান ও শক্তিপ্রভাবে শিষ্যের প্রারব্ধ আকর্ষণ করিয়া ক্ষয় করিয়া দিয়া শিষ্যকে অগ্রসর করিয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে প্রারব্ধের ফলই আমাদের জীবন এবং ইহার উপর স্বয়ং ভগবানেরও হাত নাই। কারণ তিনি যে কর্ম্মের ফলদাতা—সে যেরূপ কর্ম্মই হউক। কিন্তু যখন ভগবান গুরুরূপে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন কিংবা মানুষ যখন ভগবানের স্বারূপ্য লাভ করে, তখন তাহার সে ক্ষমতা হয়। প্রারব্ধক্ষয় একমাত্র সদ্গুরুর কৃপাতেই হইয়া থাকে। গুরুকৃপাই ভগবৎকৃপা।

এইক্ষণ প্রারব্ধ কি এবং উহার প্রভাব মানবজীবনে কি প্রকার ক্রিয়াশীল হয় ও সদ্গুরুর কৃপায় কি প্রকার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, তাহা দেখিতে হইবে।

প্রারব্ধ কি এবং তাহার উপর সদ্গুরু-প্রভাব

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন। তিনি ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, জ্ঞানী, অজ্ঞান, সুন্দর, কুৎসিৎ, সবই সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এ সৃষ্টিতে বৈষম্য হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি অনাদি—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

তিনি কল্পের প্রারম্ভে প্রজা প্রকাশ করেন মাত্র। প্রজাগণ তাহাদের সঞ্চিত কর্ম্মবশতঃ স্ব স্ব অর্জ্জিত স্থান অধিকার করে। কাজেই শ্রীভগবানের সৃষ্টি অর্থে কল্পের পর পুনঃপ্রকাশ বুঝিতে হইবে। এইরূপ কত কল্প হয়ত আমরা নিদ্রিত ছিলাম—আবার কল্পারম্ভে কর্ম্মের বোঝা পৃষ্ঠে ধরিয়া কেবলই ছুটিতেছি। ছুটিতেছি আমরা অতীত জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত। শাস্ত্র বলিতেছেন—

পুরাধীতা যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ যদ্ধনম্।
পুরা কৃতানি কর্ম্মাণি অগ্রে ধাবতি ধাবতঃ॥
যত্র মৃত্যুর্যতো হন্তা যত্র শ্রী র্যত্র সম্পদঃ।
তত্র তত্র স্বয়ং যাতি প্রেষ্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥
ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্॥

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে বিদ্যা অর্জ্জিত হইয়াছে, যে ধন দান করা গিয়াছে, যাহাকে হত্যা করা গিয়াছে, বৎস যেমন সহস্র গাভী হইতে স্বীয় মাতাকে বাছিয়া লয়, তদ্রূপ তৎসমস্ত কর্ম্ম কর্ত্তাকে বরণ করিয়া থাকে।

অন্যত্র শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণ্যেব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥
অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাং।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হিনঃ॥

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মানব কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে—শ্রীভগবান কর্ম্মের ফলমাত্র দান করিতেছেন। তবে মানব শ্রীভগবানের আরাধনা না করিয়াও একমাত্র কর্ম্মেরই অনুসরণ করিতে পারে এবং তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তবে শ্রীভগবানের আরাধনা শাস্ত্রোপদিষ্ট কেন?—তাঁহার আরাধনা করি, তৎসারূপ্য লাভ করিবার নিমিত্ত। তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার লীলানুবর্ত্তনে, তাঁহার সংকীর্ত্তনে, তাঁহারই সচ্চিদানন্দভাব, যাহা আমাদের ভিতরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অবিদ্যামলিন হইয়া রহিয়াছে—সেই মালিন্য কাটিয়া গিয়া তাঁহারই গুণরাশি আত্মাতে ফুটিয়া উঠে। তাঁহার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় আমার মলিন মন পরিষ্কার হইয়া যায়। চিন্তাই একমাত্র তাঁহার স্বারূপ্যলাভের অধিকার আনয়ন করে। কারণ বর্ত্তমানে আমরা যাহা, তাহা আমাদের অতীত চিন্তারাশির ফলস্বরূপ। চিন্তায় যে চিন্তামণির স্বারূপ্য আনয়ন করা যায়, তাহা সর্ব্বসম্মত।

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপং সন্ত্যাজন্॥

—যেরূপ তৈলপায়িকা কাচপোকাদ্বারা স্বগৃহমধ্যে নীত হওয়ায় ভয়ে নিরন্তর তাহার চিন্তা করায় তৎস্বরূপত্ব লাভ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের লীলা বা রূপচিন্তনে তাঁহার স্বরূপতা লাভ করা যায়। এই জন্যই শ্রীভগবানের আরাধনা প্রয়োজন এবং তাঁহার উদ্দেশে কর্ম্মই একমাত্র কর্ম্ম। কিন্তু যদি প্রারব্ধ মানবকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে, তবে তাহার গতি ফিরাইয়া ভগবন্মুখী করিবার উপায় কি? উপায় একমাত্র ভগবদ্দত্ত বিচারবুদ্ধিদ্বারা মনোলয়।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

—বায়ু যেমন নৌকাকে জলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ মন উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিষয়-ভোগনিরত ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে, সেই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

এই উচ্ছৃঙ্খল মনের ইতস্ততঃ ছুটাছুটীর কারণ একমাত্র বিষয়াসক্তি। বিষয়াসক্তি হইতেই কামক্রোধের জন্ম।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

সুতরাং বিষয়াসক্ত মনকে অভ্যাস ও বিষয়-বিরাগ দ্বারা নিগৃহীত করিতে হইবে।

কারণ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

মানবের বিষয়বিরাগ অভ্যাস করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম জগতের অনিত্যতা বুঝিয়া নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। মানব অনিত্য পদার্থে মমতাযুক্ত হইয়া সংসারে কেবলই আসাযাওয়া করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মানব, পশু, বৃক্ষ, লতা, যাহা কিছু দেখিতেছি, ইহা কিছুই ছিল না—বর্ত্তমানে আছে, আবার থাকিবে না। কাজেই এ সমস্ত অনিত্য পদার্থ। এই অনিত্য পদার্থে মমত্ববোধহেতু নিত্য পদার্থে মমতা হইতেছে না। এই সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইতেছে, যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে এবং যাঁহাতে লয় পাইতেছে—সেই নিত্য সত্তা বস্তুতে আসক্ত হইতে হইবে। এই অনিত্য পদার্থের অসারতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া নিত্য পদার্থের অনুসন্ধান করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধক্ষয়ের সহায়তার জন্যই একমাত্র সদ্‌গুরুদত্ত মন্ত্রকে সাধন দ্বারা চৈতন্য করিতে হইবে।

গুরুকৃপা

—•—

সুখ সুখ করে মানুষ সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কিন্তু কেউ সুখ পাচ্ছে না। বাইরে থেকে ধনদৌলতের জাঁকজমক দেখে মনে হবে এই লোকটা বুঝি সুখী। কিন্তু ভিতরের খবর নিয়ে দেখ, কেউ এমন কথা বলবে না যে সে বাস্তবিক সুখে আছে ; একটা না একটা ফাসাদ সকলের লেগেই আছে। সংসারে থেকেও মানুষ সুখ পায় না কেন ?—শিক্ষার অভাবে। সংসারটাকে ভোগ করতে হলেও একটা শিক্ষার দরকার। যে জিনিষ ভোগ করবে, তার তত্ত্ব জানা দরকার, নইলে ভোগ চূড়ান্ত হয় না ; তত্ত্ব না জানলে তুমিই বিষয়ের অধীন হয়ে থাকবে, বিষয় তোমার অধীন হবে না। পূর্ব্বে সংসারভোগের একটা শিক্ষার ব্যবস্থাসমাজ ছিল। সংসারতত্ত্ব জানবার জন্যই গুরুগৃহবাস, ব্রহ্মচর্য্য পালন, বেদাভ্যাস ইত্যাকার অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে হত। যারা গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে শক্তিসঞ্চয় করে সংসারে ঢুকত, তারা সংসারের ভালমন্দ কতকটা বুঝে আর তার দায় ঠেকাবার শক্তি নিয়ে সংসারে ঢুকত। কাজেই তাদের এতটা দুর্ভোগ ভুগতে হত না।

কিন্তু আজকাল তো সে শিক্ষা নেই। তাই মানুষ এখন পশুর মত সংসার করছে। বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর দিকেই নজর দিয়ে দেখ না কেন। বাস্তবিক সংসারে লোকের যে দুর্দ্দশা, তা দেখলে কি যে দুঃখ হয়! মুখে অত সাত্ত্বিকতার বড়াই, কিন্তু ঘোর তমোতে সব ডুবে রয়েছে। ঘোর সাত্ত্বিকতা আর তামসিকতা বাইরে থেকে কার্য্যতঃ একই রকম দেখায় কিনা, তাই লোকে মনে করছে, আমরা বুঝি খুব সত্ত্বগুণী। কিন্তু তা নয়, সমস্তটা দেশ তমোতে একেবারে উৎসন্ন যেতে বসেছে।

নিজের শক্তিতে যে কেউ কিছু করবে, এমন সঙ্গতি কারু নেই। অথচ মুখে বড় বড় বুলি ঝাড়বার বেলায় কেউ কম নয়। এখনকার যে অবস্থা, তাতে শরণাগতের ধর্ম্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। আত্মাভিমান কতকটা চূর্ণ হলে তবে স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের একটা ধারণা জন্মাবে। তখন শক্তি সঞ্চার ও শক্তি পরিচালনায় উৎসাহ ও সামর্থ্য আসবে। এখন নিজকে যে কেউ খাটো করতে পারছে না—অথচ বাস্তবিক কারো কণামাত্র শক্তিও নাই। এ অবস্থায় মনের কপটতা দূর করে বাইর ভিতর সরল করে তাঁর কৃপার জন্য আকুল প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনও সাধনা নাই।

তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, এইটুকু বুঝলেই তো আর সাধনা থাকে না। যিনি বিশ্ববিধাতা, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটী পড়ে না, তোমার চোখের পাতাটী নড়ে না। কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারছ কোথায়? হয়ত আত্মাভিমানে পূর্ণ হয়ে বলছ—আমিই কর্ত্তা। নয়ত ঠেলায় পড়ে বলছ, হরি হে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু ও কথাও তোমার প্রাণের কথা নয়। শুনে শুনে মুখে ও কথা বলতে শিখেছ বটে, কিন্তু ভগবান যে কর্ত্তা, এ কথায় এখনো বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হলে আর কর্ম্ম

থাকত না। সবই যদি তিনি করাচ্ছেন, তবে আর আমি কে? গীতাতেও আছে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রামযন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

কিন্তু এ কথা তো তোমাদের ধারণা হয় না। ধারণা শুধু মুখে বললে হয় না—তার জন্যও শিক্ষা চাই।

যিনি শেখাবেন, তিনি হলেন গুরু। তিনি ভাব পেয়েছেন, আর অপরের মাঝে সেই ভাব সঞ্চারিত করবারও শক্তি তাঁর আছে। তাই তিনি সবার চেয়ে ভারী, সবার গুরু। সব বিদ্যারই গুরু লাগে। ব্রহ্ম-বিদ্যাতেও লাগে। শাস্ত্রে দু'রকম গুরুর কথা আছে—আচার্য্য গুরু আর সদ্গুরু। মন্ত্র বা সাধন তোমাকে যে সে দিতে পারে। ও তো কাউকে বানিয়ে দিতে হয় না। শাস্ত্রেই সব আছে—শুধু দেখিয়ে দেওয়া। এমনি করে কারু কাছ থেকে মন্ত্র পেয়ে সাধন করতে সুরু করলে। এই হলেন তোমার আচার্য্য গুরু। ইনি নিজে কিছু করে দিচ্ছেন না—পথ দেখিয়ে দিলেন, এখন তোমার চেষ্টায় যতটুকু হয়। কিন্তু সদ্গুরু সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চার করে দেন। প্রাথমিক শিক্ষা আচার্য্য গুরুর কাছেই হতে পারে। কিন্তু বন্ধনমোচন সদ্গুরুই করেন। এই জন্য আচার্য্য গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে আবার সদ্গুরুর আশ্রয় নেওয়া চলে। সদ্গুরু আর তখন নূতন মন্ত্র দেন না—ওই মন্ত্রেই শক্তি সঞ্চার করে দেন।

আবার এমনও হতে পারে যে, প্রথম হতেই সদ্গুরুর আশ্রয় নিলে। যেমন ধর, হাতেখড়ি যে কেউ দিতে পারে—তাই কি কিছু দূর লেখাপড়াও শিখিয়ে দিতে পারে। এঁরা হল পাঠশালার গুরুমশাই। আবার একজন অধ্যাপক রয়েছেন, তিনি দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত। পাঠশালার পড়া, স্কুলের পড়া শেষ হলে তবে তাঁর কাছে দর্শনের পড়া চলে। এখন, এমনও হতে পারে যে, দর্শনের অধ্যাপকই তোমার হাতেখড়ি থেকে সুরু করলেন। তা বলে তিনি কি প্রথম থেকেই দর্শন পড়াবেন? তা নয়। তুমি যতটুকু ধারণা করতে পার, ততটুকুই তিনি তোমাকে দিবেন। ক্রমে দর্শনও পড়াবেন।

আচার্য্য গুরু আর সদ্গুরুতে বিশেষ প্রভেদ এই যে, সদ্গুরুর কেবল মাত্র আশ্রয় নিলেই তার একটা ফল আছে। কিছু কর আর না কর, কিছু না কিছু তোমার হবেই হবে। এই হচ্ছে সৎগুরু আশ্রয়ের বিশেষত্ব।

গুরুতে নিষ্ঠা রাখতে হয়। এমন কি সাধনের চেয়ে গুরুনিষ্ঠাই বড়। কিন্তু আজ-কাল লোকে সাধনের জাঁকজমকে সব ভুলে যায়—নিত্য নূতন সাধনের পিছু পিছু ছোটে। এই সব ব্যভিচার অবাধে চলছে। কেউ একটা ধরে থাকতে পারে না। খুঁজলে দেখতে পাবে, এক এক জন মন্ত্র নিয়েছে তো একেবারে মন্ত্রের মালা গেঁথে বসে আছে। আজ এক গুরুর কাছ থেকে এক মন্ত্র নিলে, দু' চারদিন তাই জপ করলে। দুদিন পরে ওতে কিছু হল না বলে আর এক জনের কাছ থেকে মন্ত্র নিলে। এমনি করে মন্ত্রের পুঁটুলী বেঁধেছে। তাতে লাভ হয় এই যে, কোনও মন্ত্রেরই ক্রিয়া হয় না। চার দিকের টানাটানিতে চিত্ত আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। বহু গুরু করা তাহলে দোষের? তা কেন? আমি তো গুরুর কথা বলছি না—

মন্ত্রের কথাই বলছি। একটা মন্ত্রের সাধন না হতেই আর একটা নিলে চলে না। গুরু অনেক করলে তা দোষ নেই—তবে পর পর স্তরে স্তরে গুরু করতে হবে। নীচের ক্লাসে যতটুকু পড়া হয়, ততটুকু সাঙ্গ হলে তবে উপরের ক্লাসে প্রমোশন পাওয়া চলে। একজন গুরুর কাছে যতটুকু শিখবার ততটুকু শিখে তার পরের শিক্ষার জন্য আর এক জনের কাছে গেলে। তাতে আর দোষ কি? কিন্তু এক জন গুরুমশাই তোমার হাতে খড়ি দিলেন বাংলাতে; তাঁর কাছে শিক্ষা শেষ না হতেই ছুটলে আর একজনের কাছে—তিনি হাতে খড়ি দিলেন ফারসীতে। এমনি করে তো তোমার কিছু হবে না। এমন কি এক একবার এক একজনের কাছে গিয়ে যদি কবল হাতে খড়িই হতে থাকে, তাহলে তো কিছুই হল না।

আসল কথা হচ্ছে, মন্ত্রেরই সাধন। একটা বচন আছে—

"গুরু কর লাখে লাখে মন্ত্র কর সার।
পায়ের বাঁধন কাটেন যিনি,
দোহাই দিবে তাঁর॥"

"পায়ের বাঁধন কাটেন যিনি"—ইনিই হলেন সদ্‌গুরু। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। একমাত্র গুরুকে ধরে আমাদের দেশে ধর্ম্ম-সমন্বয় হতে পারে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈবে ঝগড়া—এ বলছে আমার শক্তি বড়, ও বলছে আমার বিষ্ণু বড়, ও বলছে শিব বড়—কিন্তু গুরুর বেলায় কেউ কোনও প্রতিবাদ করে না। "গুরু সবার বড়"—এ কথা বললে, ওই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীও আপত্তি করবে না, শাক্তও করবে না, বৈষ্ণবেও করবে না।

যারা অদ্বৈতবাদী, কিছুই মানে না—তারাও গুরু মানে। অদ্বৈতজ্ঞানের আচার্য্য শঙ্কর বলছেন—"অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ"—গুরুর সঙ্গে অদ্বৈতভাব চলে না। গুরু যে সবার বড়, এ কথা ঠেকে শিখতে হয়। যখন ভগবান্ ভগবান্ করে ছুটাছুটি করেছিলাম, তখন—ভগবান্ তে সর্ব্বত্রই আছেন—কিন্তু কই একদিনের জন্য তো ভগবান্ দয়া করে দেখা দিলেন না। আগে গুরু পেয়েছি, তারপর ভগবান্ পেয়েছি। একটা সোজা কথায় বুঝিয়ে বলি। এই যেমন ধর টাকা; টাকা সংসারে খুবই প্রয়োজন, টাকা সব জায়গাতেই আছে বটে, কিন্তু তবুও যে লোকটার হাত দিয়ে টাকা পাই, তাকেই বেশী দরকার।

ধ্রুব পাঁচবছরের ছেলে—হরির জন্য ব্যাকুল হয়ে বনে ছুটে এসেছে। তার আকুলতা দেখে নারদ বিষ্ণুকে বললেন, ঠাকুর, তোমার মত অমন নিষ্ঠুর তো দেখিনি। এই পাঁচবছরের দুগ্ধপোষ্য শিশু, অমন করে তোমায় ডাকছে, তার অবস্থা দেখে তোমার কি একটু দয়াও হয় না ঠাকুর? বিষ্ণু বললেন, নারদ, ওতো এখন সব হরি দেখছে। বাঘকে ও হরি বলে জড়িয়ে ধরছে। আমি কোন্ রূপে ওকে দেখা দেব? বরং তুমি আগে গিয়ে ওকে মন্ত্র দাও, নামরূপ শিখিয়ে দাও, তারপর আমি যাব। নারদ এসে ধ্রুবকে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্র পেয়ে ধ্রুব জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর, এই মন্ত্রে কতদিনে হরির দেখা পাব? নারদ বললেন, ছয় মাসে। তারপর নারদের কাছে সকল কথা শুনে বিষ্ণু বললেন, "নারদ, এই যে তুমি আমায় নিষ্ঠুর বলে গাল দিচ্ছিলে, এখন তো দেখি আমার চেয়েও তুমি নিষ্ঠুর

আমি একমুহূর্ত্ত দেরী করেছিলাম বলে আমার দোষ হয়েছিল। আর তুমি যে এখন ছয় মাস দেরী করিয়ে দিলে। তা তুমি যখন বলেছ, তখন আমাকে ছয় মাস পরেই যেতে হবে।

এই যে আছে, "শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন"—এটা শুধু স্তুতিবাদ বা বাজে কথা নয়। গুরুতে নিষ্ঠা রাখলে সব সঙ্কট হতে উদ্ধার পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ গিরির জীবনে আছে—গুরুর কাছে মন্ত্র পেয়ে জপ করছেন, মা এসে বললেন, তুমি যে মন্ত্র জপছ, তা অশুদ্ধ—তাতে এই সব ছিন্নাদি দোষ আছে। ব্রহ্মানন্দ গিরি তাঁকে হেঁকে দিলেন, তোমাকে তো আমি চিনি না—আমি চিনি গুরুকে। কই, এতদিন তো তোমায় কত ডেকেছি; তখন তো দরদ হয়নি। আর আজ গুরুর কাছে মন্ত্র পেয়েছি বলে দয়া করে ভুল দেখিয়ে দিতে এসেছ। তোমার ও সব চালাকি আমি শুনি না। গুরু আমাকে যে মন্ত্র দিয়েছেন, আমি তাই জপছি।—মা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার এলেন—একটা চোখ নেই, এক পা খোঁড়া। ব্রহ্মানন্দ গিরি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? মা বললেন, আমি তোমার ইষ্ট-দেবী। ব্রহ্মানন্দগিরি বললেন, কই, গুরু যে আমায় ধ্যান দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তো তোমার রূপ মিলছে না। ধ্যানে তো এমন বলেনি যে তুমি কাণা বা খোঁড়া।—মা বললেন, তা আমি কি করব? তুমি যেমন অঙ্গহীন মন্ত্র জপেছ, তেমনি অঙ্গহীন রূপেই আমাকে আসতে হয়েছে।—ব্রহ্মানন্দ তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন, ও সব চালাকীর কথা আমি শুনবো না। আমার মন্ত্র অঙ্গহীন কি না, তা আমার গুরুই বুঝবেন। আমায় তিনি যে ধ্যান দিয়েছেন, সেই ধ্যানেই তোমায় আসতে হবে। যাও এখন তুমি এখান থেকে।—অবশেষে মাকে হার মানতেই হল, পূর্ণরূপেই তিনি দেখা দিলেন।

ভগবান দেখা দেন গুরুর ভিতর দিয়ে; এই তাঁর বিধান। সব সৃষ্টি করবার আগে তিনি গুরু হয়েছেন। এই যেমন একটা চলতি কথা আছে, মন্ত্রবলে কেউ বাঘ হতে পারে। সে আগে একটা বাটিতে জলপড়া রেখে অপরকে বলে দেয়, দেখ, আমি বাঘ হলে তো আর ফিরে মানুষ হবার মন্ত্র মনে থাকবে না, তাই এই জলপড়া তোর কাছে রাখলাম। আমি বাঘ হওয়ার পর এইটা গায়ে ছিটিয়ে দিস্, তবেই আবার মানুষ হব। তেমনি, ভগবানই তো মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে জীব হন। তাই জীবভাব ছুটাবার জন্য আগেই তিনি গুরু করে রাখেন। কাজেই গুরু ভগবানের আদি আবির্ভাব।

গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। তার মানে কি? দীক্ষা মানে একটা বিশেষ সঙ্কল্প। আজকাল লোকে দীক্ষার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছে। এখন সবাই দীক্ষা দীক্ষা করে পাগল। পূর্ব্বে যজ্ঞে দীক্ষা হত। অভিষেক করে দীক্ষা হত। দীক্ষিত যজমানকে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করতে হত আজ হতে আমি অমুক যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হব, এই এই নিয়মে বাধ্য থাকব, এমনি একটা সঙ্কল্প করতে হত। এখন দীক্ষা বলতেই মন্ত্র নেওয়া বোঝায়।

ভগবানের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ। তুমি কোন্ নামে, কোন্ রূপে তাঁকে ডাকবে? তাই গুরু তোমাকে বলে দেন, আজ হতে এই নামে, এই রূপে, তুমি তাঁকে ডাকতে থাক। এই হল দীক্ষা। আগে জঙ্গল সাফ করে, আগাছা বেছে, চাষ দিয়ে জমী তৈরী

করতে হয়, তার পর বীজ ছড়ালে শস্য হয়। কাজেই দীক্ষার পূর্ব্বেও অনেক করবার আছে। চিত্তক্ষেত্র তৈরী হলে তারপর দীক্ষা।

সাধন সম্বন্ধে পূর্ব্বের কোন সংস্কার না থাকলেই ভাল। তুমি সরলপ্রাণে ভগবানকে চাও না কেন। তাঁকে পেতে হলে কি করতে হবে, তা গুরুই বলে দেবেন। গুরুর কাছে এসে তোমরা বললে, আমরা দীক্ষা নেব। এ ও তোমাদের শোনা কথা। এই-টুকু সংস্কারও যদি না থাকত, তাহলেই ভাল।

গুরু অধিকার বুঝে সাধন দেন। একবার একটা লোক এক সাধুর চেলা হতে গিয়েছিল। কিছুদিন তাঁর কাছে থেকে খুব সেবাশুশ্রূষা করলে। গুরু তাকে কোনো সাধনভজন দিলেন না। গুরুর কাছে যে এসে যা বলত, তিনি তার যা জবাব দিতেন, চেলাটী তাই শুনত।

একদিন একজন এসে বলল, প্রভু, আমি তো শিবস্বরূপ, এখন জীব সেজেছি। মায়া দ্বারা আমার স্বরূপ আবৃত রয়েছে। শ্রবণ-মনন করে যদি আবরণ দূর করতে পারি, তবে আমি যা ছিলাম, তাই তো আবার হব। গুরু বললেন, হাঁ, হাঁ, ঠিক, তুমি যাও—শ্রবণ মননই করগে।

আর একজন এসে বলল, ঠাকুর, আমার এই মনটা বাইরে নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বলেই না আমি এত কষ্ট পাচ্ছি। যদি কোনও রকমে মনটাকে গুটিয়ে আনতে পারি, তার বৃত্তিগুলি রোধ করতে পারি, তাহলেই তো আমার সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। গুরু বললেন, হাঁ ঠিক ধরেছ। তুমি তোমার চিত্তবৃত্তিগুলিই রোধ করতে চেষ্টা করগে, তাহলেই হবে।

আর একজন বলল, ঠাকুর, কর্ম্মের ফলেই তো আমাদের জন্ম হয়, সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়। অসৎ কর্ম্ম করলে কষ্ট পেতে হবে, সৎকর্ম্মে সুখ হবে। তাহলে অসৎ কর্ম্ম বর্জ্জন করে কেবল সৎ কর্ম্মই করি না কেন? গুরু বললেন, হাঁ ঠিক, তুমি সৎকর্ম্ম সদাচার নিয়ে থাকগে—সেই ভাল।

আর একজন বলল, ঠাকুর, আমার নিজের কি সাধ্য আছে যে কর্ম্ম করি? তিনি যা করাচ্ছেন, তাই করছি। আমি আর সাধন করে তাঁকে কি পাব? একমাত্র তাঁর কৃপাই সম্বল। আমি কেবল তাঁর কৃপা ভিক্ষা করে আকুল হয়ে কাঁদতেই পারি। গুরু বললেন, হাঁ, ঠিক বলেছ। তুমি আকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদ—তবেই তাঁকে পাবে।

এদিকে আগেকার সেই চেলাটী ততক্ষণে পোঁটলা পুঁটুলী বেঁধে চলে যাবার উদ্যোগ করছে। তা দেখে গুরু বললেন, কি হে, তুমি চলে যাচ্ছ যে? চেলা বলল, আজ্ঞে আপনাকে আমি চিনে নিয়েছি, আপনি ভয়ানক ব্যবসাদার। আপনাকে এসে যে যা বললে, তাতেই আপনি হাঁ দিয়ে গেলেন। আপনার কাছে আমি আর থাকতে চাই না। —কিন্তু গুরু কি কারু মনরাখা কথা বলেছেন? তা নয়। যে যেমন অধিকারী তাকে তিনি সেই পথে পরিচালনা করেছেন।

একবার গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেই সব ফুরিয়ে যায় না, মাঝে মাঝে আবার গুরুর সাহচর্য্য করতে হয়। তাতে শিষ্যেরই উপকার হয়। গুরু শিষ্যের মাঝে শক্তি সঞ্চার করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গ না করলে, একটা কিছু অবলম্বন না থাকলে শক্তি সঞ্চার

করলেন কি করে? অবশ্য দূরে থেকেও যে তা না হয়, তা নয়। ভাবনায় শক্তি সঞ্চার হতে পারে। যেমন ছেলে দূরদেশে রয়েছে। সেখানে সে অসুখে পড়ল। মা বাড়ীতে থেকেই তা টের পান। ঠিক ঠিক না জানতে পারলেও তাঁর মনে একটা অস্বস্তি হয়, তাতেই বুঝতে পারেন, ছেলের কিছু অমঙ্গল হয়েছে। ছেলেতে মায়েতে যোগ ছিল বলেই ছেলের কথা মা বুঝতে পারলেন। শক্তি থাকলে প্রতীকারও করতে পারতেন।

গুরুর কৃপাতেই সব হয়। কিন্তু গুরু কি আর শিষ্য বেছে বেছে কৃপা করেন? তাঁর সবার উপরই সমান দৃষ্টি। তবে এক জন বেশী কৃপা পায়, একজন কম পায় কেন? —আধার ভিন্ন আছে বলে। রামকৃষ্ণ দেবের কত ভক্ত ছিল। তার মাঝে বিবেকানন্দই এতটা ফুটলেন কেন? তিনি কি তাঁকে বেশী ভালবাসতেন, আর সবাইকে কম ভালবাসতেন? তা নয়, বিবেকানন্দের আধার বড় ছিল। এ না হলে গুরুর গুরুত্বই থাকে না। তাঁর মাঝে পক্ষপাত নাই।

—*—

আদর্শ সংসার

—*—

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে একটী পরমাণু পর্য্যন্ত একই ধর্ম্ম দ্বারা শাসিত—ক্ষুদ্র বৃহতেরই প্রতিরূপ। এই তত্ত্বটী আবিষ্কার করাই হইল বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞান জানা থাকিলে আর কার্য্যক্ষেত্রে ঠকিতে হয় না। বিজ্ঞান ধর্ম্মকে আবিষ্কার করে, অধর্ম্মকে পরাভূত করে। তাই বিজ্ঞানে শক্তিলাভ হয়। জড়ের বিজ্ঞান আছে, মনের বিজ্ঞান আছে, সমাজের বিজ্ঞান আছে—তেমনি সংসারেরও বিজ্ঞান আছে। সংসারের বিজ্ঞান জানিয়া চলিতে পারিলে আর অধর্ম্ম করিতে হয় না। আর ধর্ম্ম যথাযথ প্রতিপালিত হইলে যে অনুত্তম সুখলাভ হয়, ইহা শাস্ত্রেরই কথা। অতএব ধর্ম্মরক্ষার জন্য, সুখলাভের জন্য সংসারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর সে বিজ্ঞান আর কিছু নয়, কেবল এই-টুকু জানা—আমাদের এই ক্ষুদ্র সংসার কোন্ বৃহৎ সংসারের প্রতিরূপ; আর সেই বৃহৎ সংসারের ধর্ম্মকে অব্যাহত ভাবে এই ক্ষুদ্র সংসারে প্রবাহিত হইতে দেওয়া।

ভগবানই তো আদর্শ সংসারী। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সংসার—সেই সংসারের অনুরূপেই আমাদের এই সব ক্ষুদ্র সংসারের উৎপত্তি। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সংসার যে আইনে চলিতেছে, আমাদের ক্ষুদ্র সংসারকেও সেই আইনে চলিতে দিতে হইবে—তাহা হইলে আর কোথায়ও দুঃখ থাকিবে না। ধর্ম্মের আশ্রয়ে মানবজীবন পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে।

ব্রহ্মাণ্ডে তিনটী বিভাব। প্রথমতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সংসারের সংসারী যে ভগবান—তিনি; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার শক্তি; তৃতীয়তঃ জীব।

এখন ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক কি, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ দেখিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড গুণের বিক্ষোভে সৃষ্ট। এখানে সর্ব্বত্রই গুণের খেলা। কিন্তু এই গুণ ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বোক্ত তিন বিভাবে তিন অংশে বর্ত্তাইয়াছে। প্রথমতঃ ধর, ভগবান্। তিনি জগৎ সংসারের সংসারী, কিন্তু তিনি গুণের অতীত। সংসারের সর্ব্বত্র থাকিয়াও যেন তিনি নাই—অর্থাৎ তিনি নির্লিপ্ত। অথচ এই নির্লিপ্ত পুরুষটী যদি সাক্ষীরূপে জগৎসংসারের মাথার উপরে বসিয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে জগৎ চলিত না। তিনি নিজ হাতে কিছু করেন না বটে, ভাল মন্দ কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করে না বটে, কিন্তু তবুও তিনি না থাকিলে সংসার থাকে না। এই হইল জগৎসংসারের প্রথম পুরুষ—ইনি গুণাতীত।

তবে এই এত বড় সংসারটা চালাইয়া নিতেছে কে?—ভগবানের শক্তি। ইনি গুণময়ী বটে; কিন্তু তবুও ইনি গুণের অধীন নন। গুণ তাঁহার হাতের পুতুল। অবহেলা-ক্রমে তিনি তাহাদের লইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের খেলা খেলিতেছেন বটে, কিন্তু কোথায়ও গুণের বশ হন নাই। গুণ তাঁহার ইচ্ছামত চলিতেছে—কিন্তু তাঁহাকে কাবু করিয়া যা খুসী তাই করাইয়া লইতে পারিতেছে না। বেশী কথা কি, তিনি ত্রিগুণ-শাসিনী। সন্তান কি আর মাকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারে? অথচ মা ছাড়া তাহাদের গতি নাই; আবার মায়েরও সন্তান কয়টী লইয়াই নাড়াচাড়া—ওই লইয়াই তাঁহার সংসার। কিন্তু শক্তির এই সংসার লীলা কাহার জন্য?—ওই গুণাতীত পুরুষের জন্যই। তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই খেলা পাতিয়াছেন। দুয়ে প্রভেদ এইটুকু যে, ভগবান্ সংসার লইয়া হাতে নাতে নাড়াচাড়া করেন না—কিন্তু ইনি করেন। তাই বলিতে পারি, জগৎসংসারে শক্তি দ্বিতীয় পুরুষ—ইনি গুণাধীশ।

তারপর কাহাদের লইয়া এই সংসার-খেলা?—আমাদের লইয়া। আমরা জীব—গুণের অধীন। নিজের স্বাধীন কর্তৃত্ব কিছুই নাই—গুণের বিকারে পড়িয়া হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, নাচিতেছি। আমাদের এই গুণ লীলাতেই তো সংসার এমন জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। অথচ একটা মজা এই, গুণের অধীন হইয়াও আমরা কখনও মনে করি, আমরাই বুঝি কর্ত্তা; কখনও বা শৈশবচাপল্য ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বসি, যেন আমরা বুড়োর ঠাকুরদাদা। এই যে জীবের কর্তৃত্ব, দ্রষ্টৃত্বের অভিমান—এটা কি কেবল ফাঁকি। তা তো নয়। ওই স্বভাব আমাদের পিছনে রহিয়াছে—একদিন ওই স্বভাব পাইতে হইবে, সত্যকার কর্তৃত্ব, সত্যকার দ্রষ্টৃত্ব একদিন মিলিবে। এ তাহারই আভাস। আমরা জীব হইলেও শিবস্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন নই—সেই শিবস্বরূপের পানেই আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি। আজ শিশু আছি, এক দিন বড় হইব, এ আশা হৃদয়ে পোষণ করি বই কি। জীবলীলায় এই কথাটুকু কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে বলিতে পারি—জগৎসংসারে জীব তৃতীয় পুরুষ—ইনি গুণাধীন।

এই তিন পুরুষের আবর্ত্তনে জগৎসংসার। ঠিক এই সংসারের অনুরূপ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র সংসারও গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপকরণ সমস্তই প্রস্তুত, এখন পরিকল্পনা পাইলেই

হইল। যে কোনও গৃহস্থের জীবনে এই তিনটী লীলার আভাস দেখিতে পাই। এখন জ্ঞানে ইহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিলেই হইল।

সাধারণ সংসারেও তিন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতামহ, পিতা আর পুত্র - বৃদ্ধ যুবক আর শিশু—এই লইয়াই না সংসার? এই হইল উপকরণ। এখন কি করিয়া ইহাদের মাঝে বিজ্ঞান খাটাইয়া লীলা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহা দেখা যাক্। মনে রাখিতে হইবে, সংসার কথাটার অর্থই সচল। সুতরাং সর্ব্বত্রই এই তিন পুরুষের আবর্ত্তন হইতেছে—ইহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ যে পিতামহ, সে পুত্র ও পিতার অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে—সে পুত্রকেও জানে, পিতাকেও জানে।

কিন্তু সংসার কর্ম্মস্থল। এখানে যুবক পিতারই প্রাধান্য। ইঁহাকে মধ্যম পুরুষ বলিব। ইনিই একমাত্র কর্ম্মনির্ব্বাহক। ইহার কর্ত্তব্য বুঝিতে হইলে উর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষের সহিত ইহার কি সম্পর্ক, তাহা বুঝিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আদর্শ সংসার কিরূপ হওয়া উচিত, আমরা তাহাই চিত্রিত করিতেছি। সংসারধর্ম্মই আমরা ব্যাখ্যা করিতেছি। অধর্ম্ম বর্ত্তমানে কি দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, তাহা পরে বিবেচ্য।

মধ্যম পুরুষে দেখিতে পাই, যৌবনোচিত শক্তির বিকাশ—অদম্য কর্ম্মের স্পৃহা। যুবক পিতার ভিতর হইতে কর্ম্মের প্রেরণা যেন আপনা হইতেই স্ফূর্ত্ত হইতেছে। কিন্তু এই কর্ম্ম লক্ষ্যহীন কর্ম্ম নয়। অতীতের অভিজ্ঞতা ইহার ভিত্তি। অভিজ্ঞতা কাহার?—পিতা মহের। পিতামহ সংসার করিয়া আসিয়াছেন, সংসার গুছাইয়া পিতার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, পিতা সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কর্তৃত্বের অধিকার পাইয়াছেন বলিয়াই উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারেন না। পিতামহ বা উত্তম পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁহার কর্ম্মের নিয়ামক। নিজ হাতে তিনি সমস্ত কাজই করেন বটে, কিন্তু জানেন, মাথার উপর যে বৃদ্ধ বসিয়া আছেন, তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখেই সংসার চলিতেছে। তাঁহার প্রসন্ন অনুমোদন ব্যতীত ইহার কল্যাণ নাই। এই জন্য হিন্দু গৃহস্থ পিতৃপুরুষকে বাদ দিয়া এক পা চলিতে পারে না শ্রদ্ধার নিবেদন বা শ্রাদ্ধ এই জন্য গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতার হাতে যে সংসার আজ আসিয়া পড়িয়াছে, কার্য্যতঃ তিনি ইহার কর্ত্তা হইলেও বিগত পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থই এই সংসার পরিচালনা করিতে হইবে। ইহা তাঁহার ভোগের ক্ষেত্র নহে—স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি নহে। সাক্ষীস্বরূপ গৃহপতি অগ্নি এই সংসারের অধিষ্ঠাতা। প্রাচীন কালে বানপ্রস্থাবলম্বী পিতামহ চিরপূজিত গৃহপতি অগ্নিকে আত্মাতে সমাহিত কল্পনা করিয়া গৃহ হইতে দূরে অবস্থান করিতেন; অর্থাৎ যে অগ্নি এতদিন গৃহের সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও যেন সেই অগ্নিস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আজ প্রাচীন অনুষ্ঠান নাই, কিন্তু তাহার ভাবটুকু আমরা বজায় রাখিতে পারি। বানপ্রস্থাবলম্বী পিতামহ যে পথে চলিতেন, সে পথ অনুসরণ করা দুরূহ নহে, বরং অতি মাত্রায় কর্ত্তব্যই। যখন গার্হস্থ্যধর্ম্ম উদ্‌যাপন করিয়া বৃদ্ধ হইলে, প্রাকৃতিক শক্তি সংহৃত হইয়া জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখন বানপ্রস্থ অবলম্বন কর। সোজাসুজি বনে যাওয়ার

কথা বলিতেছি না—গৃহেই বানপ্রস্থাবলম্বীর মত অবস্থান কর। গৃহপতি অগ্নিকে আত্মায় সমাহিত করিয়া নিজেই সেই অগ্নিস্বরূপ, সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান। তুমি তখন গুণের অতীত; সংসারের সুখদুঃখে তুমি বিচলিত হও না—অথচ সংসারের সর্ব্বত্র তোমার দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে। তুমি কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, উপযুক্ত পিতা বা মধ্যম পুরুষ তাহা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। তাহার সহিত তোমার শ্রদ্ধার সম্পর্ক, প্রীতির সম্পর্ক। মধ্যম পুরুষ সংসার পরিচালনা করে—তোমারই প্রীত্যর্থে, তোমারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী। গৃহপতি অগ্নিই গৃহের সাক্ষী তাঁহার প্রীত্যর্থেই নিত্য এই জীবনযজ্ঞের অনুষ্ঠান।

যদি উত্তম পুরুষের প্রতি মধ্যম পুরুষের এই ভাব থাকে, তাহা হইলে সংসারে আপনা হইতেই সংযমের ভাব আসিয়া পড়িবে। মধ্যম পুরুষও গুণের অধীন নন, তিনিও অবিচলিত থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন। তবে সংসারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎভাবে যোগ আছে, এই যা বিশেষ। কিন্তু এইরূপ গুণস্পর্শ রহিত হইয়া সংসার করার প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? একবার সেই সাক্ষীপুরুষের কথা স্মরণ কর। মধ্যমপুরুষও জানেন, চিরদিন এই সংসার লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিবেন না; তাঁহাকেও গুণাতীত ভূমিতে বিশ্রাম করিতে হইবে—এই সংসারের দ্রষ্টা হইতে হইবে। দ্রষ্টা হইতে হইলে ভোগ লইয়া থাকা চলে না। ভোগে যাহার আসক্তি আছে, সে দ্রষ্টা তো নয়ই—কর্ত্তাও হইতে পারে না।

মধ্যমপুরুষ সমস্ত সংসারটাকে পরিচালনা করিতেছেন—বন্ধনের দিকে নয়, অধোগতির দিকে নয়—অনাসক্তির দিকে, মুক্তির দিকে। সংসারধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য, এই মুক্তিফলকে পুরুষানুক্রমিক সাধনায় সুলভ করিয়া তোলা। সুতরাং ভোগ কাহারও লক্ষ্য নহে। তিনি যখন সংসারের ভার পাইতেছেন, তিনিই তখন গৃহপতি অগ্নির দিকে, উত্তমপুরুষ পিতামহের বিক্ষোভহীন প্রশান্ত মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসার করিতেছেন। ওই প্রশান্তি বা সাক্ষিস্বভাবই তাঁহার লক্ষ্য।

সন্তানকে বলিয়াছি, তৃতীয় পুরুষ। এই সন্তানের প্রতি মধ্যমপুরুষের গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সন্তান লইয়া সংসার। কিন্তু সন্তানকেও মোক্ষপথের পথিক করিতে হইবে। সন্তান অপ্রবুদ্ধ, চঞ্চল, তাই তাহাকে গুণাধীন বলিতে পারি। যেমন করিয়াই হউক, প্রত্যেক সংসারেই সন্তানের ভাগ্যে কিছু না কিছু ভোগ জুটিয়াই যায়। পিতামাতা আত্মত্যাগ করেন, সন্তানের ভোগের জন্যই। এই পর্য্যন্ত সন্তানের সঙ্গে জীবলীলার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, মহামায়ার সংসারেও জীবের ভোগের ব্যবস্থাও মুক্তির দিকেই অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করিতেছে। সমস্তটা জগতের ঊর্দ্ধগতি—তেমনি সমস্তটা সংসারেরও ঊর্দ্ধগতি। কিঞ্চিৎ ভোগ অনিবার্য্য হইলেও সন্তানকে মধ্যমপুরুষ ত্যাগেরই শিক্ষা দিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার যথার্থ সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইবে। মনে রাখিবেন, একদিন এই সন্তানকেই পিতৃত্ব লাভ করিয়া অনাসক্তভাবে সংসার করিতে হইবে, এবং পরিণামে পিতামহত্ব লাভ করিয়া সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিতে হইবে।

মধ্যমপুরুষ বা পিতার কর্ত্তব্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, আত্মোৎসর্গ যা কর্ম্মই

সংসারধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য। যেখানে ঐশ্বর্য্য আছে, অথচ ভোগ নাই—সেখানে ত্যাগই একমাত্র সত্য। সাক্ষিস্বরূপ বা অগ্নিস্বরূপ লাভ করিতে হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সংসারে যাহা কিছু ভোগোপকরণ সঞ্চিত হইবে, তাহা গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজনেই গৃহীর অধিকার। যে নিজের জন্য পাক করে, সে পাপই ভোজন করে— ইহাই গীতোক্ত গার্হস্থ্যধর্ম্মের সার নিষ্কর্ষ। এই জন্যই প্রাচীন গৃহস্থালীতে পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা দেখি। অন্নসম্পদ্ বা মনঃসম্পদ্ যাহা কিছু গৃহস্থ উপার্জ্জন করিবেন, তাহা ঋষি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, নর, ও সর্ব্বভূতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিবেন। যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গই একমাত্র কর্ম্ম—সংসারে আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই। যে সংসারে থাকিয়া অগ্নিহোত্র সমাপন করে না, অর্থাৎ গুণাতীতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আত্মোৎসর্গ দ্বারা গুণকে পরিচালনা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করে না— সে ভণ্ড সংসারী। জগৎসংসার আর নিজের সংসার একসুরে বাঁধিয়া লও—কোথায়ও গোল হইবে না। নিষ্কামকর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হইয়া অন্তে জ্ঞান প্রেমের অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

[অনুমানের ভেদ—বিবৃতি]

অনুমানের ভেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ ব্যাপ্তির প্রকার ধরিয়া আচার্য্য অনুমানকে বীত ও অবীত এই দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তন্মধ্যে অন্বয়-ব্যাপ্তিমূলে বীত অনুমান ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিমূলে অবীত অনুমান। সাধ্য ও সাধনের সহচার ভাবই ব্যাপ্তি—ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। তখন এ কথাও আলোচিত হইয়াছে যে, এই সহচার ভাব ভূয়োদর্শনের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং একটী ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে সম্বন্ধিদ্বয়ের সহাবস্থিতির একাধিক দৃষ্টান্তস্থল সংগ্রহ করা প্রয়োজন হইতে পারে। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারি, এই সহাবস্থিতির প্রমাণ আমরা দুই আকারে পাইতে পারি—একটী বিধিমুখে, অপরটী প্রতিষেধমুখে। সাধন থাকিলেই সাধ্য আছে—এইরূপ দৃষ্টান্তের ভূয়োদর্শনদ্বারা যে ব্যাপ্তি নিরূপিত হইবে, উহা বিধিমুখী। ইহাই অন্বয়ব্যাপ্তি। ইহা ভাবরূপ। আবার ইহার বিপরীতমুখে অর্থাৎ অভাবরূপেও ব্যাপ্তি নিরূপিত হইতে পারে। যদি দেখি, যেখানে সাধ্য নাই, সেখানে সাধনও নাই—তাহা হইলেও সাধ্য ও সাধনের মাঝে সহচার ভাব অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপ্তি অভাবপ্রত্যয় দ্বারা অনুগৃহীত। ইহাকে বলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি। ফল কথা—যেখানে সাধন আছে, সেইখানেই সাধ্য আছে, এইরূপ নিশ্চয়কে অন্বয়ব্যাপ্তি ও যেখানে সাধ্য নাই, সেখানে সাধনও নাই, এইরূপ বিপরীত নিশ্চয়কে ব্যতিরেকব্যাপ্তি

সিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ ধূম ও অগ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি বলি, যেখানে ধূম (সাধন) আছে, সেখানে সেখানেই অগ্নি (সাধ্য) আছে। যেমন পাকশালা ইত্যাদিতে—তাহা হইলে অন্বয় ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নিরূপিত হইল। আবার এই সত্যেরই সমর্থনকল্পে যদি বলি, যেখানে অগ্নি (সাধ্য) নাই, সেখানে ধূমও (সাধন) নাই, যেমন জলাশয় ইত্যাদিতে—তাহা হইলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নিরূপিত হইল।

*

ইহার পর আচার্য্য অনীত বা শেষবৎ অনুমান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। "শেষবৎ" এই সংজ্ঞায়, শেষ বলিতে কি বুঝিব, তাহাই প্রথমতঃ বিচার্য্য। এই সংজ্ঞাটী ন্যায়দর্শন হইতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রভাষ্যকার বলিতেছেন—"শেষবন্নাম পরিশেষঃ; 'স চ প্রসক্তপ্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়। যথা 'সৎ, অনিত্যম্' ইত্যেবমাদিনা দ্রব্যগুণকর্ম্মণাম্ অবিশেষেণ সামান্যবিশেষ সমবায়েভ্যো নির্ভক্তস্য শব্দস্য, তস্মিন্ দ্রব্য-গুণকর্ম্মসংশয়ে, 'ন দ্রব্যম্—এক দ্রব্যত্বাৎ; ন কর্ম্ম—শব্দান্তরহেতুত্বাৎ; যস্তু শিষ্যতে, সোঽয়ম্' ইতি শব্দস্য গুণত্ব প্রতিপত্তিঃ।"

উল্লিখিত সন্দর্ভে ভাষ্যকার শেষবৎ সংজ্ঞায় শেষ বলিতে কি বুঝায় এবং শেসবৎ অনুমানের উদাহরণই বা কি, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিতেছেন—শেষবৎ অনুমান অর্থে পরিশেষের অনুমান। পরিশেষ বলিতে কি বুঝিব? কোনও একটা বস্তুর স্বরূপ আমরা যথাযথরূপে জানি না। এরূপস্থলে নানা দিক হইতে বিচার করিয়া অনুমানবলেই আমাদিগকে তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে। বিচারের সময় নিশ্চয়ই আমাদিগের বিকল্প উপস্থিত হইবে। তখন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মাঝে আমাদিগের বিচার্য্য বস্তুটী প্রয়োগ করিয়া তাহার লক্ষণ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে গেলেই প্রথমতঃ দেখিব, কতকগুলি লক্ষণ বিচার্য্য বস্তুর উপর মোটেই খাটে না; আবার কতকগুলি খাটে কি না খাটে, তাহা বিশেষ বিচার না করিয়া বলা যায় না। ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি হইবে বিচার্য্য বস্তুতে অপ্রসক্ত; পরের লক্ষণগুলি হইবে প্রসক্ত। যাহারা অপ্রসক্ত, তাহাদিগের সহিত আমাদের কোনও কারবারই নাই। যাহারা প্রসক্ত, তাহাদিগকেই একবার যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে হয়ত প্রায় সকল গুলির সম্বন্ধেই আমরা প্রমাণ পাইলাম যে, বিচার্য্য বস্তুতে তাহাদিগকে আরোপ করা চলে না—সুতরাং তাহাদিগকে বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। কেবল একটী মাত্র লক্ষণ অবশিষ্ট থাকে, যাহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় নাই। এক্ষণে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, নির্দ্দিষ্ট সীমার মাঝে যদি নির্ব্বাচন চলে, এবং স্পষ্টতঃ যাহারা অপ্রসক্ত, তাহারা যদি বাদ যায়; তাহার পর যাহারা প্রসক্ত বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যেও যদি একটী ছাড়া আর সকলগুলিই প্রতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পরিশিষ্ট লক্ষণটীই স্বচ্ছন্দে বিচার্য্য বস্তুতে আরোপিত হইতে পারে। এইরূপে অপ্রসক্তকে বর্জ্জন করিয়া ও প্রসক্তের প্রতিষেধ করিয়া পরিশিষ্টকেই বিশেষ প্রতীতির হেতু বলিয়া গ্রহণ করাই ভাষ্যকারের ভাষায়—শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ।

ভাষ্যকার শব্দের স্বরূপ বিচারকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন এবং বৈশেষিক দর্শনানুযায়ী পদার্থ বিভাগ স্বীকার করিয়া এই সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ বলেন, জগতের যাবতীয় পদার্থকে ছয় ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ। যে কোনও পদার্থই হউক না কেন, তাহাকে এই ছয়টীর একটীর মাঝে পড়িতেই হইবে। এক্ষণে আমাদের বিচার শব্দ লইয়া। এই প্রসঙ্গে পদার্থ ছয়টীর সম্পূর্ণ লক্ষণ আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল যে যে লক্ষণ বিচারের অনুকূল, তাহাদিগকে ধরিয়া দিলেই চলিবে। শব্দ সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, শব্দের সত্তা আছে এবং উহা অনিত্য। শব্দ অনিত্য এবং প্রতিক্ষণে নূতন শব্দের আরম্ভক—ইহা নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত। শব্দের সত্তা আছে—শুধু এইটুকু ধরিয়া ইহাকে ছয়টী পদার্থের তুল্য মূল্য ধরা যাইতে পারে, কেননা উপরি-উক্ত ছয়টী পদার্থই ভাব পদার্থ। এই হইল বিচারের প্রথম কথা। কিন্তু ইহার পরেই আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, শব্দ অনিত্য; অথচ ছয়টী পদার্থের মাঝে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটী পদার্থ নিত্য। সুতরাং শব্দকে ইহাদের সামিল ধরা যাইতে পারে না। শব্দের পক্ষে এই তিনটী অপ্রসক্ত। ইহাদিগকে বাদ দিলে থাকে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম। এখন শব্দ এই তিনটীর কোনটীতে পড়িবে তাহাই বিচার্য্য। শব্দের অনিত্যতা ও সত্তা শুধু এই দুইটী লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে এখানে কোনও সুবিধা হইবে না—কেন না উক্ত লক্ষণ এই তিনটী পদার্থেও থাকিতে পারে।

তাহা হইলে বলিতে পারি, এই তিনটীই তখন শব্দে প্রসক্ত। সুতরাং ইহাদিগের এক একটী লইয়া আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ ধর, দ্রব্যের কথা। প্রশ্ন এই, শব্দ দ্রব্য কি না? দ্রব্য দুইপ্রকার—সাবয়ব ও নিরবয়ব। যাহা সাবয়ব, তাহার একাধিক অবয়ব আছে; উহা বহু অবয়বের সমবায়ে গঠিত, উহা বিভাজ্য। আর যাহা নিরবয়ব, তাহার ভাগকল্পনা তো চলিতেই পারে না। এখন দেখা যাউক, শব্দ এই দুইপ্রকারের কোন্‌টীর অন্তর্গত হইতে পারে। প্রথমতঃই আমাদের অনুভব হয়, শব্দ একটা অখণ্ড বস্তু—ইহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করা চলে না; আধখানা শব্দ, সিকিখানা শব্দ—এরূপ বলা চলে না। সুতরাং শব্দ যে সাবয়ব, তাহা বলিতে পারি না। আবার শব্দ নিরাধার বলিয়াও অনুভব হয় না, সুতরাং তাহাকে নিরবয়বও বলিতে পারি না। তবে মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা হইতে পারে, যে শব্দ অনেকাবয়বও নয়, আবার নিরবয়ব নয়—উহা একাবয়ব, অর্থাৎ উহার সামান্যতঃ আধার আছে, কিন্তু স্বগত ভেদ নাই। কিন্তু তাহা হইলেই শব্দ আর দ্রব্য হইতে পারিল না, কেননা দ্রব্য হয় সাবয়ব অথবা নিরবয়ব হইবে।

তারপর প্রশ্ন এই, শব্দ কর্ম্ম হইতে পারে কি না? বৈসয়িক সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের আরম্ভক হয় না। কিন্তু নৈয়ায়িক শব্দকে অনিত্য বলেন। যাহা অনিত্য, তাহা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং অধিকক্ষণব্যাপী হইতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, পূর্ব্বক্ষণে যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা পরক্ষণে তৎসদৃশ আর একটী উৎপন্নও করিয়াছে, নতুবা ধারা বজায় থাকে না। তাহা হইলে শব্দ শব্দান্তরের

আরম্ভক। কিন্তু শব্দ কর্ম্ম হইলে, কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের আরম্ভক স্বীকার করিতে হয়। ইহা বিরুদ্ধ; সুতরাং শব্দ কর্ম্মও নহে।

এইরূপে শব্দে দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রসক্ত হইয়াছিল। বিচার দ্বারা আমরা তাহার নিরাস করিলাম। ছয়টী পদার্থের মাঝে পাঁচটীই নিরস্ত হইল—বাকী থাকিল গুণ। এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, শব্দ গুণ। ইহাই পরিশেষের উদাহরণ।

*

তারপর যদি প্রশ্ন হয়, শব্দ কাহার গুণ? আমরা বলিলাম, শব্দ পৃথিবীরই আশ্রিত, যেহেতু উহা গুণ। কিন্তু শব্দ অপাকজ বিশেষগুণ। আবার পৃথিবীর বিশেষগুণ গন্ধের সহিত তাহার সামানাধিকরণ্য নাই। সুতরাং তাহাকে পৃথিবীর বিশেষগুণ বলিতে পারি না। এইরূপে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, দিক্, কাল, আত্মা ও মন—এই আটটী দ্রব্যের কোনটীর সঙ্গেই শব্দকে গুণরূপে জুড়িয়া দেওয়া যায় না। নয়টী দ্রব্যের মধ্যে বাকী থাকে এক আকাশ। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়, বা সম্প্রত্যয় হয় যে, শব্দ আকাশেরই গুণ। ইহাই পরিশেষের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

পূর্ব্ববৎ অনুমান সম্বন্ধে আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যাহা বর্ত্তমান অনুমানে সাধ্য, ঠিক তাহার মত বস্তু যদি অন্যত্রও দেখা যায়, তাহা হইলে উহাকে দৃষ্টান্ত ধরিয়া যে সাধ্যের অনুমান হয়, তাহাই পূর্ব্ববৎ অনুমান। যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিব। এখানে বহ্নি সাধ্য, পর্ব্বত পক্ষ। কিন্তু এই বহ্নি কেবল পর্ব্বতেই যে থাকে, তাহা নয়। পাকশালাতেও আমরা বহ্নি দেখিয়াছি, এবং পর্ব্বতে অনুমেয় বহ্নি হইতে উহা যে কোনও অংশেই পৃথক নহে, তাহাও জানি। উভয় বহ্নির মাঝে একটী সাধারণ ধর্ম্ম রহিয়াছে বহ্নিত্ব—উহাই বহ্নির স্বলক্ষণ। এই স্বলক্ষণ বহ্নির আশ্রয় যেমন পর্ব্বতও হইতে পারে, তেমনি পাকশালাও হইতে পারে। ফল কথা, আমাদের অনুমেয় সাধ্য একটী প্রসিদ্ধ বস্তু। প্রসিদ্ধ সাধ্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অনুমাণ বলা যাইতে পারে।

কিন্তু যেখানে সাধ্য প্রসিদ্ধ নয়, সেখানে ব্যাপ্তির প্রকার ধরিয়া হয় সামান্যতোদৃষ্ট, নতুবা শেষবৎ অনুমান হইবে। যদি অন্বয়-ব্যাপ্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হইবে, আর যদি ব্যতিরেকব্যাপ্তিমাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে শেষবৎ অনুমান হইবে। সামান্যতোদৃষ্টের উদাহরণস্বরূপ আচার্য্য ইন্দ্রিয়ানুমানের কথা বলিয়াছেন। অল্প কথায় বলা যাইতে পারে—আমরা ইন্দ্রিয়ের অনুমান এইরূপে করিতে পারি। সমস্ত ক্রিয়ারই করণ আছে—ইহা একক সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত। ইহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই—যেমন ছেদন ক্রিয়া, করণ কুঠার—খনন ক্রিয়া, করণ খনিত্র, ইত্যাদি রূপাদিজ্ঞানও ক্রিয়া, সুতরাং তাহারও করণ আছে। সেই করণকেই বলি ইন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। অর্থাৎ যে সাধ্য অনুমত হইল, তাহা অপ্রসিদ্ধ বস্তু। করণ আমরা অনেক দেখিতে পাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়জাতীয় করণ দেখিতে পাই না। অবশ্য এখানে যোগীদিগের প্রত্যক্ষ ধরা হইতেছে না। যেখানে এইরূপ অন্বয়ব্যাপ্তিমূলক অনুমান বলে অপ্রসিদ্ধ সাধ্যের অনুমান করা হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে।

পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্টের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে। কেহ বলেন, পূর্ব্ব অর্থে কারণ। যেখানে কারণ ধরিয়া কার্য্যের অনুমান হয়, সেখানে পূর্ব্ববৎ অনুমান। যেমন মেঘাড়ম্বরকে হেতু ধরিয়া বৃষ্টি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইল—ইহা পূর্ব্ববৎ অনুমান। শেষ অর্থ কার্য্য। কার্য্য ধরিয়া কারণের অনুমান হইলে শেষবৎ অনুমাণ হইবে। যেমন নদীতে জল বাড়িয়াছে, এই হেতুতে বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইল। যেখানে হেতু ও সাধ্যের মাঝে কার্য্যকারণভাব নাই, সেখানে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান—যেমন পৃথিবীত্বকে হেতু ধরিয়া কোনও পদার্থে দ্রব্যত্ব অনুমান।

এই সমস্ত অনুমানপ্রকার প্রাচীন ন্যায়-কর্ত্তাদিগের অভিমত।

আরণ্যক

—✽—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৩

চেষ্টার সঙ্গে এমন দৃঢ়তা থাকবে—যাতে লক্ষ্যের চিন্তায় মন একেবারে তদাকারকারিত হয়ে যাবে; এ নইলে পতনের ভয় হতে মুক্তি নাই। আদর্শের খাপে মনকে যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না পূরে ফেলা যাবে, সে পর্য্যন্ত যথেচ্ছাচারের পথে সে আকৃষ্ট হবেই। এক-বিন্দু অমল থাকলে একটু খুঁৎ থাকলে সেইটী ধরেই তোমার সমস্ত সত্ত্ব বেরিয়ে যেতে পারে, এই জেনে একটী মুহূর্ত্তের জন্যও দেহকে অসংযত হতে দিও না—মনকে অব্যবস্থিত হতে দিও না। স্থৈর্য্যই শক্তির মূল—এ কথাটী মনে রেখো।

✽

তিনি আমার দেবতা, এ কথা মানি। কিন্তু তা বলে শুধু প্রণাম করে আর পূজা করে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখলেই তো হবে না। তিনি আমার প্রাণের ঠাকুর—তাঁকে আমার প্রাণ হয়ে আমার মাঝে নেমে আসতে হবে—আমার মাঝ দিয়ে তাঁর লীলা জগতে প্রকাশিত হবে—তবেই না আমার আদর্শ সিদ্ধ, সাধনা পূর্ণ! এ নইলে তাঁকে সর্ব্বময় বলে স্বীকার করেছি কেন?

✽

একটা কিছু মনে আনা এক কথা—আর লালসার সঙ্গে উপভোগ করা এক কথা। কুকথা মনে এলেই যে তার দ্বারা আমার ক্ষতি হয়ে গেল, এমন নয়;—কথার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনে লালসা, দেহে উত্তেজনা আসে—তবে আমার ক্ষতি হতে পারে। শুধু মনে আনলেই যদি ক্ষতি হয়ে যেত, তবে মানুষ কোনদিন ভাল হতে পারত না। প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য মনকে একটা সুচিন্তা বা জপে ব্যাপৃত রাখা ভাল। তাতে কুচিন্তা আসবে না। যদিও আসে, তখন

মনকে নির্ব্বিকার রেখে চল্‌তে হবে—"কুচিন্তা করব না" এই সংকল্পও যদি তখন মন থেকে মুছে যায়, তাও ভাল। এমনি করে সঙ্কল্পাতীত ভাবনাদ্বারা ভাল মন্দ উভয় সঙ্কল্পেরই ঊর্দ্ধে মনকে স্থাপন কর্‌তে হবে। তবেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনের যে লালসা, তা দূর হবে, দেহের উত্তেজনাও কমে আস্‌বে। তখন ভাল চিন্তাতেও মনে অভিমানের উচ্ছ্বাস আস্‌বে না,—মন্দ চিন্তার কণ্ডুয়নও ক্রমেই কমে আস্‌বে।

*

গুরু কৃপা করেন অলক্ষ্যে। শুধু তাঁর উপর বিশ্বাস চাই। তিনি যখন যাকে যেদিকে চালিত করেন, সহস্র বাধাবিপদের মাঝেও সেদিকের লক্ষ্যে সে পৌঁছাতে পারে; এই জেনে সর্ব্বদা সেই মহাশক্তির কাছে নত হয়ে থাক্‌তে হবে। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে আর কতটুকু দেখি? হয়ত আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আমি আমার বাধা মনে করছি, সেটাই অপর দিক দিয়ে আমার পক্ষে মুক্তির দ্বার। নিজের বুদ্ধির অভিমানকে সর্ব্বদা তাঁর পায়ে সঁপে দিয়ে চল্‌তে হবে—তবেই তাঁর গৌরব আমরা অনুভব কর্‌তে পারব।

*

মহাশক্তিই তো আমাকে চালিয়ে নিচ্ছেন—তবে আর আমার পথের ভাবনা কি?—আমাকে যে তিনি চালিয়ে নিচ্ছেন, এটুকু বুঝ্‌বার জন্য পথের ভাবনা—নতুবা সে অদৃশ্য শক্তির প্রমাণ কি? তারপর, ভাবনা যদি না করি, তবুও তিনি চালিয়ে নিবেন—তবে সে চলা অজ্ঞাতসারে হবে। সে চলার চেয়ে জেনেশুনে চলায় কি সুখ নাই? তাই আমাকে ভাব্‌তে হয়, ভেবে তাঁর নির্দ্দেশ বুঝ্‌তে হয়, বুঝে চল্‌তে হয়;—এই চলাই পূর্ণভাবে চলা। ভাব-শক্তির সমন্বয় এতেই। তাঁকে শুধু জান্‌লে হয় না—বুঝ্‌তে হয়।

*

স্বভাবের বশে ছুটাছুটী করিতে করিতেই মনে হয়—এই চঞ্চলতার মূলে স্থির একটা কিছু আছে; কাজেই এই ছুটাছুটীরও প্রয়োজন আছে। সত্যের সন্ধান যতক্ষণ না পাইতেছি, ততক্ষণই প্রয়োজনের ছুটাছুটী। সত্যলাভ হইলে প্রয়োজনের কোলাহল আপনা হইতেই শুদ্ধ হইয়া যায়—তখন তার জন্য না ভাবিলেও নীরবে সত্যের কাছে থাকিয়া নতমস্তকে সে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যায়। তাই দেখি, ভগবানের কাছে যে আত্মসমর্পণ করে, তার অভাব বা প্রয়োজন আপনা হইতেই পূর্ণ হইয়া থাকে। তখন সে না চাহিয়াও সবই পায়।

*

তিনি যে পূর্ণস্বরূপ। তাই আমাদের অপূর্ণতার মাঝ দিয়া তাঁর প্রকাশ। আমরা যদি অশক্ত হই, তবেই তিনি আসিয়া কোলে লইতে পারেন; কিন্তু আমরা যতক্ষণ শক্তির অভিমান রাখি, ততক্ষণ তো তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি না করাইলে আমাদের করিবার অধিকার নাই, কিন্তু আমরা না করিলেও তিনি করাইবেন-ই—কেননা পূর্ণ করা তাঁর স্বভাব। যদি মনে কর, যা করাইতেছেন, পূর্ণতার জন্যই—তবেই তো সকল গোল চুকিয়া গেল।

*

ভিতরের দিকে দৃষ্টি খোলেনি বলেই বাইরটা অস্পষ্ট ঠেকছে। কেউ যদি কাউকে ভালবাসে, তার প্রাণ বোঝে—তবে তার

বাইরের কাজ দেখেই মনের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলে। বাইরের সমস্ত হৈচৈএর মাঝে আহার খোঁজ, তাতে আপত্তি নাই—কিন্তু তৃপ্তি খুঁজতে হলে ভিতরে না ঢুকে উপায় নাই। ভোগ করা যায় বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে, কিন্তু তৃপ্তি আসে মনে। তৃপ্তি না থাকলে যেমন ভোগ ব্যর্থ—এ জগতেরও তেমনি ভিতরের জিনিষটাকে না ধরতে পারলে বাইরটা ভাল লাগে না, বোঝাও যায় না, কাজেই ব্যর্থ মনে হয়।

*

আমাদের মন চঞ্চল—তাই আমরা অকৃত্রিম ভাবকে ধরতে পারি না, আনন্দকেও অব্যাহত রাখতে পারি না। সঙ্কল্পে দৃঢ়তা নাই, অথচ তীব্র ফলাকাঙ্ক্ষা আছে—কাজেই কোনও কর্ম্মে পূর্ণতা লাভও হয় না; মতের স্থিরতা নাই—কাজেই মতের ঐক্যও নাই। মতের অনৈক্য যেখানে, সেইখানেই তো বিরোধ; আবার স্থৈর্য্য নাই বলে বিরোধকে সহ্য করবার মত ধৈর্য্যও নাই। ধৈর্য্য-হীনতা বা অক্ষমা যেখানে, অত্যাচারও সেখানে। সব দিকেই আমাদের মাঝে কেবল অসামঞ্জস্য—পূর্ণতার অভাব। এর একমাত্র কারণ মনের অস্থিরতা—পূর্ণতা লাভ করতে হলে এই অস্থিরতা দূর করতে হবে, ভাল-মন্দ সমস্ত ব্যাপারের মাঝে মনকে প্রশান্ত রাখতে হবে।

*

শক্তি আছে, তাই তা প্রকাশ পাচ্ছে। তার মাঝে আমার কৃতিত্ব ভাবনা—সে শুধু কল্পনাতেই খাটে। নতুবা অনুভূতিতে তো তুমি আমি ভেদ নাই—সেখানে হয় সব তুমি, নয় সবই আমি, প্রেমের রাজ্যে দ্বৈত কোথায়? কল্পনার পিছনে এমন করে দৌড়ে বেড়াব কেন? ভাব,—আমি নির্দ্বন্দ্ব, নির্মুক্ত একরস—আমি আবার কার কাছে চাইতে যাব? আমার মাঝেই তো সব—কেননা সবের মাঝেই যে আমি।

*

বৃহৎ কল্পনায় সুখ আছে, তাতে সার্থকতাও আছে—যদি স্বারসিকী অনুভূতিতেই তার পর্য্যবসান হয়। যে কল্পনার দৌড় কল্পনা পর্য্যন্তই, সে কল্পনা আংশিক সুখকর হতে পারে—কিন্তু চরম আনন্দদায়ক নয়। এই কল্পনার সুখে যারা মজে থাকে, তারা চিরদিন "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘুরে মরে পলে পলে"॥ কল্পনা যে করবে না এমন নয়—স্বাধীন হতে হলে কল্পনা চাইই; তবে অনুভূতিতে এবং বাস্তব জীবনে তাকে ফলিয়ে তুলতে হবে, এই যেন লক্ষ্য থাকে।

*

সত্যের সঙ্গে তোমার কোন দ্বৈত নাই, কেননা সত্যই তোমার স্বরূপ; এই অনুভূতি যতদিন না হবে, ততদিন ভুলের মাঝে পিছলিয়ে পড়তেই হবে। সত্য মিথ্যাকে গ্রাস করবে—তুমি যদি তার উৎপত্তিস্থল হও। এই মহান ভাব সর্ব্বদাই চাই—তুমি শুধু সত্য দ্রষ্টা নও, এমন কি তুমি তার অনুভবিতাও নও—তুমি তাই।

*

আবেগ জিনিষটার মূলে যদি একটা ছন্দঃ না থাকত—তবে সেটা যার মাঝে আসত, সে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ত। কিন্তু তা তো হয় না—যার মাঝে তাঁর জন্য নিঃস্বার্থ আবেগ জাগে, তাকেই দেখি সব চেয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ, সবের মাঝেই প্রশান্ত!

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব ভক্ত-সম্মিলনী উপলক্ষে ময়নামতী আশ্রমে ছিলেন। তথায় সম্মিলনীর কার্য্যান্তে তিনি ১৪ই পৌষ সোমবার পুরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পুরীর ঠিকানা—"নীলাচলকুটীর, স্বর্গদ্বার, পুরী।"

দানপ্রাপ্তি

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমে নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র রায় ৩৲, বৰ্দ্ধমানবাসী জনৈক ভদ্রলোক ৫৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস ৫৲।

হালিসহর সারস্বত-আশ্রম

অত্রত্য সারস্বত মঠের শাখাস্বরূপে হালিসহরে (চব্বিশপরগণা) একটী আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। আমরা তাহার একখণ্ড বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

"পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তারকল্পে আসাম প্রদেশস্থ শিবসাগর জেলার অন্তর্গত কোকিলামুখ নামক স্থানে একটী "সারস্বত মঠ" স্থাপন করিয়া তথায় সৎশিক্ষা প্রচারকল্পে ঋষিপ্রদর্শিত পন্থায় একটী ঋষি-বিদ্যালয় (ব্রহ্মচর্য্য স্কুল) ও সাধারণ পাঠাগার এবং দরিদ্র-নারায়ণ সেবার জন্য অনাথনিকেতন ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ প্রারব্ধ কার্য্যের সুপ্রসারের জন্য বঙ্গদেশের পাঁচটী বিভাগে উক্ত সারস্বত মঠের আদর্শে পাঁচটী শাখা আশ্রমও স্থাপিত হইয়াছে। এই পাঁচটী বিভাগীয় শাখা আশ্রমের মধ্যে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত হালিসহরস্থ "সারস্বত আশ্রম" অন্যতম একটি আশ্রম।

"এই সারস্বত আশ্রমে ছাত্রাবাস, পাঠগৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথ নিকেতন, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি ও কৃষি কার্য্যের জন্য জমীর বন্দোবস্ত করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রমটী দেশের উন্নতিকল্পে সর্ব্বকার্য্যোপযোগী করায় পক্ষে অন্যূন দশ হাজার টাকার দরকার।

"অতএব আমরা প্রত্যেক দানশীল স্বধর্ম্মানুরাগী দেশবাসীর নিকট অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের কার্য্যের সহায়তা করেন।

"আমরা অর্থসংগ্রহের জন্য আমাদের সারস্বত আশ্রমের অন্যতম সেবক শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী মহাশয়কে পাঠাইলাম। যিনি যাহা দান করিবেন, প্রেরিত সেবক রসিদ দিয়া তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। নিবেদনমিতি"— বিনীত—

অধ্যাপক শ্রীক্ষেপাদাস ভট্টাচার্য্য
আশ্রম পরিচালক

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়
ঐ সহকারী

উক্ত আশ্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষকগণ—

শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, উকিল
হাওড়া জজকোর্ট।

শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষ এম, এ, বি এল,
উকিল, আলিপুর।

শ্রীযুত নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সাব জজ, আলিপুর।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ইন্‌স্পেক্টর অফ্
ওয়ার্কস্, কলিকাতা কর্পোরেশন।

শ্রীযুত নারায়ণদাস নন্দী বি, ই,
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

শ্রীযুত তারাপদ রায়, জুয়েলার,
মটরকার ইঞ্জিনিয়ার।

—✻—

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } মাঘ { ১০ম সংখ্যা

বিশ্বেদেবাঃ

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৩।৮]

প্র হি ক্রতুং বৃহথো যং বনুথো
রধ্রস্য স্থো যজমানস্য চোদৌ।
ইন্দ্রা সোমা যুবমস্মাঁ অবিষ্টম
অস্মিন্ ভয়স্থে কৃণুতমু লোকম্॥

ন মা তমন্ ন শ্রমন্ নোত তন্দ্রন্
ন বোচাম মা সুনোতেতি সোমম্।
যো মে পৃণাদ্ যো দদদ্ যো নিবোধাদ্
যো মা সুন্বন্তমুপ গোভিরায়ৎ॥

যো নঃ সনুত্য উত বা জিঘত্নুঃ
অভিখ্যায় তং তিগিতেন বিধ্য।
বৃহস্পত আয়ুধৈর্জেষি শত্রূন্
দ্রুহে রীষন্তং পরিধেহি রাজন্॥

তং বঃ শর্দ্ধং মারুতং সুম্নযুর্গিরা
উপব্রুবে নমসা দৈব্যং জনম্।
যথা রয়িং সর্ববীরং নশামহা
অপত্যসাচং শ্রুত্যং দিবে দিবে॥

বাড়াও তাহার কীর্ত্তি, হে দেবতা, ভালবাসো যারে,
হিংসে সদা যজমানে যে অভাগা, দূর কর তারে।
নিরাশ্রয় হের মোরা, ইন্দ্রসোম, দাও গো শরণ—
জ্বালাও জ্ঞানের আলো উজলিয়া ভয়ের গহন।

দুঃখ-গ্লানি-তন্দ্রালসে নিত্যকর্ম্মে নাহি পড়ি ঢলি,
"কিবা হবে অভিষবে"—হেন কথা কভু নাহি বলি।
জানি ইন্দ্রে—জ্ঞাতা তিনি, দাতা তিনি – বাঁধা প্রীতিডোরে—
করে যবে সোমরস, প্রজ্ঞালোক দেন তিনি মোরে।

লুকায়ে শত্রুতা সাধে যত সব হিংস্রুকের দল,
বাহিরে টানিয়া আন ;—তীক্ষ্ণশরে বিঁধ মর্ম্মস্থল।
লও অস্ত্র, বৃহস্পতি, শত্রুজয় কর মহারাজ—
বিদ্রোহীরে বেড়ি আজি রুদ্ররোষে হান শিরে বাজ।

সুখকামী মোরা তাই মরুতের বীর্য্যগাথা গাহি—
ঢালিয়া প্রাণের নতি মর্ত্তে তার দেবজন্ম চাহি।
চাহি ঋদ্ধি – বীর্য্যে যাহা কারো কাছে নহে কভু হীন –
কুলের গৌরব সাথে কীর্ত্তি যার দীপ্ত দিনে-দিন॥

সনাতন ধর্ম্ম

—✻—

কোথায় থাকিলে ধর্ম্ম হইবে, আর কোথায় থাকিলে হইবে না—এ সম্বন্ধে আমরা বেশ একটা মীমাংসা করিয়া লইয়াছি। ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে সংসারত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় নাই; তা সংসার যখন ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তখন ধর্ম্মের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন?—এই হইল এক যুক্তি। ইহা হইতে আর এক পা অগ্রসর হইয়া কাহাকেও একথাও বলিতে শুনি—সংসারে থাকিতে গেলে এত ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া থাকা যায় না; একটু-আধটু অধর্ম্মের আশ্রয় না লইলে সংসার চলে না।

এই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমাদের সমাজ দিন দিন অধোগতির পথে চলিয়াছে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা সংসারী সমস্ত সমাজেই সংখ্যায় অধিক এবং ইহাঁরাই লোকস্থিতির আশ্রয়। কিন্তু জীবনযাপনের প্রণালী অনুযায়ী মানুষকে সংসারী আর সন্ন্যাসী এই দুই দলে ভাগ করিলেও ধর্ম্মের বেলায় কিন্তু এমন ভাগাভাগি করা চলে না। ধর্ম্ম তুল্যভাবে সকলেরই আশ্রয়। আত্মহিত ও জগদ্ধিত সকলেরই ধর্ম্মের ভিত্তি। সমস্ত ধর্ম্মেই কতকগুলি মূল নীতি আছে; সম্প্রদায়ভেদে, অবস্থাভেদে, বা দেশকালভেদে যাহাদের কখনও বিপর্য্যয় হয় না। এই সমস্ত নীতির সমষ্টিকেই বলি সনাতন ধর্ম্ম। ইহা কাহারও উদ্ভাবিত নহে বা কোনও পুরুষের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। মানুষের হৃদয়ে অনাদিকাল হইতে এই ধর্ম্মের স্ফুরণ হইয়া আসিতেছে। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে হইলে এই ধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে চলিতেই হইবে।

এই সনাতন ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। যখন ইহাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলি, তখন এই কথাই বুঝাইতে চাই যে হিন্দুনামধারী বিশিষ্ট এক মানবজাতি এই সনাতন ধর্ম্মের দ্রষ্টা। নিউটন যেমন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া ফলিত বিজ্ঞানে তাহার প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন, হিন্দুজাতিও তেমনই এই মানবহৃদয়ের এই সনাতন ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিয়া নিজের জীবনে তাহা ফলাইয়া তুলিয়াছিল এবং এই ভিত্তির উপরই আশ্রম, বর্ণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। হিন্দুর আশ্রম ধর্ম্মের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি, এই সনাতন ধর্ম্মের মূল নীতিগুলি কিরূপে তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল এবং কিরূপে একই সত্যের অনুশাসনে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া একটা বিরাট জাতি সংহত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিয়াছিল। আজ আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুজাতির ভিতর হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে, এবং ইহার অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ হিন্দুরও দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। এই সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিয়া ব্যক্তিগতজীবনে ইহাকে ফলাইয়া তুলিয়া আগে আশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে কোনও জাতীয় সমস্যারই মীমাংসা হইবে না।

স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে মানবজাতির সনাতনধর্ম্ম হইতেছে মোক্ষলাভ করা। অবশ্য আজকালকার উন্নত বিজ্ঞানের যুগে এখন

কথা বলিলে গালি খাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু কথা এই যে, মোক্ষ বলিতে যে কি বুঝিব, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও সুস্পষ্ট ধারনাই নাই। আমরা মনে করি, মোক্ষ যেন আমাদের ঘরের কোণে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, যখন তখন তাহার নাম করিলেই ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে, এবং সংসারটা ছারখার করিয়া দিবে। এদিকে উন্নতি উন্নতি বলিয়া আমরা চীৎকার করিতে কসুর করি না—জগতের যেখানে যত অনুন্নত আছে, সকলকে টানিয়া রাতারাতি উন্নতির কল্পশিখরে চড়াইয়া দিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। কিন্তু বাস্তবিক মানবজাতির উন্নতি যদি বৈজ্ঞানিক ভাবেই অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার চরম ফলটা কি দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া দেখি কি? আজকাল আবার উন্নতি হইলেই চলে না—"অনন্ত" উন্নতি চাই। কিন্তু এই কল্পনাসুখকর পদার্থটী যদি বাস্তব হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সংসারের দশাটা কি হইবে, তাহা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভাবিয়া দেখেন কি? নব্যযুগে মানবাত্মার অনন্ত উন্নতির কামনায় কোনও দোষ হয় না, গোল হয় কেবল এই মোক্ষকথাটা লইয়া।

থাক্ সে কথা। বর্ত্তমান অবস্থায় অতৃপ্তি এবং উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, এই যদি মানুষের অন্যান্য প্রাণী হইতে বৈশিষ্ট্যের কারণ হয়, তাহা হইলে ইহার অপরিহার্য্য কারণ হইবে মোক্ষ। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এই জগৎটাই পর্য্যাপ্ত, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না। তারপর এই জগতে যে সমস্ত জড় ভোগ্য বস্তু দেখিতে পাইতেছি, তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করাও কোনও দিন মানুষের সাধ্য হইবে না। শুধু যে মানুষের শক্তিতে কুলাইবে না, তাহাই নয়, মানুষের প্রকৃতিই ইহা চাহিবে না। যে যত বড় ভোগীই হউক না কেন, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক কারণে তাহার ভোগে বাধা উপস্থিত হইবেই—আধিদৈবিক বাধার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। মানুষের দেহ ও মন অনবচ্ছিন্ন জড় ভোগের নিতান্ত প্রতিকূল—এ কথা নিজের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি জড়ের ভোগে তৃপ্তি না হয়, জীবনের চরম সার্থকতা না ঘটে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া জড় ভোগের মায়া একদিন কাটাইতেই হইবে। অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে বাধ্য হইয়া মানুষকে একদিন সংসার বিরাগী হইয়া মোক্ষান্বেষী হইতে হইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি—পাই আর না পাই, মোক্ষ খোঁজাই আমাদের চরম নিয়তি।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, মোক্ষলাভ মানবজাতির সনাতন ধর্ম্ম। এখন আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই করিতে হইবে। তবে এখানে আর একটা কথা বাকী। মোক্ষ অনুসন্ধেয় বটে, কিন্তু উহা মিলিবে কি না, সে সম্বন্ধে একটা মীমাংসা চাই। এ বিষয়ে হিন্দুজাতি এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। মোক্ষ কিরূপ অবস্থা, উহা মিলে কি না এ বিষয় নিয়া যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু হিন্দুজাতি এই তর্ককে একেবারেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াছে বেশী। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—অবিশ্বাসীর প্রতি ইহাই challenge. আপ্তবাক্যের প্রমাণ যদি আমরা তৃতীয়পক্ষ হইয়া উপস্থিত করিতে যাইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আপ্তব্যক্তি যদি

স্বয়ং আসিয়া তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ হয় না। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভগবানসম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্কে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর সংশয় মিটিল না। তর্কবিতর্ক উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি ভগবান দেখিয়াছেন ?" রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "হাঁ দেখিয়াছি—তোমাকে যেমন দেখিতেছি, তাহার চেয়েও স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি।" বিবেকানন্দ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি আমাকে দেখাইতে পারেন ?" উত্তর হইল, "হাঁ, নিশ্চয়ই পারি।" ভগবদ্দর্শনসম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উক্তি হইল, আপ্তবাক্য। আমরা যাহারা প্রকৃত জিজ্ঞাসু নহি, তাহারা যদি এই কথা শুনিয়াই মানিয়া লই, তাহা হইলে আমরা হইলাম তৃতীয়পক্ষ। তৃতীয়পক্ষের সাক্ষ্যে আপ্তবাক্যকে তেমন বলবৎ প্রমাণ বলিয়া না-ও মানিতে পারি। কিন্তু আপ্তব্যক্তি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্তি করিলেন এবং তাঁহার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে জিজ্ঞাসুকে আহ্বান করিলেন, সেখানে আপ্তবাক্য তো শুধু একটা কথার কথা নয়—উহা সুস্পষ্ট challenge. হিন্দু বলে, মোক্ষ সম্বন্ধে এইরূপ challenge করিবার লোকের অভাব নাই; ইঁহারাই গুরু। ইঁহাদের কথা মানিতেই হয়—শুধু যে শুনিয়া মানিতে হয়, তাহা নহে, দেখিয়া মানিতে হয়। কাজেই মোক্ষসম্বন্ধে আপ্তবাক্যই প্রমাণ।

মোক্ষলাভ মানবজাতির সনাতনধর্ম্ম হইলেও মোক্ষ যে সকলের হাতের কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে, এমন নয়। তবে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানে সকলেই একদিন মোক্ষের অধিকারী হইবে। যদি এই কথা জানা থাকে, এবং ইহাও অনুভব করি যে মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য অন্ততঃ কতকপরিমাণে বজায় আছে, তাহা হইলে প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট কালটা যাহাতে সংক্ষেপ হয়, সে বিষয়ে সকলেই আগ্রহান্বিত হইবে। যদি বল, মোক্ষের স্বরূপ না বুঝিলে তাহার প্রতি আগ্রহ হইবে কেন ? যদি মোক্ষ একটা অন্ধকারের রাজ্য হয় ? তাহা হইলে কে তাড়াতাড়ি ভবের খেলা সাঙ্গ করিতে চাহিবে ? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। বলিয়াছি, উপস্থিতভোগে আমাদের তৃপ্তি হয় না—এই দেহ মনের সীমা আমরা ছাড়াইয়া যাইতে স্বতঃই ব্যগ্র। এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যগ্রতাই তো মুমুক্ষুত্ব। তবে দেহমন ছাড়াইয়া গেলে কি অবস্থায় পৌঁছিব, তাহা আন্দাজ করিয়া বলিলে কোনও লাভ নাই সে অবস্থার সাক্ষাৎদর্শী যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহার কাছেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আবার আপ্তবাক্যের শরণ লইতে হইবে। অবশ্য আপ্তবাক্য অনুকূল, কেননা আপ্তেরাই মোক্ষপথের নির্দ্দেশক।

এই লক্ষ্যের উপর হিন্দু সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই হিন্দুর পরিভাষায় যাহা মোক্ষের অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম। আমাদের কায়িক মানসিক সমস্ত চেষ্টাই, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, একই লক্ষ্যকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এইটুকু স্মরণ রাখিলেই কর্ম্মকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করিতে পারিব। দূরদৃষ্টি নাই বলিয়া বুদ্ধির দোষে আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি, যাহা আপাত মনোরম, তাহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। এই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রেয়ের পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবার জন্যই ধর্ম্মসম্মত সমাজ ব্যবস্থা। একমাত্র হিন্দুই বলিয়াছে—তোমার জীবনের

সমস্ত চেষ্টাই ধর্ম্ম। তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া যাগযজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপন লইয়াই থাক, রাজা হইয়া রাষ্ট্রনীতি লইয়াই থাক, বৈশ্য হইয়া কৃষি-বানিজ্য লইয়াই থাক, আর শূদ্র হইয়া পরিচর্য্যা লইয়াই থাক, জানিও তোমার সমস্ত কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্ম জড়িত। ধর্ম্ম মোক্ষানুকূল, অতএব তাহা তোমার স্বভাবের অনুকূল। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যখন কাজ কর, তখন কাজের মাঝে ছোট বড় কিছুই নাই—স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম্মাশ্রিত কার্য্য করিয়া সকলেই সনাতনপথে মোক্ষপথে অগ্রসর হইতেছে। এই উদার সামঞ্জস্যের উপরই হিন্দুর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

একদিন বাধ্য হইয়া সকল ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই সত্য জানা আছে বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম কখনও ভোগের প্রশ্রয় দিতে পারে না। সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগের ধর্ম্ম। তবে সহসা ত্যাগ হয় না; কিম্বা জোর করিয়া সমস্ত ছাড়িয়া বসিয়া থাকাটাও ত্যাগ নয়। ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহা জানি; কিন্তু এখনও ছাড়ার সময় উপস্থিত হয় নাই। ততদিন এই জগৎটা লইয়া কারবার করিতে হইবে। এই অবস্থায় কি করিব? সনাতনধর্ম্ম বলিতেছে, কর্ম্ম কর; কেননা কর্ম্ম করা তোমার স্বভাব। তোমার মাঝে গুণের ক্রিয়া হইতেছে, হইবেই। কোনও মতলববশতঃ কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাহিলেও পারিবে না। গুণ তোমাকে অবশ করিয়া কাজ করাইয়া লইবে। কাজেই কর্ম্ম কর। কর্ম্মও যেমন তোমার স্বভাব, মোক্ষও তেমনি তোমার লক্ষ্য। সুতরাং উহাও স্বভাব তবে এই দুইয়ে সামঞ্জস্য হইবে কি করিয়া? —মোক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মে আসক্তি রাখিও না। আসক্তিতে শান্তি পাইবে না—জড় জগতের কোনও আসক্তির বস্তুই চিরস্থায়ী হইবে না। কর্ম্মের ফল চাহিও না, কেননা ফল তোমার আয়ত্ত নয়। কর্ম্ম দ্বারা ভোগসঞ্চয় করিও না—ভোগে পিপাসা মিটিবে না। কাজেই অনাসক্ত হইয়া —ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম কর। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মও সনাতন ধর্ম্ম।

সংসার এই কর্ম্মক্ষেত্র। সংসারকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। যতদিন গুণের অধীন রহিয়াছ, ততদিন ঘরেই থাক, আর বনেই যাও, সংসার পিছনে পিছনে যাইবে। আর বনেও যখন সংসার পিছু পিছু যাইবে, তখন কর্ম্ম না করিয়া বসিয়া থাকিতে তো পারিবে না। বনে গেলেই কর্ম্মের এলাকা ছাড়াইয়া ফাঁকা ধর্ম্মের এলাকায় পড়িবে না। আবার সংসারে থাকিলেই যে ধর্ম্মের এলাকা ছাড়িয়া কর্ম্মের এলাকায় পড়িয়া গেলে— এমন কথা নয়। যেখানে কর্ম্ম, সেখানেই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ছাড়িয়া কর্ম্ম করিলে কোনও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। আর স্বভাব ছাড়িয়া অভাবে পড়িলে কাঁদিতেই হইবে —ইহা ধ্রুব সত্য।

তাই বলি, যে অবস্থায়ই থাকনা কেন, মোক্ষই একমাত্র লক্ষ্য—ইহা স্মরণ রাখিও। মোক্ষানুকূল কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলেই মোক্ষানুকূল হইয়া থাকে। ভোগবাসনা মোক্ষের বিরোধী। মোক্ষচেষ্টা মানুষের স্বাভাবিক। যত শীঘ্র সম্ভব অভাব মিটাইয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই ভগবান মানুষকে একটু ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন। মোক্ষানুকূল নিষ্কাম কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম দ্বারা এই স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করা উচিত। ইহাই মানবজাতির সনাতন ধর্ম্ম। ঘরে থাক, আর বনে থাক—সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

ভাবের অঙ্কুর

—*—

[আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীমৎ রূপগোস্বামীসূচিত ভাবাঙ্কুরসমূহের মধ্যে—ক্ষান্তি ও অব্যর্থকালত্ব এই দুইটীর আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর অবশিষ্ট ভাবাঙ্কুর-সমূহের আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপন করিব। মনে রাখিতে হইবে, সর্ব্বত্রই ভাবাঙ্কুরকে আমরা সিদ্ধ সম্পদরূপে গ্রহণ না করিয়া সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য এই, এইরূপ আলোচনা দ্বারা আমাদের মত অকিঞ্চনেরও ভক্তিসাধনায় আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। পূর্ব্বপ্রবন্ধে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের আলোচনা কালে আমরা এই কথায় ইঙ্গিত করিয়াছি।

(বিরক্তি)

ভাবের অঙ্কুর যাঁহার হৃদয়ে উদ্গত হইয়াছে, তাঁহার বিষয়ে বিরক্তি জন্মিবে। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, "ভুক্তিসিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভয়।" ইহাই ভাবুকের লক্ষণ।

বিষয়ে সুখ আছে, মত্ততা আছে—ইহা কেহ অস্বীকার করিবে না। জীব আনন্দস্বরূপ, সুতরাং সুখ আস্বাদন করিবার জন্য স্বাভাবিক লোলুপতা থাকিবেই। এইজন্য বিষয় হইতে সুখভোগের আশায় জীব যদি বিষয়সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কেননা "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্।" কিন্তু তথাপি মহাজনেরা বলিতেছেন, "নিবৃত্তিস্ত মহাফলা"—এবং জীবকে নিবৃত্তিরপথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রবৃত্তির পথে কাঁটা দিতেছেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝিব, নিবৃত্তির সুখ অনির্দ্দেশ্য, প্রবৃত্তির সুখ আশুলভ্য ও নিশ্চিত; সুতরাং নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিতের পেছনে ছুটিব কেন? এইখানেই নাস্তিকতার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাকে নির্জ্জীব করিতে হইলে বিচারশক্তিকে প্রবুদ্ধ করা প্রয়োজন।

বিচারের কথা শুনিয়া ভয় পাইবার কোনও প্রয়োজন নাই; বিচার আমরা সকলেই করি—শুধু কথায় করি না, কাজে করি। জীবনে অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হইতেছে, চিত্তে কত আঘাত লাগিতেছে। সকলের বেদনাই কি মুছিয়া যায়? অতীত হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য সকলের সঞ্চিত করিয়া রাখি এবং তদনুযায়ী ভবিষ্যতের পথযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করি। ইহাকেই বলি বিচার। ইহা শুধু একস্থানে বসিয়া তর্ক করা নয়—অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া তবে আমরা এই বিচার করিতে শিখি।

মানবজীবনের এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা প্রবৃত্তিপথের অসারতার প্রমাণ পাই। বিষয়ে দোষদর্শন করিতে না পারিলে উহাতে বিরক্তি আসিবে না। এই দোষগুলি যে কেবল পুঁথিপত্রেই লেখা আছে, তাহা নয়; বিষয়সঙ্গ করিতে করিতেও তাহার দোষ দেখিতে পাইয়াছি, ক্ষণিক বিরক্তিও আসিয়াছে; কিন্তু মোহের প্রলোভনে মজিয়া আবার সেইপথেই ছুটিয়া চলিয়াছি। বিষয়সঙ্গে আনন্দ আছে স্বীকার করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাইতেছি এই আনন্দ নিরপেক্ষ বা নিরঙ্কুশ নয়। প্রথমতঃ বিষয়ের ধর্ম্ম এই আনন্দের উপর কর্ত্তাইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ আমার গ্রহণ

করিবার শক্তি ও ধারা অনুযায়ী আনন্দেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ দেখিতেছি, বিষয় নশ্বর; বিষয় চঞ্চল; বিষয়প্রাপ্তি অনিশ্চিত। আবার বিষয়সঙ্গে যদিচ আমার সুখ হয়, তথাপি এই সমস্ত দোষের দরুণ সে সুখ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তারপর আমারদিক হইতেও বাধা আছে। বিষয়কে আমি গ্রহণ করি, দেহদ্বারা, ইন্দ্রিয়দ্বারা, মনদ্বারা বা বুদ্ধিদ্বারা। এই সমস্ত করণের একটীও নিত্য নয়, স্থির নয়, নিশ্চিতক্রিয় নয়। সুতরাং করণের দোষেও আনন্দের বিকৃতি ঘটে। এইরূপে বিষয় ও করণের দোষে আমাদের সংসারসুখ নিরন্তর খণ্ডিত হইতেছে, আমরা অখণ্ডতৃপ্তি কোথায়ও পাইতেছি না—বিষয়সুখে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও চিত্তের হাহাকার কখনও ঘুচিতেছে না। প্রবৃত্তির এই জ্বালাময় সুখের অভিজ্ঞতা বহুদর্শীর জীবনে সঞ্চিত আছে—ইহার দহনে অতিষ্ঠ হইয়া সে চায় মুক্তি—সে চায় অনন্ত-প্রেমের শীতল প্রস্রবণ।

কোথায় প্রেম? কোথায় মুক্তি? কোথায় আনন্দ?—বিষয় বিরক্তিতে—দেহেন্দ্রিয় মন-বুদ্ধির চরম প্রশান্তিতে। বিষয়ী এ কথা শুনিয়া ভয় পায়। বিষয়ই যদি ছাড়িলাম, ইন্দ্রিয়মনকে যদি জবাব দিলাম, তবে আনন্দকে ধারণা করিব কোন্ আধারে?—এইখানেই বলি, দর্শন ছাড়িয়া সম্যক্‌দর্শন করিতে শিখ। বিষয় বা ইন্দ্রিয় আনন্দের হেতু নয়—আনন্দের হেতু রসরাজের রসবিলাস। প্রাকৃত দেহমনবুদ্ধির অতীতরাজ্যে নিত্যানন্দের অমৃতপ্রস্রবণ—সেইখান হইতে আনন্দের ধারা ঝলকে ঝলকে এই মর্ত্ত্যজগতে নামিয়া আসিতেছে, বিষয়কে ইন্দ্রিয়কে, সুধাসারে অভিষিক্ত করিতেছে। তোমাকে উজান বাহিয়া সেই আদি প্রস্রবণে পৌঁছাইতে হইবে—বিষয় বর্জ্জন করিতে হইবে ইন্দ্রিয়ের চাপল্য রোধ করিতে হইবে। আনন্দের বিলাস যদি করিতে চাও, তবে এই প্রাকৃত তনুমনের মমতা ছাড়িতেই হইবে, অপ্রাকৃত চিন্ময় দিব্যদেহে বিভূষিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রাকৃত দেহ-মনের ভোগকে সম্পূর্ণ নিরসন করিতেই হইবে—বিষয় ভোগের বাসনা, এই মর্ত্ত্যজগতের স্মৃতি ও সংস্কার বিন্দুমাত্র থাকিলেও চলিবে না। চিরকিশোর কিশোরীর নিত্যলীলা অনুভব করিতে হইলে এই প্রাকৃত দেহমনের আধারে প্রাকৃত কামলীলার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে হইবে। এই জন্য জ্ঞানের পথে বৈরাগ্য এত প্রয়োজন। বৈরাগ্য শুধু জ্ঞানীর শুষ্কসাধনা নয়। বিষয়রস না মরিলে প্রেমের আগুণও জ্বলে না।

এইরূপ ভাবুক বৈরাগীর উদাহরণস্বরূপ কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ ভরতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভরতের কথায় বলিতেছেন—(শ্রীমদ্ভাগবত, ৫, ১৪, ৪২,)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥

স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবের মমতা, রাজ্যের লালসা একেবারে হৃদয়েরঃ অন্তস্থল স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে ছাড়িয়া আসা কি সহজ কথা? বিশেষতঃ মহারাজ ভরত তরুণ যুবক মাত্র। কিন্তু তথাপি শ্রীহরির প্রতি তাঁহার লালসা এত প্রবল হইল যে এই সমস্ত বিষয় সম্পদ্ বিষ্ঠাতুল্য হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করিলেন।

একটী কথা—"জহৌ যুবৈব"—মহারাজ ভরত যৌবনেই ত্যাগ করিলেন। যদি ভগবানের জন্য ত্যাগ করিতে হয়, তবে

যৌবনই প্রশস্ত সময়। বাসিফুলে পূজা হয় না। যৌবনভরা কামকাঞ্চনের মজা লুটিয়া বৃদ্ধবয়সে শিথিলইন্দ্রিয় আর শুক্‌নো কয়খানি হাড় ভগবানকে নিবেদন করা—এ কি লজ্জার কথা! দিবে তো দাও—নবীন যৌবনের সরস সম্পদ্ তাঁর পায়ে লুটাইয়া দাও।

(মানশূন্যতা)

মানশূন্যতা চতুর্থ ভাবাঙ্কুর। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ইহার লক্ষণ বলিতেছেন—"সর্ব্বোত্তম আপনারে হীন করি মানে।"

প্রেমের পথ সাম্যের পথ। শ্রুতি বলিতেছেন, চরম অবস্থায় মানুষ "পরমসাম্যমুপৈতি"—পরম সাম্য লাভ করে। এই পরম জ্ঞানেরও লক্ষণ বটে, প্রেমেরও লক্ষণ বটে। তোমাতে আমাতে বৈষম্য থাকিলে ভালবাসা হয় না। অনেকে এক দর্শন—এই বলি জ্ঞান। বৈষম্যে সাম্যের রসময় অনুভূতি—এই বলি প্রেম। জগতে যদি কেবলই বৈষম্য দেখি, যদি ভাবি, এ আমার শত্রু, ও আমার মিত্র, এ ছোট, ও বড়—তাহা হইলে মিলিব কাহার সঙ্গে? যখন অপরের মাঝে বৈষম্য দেখি, তখন বাস্তবিক বৈষম্য ঘটে কিন্তু আমার সঙ্গেই। আমার মনের মাঝেই শত্রু-মিত্রের ভেদ, ছোট-বড়র ভেদ, তাই বাহিরেও তাই দেখিতে পাই। বাহিরে যখন এইরূপ ভেদ দেখি, তখন ভিতরে ভিতরে গণ্ডী আঁকিয়া আমাকেও জগৎ হইতে পৃথক করিয়া ফেলি। এইরূপে অভিমানের সৃষ্টি হয়। অভিমান আমার স্বরূপ দেখিতে দেয় না—নানা সংঘাত ও আবর্ত্তে পড়িয়া যে সংস্কারগুলি আমার স্বরূপে আরোপিত হইয়াছে, তাহাই আমার পরিচয় বলিয়া প্রকাশ করে।

জগতে যে ভেদ আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। মূলে এক আর স্থূলে অনন্ত বৈচিত্র্য—ইহাই তো লীলা; আর লীলা চিরসুন্দর। কিন্তু সুন্দরের সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ করিতে না পারিলে সৌন্দর্য্যের অনুভব হয় না। মিশিব কাহার সঙ্গে? খণ্ডের সঙ্গে নয়—অখণ্ডের সঙ্গে। খণ্ড তো হইয়াই আছি। এখন একটা গণ্ডী ছাড়াইয়া আর একটা গণ্ডীতে ঢুকিয়া কি লাভ হইবে? তাই যথার্থ মুক্তি অখণ্ডের মাঝে আত্মসমর্পণে। অথবা—একই কথা—খণ্ডতা অভিমানের পরিহারে। মানশূন্যতার এই হইল নিদান। এখন আনে ভাবে ইহার বিশেষ অভিব্যক্তি হইবে।

জগৎ আমার প্রিয়তমেরই রূপ—ইহ ভাবুকের কথা। স্বতঃ বৈচিত্র্য আছে বলিয়া তাহার মাঝে ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আমার দিক হইতে ভেদের কোনও নিমিত্ত আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার সবটুকু সেই প্রিয়তমকেই সঁপিয়া দিয়াছি, আমার বলিতে কিছুই বাকী রাখি নাই, কোনও বস্তুকেই অভিমানের দাগে দাগিয়া রাখি নাই। কাহাকে ধরিয়া আমি-আমার ভেদের সৃষ্টি হয়? হয়ত তাহা এই দেহ বা মন বা গৌরববুদ্ধি। কিন্তু গোবিন্দের পায়ে এই সমস্তই যে লুটাইয়া দিল, সে জগতের কোথায়? সে জগতের কোথায়ও নাই—দেহ-মন বুদ্ধির অতীত চিন্ময় লোকে সে। অভিমানের পরকলা যখন খসিয়া পড়িয়াছে, তখনই জগতের দিকে চাহিয়া তাহার যথার্থ রূপটী দেখিবার শক্তি লাভ হইয়াছে। এই যে অনন্ত বৈচিত্র্যে বিলসিৎ এ জগৎ—এ তো সেই চিরসুন্দরেরই রূপের মাধুরী। তখন, "যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ তাহাঁ কৃষ্ণ

পুষ্টতা—এ শুধু সংস্কারে আবিল মন বুদ্ধির ফুরণ নয়—এ আত্মার আনন্দ জ্যোতির প্রকাশ। সে প্রকাশে জগতের সবই আপন—কেন না সবই যে সে!

মহাজনেরা বলেন, তাহে চিত্ত মসৃণ হয়। মসৃণতা মাধুর্য্যেরই পরিচায়ক। আবার যাহা মসৃণ হয়, তাহা উজ্জ্বলও হয়। তখন ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশে অপর বস্তুর প্রতিবিম্ব ধারণা করার ক্ষমতাও তাহার জন্মে। যাদুময় দর্পণ তাহার উদাহরণস্থল। চিত্ত অভিমান-শূন্য হইলে, এইরূপ মসৃণ হয়—বিশ্বের সকল ছবির প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়ে—আমার মাঝেই সকলকে এবং সকলের সঙ্গে আমার সেই মনোচোরকে তখন পাই।

শুধু নিষ্ক্রিয় ভাবে পাওয়া তো নয়—নিরভিমান যে আবার সেবায় ফুটিয়া উঠে। সেবা সহজ ধর্ম; অভিমান আর নিরভিমানের লীলা আর নিত্যের অপরূপ সম্বন্ধ। আমার সব হারাইয়া অতল রূপসাগরে তলাইয়া গেলাম—এ কাহার না কাম্য হইতে পারে? কিন্তু কোথা হইতে আবার জগতের সঙ্গে বিলাস করিবার বাসনা যেন আসিয়া উঠে। তখন আবার দেহ মন বুদ্ধির উপর অভিমানের ছায়াপাত হয়। কিন্তু এ অভিমান বিরোধের নয়, স্পর্দ্ধার নয়—প্রেমের। আমি দেহ চাই, মন চাই, প্রাণ চাই—কেন চাই? এই দেহ মন প্রাণ দিয়া তাঁহারই সেবা করিব বলিয়া। আমার জন্য দেহ নয়, আমার জন্য মন নয়—প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দেহমনের আশ্রয় যেখানে ভাঙ্গি তাহার পায়ে ঢালিয়া দিতেছি—দেহ মনের এই নিরন্তর উৎসর্গের আনন্দ কত মধুর, কত সুন্দর। তখন বলি, হে বিশ্বরূপ, আমার এই সুখের খেলায়, এই অফুরন্ত জীবনের লীলায় যেন কখনও অবসান না হয়। তুমি আমাকে অনন্ত যৌবনের, অনন্ত প্রাণের, অনন্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারী কর আর অনন্ত কাল ধরিয়া তাহা আমি তোমার পায়ে ঢালিয়া দিই। এমনি করিয়া চিরকাল আমার অভিমানের নিরসন হইতে থাকুক—কখনও যেন তাহার পরিসমাপ্তি না ঘটে। একেবারে নিরভিমানের অটল প্রশান্তিতে যেন ডুবিয়া না যাই—অনন্ত সেবার অধিকারে ক্ষণেক্ষণে অভিমান-নিরসনের লীলা চিরকাল ধরিয়া চিত্তবেলায় সুখের লহর কাঁপাইয়া তুলিতেছে—এই যেন আমার নিয়তি হয়!

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী আবার মহারাজ ভরতকে মানশূন্যতার উদাহরণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে আছে—

> হন্তৌ ষতিং বহন্তেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
> ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

—মহারাজ ভরত ঐশ্বর্য্যে সকল রাজার মাথার মণি। কিন্তু আজ তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখ, কোথায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভিমান? মহারাজ যে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতেছেন। সামান্য আহার-সংগ্রহও যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে না, তিনি আজ তাহাই দেখাইতেছেন। আবার দেখ, তিনি ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন, শত্রুপুরীতে। তিনি রাজা, ক্ষত্রিয়—শত্রু-নিগ্রহ রাজোচিত স্পর্দ্ধা, এ তাঁহার পক্ষে অশোভন হইত না। কিন্তু আজ তাঁহার চিত্তে শত্রুমিত্রের ভেদ নাই। সমস্ত রাজগর্ব্ব লুটাইয়া দিয়া শত্রুপুরীতে ভিক্ষাচরণ করিতেও তাঁহার মানের লাঘব হয় না। আবার চাহিয়া দেখ, মহারাজ পথে যাহাকে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই প্রণাম করিতেছেন। সকলের মাঝেই শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাই সকলের প[illegible]

অস্পৃশ্য চণ্ডালও তাঁহার কাছে পারাপার— তাই তাহাকেও তিনি বন্দনা করিতেছেন। আজ মহারাজের আভিজাত্যের অভিমান কোথায় গেল?

কি করিয়া এমন অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল?—ইহাই শুধু বক্তব্য—মহারাজের শ্রীহরিতে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। তাই তাঁহার এই ভাব-বিহ্বলতা—এই নিরভিমান, অকিঞ্চন দৈন্য!!

(ক্রমশঃ)

পশুবলি

শাস্ত্রে বলে, আহার নিদ্রা মৈথুন পশুর বৃত্তি। মানুষের মাঝে পশুত্ব আর মনুষ্যত্ব অজাঙ্গী হয়ে আছে। পশুত্ব ছাড়িয়ে মনুষ্যত্বে ওঠাই হল সাধনার প্রথম সোপান। তাই সাধনার গোড়াতেই প্রয়োজন হয়— পশুবৃত্তিগুলিকে জয় করা। যে পথেই চলি না কেন, এ কাজটি আগে করতেই হবে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা একটু-আধটু আছে— তাই তার কাল হয়েছে। নইলে আজ যাকে পাশববৃত্তি বলে গাল দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো পশুর মাঝে কিন্তু বাস্তবিক নিয়ন্ত্রিত হয়েই দেখা দেয়, কেবল মানুষই তার আতিশয্যের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। দেহ-সর্ব্বস্ব পশু দেহের ধর্ম্মপালন করে দেহটাকে অধঃপাতে দিয়েছে, এমন তো আমরা দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু দেহাত্মবাদী মানুষ পাশববৃত্তির চর্চ্চায় দেহ-মন উভয়ের অধঃপতন ঘটিয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত সমাজের সর্ব্বত্র। নিজের দোষে প্রকৃতিকে বিদ্রোহী করে তুলে এখন তার স্বাভাবিক প্রেরণাকে পশুর বৃত্তি বলে গাল দিয়ে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে—যেন অমিতাচারী মানুষ খাঁটি পশুর চেয়েও উন্নত সংস্করণের জীব!

যাক্ সে কথা। এখন যে সমস্যা আমাদের সামনে পড়েছে, তারই মীমাংসা প্রয়োজন। কি করে দেহধর্ম্মকে জয় করা যায়, তারই উপায় খুঁজ্‌তে হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষের পরাজয় ঘটেছে—মনের লালসায়, কল্পনার আতিশয্যে। পশু যে ভোগটা সহজভাবে করে, মানুষের শক্তিশালী মন ও কল্পনা তাকে শতগুণে অতিরঞ্জিত করে তুলে শেষে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে। সুতরাং মানুষের অধঃপতন যদি মানসিক হিসাবেই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে তুলতেও হবে মনের জোরেই। এই হল সকলের গোড়ার কথা।

এখন এক একটা বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক্। [illegible], ঘুম তাড়াতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেকেই ঘুমায়; তাতে দেহ-মনের উন্নতি না হয়ে অবনতিই ঘটে। অথচ এ কুঅভ্যাস ছাড়িয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই নিদ্রাজয়ের একটা পন্থা আবিষ্কার করতে হবে। তা করতে হলে আগে তার বিজ্ঞান খোঁজ—তবেই বুঝ্‌তে পারবে। পাতঞ্জল বলছেন, নিদ্রা চিত্তেরই একটা বৃত্তি—"অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা নিদ্রা"— অভাব অনুভূতিকে আশ্রয় করে নিদ্রাবৃত্তির সৃষ্টি। তবেই হলো, ভাব-প্রত্যয় বা ভাবের স্পষ্ট অনুভূতিকে আলম্বনরূপে চিত্তে জাগিয়ে রাখ্‌লে নিদ্রা থাকবে না। তবে বহুভাব অর্থাৎ ভোগানুকূল ভাবকে আলম্বন করলে

প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামে আবার অভাব আলম্বন এসে জুটবেই। এই জন্ম সত্যভাব বা হৃষিকেশকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রকৃতির বিকারের যত উর্দ্ধে থাকবে, ততই ভাবপ্রতিষ্ঠা হবে—অভাবে আর পীড়িত হতে হবে না—অর্থাৎ নিদ্রাজয় হবে।

এটা হল আদর্শ। এখন এরই নিম্নস্তরে নেমে এস। সারাদিন ভাব ছেড়ে ভাবনা নিয়ে যে ব্যতিব্যস্ত, তার ঘুম আসবেই। আমরা বাজে চিন্তা যে কত করি, তার সীমাসংখ্যা নাই। এ সমস্ত চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও যোগই থাকে না—অধিকাংশই শুধু আকাশ কল্পনা বা একটা ব্যাপারের কল্পিত ফলাফল নিয়ে হর্ষ বা উদ্বেগের আন্দোলন। এগুলো না করলেও দিন চলে যায়, বরং তাতে মস্তিষ্কের শক্তির অপব্যয় হয় না, তাতে আপনা হতে নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এ কথা বিজ্ঞান-সম্মত। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, মস্তিষ্ককোষ সমূহের উপর উত্তেজনা প্রবাহ এসে যে ক্ষয় উৎপন্ন করে, তার পরিপূরণের জন্যই নিদ্রা প্রয়োজন। এবং বিদ্যুৎপরিচালনা দ্বারা মস্তিষ্ককোষে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে এই ক্ষয় নিবারণের ব্যবস্থা করে নিদ্রার পরিমাণ কমানোও সম্ভব হয়েছে। তার জন্য জড়যন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির দেওয়া মনোযন্ত্র থাকতে জড়যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয় না। ভাবের বিদ্যুৎ-প্রবাহে মস্তিষ্ককে সুস্থ ও সবল রাখা চলে। চিত্তকে যে যত একাগ্র ও আত্মবশ রাখতে পারবে, তার পক্ষে নিদ্রাজয় তত সহজ হবে।

যোগী বলছেন, কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে ঘুমিয়ে রয়েছেন বলেই জীবও হতচেতন হয়ে আছে। বাস্তবিক শক্তি আছে নিম্নকেন্দ্রে—শুধু, লিঙ্গ, নাভিতেই। তাই জীব আহার, নিদ্রা মৈথুন নিয়েই আছে। জীবনে ওই একমাত্র চেষ্টা। খাটছে, ছুটো খাবার সংগ্রহ করতে, বা মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই জোগাড় করতে বা স্ত্রীপুত্রপরিবার পোষণ করতে। এটা হচ্ছে সংসারের স্বভাব-চিত্র—এর জন্য দোষ দোব কাকে? এই তো আহারনিদ্রা মৈথুনের কর্ম্মময় রূপ। একটু রাংতা মুড়ে এই ভাবগুলো নিয়ে শুধু থাকলে পশুভাব প্রবল হবে না কেন? যে সমাজে মানুষের কর্ম্মচেষ্টা এর বাইরে অন্য কোনও ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পায় না—সে সমাজকে ধিক্। শুধু এই চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকবে, আর মুখে আধ্যাত্মিকতার বুলি ঝাড়বে অথচ বলবে সংসারে থেকে ধর্ম্ম করা কঠিন? মনকে উর্দ্ধকেন্দ্রে তোল, তাঁর কথা ভাব—ঘুম কমে আসবে, আহার সংযত হবে, মিথুনবৃত্তি জাগবে না।

এই তিনটী একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মহাভারতে যাজ্ঞের অধ্যাত্মপ্রকরণে আছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—"যদি যথার্থই ব্রহ্মচর্য্য অটুট রেখে বীর্য্য লাভ করতে চাও, তবে ঘুমটী একেবারে ছাড়।" বিজয় গোঁসাইও বলছেন, বেশী ঘুমে স্বপ্নদোষ হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে দিবানিদ্রা নিষেধ কেন? বীর্য্য চঞ্চল হবার আশঙ্কা আছে বলে, দিবানিদ্রায় শরীরে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা নিয়ে আসে।

যেমন ঘুমটী কমাতে হবে, তেমনি আহারটীও। তবে না ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হবে। বেশী খেলে তলপেটে চাপ পড়ে, যৌনকেন্দ্রে উত্তেজনা নিয়ে আসে—এটা ডাক্তারদেরও মত। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দিনে বারুদঠাসা—রাত্রে কোণ ঘেঁষা।" তার মানেই ওই।

দিনটা আমার আয়ত্তে আছে—কিন্তু রাত্রে আমি স্ববশে থাকি না। রাত্রে বেশী খেলেই ব্রহ্মচর্য্যহানির আশঙ্কা আছে। এইজন্য বিধবা ব্রহ্মচারিণীর একাহারের ব্যবস্থা। বৌদ্ধশাসনে ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বিকালভোজন বা রাত্রিভোজন বুদ্ধদেব একদম নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আরও একটা কথা ভাববার আছে। রাত্রি-মৈথুন মানুষের সংস্কারগত। যুগযুগান্তরের বংশধারা বেয়ে ওই সংস্কার নেমে এসেছে। এইজন্য পূর্ব্বপুরুষের সংস্কারক্রমেও রাত্রে কামের উত্তেজনা আসা স্বাভাবিক। তাই সাধকের রাত্রটা এত সাবধানে কাটাবার জন্য ব্যবস্থা। রাত্রে ঘুমের পরিমাণ কমানো, দিবানিদ্রা বর্জ্জন করে ঘুমের গাঢ়তা করা, ঘুম না আসা পর্য্যন্ত জপ করা, রাত্রিভোজন না করা—এই সবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সহজ হবে।

তবে বলেছি, আহার নিদ্রা মৈথুন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কামচিন্তা বর্জ্জন কর, ঘুম আপনি কমবে। বিন্দুক্ষয়ে স্বভাবতঃই শ্রান্তি নিয়ে আসে। তাই কামচিন্তার ফলে যদি অজ্ঞাতসারেও বিন্দুক্ষয় হয়, তাহলে ঘুম বাড়বেই। শুধু কামচিন্তাই বা বলছি কেন—যে কোনও আশঙ্কা, উদ্বেগ, ক্রোধ, হিংসা, ইত্যাকার দানবীয় বৃত্তিতে বিন্দুক্ষয় হয়। কারণ সুস্পষ্ট। বিন্দুই হচ্ছে জীবন। জ্যোতিঃর পথ জীবনের পথ—অন্ধকারের পথ মৃত্যুর পথ। এই জৈবিক আলোর স্পর্শেই প্রাণ সচেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, অন্ধকারে ভয়, অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা নিয়ে আসে। দেববৃত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী, দানববৃত্তি—তামসী। সুতরাং দেববৃত্তির অনুশীলনে জীবন জাগবে, দানববৃত্তিতে ক্ষয় হবে। বিন্দু জীবনেরই মূলরূপ। কাজেই দেবভাবে বিন্দু রক্ষা হবে, আসুরভাবে অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিকভাবে বিক্ষয় হবে—এ তো সহজ কথা। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখতে হলে বাজে চিন্তা ছাড়তে হবে—অশান্তি উদ্বেগ ছাড়তে হবে। নিরুদ্বিগ্ন হলে ঘুম কমবে, বীর্য্যধারণ সহজ হবে।

ঘুম কমার আর একটা বিশেষত্ব আছে। ঘুম চিত্তেরই বৃত্তি কি না, তাই তার মাঝেও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই তিন ভেদ আছে। পাতঞ্জলে এগুলো বেশ সুন্দর বোঝান হয়েছে। কখনও কখনও ঘুম হতে জাগলে মনে হয়, এখন শরীর লঘু, বুদ্ধি সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এটা সাত্ত্বিক নিদ্রার লক্ষণ। কখনও মনে হয়, ঘুমটা ভাল হয়নি, জেগে উঠে মনের চঞ্চলতা যেন বড় বেড়েছে, কোনও কাজে এক মনে লাগতে পারি না; দেহ মন যেন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে—এটা রাজস নিদ্রা। আবার একদিন হয়ত এমনই ঘুম হল যে ঘুম হতে উঠলেও ঘুমের ঘোর কাটতে চায় না। শরীর ভার বোধ হয়, মন ক্লান্ত, অলস—কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না; কোনও দিকেই বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না। এইটাই তামস নিদ্রা। এর জের যেন আর কিছুতেই মিটতে চায় না। যত নিরুদ্বিগ্ন হতে পারবে, বিষয়চিন্তা কমাতে পারবে, ব্রহ্মচিন্তা নিয়ে থাকতে পারবে, তত নিদ্রা কমবে, আহার কমবে, কাম কমবে।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানুষের মন যেন একটা শটকা কল। স্বভাবতঃ তার গতি কিন্তু ঊর্দ্ধমুখী। কিন্তু নীচের টানে বাঁশ নোয়ানো আছে। সে টান কেটে গেলেই আবার উপরমুখী চলে যাবে। পশুবৃত্তির চর্চ্চাতেই মন নীচুমুখী চলে আসে। তখন মনে হয়, নীচে আসাটাই বুঝি স্বভাব। কিন্তু এ ভুল ভাঙতে হবে।

যে বৃত্তিগুলি স্বভাব বলে আমাদের ধারণা—যেমন আহার নিদ্রা মৈথুন—তাদের বাগ মানানো আমরা একেবারেই অসম্ভব মনে করি; কিন্তু এগুলোও যদি বিবেচনা পূর্ব্বক সেবা করা যায়, তাহলে ক্রমে তাদের তীব্রতা কমে আসে। এই হচ্ছে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তিপথে আসবার সঙ্কেত। হিন্দুর শাস্ত্র বিজ্ঞানে এর বিধি-ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ ধর, আহার। সর্ব্বদা খাই খাই করা, খিদে পেলেই অমনি খেতে বসে যাওয়া, যেমন তেমন করে যা তা আসনে বসে খাওয়া, যেখানে সেখানে যার তার হাতে খাওয়া—এগুলো হিন্দু প্রশ্রয় দেয় না। আহার পশুবৃত্তি। পশুর দিকটা এখন আমাদের মাঝে প্রবল। ওটাকে নির্জ্জিত করতে হবে। একেবারে উচ্ছেদ এখন সম্ভবপর নয়—ওকে বাগ মানানো চাই। বিবেক না হলে তা হবে না। তাই আহারে এত বিবেক: এত প্রহরে এমন আসনে, অমুকের রান্নায়, এমন করে খাবে, খাওয়ার সময় অন্যমনস্ক হবে না, কথা বলবে না, ইষ্টকে নিবেদন করে প্রসাদস্বরূপ খাবে, খাওয়ার আগে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে, পরে এই মন্ত্র, অমুক জায়গায় খাবে, অমুক জায়গায় না—ইত্যাকার কত বিবেকের কথা, সাবধানের কথা। বুঝতেই পার, এতখানি আঁটাআঁটি করে যারা খাবে, তাদের খাওয়ার আমেজটা কমে যাবেই। অথচ তাতে মনে একটা তেজের সঞ্চার হবে—আমি নিষ্ঠাবান্, আমি আচারী, আমি পশু নই। ক্রমে ধারণা হবে খাওয়া তো সুখ নয়, ক্ষুধাব্যাধির ওষুধ মাত্র। ওষুধ কেউ আগ্রহ করে ঘটীতে ঘটীতে খায় না। বুদ্ধদেব তাই উপদেশ দিয়েছিলেন, "আহার করবে, যেন কান্তারে পুত্রমাংস ভক্ষণ করছ।" এমন জায়গায় এসে পড়েছ যেখানে কিছুই মিলছে না, অথচ ক্ষুধায় প্রাণ যায়। তখন যদি ক্ষুধার তাড়নায় কেউ নিজের ছেলের মাংস খেতে বাধ্য হয়, তখন তার চিত্তে যেমন বিরাগ জাগবে, তেমনি বিরাগ নিয়ে, যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই আহার করবে—এই হল তাঁর উপমার তাৎপর্য্য।

যেমন আহার, তেমনি নিদ্রা সম্বন্ধেও অনেক বিবেকের কথা আছে। ঘুম পেল আর অমনি অমনি পড়ে ঘুম দিলাম, কিম্বা এক জায়গায় বসেছি এককাৎ, আর বসে বসে ঢুলছি—ওগুলো ভাল না। ঘুম সম্বন্ধেও কত বিধি আছে। যার তার বিছানায় শোবে না। শোবার পূর্ব্বে বিছানায় বসে ইষ্টস্মরণ বা জপ করবে। জপ করে চিত্ত প্রশান্ত হলে শোবে। যতক্ষণ নিদ্রা না আসবে, ততক্ষণ জপ করবে, ইষ্টভাবনা করবে—করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে। আবার ঘুম হতে উঠতেই ইষ্টের মন্ত্র, স্তব ইত্যাদি উচ্চারণ করতে করতে উঠবে। কেমন শান্ত, সুন্দর ব্যবস্থা! হুড়মুড়িয়ে ঘুম, আর ধড়মড়িয়ে ওঠা—কোনটাই নিদ্রাজয়ের অনুকূল নয়। নিদ্রা হল পশুর বৃত্তি। বিবেকসহকারে তার সেবা করলে তবে তার বিষদাঁত ভাঙবে।

তারপর আর এক প্রবৃত্তি মৈথুন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে গৃহস্থকে কত উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার অন্ত নাই। গর্ভাধান হিন্দুর দশ সংস্কারের একটা—সুতরাং তাও তো অবিবেক সহকারে অনুষ্ঠিত হলে চলবে না। বরং পুত্রোৎপাদনের দায়িত্ব মানুষের সব চেয়ে বেশী। আহার নিদ্রার কুফল ব্যক্তিগত ভাবে একজনকেই দুঃখভোগ করাবে, কিন্তু জীবসৃষ্টিতে বংশের ভবিষ্যৎ, সমাজের ভবিষ্যৎ, দেশের কল্যাণ সব নির্ভর করছে। এই জন্য বিবাহ হতে আরম্ভ করে গার্হস্থ্যধর্ম্মের

পদে পদে এমনি বিধি নিষেধের ব্যবস্থা। শুধু হৃদয়ের আবেগ বা রিপুর খেয়ালে পরিচালিত হলে মনুষ্যত্বের কিছু বিকাশ হয় না—মানুষ পরিণামদর্শী, বিবেকী, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে—এই জন্য বিশেষত্ব। মরণের সঙ্গে সঙ্গেই একটা জীবনের সব দায়িত্ব মিটে যায় না, মানুষ বিদেহী হলেও [illegible] অন্ততঃ বংশধারা পর্য্যন্ত আপনার জীবনকে ব্যাপ্ত অনুভব করতে পারে—তাই সে সংযমী। বংশধারা রক্ষায় হিন্দু এই সংযমের পরিপূর্ণ আদর্শ প্রচার করেছে। তাই গর্ভাধানকেও সে জীবনের একটা পবিত্র সংস্কার রূপে গ্রহণ করেছে। এই জন্য তিথি পর্ব্ব ইত্যাদির বিচার তো আছেই. তা ছাড়াও কত গর্ভাদান ব্যাপার সম্বন্ধেও শাস্ত্রে কত সতর্কতা। উপনিষদ্ খুলে দেখ, তার মধ্যে গর্ভাধানের মন্ত্র, অনুষ্ঠান, পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি, পরকৃত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে কত গম্ভীর বিধান রয়েছে। গৃহসূত্র খুলে দেখ, তার মধ্যেও গর্ভাধানের জন্য কত শুচি সংযত আয়োজন। গর্ভাধান উপলক্ষ্যে যজ্ঞাদি প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হত, সুতরাং পুত্রার্থ মৈথুনকে যে কি পবিত্র দৃষ্টিতে দেখা হত, তা বলবার নয়। যেখানে লজ্জা, সেখানেই পাপ, সেখানেই গোপন করবার ইচ্ছা।

বিবেক সহকৃত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে যে কাজটা হবে. তার মাঝে পাশবিক আসক্তি থাকবে কতটুকু? এই তত্ত্বটা তন্ত্র অতি সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন। প্রবৃত্তির আয়োজন সামনে রেখে তন্ত্র সাধনার উপদেশ [illegible]। সবই ভোগ্য বস্তু—কিন্তু তন্ত্র বলছেন, অসংযত ভাবে ভোগ করো না; আমি যেমন ভাবে বলছি, তেমনি বিবেক সহকারে উপযুক্ত অনুষ্ঠান সহকারে ভোগ কর—দেখি কোথায় তোমার পাশব আসক্তি থাকে। বাস্তবিক তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলি যদি কেউ স্থিরচিত্তে মনোযোগ সহকারে আলোচনা করে দেখে, তবে বুঝতে পারবে, তন্ত্র যেমন সাধককে ধীরে ধীরে সতর্কভাবে পদে পদে উদ্বুদ্ধ করে ভোগের সামনে উপস্থিত করছেন; তাতে শেষকালে যখন ভোগ্যবস্তু সাধকের কবলিত হবে, তখন ভোগের মাঝেই যে সে মহাযোগের সন্ধান পেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়বে। অবশ্য এখানে বিশ্বাসী শ্রদ্ধালু সাধকের কথাই বলছি। অনুষ্ঠানের সময়ও ভোগ্যবস্তুর স্মৃতিটাই যার চিত্তে কেবল লোলুপতা জাগিয়ে দিচ্ছে, তার কথা বলছি না। প্রবৃত্তির স্রোত ঠেলে উজান চলাই হচ্ছে লক্ষ্য; তাই দাঁড়ও টানতে হবে, ঠিক ঠিক হালও ধরতে হবে।

বাস্তবিক এই যে জগতে কতকগুলি বস্তুকে আমরা ভোগ্য বলে বিষজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখি, সেটা কিন্তু আমাদেরই মনের গুণে। দ্রব্যগুণে কোনও বস্তু হেয়ও নয়, উপাদেয়ও নয়। এই যেমন ধর, নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। তুমি পুরুষ, তোমার মন যদি দেহের সুখ লালসাতেই আবদ্ধ থাকে, দেহতর্পণের স্মৃতিতেই অভ্যস্ত থাকে, তাহলে নারীকে দেখে তোমার মাঝে কামভাবই জাগবে। কিন্তু যিনি দেহাত্মবুদ্ধি হীন, যার মন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তিনি তারদিকে তাকিয়েই দেখবেন, আনন্দময়ীর প্রতিমা—দেখেই ভাবে তাঁর চিত্ত অবশ হয়ে পড়বে। অথচ সেই একই নারী—আসলে সে যাই আছে, তাই আছে; কেবল সাধু আর অসাধুর মনে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। সেটা কি বস্তুর দোষ, না মনের দোষ?

তা ছাড়া, আর একটা কথা। অসাধু

যে দেহ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করে, তার তৃপ্তির চেয়ে সাধু যে অন্তরাত্মা দিয়ে আস্বাদন করেন, তার তৃপ্তি কত বড়, ভাব দেখি। দেহ ইন্দ্রিয় থাকবে না; তাদের শক্তিও বেশী নয়; কাজেই অসাধুর ভোগে শুধু জ্বালাই বাড়বে, আর তার পরিণামে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর সাধুর অন্তরাত্মা অবিনাশী, অনন্ত শক্তিময়, কাজেই তাঁর তৃপ্তির আর শেষ নাই। তারপর অসাধু যে ভোগ করবে, তার উপকরণ চাই—নইলে উত্তেজনা হয় না। সেটাও স্থূল, থাকে না। আর সার ভোগ্য চিন্ময় তা নিত্যই আছে—স্থূল থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে।

আনন্দটুকু পাওয়ার জন্যই তো সাধনা—সেইজন্যই শক্তিনিগ্রহ। একবারে ত্যাগ করতে পার, ভালই; আর তা যদি না পার, তবে বিবেকসহকারে তাদের গ্রহণ কর—ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসবে। ভোগের কাত হবে, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়েছ কেন? তোমার ভোগ তাড়াতে চাই না—সে ভয় নাই। জানি, তুমি ভোগীই বটে। কিন্তু ক্ষুদ্র ভোগ কেন তাই? ক্ষুদ্রের লোভ ছাড়—শাশ্বত ভোগ তোমার আয়ত্ত হবে।

একনাথ

জনার্দ্দন ও একনাথ দেওগড় হইতে প্রথমে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যে একটা প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র। পঞ্চবটী হইতে তাঁহারা ত্র্যম্বকেশ্বরে আসিলেন। ত্র্যম্বকেশ্বর পঞ্চবটী হইতে কুড়ি মাইল দূর। গোদাবরী নদী এইস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের যে দ্বাদশটী শিবমন্দির দেবনির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির তাহাদের অন্যতম। ত্র্যম্বকেশ্বরের বিশেষ প্রসিদ্ধি এইজন্য যে উহা ভগবান্ নিবৃত্তিদেবের সিদ্ধপীঠ। নিবৃত্তিদেব জ্ঞানেশ্বরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইহাদের কাহিনী পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ত্র্যম্বকেশ্বরে আসিয়া জনার্দ্দন কিছু দিন বিশ্রাম করিলেন। এই সময়েই তিনি একনাথকে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য কি তাহা বুঝাইয়া দেন—এবং সংসারে লোকশিক্ষারূপ যে মহৎ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি একনাথকে বুঝাইলেন যে আত্মমুক্তি ও জগতের হিত—এই দুইটী বৈদান্তিকের জীবনে পরস্পর জড়িত। একনাথ নিজে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। এক্ষণে এই জ্ঞান লোকসমাজে প্রচার করিতে হইবে, সংসারে যাহারা মজিয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। জ্ঞানের উচ্চভূমিতে সর্ব্বদা অবস্থান করিলে কর্ম্ম হইবে কি করিয়া? তাই জ্ঞানের ভূমিকায় ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মহাজ্ঞানী দত্তাত্রেয় যে তাঁহাকে ভাগবতধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার স্মরণ নাই? অদ্বৈতজ্ঞানের গভীরতত্ত্ব সাধারণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিবে না—বরং তাহাতে

বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে। ভাগবতধর্ম্মই সর্ব্বোপযোগী যুগধর্ম্ম। একনাথ স্বয়ং অদ্বৈত-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠ থাকিয়া এই ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া লোকসমাজে ইহা প্রচার করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য—এবং ইহাতেই তাঁহার জীবনের পূর্ণতা সাধিত হইবে।

জনার্দ্দন আরও বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলি। এই তীর্থভ্রমণ তাহার ভূমিকা মাত্র। তোমাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। নির্লিপ্ত গৃহস্থের আদর্শ বড়ই দুর্লভ। সেই আদর্শ আবার সমাজে উপস্থিত করিতে হইবে। জ্ঞানাবতার বামদেব বশিষ্ঠ দেবকে স্মরণ কর। রাজর্ষি জনকের কথা মনে কর। তাঁহারাই তোমার আদর্শ। আমি নিজেও এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলি। শিশুকাল হইতে তুমি সংসারের প্রলোভন হইতে দূরে রহিয়াছ। তারপর জ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন করিয়া মোহপাশ ছিন্ন করিয়া নিত্যতত্ত্ব অধিগত করিয়াছ। কিন্তু যে সংসারকে তুমি দূরে ঠেলিয়া আসিয়াছ, উহাকেও সত্য আছে—সার আছে। ভগবান্ যেমন নিত্য, তাঁহার লীলাও তেমনি নিত্য। তুমি বিশ্লেষণপথে একটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, এখন সংশ্লেষণ পথে অপরটীর তত্ত্ব আস্বাদন কর। তীর্থ ভ্রমণে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হইবে—নানা দেশ, নানা সমাজ, নানা রকমের লোক দেখিয়া লীলাময়ের লীলার বিচিত্র বিকাশে আত্মহারা হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, সচ্চিদানন্দস্বরূপে যিনি নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকার, তিনিই আবার এই জীবজগৎ সাজিয়াছেন—তিনি ইহাকে ব্যাপ্ত করিয়াও ইহার অতীত হইয়া রহিয়াছেন।

"গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু শিষ্যকে গৃহে ফিরিতে আদেশ দেন। অবশ্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ আমরণ গুরুগৃহেই থাকিয়া যায়। কিন্তু যাহারা সংসারে ফিরিয়া যায়, তাহারা সকলেই যে সংযত ভোগ সহায়ে ভোগ পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া জন্মান্তরে উচ্চাধিকার লাভ করিবার আশা করিয়া যায়, তাহা নহে। অবশ্য যাহারা গুরুগৃহে থাকিয়াও সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম করিতে পারিল না বলিয়া সংসারে ফিরিয়া যায়, সমাবর্ত্তনকারীদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু সংসারের হিতের জন্য ভোগনিবৃত্ত পূর্ণসংযমীকেও গুরু কখনও কখনও সংসারে পাঠাইয়া দেন। ইহাদের ভোগের পিপাসা নাই—লোকহিতে আত্মোৎসর্গ মাত্র ইহাদের জীবনের ব্রত। ইহারা অনাসক্ত থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করেন—নিত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লীলানন্দে আপনাকে ভাসাইয়া দেন। অবশ্য এই আদর্শ অনুসরণ করা যে সহজ নহে, তাহা বলা বাহুল্য। আমি তোমাকেই ইহার যোগ্য অধিকারী মনোনীত করিয়াছি। সুতরাং আমার আদেশ, তুমি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে প্রতিষ্ঠানপুরে ফিরিয়া যাও এবং গার্হস্থ্যধর্ম্মসহায়ে লোকসমাজে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ইষ্টদেবের ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

পরিশেষে একনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জনার্দ্দন বলিলেন, "বাছা, বারো বছরের ছেলে তুই আমার কাছে আসিয়াছিলি। বারো বছর পূর্ব্বে সেই সন্ধ্যায় তোকে যেমনটী দেখিয়াছিলাম,

আজও যেন তাহা আমার চোখে লাগিয়া রহিয়াছে। আজ বারো বছর ধরিয়া তোকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়াছি। এখনও তুই আমার কাছে সেই ছোট ছেলেটাই রহিয়াছিস্। তোকে ছাড়িয়া যাইতে যে আমার কি কষ্ট হইতেছে, মুখ ফুটিয়া আর কি বলিব। আমার যাহা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, সব আমি তোকে দিয়াছি। তুই তাহা জগৎকে বিলাইয়া দে। আমরা উদাসী—জগতের হিতই আমাদের একমাত্র কামনার বিষয়। সেই কামনার উদ্‌যাপনের জন্যই তোকে ছাড়িয়া যাইতেছি। কোনও ভয় নাই তোর—তুই যেখানেই যাস্ না কেন জানবি, আমি তোর সঙ্গে আছি। আমার আর এক আদেশ, কোথাও বিভূতি প্রকাশ করিস্ না। তবে আয়, বাছা।” এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে জনার্দ্দন রোরুদ্যমান একনাথকে বিদায় দিয়া দেওগড়ে ফিরিয়া গেলেন।

গুরুর আদেশক্রমে একনাথ ত্র্যম্বকেশ্বর হইতে উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করিলেন। তীর্থ-ভ্রমণের বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই তীর্থ-ভ্রমণের ফলে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে সত্যের আর একটা দিক খুলিয়া গেল—গুরুবাক্যের যথার্থতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন, এবং আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত করিয়া শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত তীর্থ দর্শন সারা হইলে একনাথ আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া চলিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠানপুরাতে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার তখনও ব্রহ্মচারীর বেশ, আত্মপ্রকাশ করিবারও কোনও ইচ্ছা নাই; তাই বাল্যকালের সেই শিবালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দিন নির্জ্জনে অতিবাহিত করিয়া দিনান্তে একনাথ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। বালক একনাথকে যাহারা দেখিয়াছে, এখন তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের চিনিবার কোনও উপায়ই ছিল না। একনাথ ভিক্ষা করিতে করিতে স্বেচ্ছাক্রমে নিজবাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ চক্রপাণি তখনও জীবিত ছিলেন; বারো বৎসর পূর্ব্বে যে বালক সহসা একরাত্রে তাঁহাদের স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এখনও বৃদ্ধ তাহারই সতৃষ্ণ প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছেন। প্রায়ই ব্রাহ্মণীকে বলিতেন, দেখিও ব্রাহ্মণী, নিশ্চয়ই সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বাছা আমার কোনও দিন আমাকে না বলিয়া কোথায়ও যায় নাই। সে যে কি দুঃখে ঘর ছাড়িয়া গেল, অন্ততঃ এই কথাটা বলিবার জন্যও একদিন সে ফিরিয়া আসিবে।” বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত—ব্রাহ্মণীও আঁচলে চক্ষু মুছিয়া কার্য্যান্তরে যাইতেন।

আজ সেই একনাথ ফিরিয়া আসিয়াছেন। একনাথকে অপর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু বৃদ্ধচক্রপাণির কাছে তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া একনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। যুগপৎ হর্ষ বিষাদে তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝড় বহিতে লাগিল। হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন, এই তাঁহার আনন্দ; কিন্তু একনাথের বেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল। একনাথের যে উদাসীর বেশ—তবে তাহাকে ঘরে ফিরাইবেন কি করিয়া? আত্মসুখের জন্য স্নেহের পুতুলীর

ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন, এত বড় স্বার্থপর পাষণ্ড তিনি নন। আর তিনিও তো ভানুদাসেরই পুত্র। আত্মতৃপ্তির চেয়ে কর্ম্ম তাঁহার কাছে চিরদিনই বড়।

তারপর একনাথকে একান্তে বসাইয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী যখন তাঁহার মুখে সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। চক্রপাণি বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে আর তোমাকে কোথায়ও যাইতে দিব না।" একনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "দাক্ষিণাত্যের তীর্থগুলি যে এখনও সারা হয় নাই, দাদামশাই।" চক্রপাণি বলিলেন, "আচ্ছা, সে পরে হইবে। আমরা এখন বুড়ো হইয়াছি—যে কয়টা দিন আছি, কাছেই থাক্—মরিলে পর তোর তীর্থধর্ম্ম যা করিবার আছে করিস্।" একনাথ আর কোনও কথা বলিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "তোমার আদেশেই আবার এ বন্ধনে পড়িলাম। সঙ্গে থাকিবে বলিয়াছ, এই মাত্র আমার ভরসা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" তারপর যথাসময়ে দারপরিগ্রহ করিয়া একনাথ সংসারী সাজিলেন।

একনাথের সংসারে কোনও অভাব ছিল না। তাই তিনি নিরুদ্বেগে ধ্যান-ধারণা নিয়া থাকিতে পারিতেন। সাধন ভজন ছাড়া তাঁহার আর দুইটী কাজ ছিল, গ্রন্থ-রচনা ও প্রচার। তবে প্রথম বার' বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এক "চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব্যাখ্যা" ছাড়া আর কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আদিষ্ট ভাগবত ব্যাখ্যা তখনও আরম্ভ হয় নাই। ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের কীর্ত্তি; আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। পূর্ব্বোক্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব্যাখ্যায় তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনের সমন্বয় করিয়া বেদান্তের গূঢ় তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিয়া মহাপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের উপায় ছিল কীর্ত্তন ও কথকতা। তিনি স্বয়ং সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। কীর্ত্তনে যে তাঁহার কত প্রীতি, তাহা নিম্নের উক্তিতে প্রকাশ পাইবে—

"পাপভারে আক্রান্ত হইলেও কলিযুগই ধন্য, কেননা এই যুগে নাম গানেই জীবের মুক্তি। কীর্ত্তনে জাতিভেদ নাই, সম্প্রদায় বিচার নাই—বলা-বলের বিচার নাই; যার যতটুকু জ্ঞান, যতটুকু শ্রদ্ধা, তাহা লইয়াই সে কীর্ত্তনানন্দে যোগ দিতে পারে। ভক্তিতে স্ত্রীশূদ্রেরও কোনও বাধা নাই। এমন কি বেদ পর্য্যন্ত সকলকে তুল্যাধিকার দেন নাই—ত্রিবর্ণেরই তাহাতে অধিকার। কিন্তু কীর্ত্তনে অতি নীচ পাষণ্ডেরও অধিকার আছে। কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা গাঢ় হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়। কীর্ত্তনের আনন্দের কাছে মোক্ষসুখও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে যোগ বা তপস্যার কাঠিন্য নাই। কীর্ত্তনই এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।"

তিনি নিজগৃহে যেমন কীর্ত্তন করিতেন, তেমনি বাহিরেও অপরের নিমন্ত্রণে কীর্ত্তন করিতে যাইতেন। তাঁহার কীর্ত্তনে এক অপূর্ব্ব মাদকতা ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর একবার কানে গেলে আর কাহারও স্থানত্যাগ করিবার সাধ্য থাকিত না। গৃহে যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন তাহা শুনিবার জন্য সহস্র লোকের সমাগম হইত। শেষে আঙ্গিনায় আর লোক

থরিত না—মানুষ বাড়ীর দেওয়ালে উঠিয়া গাছে চাড়য়া, তন্ময় হইয়া তাঁহার কীর্ত্তন শুনিত।

আর তাঁহার কথকতাও ছিল এক অপূর্ব্ব জিনিষ। তাঁহার অগাধপাণ্ডিত্য, ঐকান্তিক ভক্তি, আশ্চর্য্য ব্যাখ্যাকৌশল, সর্ব্বোপরি তাঁহার অভাবনীয় সম্মোহনীশক্তি শ্রোতৃবর্গকে যেন চিত্রার্পিতবৎ নিষ্পন্দ করিয়া রাখিত।

এইরূপে লোকনাথের লোকহিত অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইল। (ক্রমশঃ)

পাপাদৃষ্টি

—✻—

কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল, আত্মাই তো কর্ত্তা; তবে তিনি কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকবেন কি করে? তিনি কি কাজকর্ম্মের কোনও খোঁজখবরই রাখেন না?"

"না।" বেদান্তমতে আত্মা কর্ত্তাও নন, ভোক্তাও নন। তিনি যদি কর্ত্তা বা ভোক্তা হন, তাহলে নির্ব্বিকার হবেন কি করে? তোমার মাঝে যাঁকে কর্ত্তা বা ভোক্তা বলে অনুভব কর, তিনি বাস্তবিক আত্মা নন, আত্মার আভাসে তিনি আভাসিত। এঁর যত শক্তি, যত স্ফুরণ, সমস্ত আত্মার নিকট হতে পাওয়া।

এটা বড় কঠিন বিষয়। যদি খুঁটীনাটী বিচার করতে যাই, তাহলে অন্ততঃ তিন ঘণ্টার কমে বোঝাতে পারব না। তাই শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

ধর, ভ্রমবশতঃ ঘরের কোনায় তুমি একটা সাপ দেখ্‌লে। সাপ বলে মনে হল বটে, কিন্তু কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেখ্‌লে এটা সাপ নয়, দড়ী। তাহলে সাপটা যেন দড়ীতেই আছে, অথচ সেখানে বাস্তবিক নাইও। মনে হবে, দড়ীটা সাপের অধিষ্ঠান, কিন্তু বাস্তবিক দাড়টায় সাপ দেখায়ওনি, ধরেও রাখেনি—সাপকে সে মোটে আমলই দেয়নি।

তাহলে ভ্রান্তির দিক থেকে বিচার করতে গেলে বল্‌তে হয়, দড়ীটাই সাপের অধিষ্ঠান; কিন্তু সত্যের দিক থেকে বিচার করলে বুঝি, দড়ি কখনও সাপ নয়—সাপ বলে একটা কিছু ওখানে ছিলই না। আমাদের বুদ্ধিই হচ্ছে সমস্ত যুক্তিবিচারের মূল; অথচ বুদ্ধি ভ্রান্ত। বুদ্ধির দিক থেকে বিচার করলে মনে হবে, আত্মাই যেন তোমার সমস্ত কর্ম্মের অধিষ্ঠান—তোমার জীবনের, প্রাণের, শক্তির মূল। সাধারণ বুদ্ধিতে বা সংসারদৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে মনে হবে, আত্মাই যেন সমস্ত কর্ম্মের অধিষ্ঠান, কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাবে, আত্মা কখনও দেহ, মন বুদ্ধির ধারক, পোষক বা কর্ত্তা ভোক্তা নন। মোটকথা এইটুকু জেনে রাখ—যে এ বিষয়ে দুটো প্রেক্ষাভূমি রয়েছে। একদিক থেকে দেখ্‌লে আত্মাই সব করছেন, আবার আর একদিক থেকে দেখ্‌লে, আত্মা মুক্তশুদ্ধস্বভাব, তিনি কোনও দিন কিছু করেননি।

তারপর উপলব্ধির পক্ষে যে সমস্ত বাধা রয়েছে, সেইগুলি দিয়ে বিচার করা যাক্। অবশ্য কয়দিনধরেই এ সমস্ত আলোচনা চল্‌ছে। আজ রাম তোমাদের কাছে উপলব্ধির

দণে সবচেয়ে বড় শাদার কথা বলবেন। এ হচ্ছে, সমালোচনা—বাইরের সমালোচনাও বটে, ভিতরের সমালোচনাও বটে।

আগে বাইরের সমালোচনার কথা ধরা যাক্। দেখা যায়, কারু কারু পরের সমালোচনা করবার একটা কুৎসিৎ অথচ প্রচণ্ড অভ্যাস রয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক জানবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরের দোষ দেখবার বা পরকে বিচার করবার প্রবৃত্তি থাকবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের কেবল কালোর দিকটাই দেখবে, আলোর দিকটা দেখতে পাবে না—ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবদ্দর্শন হওয়া দুর্ঘট।

ধর, ছোট্ট একটা ছেলে। ওর মাঝে চুরীর প্রবৃত্তি নাই। ওর সামনে চোর এসে যদি ঘরে ঢোকে, তাহলে স্বচ্ছন্দে চুরী করতে পারবে। কেননা শিশুর ভিতরে চোর নাই বলে, তার বাইরেও কোথাও চোর নাই। কাজেই যখন বাইরে চোর ধরবার জন্য আড়ি পাতো, তখন বুঝতে পার না যে তোমার ভিতরেই চোরকে লুকিয়ে রাখছ।

যখন অপরের খুঁত খুঁজে বেড়াও, তখন নিজের মাঝেও সেই খুঁতগুলো ডেকে আন। যখন বন্দুক ছোঁড়, তখন গুলিটা অপরের গায়ে লাগে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও হয়, বন্দুকটা উল্টে তোমাকেও একটা ধাক্কা দেয়—তোমাকেও একটু পিছু হটে আসতে হয়। যখন অপরের দোষ ধরতে যাও, তখন সে দোষ নিজের মাঝেও কিছু ঢুকে যায়—কেননা, এই হচ্ছে আইন। অপরের দোষ না ঘাঁটলে শুধু যে তারাই বেঁচে যায়, তা নয়—তুমিও বেঁচে যাও। এই সব দোষদর্শী সমালোচকের মক্ষিকাস্বভাব, তোমাকে ছাড়িয়ে উঠতেই হবে।

হাঁ, পরের নাকের ডগায় তিলটাতে নজর দেওয়া খুবই সোজা, কেবল নিজের গালের আবটাই না চোখে পড়ে না।

সর্ব্বদা স্মরণ রেখো, যে সমস্ত চিন্তায় ঈর্ষ্যা, সমালোচনা, দোষদর্শনের লেশমাত্র সংস্রবও রয়েছে, সেই সমস্ত চিন্তা যখন জগতে ছড়িয়ে দাও, তখন নিজের মাঝেও ওই সব আপদই ডেকে আন। পরের নাকের তিলটা বসাতে গেলে নিজের গালে আবটা বসবে এসে।

তাই বলি, যদি নিজের উপর একটুখানি দরদও থাকে, তাহলে এই সব দোষদর্শী নিন্দুকের স্বভাবটা ছাড়। মনে রেখো, অমুকে যা করছে, তা হয়ত তার পক্ষে ভাল, কিন্তু তুমি সেটা করতে গেলেই হয়ত অনিষ্ট হবে। অপরের যে দোষটার তুমি নিন্দা করতে যাচ্ছ, তুমি নিজেকে তা থেকে মুক্ত কর না কেন, অপরের দোষ ধরবার প্রয়োজন কি?

আচ্ছা, জগৎজোড়া মানুষের এমন মক্ষিকা স্বভাব কেন হয়, তা জান কি? এর একটা নিগূঢ় কারণ আছে।

লোকে অপরের সমালোচনা করে কেন? আর কারাই বা সব চেয়ে বেশী সমালোচনা করে?—দেখবে, যারা দুর্ব্বল, কিছু জানে না, তারাই সমালোচনায় ধুরন্ধর; এর আর ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। এর কারণ হচ্ছে এই যে পরের সমালোচনা করে তারা আত্ম রক্ষা করতে চায়। পশুসুলভ আত্মরক্ষার প্রেরণাই সমালোচনার আকারে ফুটে ওঠে।

একজন দেখল, অমুকে যে কাজটা করছে, সে যদি তা করতে যেত, তাহলে তার ক্ষতি হত। কাজেই ও কাজটার উপর তার ঘৃণা জন্মে যায়। ও কাজটাকে তার ঘৃণা করতেই হবে, তা না হলে সে নিজেই হয়ত ওটা না

করে পারবে না—সামলে না চললে তার গায়েও ছিটে লাগবে এসে। কাজটা ছিল সংক্রামক; কাজেই যে ব্যক্তির স্পর্শদোষের ভয় আছে। অপরের নিন্দা করে নিজে নিরাপদ থাকতে চায়। সে ভাবে যতক্ষণ সে ভাইয়ের নিন্দা করবে, ততক্ষণ তার কিছু হবে না। কিন্তু এ হচ্ছে সমালোচনার উজ্জ্বল দিক; এতে প্রমাণ হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ বিশেষ স্তরে দোষদর্শন প্রবৃত্তি নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এমনতর আধ্যাত্মিক উন্নতির গলদটাই হচ্ছে এই যে, ওই সর্ব্বদুর্ব্বলচিত্ত নিন্দুকেরা গোড়াতেই এই ভুল করে বসে যে মানুষের দোষটাকে খারাপ চোখে না দেখে মানুষটাকেই তারা ঘৃণা করতে সুরু করে। অমুক ভুলত্রুটীর সমালোচনা করতে পার, অমুক কাজের বা কথার সমালোচনা করতে পার, অমুকের কুৎসিত মনোবৃত্তির সমালোচনা করতে পার, কিন্তু তা বলে সে লোকটাকে ঘৃণা করবার তোমার কি অধিকার আছে? একটা পুরোণো কথা আছে—"পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করো না।"

কিন্তু কথা হচ্ছে পাপকে ঘৃণা করব, আর পাপীকে ভালবাসব, এ কি সম্ভব। হাঁ, খুব সম্ভব। যারা সমস্তটা এই ভাবে ভেবে দেখেনি, তাদের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে। তবে কিনা একটু জ্ঞান থাকা চাই।

আচ্ছা বোঝ, একজনের একটা কাজ দেখে তুমি নিন্দা করলে; তুমিও যদিও কাজটা করতে যেতে, তাহলে তোমারও খুব ক্ষতি হত; কিন্তু সেই কাজটাই তৃতীয় একব্যক্তি করলে হয়ত দোষ হয় না। তুমি বলছ, যা পাপ, তা সকল অবস্থাতেই পাপ। তাহলে এমন প্রভেদ হয় কেন?

যদি বেছে বেছে কতকগুলি কাজকে পাপ বল, আর কতকগুলিকে পুণ্য বল, তাহলেই ভুল হল। স্বভাবতঃই কোনও কাজ ভালও নয়, মন্দও নয়। যেমন শূন্যের কোনও মূল্যই নাই। কিন্তু দশমিক বিন্দুর ডাইনে যদি তাঁকে বসাও, তাহলে রাশির মূল্য কমে যাবে; আর যদি বাঁয়ে বসাও, বেড়ে যাবে; অথচ শুধু একটা শূন্যের কোনও মূল্যই নাই। তেমনি স্বাভাবিক ভাল বা মন্দ কোনও কাজ জগতে নাই।

পাপের প্রকৃতি বুঝতে পার না বলেই পাপকে ঘৃণা করে পাপীকে ভালবাসা তোমাদের পক্ষে এত কঠিন। মানুষ যখন নিজের দেহটা আর বিষয় আশয় নিয়ে মজে যায়, তখন যেমন ভগবানকেও একটা যা তা মানুষের মত বানিয়ে বসে, কিম্বা অসভ্যেরা যেমন ইটপাটকেলকেও দেবতা বানিয়ে পূজা করে, তেমনি মানুষ মোহে আচ্ছন্নবলেই কতকগুলি কাজকেই ফাঁপিয়ে মানুষের সমান করে তোলে। তখন তাদের বিচারে অমুকটা হল পাপ আর অমুকটা হল পুণ্য। মনে রেখো, ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ—পাপ পুণ্যও অন্তরের ধর্ম্ম। পাপপুণ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তোমার অবস্থা আর মনের গতির উপর।

দেহের সংস্কার তো করতে হবে না—সংস্কার করতে হবে মনের। মনটাকেই নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। অধ্যাত্মজগতে তোমার দ্বিতীয় জন্ম হবে। মাটীর মানুষ মাটীই হবে—এ কথা আত্মার সম্বন্ধে নয়। আবার সংস্কারে মানুষ দ্বিজ হয়—এ কথাও দেহের সম্বন্ধে নয়।

মনে কর, তোমাদের বাড়ীর খোকা

এখনও মায়ের দুধ খায়। তা বলে এই ধাড়িবয়সে তোমার মায়ের দুধ খেতে যাওয়াটা শোভা পায় কি? না—তোমার মত জোয়ান মদ্দ যদি বাড়ীতে থেকে মায়ের দুধ খেতে চায়, তাহলে চলে না। খোকা মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচতে পারে, কিন্তু তুমি পার না। এই তো দেখছ, মায়ের দুধ খাওয়া ছেলের পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু তোমার পক্ষে নয়। তুমি তা খেতে গেলে অন্যায় হবে। বড় হয়ে মায়ের দুধ খাওয়াটা পাপ বলতে পার, কিন্তু খোকার তাতে পাপ হয় না। তোমার পক্ষে যা করা উচিত নয়, খোকা তাই করছে; কিন্তু তা বলে খোকাকে তুমি ঘৃণা কর কি? তুমি যদি কর, তাহলে তোমার পাপ হয়। তবেই দেখছ, তুমি পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে তো ঘৃণা কর না।

ছেলের পক্ষে যা পাপ নয়, তা তোমার পক্ষে পাপ; কিন্তু পাপকে ঘৃণা করেও পাপীকে ভালবাসছ। ওকাজটা তোমার দিক থেকেই পাপ, ছেলের দিক থেকে নয়। কাজেই মনে রেখো, জগতে সমস্ত পাপের সম্বন্ধেই ওই এক কথা। যা করলে তোমার ক্ষতি হয়, এমন কাজকে মহাপাপ বল, প্রাণপণে সে কাজকে ঘৃণা কর, কিন্তু তা বলে অপরে যদি সে কাজ করে, তাহলে তাকে যেন ঘৃণা করো না। অপরের অন্যায় বিচার করবার কোনও অধিকার তোমার নাই।

সাদী একজন বিখ্যাত পারস্য সাহিত্যিক। ইমার্সন তাঁর লেখা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। সাদী লিখেছেন, ছেলেবেলায় তিনি একবার মহম্মদের লীলাভূমি মক্কায় যাচ্ছিলেন। ভোর বেলায় যাত্রীদের ঘুম থেকে উঠে নমাজ পড়তে হত। একদিন ভোরে সাদী আর তাঁর পিতা উঠে নমাজ পড়লেন, কিন্তু সঙ্গীরা আর কেউ সেদিন উঠল না। তারা পড়ে ঘুমুচ্ছে দেখে সাদী পিতার কাছে অভিযোগ করলেন, "দেখ দেখি বাবা, লোকগুলো কি অপদার্থ, কুঁড়ে। আজ কেউ উঠে নমাজ পড়লো না।" সাদীর পিতা গম্ভীর হয়ে বললেন, "বাছা, তুমি নমাজ পড়ে উঠেই পরনিন্দাটা না করে যদি ঘুমিয়েই থাকতে, তাহলেও ভাল ছিল। নমাজ না পড়ার চেয়ে জানবে এ পাপটা বেশী গুরুতর।"

তুমি একটা সৎকাজ করেছ; অপরে সেটা করেনি। তুমি যদি এই গুমারে ফেঁপে ওঠে অপরের সমালোচনা সুরু করে দাও, তাহলে তোমার পুণ্য বাড়ল কি? ভগবান কাছে এগিয়ে এলেন কি?—না। তুমি একটা পাপের বিনময়ে আর একটা পাপ জোটালে মাত্র। যে পাপগুলো তুমি ছেড়েছিলে, তার বদলে এই একটা নূতন পাপ জুটিয়েছ—সমালোচনা, দোষদর্শন। ওই তো তোমার মাঝে অন্ততঃ একটা পাপও থেকে গেল। তাহলে তোমার আর কি উন্নতি হল?—যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। আগে হয়ত একশ'টা পাপ ছিল, এখন তার স্থানে একটা পাপ রয়েছে; কিন্তু ও একাই একশ। কাজেই তোমার মুক্তির পথ যে খুব পরিষ্কার হল, তা আর বলি কি করে?

জগৎশুদ্ধ লোক যদি এই সমালোচনা-প্রবৃত্তিটাকে একটা জঘন্য পাপ বলে ধারণা করে থাকে, তাহলে সেটা তাদেরই দোষ। কিন্তু বার বার দেখে এটা বুঝেছি, দুটা একটা অপরাধ করে থাকলেও যার হৃদয়টা কোমল রয়েছে, জগতের চোখে দোষী সাব্যস্ত হলেও যার প্রাণটা বড় নরম, বুকভরা যার স্নেহ—সেই ভগবানের কৃপালাভ করে। যারা কূট-

বুদ্ধি দার্শনিক, তাঁদের চেয়েও এই নিরীহ বেচারীর ভগবানের উপর দাবী বেশী।

বাইবেলে আছে, ফ্যারিসীরা বড় সাধু পুরুষ ছিল; তাদের কাজেকর্ম্মে কোথাও খুঁত ছিল না। কিন্তু তাঁদের মাঝে মৈত্রী ছিল না—স্নিগ্ধতা ছিল না—ছিল শুধু কূট সমালোচনার প্রবৃত্তি। তাই তারা খৃষ্টের কৃপা পেল না; কিন্তু মেরী মডলিনকে খৃষ্ট কৃপা করলেন! অথচ এই মেরী ছিল পতিতা রমণী। ধর্ম্মধ্বজীরা তাকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা দিয়েছিল! মেরীর মাঝে সমালোচনা প্রবৃত্তি ছিল না—ছিল প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শ। তাই ফ্যারিসীদের চেয়ে সেই সত্যের, স্বর্গরাজ্যের বেশী নিকটবর্ত্তিনী ছিল।*

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা, —জানুয়ারী ১৯০৩)

বেদান্তসার

ষষ্ঠ খণ্ডবিবৃতি—অধ্যাসবাদ

অনবস্থার সন্ধানে
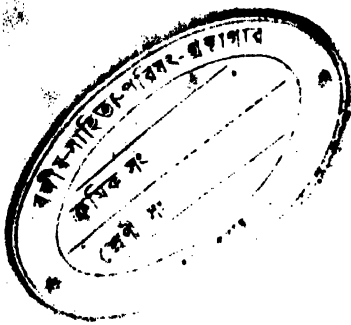
সাধারণতঃ অনবস্থা বলিতে আমরা কি বুঝি, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। তর্ক কোনও ধ্রুবসত্যায় না পৌঁছিলেই অনবস্থা দোষ ঘটিবে—ইহাই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে। কার্য্যজগতের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বেদান্তী যেখানে ভ্রমের প্রবাহ স্বীকার করিতেছেন, সেইখানেই অনবস্থা দোষের আশঙ্কা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই আশঙ্কা সত্য কি না, তাহাই বিচার করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদান্তে তত্ত্ব বিচার বলিতেই পরিণামবিচার বুঝিব। এক্ষণে পরিণামবিচারে তত্ত্ব অবস্থিত কিম্বা অনবস্থিত, তাহাই বিচার্য্য। যেখানে পরিণাম স্বীকার করিতেছি, সেখানে নিশ্চয়ই কালও স্বীকার করিতেছি। কাল অবস্থিত বা নিশ্চল, ইহা কেহ বলিবে না। কালের আদি স্বীকার করা চলে না। কেন না আদি স্বীকার করা অর্থে কালের মূলতত্ত্বে পৌঁছানো—যেখানে পৌঁছলে কাল অধঃকৃত হইবে; যে কেন্দ্রের ঊর্দ্ধে কালের স্বতন্ত্রসত্তা উপলব্ধ হইবে না। কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা ইহা নিরূপণ করা অসম্ভব। কেননা আদিকথাটাই কালবাচী। অর্থাৎ কালিক পরিভাষাদ্বারাই আমরা কালের অন্ত ধারণা করিতে চাই। কালিক বুদ্ধিদ্বারা কালের স্বতোবিনাশ—অসম্ভব ধারণা। সুতরাং কালের আদি থাকিতে পারে না। অনুভবেও বুঝি; তাহাই বিচার্য্য। যেখানে পরিণাম স্বীকার

কালকে অতীত কিম্বা ভবিষ্যতে যত দূরই ঠেলয়া দিই না কেন—তাহার পূর্ব্ব কিম্বা পরমুহূর্ত্ত থাকিয়াই যায়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, কালিকপ্রবাহ সর্ব্বদাই অনবস্থিত, অসীম। কালে ধ্রুবসত্তা স্বীকার করা চলে না। যেখানে ধ্রুব, সেখানে কালের বিরতি।

বিচারে যদি ইহাই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা যেখানে পরিণাম-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে, সেখানে ধ্রুব স্থিতি বলিয়া কিছু স্বীকার করা চলে না। এক্ষণে এই যুক্তি জগতের প্রতি আরোপ করিয়া দেখা যাউক—ফল কি দাঁড়ায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এ কথাও বলিয়াছি যে বৈদান্তিকের জগৎ প্রতীতির জগৎ। প্রাকৃত মনুষ্যের কাছে জগতের একটা বাস্তব সত্তা আছে। ভ্রমদশায় এই বাস্তবতা স্বীকার করিতে বেদান্তীরও কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া এইটুকু বলিতে চান যে, এই প্রাকৃত মনুষ্যের বাস্তব জগৎ নিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট নহে। আমাদের প্রতীতিই ইহার আধার। জগৎ প্রতীয়মান হইয়াই সত্তাবান্। তাহা হইলে জগতের বিচার করিতে হইলে, তাহার কার্য্যকারণ পরম্পরার অনুধাবন করিতে হইলে শুদ্ধ জগৎ প্রতীতি লইয়া বিচার করিলেই সমষ্টি জগতের তত্ত্ব নিরূপিত হইবে। এই জগৎ প্রতীতি বেদান্তীর মতে ভ্রমসংস্কার হইতে উৎপন্ন। এই কথা লইয়াই আমাদের গোল বাঁধিয়াছে। কেহ কেহ বুঝিয়াছেন, প্রতীতি ও সংস্কার পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া আবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ সংস্কার হইতে প্রতীতি উৎপন্ন হইয়াছে; আবার সেই সংস্কারের মূলে নিশ্চয়ই প্রতীতি ছিল; এবং উক্ত প্রতীতির মূলে ছিল সংস্কার ইত্যাদি। ইহা হইতেই অনবস্থার আশঙ্কা।

কিন্তু বাস্তবিক প্রতীতি ও সংস্কার কি নিরপেক্ষ? আত্মানুসন্ধান করিলে বুঝিব, উভয়ের মাঝে যেরূপ নিরপেক্ষ পৌর্ব্বাপর্য্য সম্পর্ক নিরূপণ করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। বলা যাইতে পারে, প্রতীতি ও সংস্কার একই অভিজ্ঞতার দুইটী পীঠ। একটী ব্যক্ত, অপরটী অব্যক্ত। প্রতীতি ব্যক্ত বোধ ও সংস্কার অব্যক্ত বোধ। উভয়ের সাপেক্ষতায় একটী সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। পূর্ব্বমুহূর্ত্তের সংস্কার ও পরমুহূর্ত্তের প্রতীতি—এই দুইটী একসঙ্গে মিলাইয়া তবে একটী বোধের সৃষ্টি। তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে যে জগৎ বোধ হইতেছে, তাহার কারণ খুঁজিতে হইলে বোধের দল দুইটী বিভক্ত করিয়া একটীকে আর একটীর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অবিচার হইবে। বরং এই কথা বলা চলে, এই মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতার পূর্ব্বে আর এক অভিজ্ঞতামুহূর্ত্ত বর্ত্তমান ছিল। সংস্কার ও প্রতীতি ওতঃপ্রোতঃ ভাবে উভয়ত্রই কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু কেহ কাহারও নিরপেক্ষ নিমিত্ত হন নাই। তাহা হইলে জগৎকে যে বিশিষ্টরূপে আমরা প্রতীতি করিতেছি—তাহা একটা অনির্ব্বচনীয় নিত্যসিদ্ধ শক্তি বলে। এই শক্তি নিয়ত। ইহাকে ভ্রম বল, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তবুও বলিতে হইবে, ইহা নিয়ত, কেননা জগতের প্রতীতির ধারাও যে নিয়ত ইহাও সর্ব্ববাদী-সম্মত। নিয়ত হইলে ইহার আর অন্যতর কারণ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না—স্বতঃ-আবৃত্ত কারণ পরম্পরা খুঁজিয়া অনবস্থা দোষের আরোপ করা তো দূরের কথা

তবে অভিজ্ঞতার পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, তাহা

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই পৌর্ব্বাপর্য্য ধরিয়া একটাকে আর একটার কারণ বলিতে সঙ্কোচ হয়, কেননা স্থূল বিচারে কারণ বিলক্ষণ হওয়া চাই। যেখানে কালের প্রবাহে নিয়ত শক্তির স্পন্দন মাত্র দেখিতে পাইতেছি, সেখানে কারণ রম্পরা স্বীকার করার কোনও প্রয়োজনই নাই—কেবল সমষ্টিভাবে স্বীকার করিলেই হইল।

শক্তিকে যদি জগতের চরম কারণ স্বীকার করি, তাহা হইলে গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু চরম বলিতে একটা ধ্রুব বিন্দু বুঝিলে চলিবে না। তবে আমরা বুদ্ধিসহায়ে বিচার করি। বুদ্ধি কালিকসংস্কার দ্বারা প্রেরিত হইয়া যতদূর সম্ভব কারণ অনুসন্ধান করিতে যায়, অবশেষে নিজের শেষ সীমায় আসিয়া সেই স্থানকেই চরম বলিয়া খুঁটা গাড়িয়া বসে। এইরূপ বৌদ্ধ নিরূপণের দিক হইতেই আমরা "চরম" কারণ বলিয়া একটা কিছু স্বীকার করিতেছি। নতুবা জগৎ কারণকে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করার মাঝে কোনও সার্থকতাই নাই—কেননা অনবস্থানই জগতের স্বরূপ, পরিণামই শক্তির ব্যক্ত স্বরূপ, এবং আমরা এই ব্যক্ত স্বরূপের সন্ধানেই বাহির হইয়াছিলাম।

তাহা হইলে বৈদান্তিকের জগৎকারণ নিরূপণ অর্থে কোনও ধ্রুব বিন্দুতে পৌছানো নয়, কেননা জগৎপরিণামে এমন কোনও ধ্রুব বিন্দু নাই-ই। তবে বেদান্তী জগৎবিচারের কি মীমাংসা করিলেন ?—বেদান্তী জগৎকে আরও গভীররূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন, অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিলাসরূপে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। যেমন বস্তুজগৎ বেদান্তীর কাছে প্রতীতি; তেমনি কারণ জগৎ তাহার কাছে শক্তি। ইহা পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাবে কারণের পরিচয় নহে, ইহা কারণের নিগূঢ় আন্তর পরিচয়। এই পরিচয়ে সমগ্রভাবে প্রবাহের বাস্তবতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকে বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধিকল্পিত ধ্রুববিন্দুকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার দুশ্চেষ্টা করা হয় নাই। জগৎ অনাদি, তাহার প্রতীতি অনাদি, এবং এই প্রতীতি ভ্রান্ত হইয়াও অনাদিরূপে প্রবহমান—ইহাই সমষ্টিভাবে জগতের তত্ত্ব।

এই বিচার হইতেই বুঝিতে পারি, অধ্যাসবাদে অনবস্থা দোষের আরোপ মিথ্যা। অনবস্থানই যাহার স্বরূপ, তাহার পক্ষে অনবস্থা দোষ হইবে কি করিয়া ? অনবস্থার আপত্তি সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে খাটিতে পারে ; সর্ব্বোপরি তাহার প্রয়োগস্থল একটা ধ্রুবসত্তার সম্ভাবনা থাকা চাই। চৈতন্যের পরতঃপ্রকাশবাদ অনবস্থা দোষের সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। চৈতন্য স্বপ্রকাশ। যদি কেহ আপত্তি করিয়া বলে, না, চৈতন্য অপর দ্বারা প্রকাশিত। আবার চৈতন্য যখন প্রকাশক, তখন শেষোক্ত চৈতন্য অপর এক চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত। আবার এই চৈতন্যেরও তাহা হইলে প্রকাশক চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়—তাহারও আবার প্রকাশক চৈতন্য চাই ইত্যাদি। এইরূপ অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, চৈতন্য স্বপ্রকাশ।

অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এখানে বিচার দাঁড়াইয়াছে ধ্রুবসত্তারই উপর। চৈতন্যের প্রসঙ্গে কোনও পরিণামের কথা বা কালিকপ্রবাহের কথা উঠে নাই, উঠিতেও পারে না। তাই বিরুদ্ধবাদীর প্রতি অনবস্থাদোষের আরোপ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে, পরিণামবিচারে, এইরূপে অনবস্থার আপত্তি সম্ভবপর ও সঙ্গত হয় না।

আমাদের বিচারের সার নিষ্কর্ষ এই—(১)

কালিকপ্রবাহে ধ্রুব স্বীকার করা চলে না; (২) জগৎকারণ অবাঙ্মানসগোচর, সুতরাং সর্ব্বদাই অনবস্থিত, ধ্রুবত্বনির্দ্দেশ বুদ্ধিসাপেক্ষ মাত্র; (৩) অনবস্থার প্রামাণ্য ধ্রুবপরম্পরায় —যেখানে অবস্থানের সম্ভাবনা আছে, যেমন চৈতন্যের প্রকাশসম্বন্ধীয় তর্কে; (৪) বৈদান্তিকের ভ্রমপ্রবাহের অনাদিত্ববাদ জগৎতত্ত্বের অনবস্থিতত্বেরই প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছে; সুতরাং যাহা স্বরূপ বলিয়া প্রমাণিত, তাহাকে দোষ বলিয়া স্বীকার করা চলে না।

এখন আর একটী প্রশ্ন মীমাংসিত হইলেই এই প্রসঙ্গ শেষ হইবে। জগতের কারণ যদি অনাদি ভ্রমের প্রবাহ হয়, তাহা হইলে এই অনাদি প্রবাহ ও ব্রহ্মে সম্বন্ধ কি? এমন প্রশ্নও কেহ করিতে পারেন যে এই ভ্রমসংস্কারের হেতু কি? অবশ্য শেষোক্ত প্রশ্ন অসৎ; কেননা এই প্রশ্নের অর্থ এই সৃষ্টির আদি কোথায়? কারণ ভ্রমসংস্কারই তো সৃষ্টি, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাকৃত ব্যক্তির বাস্তব জগৎ আর বেদান্তীর প্রতীতির জগৎ; সুতরাং সংস্কারই সৃষ্টি—ইহা অমূলক নয়। সৃষ্টির আদি নাই। কেন নাই, তাহা বলিতেছি।

ব্রহ্মের ঈক্ষা হইতে সৃষ্টি, বেদান্তীর ইহাই মত। ঈক্ষা বলিলে গুণের বিক্ষোভ বুঝি। তাহা হইলে সৃষ্টাংশে ব্রহ্ম সগুণ। আবার তাহার ঊর্দ্ধেও—"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ইহাই নির্গুণ ভাব। তাহা হইলে ব্রহ্মে সগুণ নির্গুণ দুইয়েরই যুগপৎ সদ্ভাব। সগুণকে যদি সৃষ্টিপর বলি এবং তাহার আদি কল্পনা করি, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে এক সময়ে ব্রহ্মে গুণের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম কালদ্বারা খণ্ডিত হইলেন। ইহা পূর্ণত্বের লক্ষণ নয়। তাই বলিতে হয়, ব্রহ্মের সগুণ ভাবও নিত্য, নির্গুণ ভাবও নিত্য। ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আবর্ত্তন আছে, কিন্তু তাহাতে সমষ্টিভাবে ঈক্ষণস্বভাবের কোনও অপলাপ ঘটিতেছে না। ইহাতেই প্রমাণিত হইল, সৃষ্টি অনাদি। সুতরাং ভ্রম সংস্কারও অনাদি।

আমরা অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতেছি। তাহার সহিত এই তত্ত্বের কি সম্পর্ক, তাহাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল। অখণ্ডৈকরসতত্ত্ব নির্গুণ। সৃষ্টি সগুণ। সৃষ্টিকে লীলা বলি। লীলাও অসীম, নিত্যও অসীম। যদি সমাহিতচিত্তে অনুশীলন করি, তাহা হইলে দেখি, দুইটীতে ওতপ্রোতঃ হইয়া এক অখণ্ড মাধুর্য্যরস বিস্তার করিতেছে। আর যদি আত্মানুসন্ধিৎসুর বিচারদৃষ্টি দিয়া দেখি, তাহা হইলে বলিতে পারি, দুইটী যেন সমান্তরাল ধারা। আমার মাঝেই দুইটী ধারা দেখিতে পাইতেছি। একটী সংসারবৃক্ষে স্বাদু, কটু, কষায়, ফল ভক্ষণ করিতেছে, অপরটী না খাইয়া শুধু দেখিতেছে। এইরূপ করিয়া দুইটী ক্রমেই সন্নিকট হইতেছে—ফলভোক্তাই ক্রমে দ্রষ্টার কাছে চলিয়াছে। অবশেষে নীচের পাখিটী উপরের সঙ্গে মিশাইয়া গেল—তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিল না! ফলভোক্তা পাখীটার ইহাই হইল মুক্তি; কিন্তু দ্রষ্টা দেখেন, একটী প্রতিবিম্ব মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু আবার আর একটী পাখী ভাসিয়া উঠিয়াছে—আবার পূর্ব্বের মত ফল খাইতে খাইতে ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে। অথবা আর একটা পাখীই বা বলি কেন? কালের ব্যবধানই বা বলি কেন? দ্রষ্টা দেখিতেছেন,

একটী ভোক্তা লীন হইয়া গেল বটে, কিন্তু তবুও তো ভোক্তার অভাব হইল না। লীন হইয়াও তেমনিই লীলা রহিয়া গেল? তবে কি ভোক্তার ভোগ ইন্দ্রজাল মাত্র? তাহার মুক্তিতে লয়ও ইন্দ্রজালমাত্র? সবই মায়া? অনির্ব্বচনীয় রসে ভরপুর হইয়া দ্রষ্টা এই চিরন্তনী লীলা দেখিতেছেন। দুই-ই সত্য। আমাদের দিক হইতে বলি, সগুণ আর নির্গুণ—দুইটী সমান্তরালধারা; একধারা হইতে আর একধারাতে পা বাড়াইলেই আমাদের মুক্তি—তাহাই আমাদের পুরুষার্থ, ইহার জন্যই চেষ্টিত হইতে হইবে। কিন্তু উপরের দিক হইতে দেখ—দুয়ে মিলিয়া এক। এক না দুই? কে নিরূপণ করিবে? দুইয়ে এক হইলেও আনন্দ, এক দুই হইলে বিলাস। সমগ্রভাবে বলি ব্রহ্ম পূর্ণতত্ত্ব। সর্ব্বত্রই পূর্ণ—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭১।৩

ভাবের বুলি হেঁয়ালী বলে মনে হয়, যদি শুধু তার শব্দের দিকে তাকান যায়। প্রকৃত ভাব যে বুঝে, তার কাছে কিছুই হেঁয়ালী নয়;—কেননা তিনি অসীম, তাঁকে যে যাই বলে তাই সত্য। কেউ বলে "শাশ্বত সত্য, কেউ বলে "অসীম সৌন্দর্য্যময়" কেউ বলে অখণ্ড প্রেমস্বরূপ। এর মাঝে কোনটা দিয়েই তাঁর সম্পূর্ণ ধারণা হয় না, অথচ কোনটাই মিথ্যা নয়। সেই যে এক বিরাট, সুন্দর, মধুর, জিনিষ, যা নাকি শুধু "অস্তীত্যুপলব্ধঃ, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"—তাই তিনি। তিনি নির্ব্বিশেষ।

তবে তাঁকে আমরা বিশেষিত করি কেন?—না বিশেষ একটা উপলক্ষণ না হলে তাঁকে আমরা প্রকাশিত করতে পারি না স্মরণ রাখতে পারি না। তাই আমরা নামরূপের মাঝ দিয়ে আমাদের ভিতর নামিয়ে আনি। তিনি সর্ব্বময়—কাকেই যে যা বল্লে তাঁকে মনে পড়ে, তাই বলে তাঁকে ডাকে। কেউ যদি তাঁকে বলে, "তিনি অনন্ত জ্যোতিঃ" তবে শান্ত জ্যোতিঃ থেকে তাঁকে বিশেষিত করা হয়—অর্থাৎ খণ্ড কিছুর পক্ষে যে তিনি অতুলনীয়, অথচ সমস্ত খণ্ড তাঁর মাঝে নিহিত, অতএব তিনি অখণ্ড—এ দ্বারা এই প্রমাণিত হয়। তাঁকে যে যত বড় "অসৎ" দিয়ে প্রকাশ করুক না কেন, তিনি সকল অবস্থাতেই "সৎ" চিৎ আনন্দস্বরূপ আছেনই।

*

নির্ভর করিব বলিয়া যে অন্ধকারে চোখ বুজিয়া চলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই—তাহাতে নিজেই ঠকিব। জাগ্রত হইয়া, অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহাকে সত্য এবং শক্তিরূপে অনুভব করাই যথার্থ নির্ভর।

*

শক্তি তোমার কিছু আছেই, নইলে মানুষ হতে না; তবে তাকে কর্ম্মে প্রয়োগ করে তারই ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম কর। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হলে ঠেকে শিখবে—প্রমাণ দ্বারা জানতে পারবে যে, এই ক্ষুদ্র 'আমি'টার শক্তি কত সঙ্কীর্ণ। তার তখনই ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ভর আসবে। তার আগে যে বিশ্বাস আসে, তার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে নাই।

*

দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও নিজের ভিতর ডুবিয়া দেখিতে হইবে—হৃদয়ে কাহার আরাধনা করিতেছি. তাঁহার না তাঁহার প্রজার ? তিনি রাজরাজেশ্বর, ভালমন্দ সকলেই তাঁর প্রজা। ভালর সঙ্গে মন্দের যেখানে বিরোধ লাগিয়াছে—সেখানে ভাল মন্দ উভয়কেই ছাড়াইয়া তারও ঊর্দ্ধে মনকে সমাহিত রাখিয়া তাঁহার শরণ লইতে হইবে। কিন্তু আমরা তো তাহা করি নাই—আমরা ভাল দিয়া মন্দের নিরসন করিতে চাহিয়াছি, সুখ দিয়া দুঃখের ঘোর কাটাইয়া উঠিতে চাহিয়াছি। তাই আমাদের জীবনে ঠোকাঠুকির অন্ত নাই—সমস্ত সুখ দুঃখকে ব্যাপ্ত করিয়া এক নির্ম্মল আনন্দে নিজের মধ্যে নিজে উজ্জ্বল হইয়া থাকা—এ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। সর্ব্বাবস্থার অতীত থাকা, নির্লিপ্ত থাকা—এ ছাড়া তাঁকে ধ্যান করিবার উপায় নাই।

*

হৃদয়কে পূর্ণ করতে হবে-অভাবের নিরসন দ্বারা নয়, ভাবের প্রতিষ্ঠা দ্বারা। ভাল-মন্দ স্বস্তি-অস্বস্তি, সকল অবস্থার কেন্দ্রস্থলে মনকে রাখতে হবে—কারু কোনঘেঁষা হতে গেলে চল্বে না। কারু উপর রাগ করবে সহজ মন নিয়ে;—আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার সময় মন যাতে তেমনি সহজ রাখতে পার, তারই চেষ্টা করবে।—তবেই সমঞ্জস হতে পারবে, হৃদয় উদারতায় পূর্ণ হবে। নতুবা শুধু ভাবের রাজ্যেও মনকে যদি ছুটাছুটি করতে দাও, তাতে শক্তি কম্‌বে বই বাড়বে না।

*

স্থির, অচঞ্চল প্রেম মনের কেন্দ্রকে অধিকার করে থাক্‌বে—প্রেমে মণ্ডিত হয়ে তবে মন অন্য ভাব নিয়ে লীলা করবে। নতুবা জগতে কোনটা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা চিনবে কি করে ? অস্পষ্ট কোন ধারণাকেই মনে স্থান দিতে নাই। যাকে অবলম্বন করবে, প্রাণে প্রাণে তাকে বিশ্বাস করবে। নতুবা ঘরের বিভীষণকেই হয়ত কোন্‌দিন দেখবে, সে মহাশত্রু হয়ে বসেছে। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" ধর্ম্মের পথ, সত্যের পথ—একে সকলদিক দিয়েই জানার নামই জ্ঞান আর পূর্ণভাবে পাওয়ার নামই প্রেম।

*

কোনখানেই পরাভূত হব না—এই হল সাধনা। শক্তি দিয়ে প্রবৃত্তিকে বশ করতে চেষ্টা করব। যেখানে শক্তিতে কুলাবে না, সেখানে কৌশল; যেমন ভোগ্যকে সরিয়ে দিলাম, নয়ত নিজে সরে এলাম। কৌশলেও যেখানে পারব না, সেখানে প্রেম দিয়ে তাকে বশ করতে হবে। অনাসক্তি প্রেমেরই শক্তি। অনাসক্ত চিত্তের বন্ধন নাই।

*

শক্তি দিয়েছ, উৎসাহ দিয়েছ, তুমিই আনন্দরূপে হৃদয়াকাশ আলোকে পূর্ণ করে দিয়েছ;—আবার এই মুহূর্ত্তেই যদি সব কেড়ে নাও, তাহলে আমার বলে জগতে এমন কি

আছে' যা দিয়ে তোমাকে বাধা দিই প্রভু? প্রভু, তুমিই যে বাধা হয়ে আনন্দকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছ, দুঃখ হয়ে সুখের গোলাপে কণ্টক সেজে বসেছ—সকলদিকেই যে তুমি সমঞ্জস, সার্ব্বভৌম এ কেন আমরা বুঝেও বুঝি না? বুঝি না বলেই তোমাকে পেতে চাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের রাজ্যে। ইন্দ্রিয়াতীতরাজ্যে যে তুমি আরো সহজ—এ কথা ভুলে গিয়েই তো আমরা ভোগে আসক্ত হই। চিত্তে দৃঢ়তা দাও—আর যেন না ভুলি।

*

নিজকে উপরের দিকে উঠিয়ে নেওয়া পরের কথা—যে অবস্থায় আছি, তার মাঝে স্থির থাকাই আগে দরকার। অনেক সময় মনের উচ্চ উচ্চ কল্পনাকেই আমরা শক্তি বলে মনে করি—অভিমানের নীচের দিকে অর্থাৎ নিজের প্রকৃত অবস্থার দিকে তাকাই না। এতেই সর্ব্বনাশ হয়। প্রকৃত শক্তিলাভ না করে আগেই যদি বাইরে কসরৎ দেখানোর লোভ এসে পড়ে, তাহলে যে জমার ঘরে টান পড়ে।—দুদিন পরে দেখি কল্পনা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে। এই যে কল্পনার বাড়াবাড়ি, এরি নাম উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাস মনঃসংযমের প্রধান অন্তরায়। সংযম না থাকলে শক্তির বিকাশ হয় না। অন্তরে একটা মহাশক্তি অনুভব না করলে মানুষ স্থির থাকতে পারে না। শক্তিলাভই সাধনা। সংযত কল্পনা নিরুচ্ছ্বাস কর্ম্মচেষ্টা ও সংযম তার সহায়।

*

কিছুই চাওয়া উচিত নয়। কামনা যেখানেই প্রয়োগ করি না কেন, একদিকে না একদিকে নিজের সঙ্কীর্ণতাকে প্রকাশ করবেই; যদি একদিকে চাওয়া যায়, অপরদিকে তখন খেয়াল থাকে না—একটা আনতে আরটা থাকে না। কাজেই দেখছি, কামনা থাকতে কামনার পূর্ণতা নাই। যখন আমার চাহিবার কিছু থাকবে না—একান্ত নির্ভরে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা যখন তাঁর মহাইচ্ছায় মিলিয়ে যাবে, তখনই অভাব মিটবে। অভাব যত মিটবে, ততই ভাব ফুটবে, শান্তি আসবে।

*

কর্ম্ম আকারে আমা হতে বৃহৎ হতে পারে, কিন্তু মহত্বে তা হতে তো আমি হীন নই। সে আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু পরাভূত করবার শক্তি তার নাই। মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করতে পারে, কিন্তু তাঁর জ্যোতিঃ কি তাতে কখনো লোপ পায়? আমার এই দেহের মাঝে তেমনি আনন্দ আমার জ্যোতিঃ—আনন্দের অনুভূতিতে আমি মহতো মহীয়ান্, সেই আনন্দস্বরূপের সঙ্গে যুক্ত; জগতে এমন কি আছে, যা আমার আনন্দ লোপ করতে পারে? তবে করে কেন?—করে সেখানেই, যেখানে নিজের স্বরূপ আমি ভুলে যাই, কর্ম্মে নিজকে অভিভূত মনে করে তার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হই। সুখ দুঃখ আনন্দেরই লীলাকন্দুক—এই সত্য।

*

ভিতরে যখন অকারণে অপূর্ণতা আসে, তখনই বুঝ—তিনি কিছু দিবেন, তাই আপনা হইতেই তাহার জায়গা হইতেছে। মন উদাস হইলেই অভিমানের হ্রাস হয়—কাজেই অভিমান না থাকিলে যাহা হইবার, তাহাই হয়—আসে। অভাব যখন আসে, তখন তাহাতে ব্যাকুল না হইয়া ভাবে, ধ্যানে মগ্ন হইতে হয়—তবেই অভাবের সূচনা সার্থকতায় পরিণত হয়।

———*———

ভক্তসম্মিলনী

—*—

গত ১১ই পৌষ শুক্রবার হইতে ১৩ই পৌষ রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ত্রিপুরা ময়নামতী সারস্বত-আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১০ম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎপরমহংসদেব স্বয়ং অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার সমস্ত অঞ্চল হইতে হাকিম, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী, ব্যবসায়ী ও জমিদার প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণই উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সুদূর মাদ্রাজ ও বিহার হইতেও দুই একটী ভক্ত আসিয়াছিলেন।

প্রথম দিবস ভগবান্ জগদ্গুরুকে সভাপতিরূপে আবাহন করিয়া বন্দনাগীত ও স্তোত্রাদি-পাঠান্তে বেলা ১২টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন বি, এ, একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও গত বৎসরের কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হয়। মঠ ও আশ্রমগুলির আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হয়। সেবক, বিভাগীয় ও জেলা সদস্যগণের কর্ত্তব্য এবং মঠ ও আশ্রমগুলির উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ আশাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ৪টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ভক্তগণের মধ্যে কাহারদ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে বিবৃত করিয়া সমবেত গুরুভাইগণকে পরস্পর পরিচয় করাইয়া দেন। যে সকল সভ্য ও ভক্তগণ সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়। অনন্তর শ্রীগুরুর কৃপা, চরিত্র ও পরিবারগঠন, আদর্শ গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা, ভাববিনিময়, সঙ্ঘশক্তি এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতান্তে সভাভঙ্গ হয়।

তৃতীয় দিবস সর্ব্বজন শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাসগুপ্তের প্রস্তাবে ও উকিল শ্রীযুক্ত নর্ম্মদাকুমার সেনের অনুমোদনে এবং সাধারণের সমর্থনে অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন আচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমিল্লাসহর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু গণ্যমান্যব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্রসেন বি, এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভৌমিক প্রভৃতি এবং সমাগত কতটী ভদ্রলোক সারস্বতমঠ ও শাখাআশ্রমগুলির উদ্দেশ্য, ময়নামতীর ইতিহাস, সনাতনধর্ম্মপ্রচার, এবং সৎশিক্ষাপ্রচারকল্পে আশ্রমাদর্শে ঋষিবিদ্যালয় স্থাপনসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয় সারস্বত গ্রন্থাবলী হইতে সাধারণকে কিছু উপদেশদান এবং আশ্রমগুলির মহদুদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ইহার স্থায়ীত্ব ও উন্নতিবিধানকল্পে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হলধর দে এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সভাপতি ও সমাগত ভদ্রলোকগণকে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হয়। এই দিবস প্রায় সহস্রাধিকলোক আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আগামী বর্ষে প্রেসিডেন্সি বিভাগের হালিসহর সারস্বত-আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১১শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকার ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমের ঋষিবিদ্যালয়ের, মন্দির সংস্কারের এবং বদ্ধ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য তত্রত্য আশ্রমের ব্রহ্মচারী ব্রজদাস এবং ব্রহ্মচারী জিতেন বঙ্গের কতিপয় স্থান ভ্রমণ করিয়া বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য যাইবেন। শ্রীমৎ সারদানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে অর্থ সংগ্রহ করিবেন।

ঋষিবিদ্যালয়

আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমে ঋষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। দশজন ছাত্রের আহার, পরিধেয়বস্ত্রাদি এবং পাঠ্যপুস্তকাদি প্রভৃতির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আশ্রম বহন করিবেন। তদতিরিক্ত ছাত্রেরা যে কোন জাতিই হউক, নিজব্যয়ে আশ্রমে থাকিয়া ঋষিবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারিবে। একটী ছাত্রের মাসিক ব্যয় ১০৲ দশ টাকা। নিয়মাদি মঠের ন্যায়। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

অধ্যক্ষ—ভাওয়াল সারস্বত আশ্রম
পোঃ জয়দেবপুর (ঢাকা)

গ্রাহকগণের প্রতি—প্রেস-সংক্রান্ত নানাগোলমালে এই মাসের পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল—এ জন্য আমরা দুঃখিত, আগামী মাসের পত্রিকা প্রকাশেও কিঞ্চিৎ গৌণ হইতে পারে। অতঃপর যাহাতে প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাঝে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে আমরা সচেষ্ট থাকিব।

মানুষকে ভাল-মন্দ, দোষগুণের চশমার ভিতর দিয়ে দেখো না—মানুষকে ভগবৎবিগ্রহজ্ঞানে ভালবাস, একাত্মজ্ঞানে সহানুভূতি কর—আর প্রাণভরে তাকে শ্রদ্ধা করতে শেখ। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এমনি স্বাভাবিক শক্তি যে অতি সহজেই মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতরভূমিতে নিয়ে যেতে পারে। মানুষের অন্যায় ত্রুটীর জন্য দুঃখ অনুভব কর কিনা বুকে হাত দিয়ে তা পরীক্ষা কর। দুঃখ অনুভব করে তার হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়াই ভালবাসার প্রথম লক্ষণ।
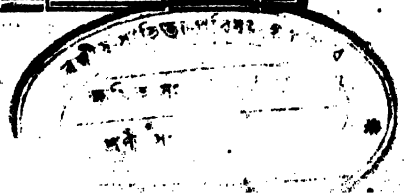
(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা

রথযাত্রা

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৩।৯]

অধস্মা ন উদবতা সজোষসো রথং
দেবাসো অভিবিক্ষু বাজয়ুম্।
যদাশবঃ পদ্যাভিস্তিত্রতো রজঃ
পৃথিব্যাঃ সানৌ জংঘনন্ত পাণিভিঃ॥

উতস্য ন ইন্দ্রো বিশ্বচর্ষণির্দিবঃ
শর্ধেন মারুতেন সুক্রতুঃ।
অনু নু স্থাত্যবৃকাভিরূতিভী
রথং মহে সনয়ে বাজসাতয়ে॥

উতস্য দেবো ভুবনস্য সক্ষণিস্ত
ত্বষ্টাগ্নাভিঃ স জোষা জূজুবদ্রথম্॥
ইলা ভগো বৃহদ্দিবোত রোদসী
পূষা পুরন্ধিরশ্বিনা বধাপতি॥

উত ত্যে দেবী সুভগে মিথদৃশা
উষাসানক্তা জতামপীজুবা
স্তুষে যদ্বাং পৃথিবি নব্যসা বচঃ
স্থাতুশ্চাবয়স্ত্রিবয়া উপস্তিরে ॥

অন্ন চাই, জনসঙ্ঘমাঝে তাই ছোটে কর্ম্মরথ
বরিষ আশিষ্ দেব, তুষ্ট হয়ে মুক্ত কর পথ।
ছুটিছে তুরঙ্গ ওই—পদাঘাতে উড়ে ধূলিজাল—
বন্ধুর ধরার বক্ষ খুরঘায় বাজিছে করাল!

ঝড়ের প্রচণ্ডবেগে কর্ম্মমাঝে পড়ে যে ঝাঁপায়ে
বিশ্বদর্শী ইন্দ্র সেই আসিবে কি দ্যুলোক কাঁপায়ে?
সঙ্কট আবর্ত্ত হতে সে কি নাহি বাঁচাবে ইহারে—
ভরি দিবে রথখানি ধনে আর অন্ন ভারে ভারে।

ত্বষ্টা দেব, প্রীতি যার ত্রিভুবন করিছে বহন,
দেবশক্তি সাথে আসি রথ রশ্মি করিবে গ্রহণ?
আসিবে কি জ্যোতির্ম্ময় ভগ, কিম্বা পূষা ইলা আর,
অথবা রোদসি কিম্বা সূর্য্যপতি অশ্বিনীকুমার?

আসিবে কি দুই দেবী—সুমঙ্গলা উষা আর নিশি?—
চেয়ে থাকে পরস্পরে চঞ্চলিয়া উঠে দশদিশি!
অথবা রোদসী এস, গাঁথিয়াছি নব স্তুতিহার—
সঞ্চিত ত্রিবিধ অন্ন, ধর এই মর্ত্ত্য উপহার।

শিক্ষা-সমস্যা

—*—

মানুষের মাঝেই হোক্, আর ইতর প্রাণীর মাঝেই হোক্, একরকমে না একরকমে শিক্ষার প্রয়োজন সবজায়গাতেই যে আছে, তা আমরা স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখন মানুষকে যদি ইতরসাধারণ হতে পৃথক করে নিই, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে উভয় জগতে মোটামুটী রকমের একটা প্রভেদ দেখতে পাই। ইতরজগতের শিক্ষা প্রকৃতির প্রেরণায় সহজাত সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; মনুষ্যসমাজের শিক্ষার উপর মনুষ্যবুদ্ধির কারিগরীর ছাপ সুস্পষ্ট। এই জন্য ইতঃস্ততঃ না করে আমরা বল্‌তে পারি, একরকমে প্রাকৃতিক শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সম্পূর্ণ; একটা জানোয়ারের জীবনযাত্রার পক্ষে যা শেখা প্রয়োজন, প্রকৃতি অতি নিপুণভাবেই তা শিখিয়ে দেন, কাজেই জানোয়ারটা পূর্ণমাত্রাতেই জানোয়ার হয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা পদ্ধতির ফলে একটা পূর্ণমানুষ গড়ে উঠেছে, এটা সচরাচর দেখা যায় না। এই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে, মানুষের মাঝে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার অভাব কি করে দূর করা যেতে পারে।

শিক্ষার আদর্শ রূপ কি হবে, মানুষ তা চিরকাল খুঁজে এসেছে। হয়ত কেউ তা আবিষ্কারও করেছে। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির পক্ষে তা সমানভাবে প্রযোজ্য হয় নি। প্রত্যেক প্রাচীনজাতিই আপন আপন শিক্ষা-পদ্ধতির গৌরব করে এসেছে; আর আধুনিক জাতির মাঝে এ সম্বন্ধে গবেষণা ও বাগ-বিতণ্ডার তো অন্তই নাই। কিন্তু তবুও পূর্ণ শিক্ষার স্বরূপ জাতীয়-আদর্শরূপে কোথাও ফুটে উঠেছে বলে তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

মানুষের শিক্ষার অপূর্ণতার কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্ম্মশক্তি অসাধারণ। তাই পশু যেমন আবহমান কাল হতে একইরকমে জীবন কাটিয়ে এসে অবশেষে পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় উদ্ভাবনীশক্তির অভাবে ধ্বংসের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়, মানুষ তা হয় না। যেমন করেই হোক, সে বাঁচবেই, এই তার পণ। বাঁচার উপায় সম্বন্ধে পরিস্থিতি অনুযায়ী মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। তাই শিক্ষার ভেদ হওয়াও স্বাভাবিক। এই বিভিন্ন শিক্ষার মাঝে যে শিক্ষা যে জাতকে বেঁচে থাকবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী করে তুলেছে, সেই শিক্ষাকেই আদর্শের নিকটতম বলে স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষের কর্ম্ম বিচিত্র। তারপর প্রত্যেক মানুষের মাঝেই নানা জটিলতা আছে। সুতরাং আদর্শও সকলের উপর সমানভাবে ক্রিয়া করে না। তাই শিক্ষায় পুরোপুরি মানুষ গড়ে ওঠা অনুকূল পরিস্থিতিতেও সম্ভবপর হয় না।

তারপর অন্যান্য প্রাণীর বিকাশের যেমন একটা সীমা আছে, মানুষের তা নাই। মানুষের যে কি হতে পারে, কি না হতে পারে, এ সম্বন্ধে সে নিজেই অনেক সময় অচেতন থাকে। একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে—এই আশাই শিক্ষার নিয়ন্তা। কিন্তু সে ভবিষ্যতের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট আছে। এ ক্ষেত্রে

পরিপুষ্ট পশুজীবন হতে ব্রহ্মবিৎ ঋষির জীবন পর্য্যন্ত সকলপ্রকার আদর্শই স্থান-কাল পাত্রভেদে সমভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে। এক যুগের প্রচারিত আদর্শ অপর যুগের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে না। তখন সঙ্গতি থাক আর না থাক্, প্রাচীনপন্থাকেই শ্রেয়: বলে স্বীকার করতে মানুষের একটা রোখ পড়ে যায়। তা ছাড়া দেশভেদে যে আদর্শ ভেদ হয়, তাও পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করে থাকে। এক বিষয়ে একটা দেশ যদি উন্নত হয়, এবং অপরদেশ যদি সে বিষয়ে কাঁচা থাকে, তবে সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার না করে অনুকরণ দ্বারা সে অপরের শিক্ষার ফল আয়ত্ত করতে চায়। মোট কথা, ধারণাশক্তি বিভিন্ন হওয়াতে শিক্ষার আদর্শও যেমন ভিন্ন হয়, তেমনি বিচার-বুদ্ধি জাগ্রৎ রেখে আদর্শ নিরূপণ না করার দরুণ শিক্ষার ফলও পূর্ণভাবে প্রকট হতে পারে না।

এ তো গেল অপূর্ণ শিক্ষার সমষ্টিগত কারণ। সমষ্টিভাবে এর প্রতীকার করতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। কারণ সমষ্টি জিনিষটা কেবল একটা বৃহৎ সংখ্যা নয় যে ব্যক্তি-বিশেষের মস্তিষ্কের হুকুম মেনে তা চল্‌বে। সমাজের যে কোনও বিষয়ে সমষ্টিভাবে প্রগতি হয়েছে বলে স্বীকার করলেও, এ কথাও ধরে নিতে হবে যে উপরিউক্ত সমষ্টির কোনও অংশ যেমন পিছিয়েই আছে, তেমনি কোনও অংশ আবার নিদারুণ উৎসাহে একটু বেশীর ভাগ এগিয়েও পড়েছে। আগে পেছনে এমনি টানা-হ্যাঁচড়া না চল্‌লে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়; সুতরাং এই টানা-টানিকে স্বাভাবিক বলেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কিন্তু যাঁরা আদর্শের প্রচারক, তাঁরা প্রায়ই এ কথাটা ভুলে যান। সমষ্টিভাবে একটা আদর্শ একটা সমাজে প্রচারিত হল না কেন, অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত সমাজের কাছে তাঁরা এর জবাবদিহী চেয়ে থাকেন। একটা আদর্শকে সর্ব্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য করবার বাতিকে অনেক সময় অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষাতেও বিপরীত ফল ফলে থাকে। এই জন্য সমষ্টির উন্নতি কামনার সময় ব্যষ্টির মঙ্গলের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আদর্শবাদীদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব অসামান্য। একটা জাতিকে সব দিক থেকে বুঝে আয়ত্ত করা ও আপন ইচ্ছামত পরিচালনা করা অমানুষিক কাজ। কিন্তু ব্যক্তিকে সহজেই আয়ত্ত করা চলে এবং তার ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রেখে তার শোধন ও বোধন উভয়ই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হতে পারে। অবশ্য সমষ্টির দৃষ্টিতেও ব্যষ্টিকে বিচার করতে হবে— এইটুকু হল সংযমের শিক্ষা। কিন্তু ব্যক্তির প্রেমে যদি ব্যক্তি আশ্রয় ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ না করে, তবে কেবল সমষ্টির দিকে তাকিয়ে আদর্শপ্রচার করা নিষ্ফল হবে।

শিক্ষার সমস্যাকেও আমাদের মতে ব্যক্তির দিক হতেই আলোচনা করা উচিত। শিক্ষার সমস্যা জীবনেরই সমস্যা। প্রত্যেকটী জীবন যেমন অনুভূতি ও বেদনাতে স্বতন্ত্র, শিক্ষাও তেমনি স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাসমস্যার যতটুকু সমাধান আমরা করতে পারি, তার প্রতি উদাসীন হয়ে কেবল সমষ্টির আদর্শ প্রচার করা এবং সেই আদর্শকে নিষ্ফল হতে দেখে দেশের নিন্দায়, জাতির নিন্দায় মনের ঝাল মিটানো—এতে কোনও পক্ষেরই কোনও লাভ নাই। অল্প মূলধনে বেশী লাভের ফিকির করা আমাদের একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্যই জীবনের

সমস্তক্ষেত্রেই আমাদের কেবল ভাগাভাগি। শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাগাভাগি হয়েছে—তার ফলে সমাজের মাঝে শিক্ষক-সম্প্রদায় বলে একটা সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের কৃতিত্ব এই যে, এঁদের একজনের গুণে অমন হাজার হাজার ছেলে "মানুষ" হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার, শিক্ষার আদর্শ উন্নত করা—সমস্তই শিক্ষার ফলকে লক্ষ্য করে, কেননা ফলকে বাতিল করলে কলিযুগের মাহাত্ম্য যে খর্ব্ব হবে।

যেখানে ব্যষ্টির প্রাণলীলাকে আহত করা হয়েছে, সেইখানেই শিক্ষায় কৃত্রিমতা এসে ঢুকেছে। স্বভাবে স্বাচ্ছন্দ্যকে রুদ্ধ করলে কেবল অস্বাস্থ্যকেই আবাহন করে আনা হয়। শিক্ষার অস্বাস্থ্যকর পরিণাম আমরা সব দিকেই দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষকেরা যে কেউ ছাত্রের অহিত কামনা করেন, তা নয়—তবুও সর্ব্বত্রই হিতের চেয়ে আহতের মাত্রাই বেশী হয় কেন? এর একমাত্র কারণ এই যে ব্যক্তিগত জীবনে স্বভাবের লীলাকে স্ফূর্ত্ত হতে দেওয়া হয় নি। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে প্রকৃতির শিক্ষায় একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জানোয়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু মানুষের শিক্ষায় একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ সৃষ্টি হয় না। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেটা আপাততঃ মাত্র। আসল কথা, মানুষ তার উন্নততর প্রকৃতিকে বাধা দিয়েছে বলেই তার আত্মহিত চেষ্টাও বিফল হয়েছে। প্রকৃতি একটা কাজ ধীরে-সুস্থে করে; একটা বীজ হতে একটা বনস্পতি গড়ে তুলতে তার সময় লাগে; সে জন্য তার ব্যস্ততাও নাই, লজ্জাও নাই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির বাহাদুরী এইটুকু যে, সব-জায়গাতেই সে সময় সংক্ষেপ করতে চায়। সে চায় সোজা রাস্তা। আলাদীনের প্রদীপের উপরেই তার লোভ। মানুষের এই দুশ্চেষ্টাকে মিথ্যা বলছি না কিন্তু বলছি এর সংযম প্রয়োজন। প্রকৃতির শত বৎসরের কাজ মানুষ দশ বৎসরে করছে—এইখানেই শিক্ষার কেরামতী. এ কথা হাজারবার স্বীকার করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব যে এটা বাস্তবিক প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই নয়—তারই উন্নততর নিয়মের অনুসরণ। মানুষের বুদ্ধিও প্রকৃতির দান; সুতরাং তারও একটা স্বাভাবিক গতি আছে। এই স্বভাবের গতিকে সহজভাবে প্রবাহিত হতে দিতে হলে, সহিষ্ণুতা চাই। কর্ম্মফলের উৎকট আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করা চাই, শান্ত সমাহিত চিত্তে প্রকৃতির সঙ্কেত ধারণা করে বুদ্ধিকে তদনুকূলে পরিচালনা করা চাই।

যে শিক্ষাপদ্ধতিতে মানুষের বুদ্ধির জয় জয়কার, সেই শিক্ষাপদ্ধতিতে যদি সহিষ্ণুতা থাকত, সর্ব্বোপরি প্রকৃতির আইন বুঝে ব্যক্তিগত স্বভাবে দৃঢ়তা ও সংযম থাকত, তাহলে শিক্ষায় আরও সুফল ফলত। কিন্তু যে কোনও মানুষের শৈশব জীবন হতে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত যদি আলোচনা করে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এই শিক্ষা জীবনের মাঝে প্রকৃতির মর্য্যাদা যে কতবার লঙ্ঘিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। কোথায়ও হয়ত অপরিমিত শৈথিল্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, আবার কোথায়ও বা অযথোচিত শাসনে প্রাণকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। যার যে কর্ত্তব্য বহন করা উচিত ছিল, সে তা করেনি, কিম্বা অপাত্রে, তার ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থেকেছে;—ফলে একটা মানুষের জীবন পণ্ড হয়ে গিয়েছে আর এই সমস্ত

অনৈসর্গিক অত্যাচারের সংস্কার তার সন্তান সন্ততির উপরও ক্রিয়া করছে।

মানুষের প্রথম ভুলই হয়েছে যখন সে তার সন্তানের জন্য নিজের "আলয়ে" "বিদ্যার" ব্যবস্থা না করে পৃথক একটা বিদ্যালয় ফেঁদে বসেছে। অবশ্য মানুষের পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী। কিন্তু তা বলে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি হতে কোনও অজুহাতেই তো রেহাই পাবার যো নাই। স্কুলের যে কোনও প্রয়োজন নাই, সে কথা বলছি না। কিন্তু "স্কুল" আর "বাড়ী"—এই দুটী বিভিন্ন পরিভাষার সন্তানের মনে, তার পিতামাতার মনে, তার শিক্ষকের মনে যে বিভিন্ন মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, তারই বিশ্লেষণ করে দেখতে বলছি যে আমরা ঠিক স্বভাবসঙ্গত কাজ করছি কিনা। কর্ত্তব্য পালন না করলে স্কুল যেমন বাড়ীর অধম হতে পারে—বাড়ীও তেমনি স্কুলের অধম হতে পারে, এ কথা সবাই স্বীকার করবে। আসল কথা তো স্থান নিয়ে নয়, স্বভাবের দাবী নিয়ে। ছেলে যদি স্কুলের চেয়ে বাড়ীকে বেশী পছন্দ করে, তবে সেটা যে কেবল তার উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়, তা নয়—স্কুলের পক্ষেও সেটা অগৌরবের কথা। বালক স্কুলের শাসন মেনে নেয় বটে, এবং যথাকালে শিষ্টশান্ত হয়ে কারামুক্তিও লাভ করে, কিন্তু কারাগৃহের প্রতি তার প্রেম জন্মায় না। পরিণত বয়সে সে যদি তার সন্তানের কাছে কারাগৃহের অজস্র মহিমাও কীর্ত্তন করে, তবুও অন্তর্য্যামী জানেন, এই সুনিপুণ চাটুবাদ নিরুপায়তারই আবরণ মাত্র। পক্ষান্তরে যদি কোনও স্কুলের এমন অভাবনীয় সৌভাগ্য হয় যে ছেলে বাড়ীর চেয়ে স্কুলেরই বেশী পক্ষপাতী হয়, তবে সেটাও তার অকৃতজ্ঞতার চিহ্ন নয়, গৃহের পক্ষেই অগৌরবের কথা এবং স্কুলের পক্ষে পরম শ্লাঘার কথা। মোটকথা, স্কুলেই হোক্ আর বাড়ীতেই হোক্, শিশুপ্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ ও পুষ্টিই হল আসল কথা। পরিস্থিতির দরুণ শিক্ষার স্থানপরিবর্ত্তন হোক্ তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু প্রকৃতিকে যদি শিক্ষায় বিকৃত করে তোলে তা হলেই বিপদ্।

বিদ্যালয় মনুষ্যবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তা মানলাম। এখানে অনায়াসে বৈজ্ঞানিকভাবে কাজ হতে পারে, তাও সম্ভব কিন্তু শিশুর যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা কি মনুষ্যবুদ্ধির অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার? প্রকৃতি যখন মানব শিশুকে অসহায় করে জগতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কি তার শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন নি, শিক্ষার সমস্যা কারও প্রাণেই দেন নি? ছেলে যখন বাড়ী ছেড়ে দূরান্তরে থাকবার উপযুক্ত হয়, তখনই হঠাৎ শিক্ষক বলে যে একসম্প্রদায় অনুষ্য আবির্ভূত হন, তারা প্রকৃতির ভ্রমসংশোধন করবার জন্যই আসেন? এতদিন কি শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না? আর আজ যদি তাঁদের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে তারা প্রকৃতির কোন প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত? শিশুপ্রকৃতি বিশ্বস্তভাবে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, এই যোগ্যতা তাঁদের আছে কি? আর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহা আড়ম্বরে শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হল—শিশুরজীবনে এই আকস্মিকের আবির্ভাব তার কাছেই বা কেমন ঠেকে? এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা না হলে শিক্ষা-সমস্যার গোড়ার কথাটাই আমরা ধরতে পারব না। আমাদের কাছে যে ব্যবস্থা সঙ্গত বলে মনে হয় শিশুর কাছেও তা হয় কি না—না হলেই বা তার প্রতীকার কি, তা চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা বারান্তরে তার আলোচনা করব।

—*—

দেবদৃষ্টি

—*—

একটা গল্প শোন। এক শেখ একদিন একটা স্বপ্নে দেখল, একজন দেবদূত একটা খাতায় কি যেন লিখছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু, কি করছেন?" দেবতা উত্তর করলেন, "যারা ভগবানের প্রিয়ভক্ত, তাঁর পার্ষদ, তাদের তালিকা করছি।" কথাটা শুনেই শেখ দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে মাথা নিচু করে বলল, "আহা, সবাই যেমন ভগবানের সেবা-পূজা করে, আমিও যদি তেমনি করতে পারতাম। আমি একবার তাঁর নামও নিই না, উপবাসও করি না, মসজিদেও যাই না; তিনি কি আমাকে কৃপা করবেন? আমার আর স্বর্গে যাওয়ার ভাগ্য হবে না।" দেবতা বললেন, "তা কি করব বল।" কিছুক্ষণ পরে শেখ বলল, "আচ্ছা, যারা ভগবানের কথা ভাবে না; কিন্তু মানুষকে ভালবাসে, জগৎকে ভালবাসে—তাদের নামের একটা তালিকা করবেন কি? তাহলে আমি মানুষের সেবক বলে আমার নামটা যদি লিখে রাখেন।" দেবতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর একদিন শেখ স্বপ্নে আবার সেই দেবতাকে সেই খাতা হাতে দেখতে পেল। তিনি তখন খাতার পাতা উলটিয়ে ভুল-চুক সংশোধন করছেন। সেখ জিজ্ঞাসা করল, "কি করছেন, প্রভু?" দেবতা বললেন, 'ভগবানের ভক্তদের নাম লেখা হয়ে গিয়েছে—এখন উলটে একবার দেখে দিচ্ছি। সেখ বিনীতভাবে বলল, "খাতাখানা আমাকে একবার দেখাবেন কি?" সেখ সবিস্ময়ে দেখল, সে তো মানবসেবক বলে নাম লিখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ভক্তদের নামের প্রথম কোঠাতেই তাঁর নাম জ্বলজ্বল করছে।

কথাটা আশ্চর্য্য নয় কি? তবুও জানবে এ সত্য।

যদি মানুষকে পূজা কর, অর্থাৎ মানুষকে মানুষ না ভেবে তার মাঝে নারায়ণকে দেখতে শিখ, সর্ব্বত্রই যদি ভগবানের বিকাশ দেখে মানুষকেও পূজা কর, তাহলে সে ভগবানেরই পূজা করা হবে।

কিন্তু মানুষের খুঁত খোঁজা, সমালোচনা করা, নিন্দা করাটা কিন্তু নারায়ণসেবা নয়। অমন নৈবেদ্যিতে ঠাকুর খুসী হবেন না। তোমার নিজেরও তো দোষ আছে, তা'বলে নিজকে কি ঘৃণা কর? কাজেই অপরের যদি দোষ দেখতে পাও, তাহলে নিজের সেগুলো না থাকে, তারই চেষ্টা কর—অপরকে ঘৃণা করো না। তারাও যে নারায়ণ—তাদের মাঝেও নারায়ণকে দেখতে হবে।

ধর একজন সরকারী কাজ করছে। সে যদি তার আফিসের কাজকর্ম্ম ছেড়ে সারাদিন বড়-বাবুর পদসেবাও করে, তাহলে তার চাকরী বজায় থাকবে কি? কিছুতেই না, পরদিনেই তাকে আফিস থেকে তাড়িয়ে দেবে।

বড়বাবুর সেবা করতে হলে আফিসের কাজ করতে হবে। তুমি সরকারী চাকর, সুতরাং সরকারী কাজই হল তোমার সেবা। তেমনি যদি মনে করে থাকি যে ফুল বেলপাতার আড়ম্বর করলে বা মালাটিপ কাটলেই ধর্ম্ম করা হবে, তাহলে ওটা ওই বড়বাবুর পায়ে

তেল মাখানোর মতই হবে। ওতে ভুলাবে না।

নারায়ণ সেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে, সর্ব্বজীবে তাঁকে দর্শন করা—সেবা করা। যখন দেখ্‌বে, তোমার এতটা উন্নতি হয়েছে যে অপরের মাঝেও তুমি ভগবানকে দেখ্‌তে শিখেছ, অপরের ভুল-ভ্রান্তিতে রাগ হয় না, ভুল-ভ্রান্তি থাকলেও তাঁদের হৃদয়ে যে ভগবান আছেন এ কথা বিস্মরণ হয় না, তোমার চিত্তের কোনও মলিন বৃত্তিতেই তাদের স্বরূপ আচ্ছন্ন হয় না—তখনই বুঝ্‌বে, হৃষীকেশ তোমার হৃদয়েও স্থিত হয়েছেন।

অল্প কথায় ব্যাপরটা বুঝিয়ে বল্‌ছি। শত্রুর মাঝে ভগবানকে দেখ্‌তে পাই না কেন? তার মাঝে যে কেবল দোষটাই দেখি। এই খুঁত দেখার বদভ্যাস ছাড়তে হবে—সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করতে হবে। সবার মাঝে ভগবান আছেন—এই কথায় দৃঢ়বিশ্বাস হোক্—সর্ব্বত্র সেই অনন্তস্বরূপকে দর্শন কর। রোমের সম্রাট্‌ নীরো যৌবনে বেশ সুশীল ও ধার্ম্মিক ছিল, কিন্তু পরে বিগড়ে গেল। ইংলণ্ডের পঞ্চম হেনরী ছোটবেলায় ভারী বদ্‌ ছিল, কিন্তু বড় হয়ে খুব ভাল হয়েছিল। এমন অহরহঃ কত দেখাছ্য। তাই বলি, কারুসম্বন্ধে একটা মার্কামারা ধারণা করে বসো না। আজ যাকে খারাপ দেখছ, কাল সে ভাল হয়ে যেতে পারে। সার ওয়ালটার স্কট ছেলেবেলায় মূর্খ ছিলেন, কিন্তু বড় হয়ে মহাসাহিত্যিক হলেন। সার আইজাক্‌ নিউটন ছোটবেলায় আঁকে ভুল হত বলে কত সাজা পেতেন, কিন্তু বড় হয়ে তিনি কি হলেন, ভাব দেখি! প্রথম যৌবনে মেরী মডলীনের স্বভাব চরিত্র অতি খারাপ ছিল, কিন্তু খৃষ্টের কৃপায় পরে সে মহাপুণ্যবতী হল। আজ যাকে পাপী বলছি, কাল সে সাধু হতে পারে, হয়ত কিছুদিন পরে সে দেবতুল্য হতে পারে। এইটা মনে রেখো, কাউকে অন্যায় করতে দেখলেই তাকে নিন্দা বা ঘৃণা করবার কোনও অধিকার তোমার নাই। তার মাঝেও নারায়ণকে দেখ। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন কর। কেউ যদি তোমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ভাব পোষণ করে, কিম্বা তোমাকে মিছামিছি দোষী সাব্যস্ত করে, তাহলে তুমি কি উল্‌টে শোধ তুলবে। ছি: ছি:—তা কক্ষণো করবে না—কক্ষণো না।

সক্রেটীস যখন কারারুদ্ধ, তাঁকে যখন বিষ খেতে দেবে, তার একটু আগে তাঁর শিষ্যেরা এসে তাঁকে পালাবার যুক্তি দিল। কারারক্ষীকে তারা ঘুষ দিয়ে বিদায় করে দেবে। সক্রেটীস জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুষ দেওয়াটা কি আইনসঙ্গত কাজ হবে।" শিষ্যেরা বলল, "না।" তিনি বলিলেন, "এ যদি বেআইনী কাজ হয়, তাহলে আমাকে পালাতে বলছ কেন, বেআইনী কাজ করতে বলছ কেন?" তারা বলল, "কেন, যারা বিচার করছে, তারা কি আইন মেনে চলেছে? কাজেই আপনারও পালিয়ে যাওয়া দোষের হবে না।" সক্রেটীস বললেন, "তাহলে অপরে বেআইনী করেছে বলে আমিও বেআইনী কাজ করে তার পাল্টা জবাব দেব, এই কি তোমরা চাও। আমি যদি আইন ভাঙি, তাহলে অপরের বেআইনী সংশোধিত হবে কি? তাহলে তোমাদেরই তো কথা ঠিক থাকে না—কেননা, তোমরাই না বললে আইনভাঙাটা আইন-সঙ্গত নয়। কালীর উপর কালীর পোঁছ দিলে কি সাদা হয়?" অপরে যদি সমালোচনা করে, নিন্দা করে, আমরাও তাহলে তাই করব না কি? অপরে যা করে, আমরাও যদি তাই করি, তাহলে

কেবল পাপ বেড়েই চলবে—সংশোধন হবে কোথায় ?

অপরের সমালোচনায় বা বিদ্বেষ বুদ্ধিতে কি করে তোমার ক্ষতি করে ? যদি ওগুলো মেনে নাও, তবেই ক্ষতি। যদি ওসব কথা মনের ত্রিসীমায়ও ঘেঁসতে না দাও—তাহলে তোমার কোনও ক্ষতিই নাই। তোমার নামে একজনে চিঠি লিখেছে। চিঠিটা পেয়ে তোমার যা ভাবান্তর হবে, তাতেই ওটা তোমার ভাল করবে বা মন্দ করবে। কিন্তু চিঠিটা তুমি না নিয়ে যদি ফেরৎ দাও, তাহলে ওটা আবার ডাকঘরে ঘুরে যাবে, সেখান থেকে প্রেরকের কাছে ফেরৎ যাবে। তেমনি লোকেও তোমার নামে দুটা কুচিন্তা বা কুকথা পাঠালে, তুমি যদি তাদের না নাও, তাহলে তারা ঘুরে যাবে। কিন্তু নিলেই গণ্ডগোল। তাই বলি সমালোচনা বা বিদ্বেষ কান পেতে বা মন পেতে নিও না কখনও। কেমন করে তা হবে ?—তুমি যে শিবস্বরূপ, এই ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হও—সত্যকে আশ্রয় কর, আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি কর—স্থিতপ্রজ্ঞ হও !

অপরের মাঝে ব্রহ্মকে এমন ভাবে উপলব্ধি করতে হবে, তাকে এত নিকট, এত অন্তরঙ্গ বলে জানতে হবে যে তোমার আর সমালোচকের মাঝে সমালোচনার কোনও ছদ্মাবরণ থাকবে না—একেবারে করামলকবৎ তাকে প্রত্যক্ষ করবে ! এই তার মন্ত্র—"এসো এসো প্রিয়তম—এস অন্তর, অন্তরতর, অন্তরতম !" অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই হলেন প্রিয়তম !

যাঁর শক্তিতে ধমনীতে রক্তধারা বইছে, তাঁর শক্তিতেই তুমি কথা বলছ, দেখছ। তোমার বাক্য ব্রহ্ম, তোমার দৃষ্টি ব্রহ্ম, তোমার শ্রুতি ব্রহ্ম—আকেশাগ্রনখাগ্র পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তোমার মিত্ররূপে, শত্রু-রূপে, ভ্রাতৃরূপে, বন্ধুরূপে ! ব্রহ্মানুভূতিতে যখন তুমি মহীয়ান্—তখন তোমার শত্রু নাই কেউ। আর ব্রহ্ম হতে দৃষ্টিবিচ্যুত হলেই শত্রু এসে দেখা দেয়। তবে, যে আনন্দের সন্ধানী তুই, তাকেই খোঁজ্ না কেন !—সে যে তোর কত কাছে—তোর বুকের মাঝে :

আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো ! জেনে হোক্, না জেনে হোক্, যা কিছু চাইছ—সেই তাঁকেই চাইছ ভাই ! তোমার সকল কামনার লক্ষ্য তো আনন্দ ? ব্রহ্মই যে আনন্দ ! এইটী একবার অনুভব কর ভাই।

এই যে বঁধু আমার—এই যে—এই যে ! সমুখে, পিছনে, উপরে, নীচে, বাহিরে, ভিতরে—আমায় ঘিরে এই যে সে—না আমি ! তুমি গভীর, তুমি গম্ভীর, তুমি পরম, তুমি চরম। বাছনি আমার, বঁধু আমার·········(সমাধিস্থ)

* * *

সকল বাঁধন ছিঁড়েছে সকল সম্বন্ধ টুটেছে—তুমি-আমির ভাব আর নাই—সমস্ত জগৎ পিছনে পড়ে আছে।

ব্রহ্মের এই মহিমা—সত্যের এই মহিমা। স্বরূপের এই তীব্র অনুভূতি যাতে সমস্ত সম্বন্ধ-জাল ছিন্ন হয়ে যায়। এই তো অপরোক্ষ অনুভূতি। বন্ধন যতক্ষণ সুস্পষ্ট, ততক্ষণ অপরোক্ষানুভূতি কোথায় ? এই হচ্ছে আইন। খ্রীষ্টের মুখে এই সত্যবাণী—"যা আছে সব বিলিয়ে দাও—দিয়ে আমার পিছনে এস। কিন্তু মানুষ ভয় পায়।

হে সত্যাভিমানী, খৃষ্টের কথায়, আচরণে সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে শেখ। বেদান্ত বজ্রনির্ঘোষে বলছেন, এক সঙ্গে শিবের পূজা আর কুবেরের পূজা চলবে না। যখন সংসার-

সম্বন্ধ, সংসারবন্ধন, সংসারসম্পদ, সংসারবাসনা —সব সত্যের অতলে তলিয়ে যাবে, তখনি অনুভূতি মিলবে।

ওগো, আমার পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, শত্রু, মিত্র—সবাই যে তুমি! তুমি আমার দিনরাত্রি, আমার পাপ পুণ্য—আমার আনন্দ—আমার আমি! আমার প্রেমের বিচিত্র বদন তুমি—উষার সোণার সাজে সেজে এসেছ বঁধু!

হে সত্য, শিব, সুন্দর!—দেখ, তুমি ছাড়া আমার আর কিছুই নাই। কোনও বাসনা নাই আমার—কেবল তোমার কাছেই বাঁধা আমি! পলকের তরেও আমি তোমা ছাড়া নই!—যদি দেখ চঞ্চল হয়েছি, তবে সে তো বঁধু তোমার কাছেই আমার সোহাগের আবদার! তুমি ছাড়া আর কার কাছে আমি আবদার করব?

তুমি আমার দেহ, আমার গেহ—আমার শয়ন—আমার উপাধান।—

ভাই, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোথায় শয়ন বিছাবে? তাঁতেই শায়িত রয়েছ—এই ভাবটী ধারণা করবে।

থামো, দেখি, কিনলাম কি? এই যে অনন্তবীর্য্য শিবস্বরূপ—সোঽহম্! সব ভুলে গেছি! কি কিনেছি?—আমাকে কিনেছি। যা কিনেছ, তাই হয়ে আছ তুমি!

আদিত্যের রথে হের মোর অভিযান!
আমি ব্রহ্ম!—খোল আঁখি হের মতিমান্!

ওঁ ওঁ ওঁ*

---

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা—জানুয়ারী ১৯০৩)

—*—

মনোলয়

—*—

(ভক্তিমার্গ)

প্রত্যেক মন্ত্র বিভিন্ন শক্তির বীজ। অন্যান্য মন্ত্রের অপেক্ষা ভক্তিমন্ত্রের একটু বিশেষত্ব -ওতত্ত্ব ও ভক্তিমন্ত্রের আছে। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে বিশেষত্ব পিপাসা মিটিলেই মানব ভক্তিপন্থী হয়। তাই প্রেমের ভাণ্ডারী শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মানবত্ব লাভ করে। মানবজন্ম লাভ করিয়া বহু যক্ষ রক্ষ ভূত পিশাচ বক রক্ষ প্রভৃতি উপাসনা করিয়া পরে নক্ষত্রাদি উপাসনা করে। তৎপরে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার শক্তির বীজস্বরূপ মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া সেই সমস্ত দেবতার শক্তি লাভ করিয়া বহু শত জন্ম পার্থিব ভোগে তৃপ্ত হন। অতঃপর মুক্তির প্রারম্ভে মানব ভগবৎপ্রেমের সাধনবীজ সদ্গুরুর প্রসাদে লাভ করিয়া সাধনরূপ বারি সিঞ্চনে কৃতকৃতার্থ হন। তজ্জন্যই সদ্গুরুর কৃপা আকর্ষণ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জগদ্গুরুকে মুহূর্ত্তেই জানা হইবে। গুরুতত্ত্ব না বুঝিলে এবং

তদ্রূপ গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে—মন্ত্র-তত্ত্ব বুঝিবার অধিকার হয় না।

গুরুদত্তমন্ত্রই তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার সূক্ষ্ম-বীজ। বীজ যেমন কর্ষিত ভূমিতে রোপণ করিয়া নিত্য জল ইত্যাদি সিঞ্চনে অঙ্কুর উদ্গত হয়—তদ্রূপ গুরূপদিষ্ট সাধনপদ্ধতির দ্বারা মন্ত্রের শক্তি জাগাইয়া দিলে মানুস তখন আর মানুষ থাকে না—দেবতাময় হইয়া যায়। অর্থাৎ তখন "ত্বং" পদার্থ "তৎ" পদার্থে লীন হয়। মানবের সাধনার উদ্দেশ্যই তত্ত্বমসিতে উপনীত হওয়া। ভক্তিমন্ত্রের সাধকের পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় উপনীত হইলে রাধা ভাব বা সখ্য ভাব

সাধকের রাধা বা সখ্যভাব গ্রহণ ও এই ভাবের তাৎপর্য্য

গ্রহণ করাই বিধেয়। রাধা ভাব বা সখ্যভাব গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণ-প্রেমই আমাদের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পতি এবং জীবমাত্রেই তাঁহার পত্নী। তাই সাধকের শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবেই ভাবিতে হইবে, কারণ পুরুষের অসংখ্য কর্ম্মময় জীবনে প্রেম তাহার হৃদয়ের কতকটা অধিকার করিলেও উহা নারীর জীবনসর্ব্বস্ব। পতির গৃহে গৃহকর্ম্ম পতির উদ্দেশে; পতির সুখে তাহার সুখ; পতির দুঃখে তাহার দুঃখ। তাহার সমস্তই পতিকে লইয়া। তাই সাধকের রাধা বা সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভাবিলে প্রেম আপনিই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে।

যোগিগণ যেমন মনঃস্থৈর্য্যের জন্য দেহের স্থানবিশেষে দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ করেন, প্রেমের সাধক তেমনি কোন প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে চিন্ময় মনে করিয়া তাহাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে থাকিবেন। কারণ মহাযোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"দেশবন্ধঃ চিত্তস্য ধারণা।"

স্থির পদার্থে কিছুক্ষণ এইরূপ চিত্তের ধারণা করিবার পরে কয়েকবার প্রাণায়াম

সাধনপদ্ধতি ও জপের বিশেষত্ব

করতঃ সেই বিগ্রহেই ইষ্ট-দেবের আবির্ভাব ভাবিয়া জাপক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে মন স্থাপন করিয়া মুক্তাহারের গাঁথুনির ন্যায় একই ভাবে গুরুদত্ত মন্ত্র শ্বাসে শ্বাসে মানস জপ করিবেন। বৈখরীর পূর্ব্বাবস্থাই চিন্তা বা মনের ভাব। তজ্জন্য বাচিক হইতে উপাংশু, উপাংশু হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ। মানস জপ চিন্তারই অব্যবহিত নিম্ন অবস্থা। এইরূপ জপ করিবার সময় মন নানাদিকে ছুটাছুটী করে। মনের এই চাঞ্চল্য রজোগুণজাত। আহার্য্যের বিশেষ সতর্কতায় মনের সঙ্কল্প বিকল্প ভাব বহুল পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। এই সংকল্প-বিকল্প কামনার বীজ ধ্বংশ না হইলে যায় না। মানবের কামপ্রবৃত্তি তখনই সম্যক্ প্রকারে নষ্ট হয়।

তখন কাম্যবস্তুর সংস্পর্শে আসিলেও শ্রীমৎ রামানন্দ রায়ের ন্যায় মনের বিকার উপস্থিত হইবে না। আমাদের সুযোগ অভাবে, অর্থাভাবে বা লোকলজ্জা ও দণ্ডাদির ভয়ে

আত্মবিচার

আমরা সমাজে পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলেও আত্মবিচারে দেখা যায় যে আমাদের মনের ভিতর কামের বীজ ধ্বংশ হয় নাই। দেখিতে হইবে সুযোগ উপস্থিত হইলে আমরা আত্মসম্বরণ করিতে পারি কি না। শুধু কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিলে কিছুই হইবে না।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

ইন্দ্রিয়গণের অধিনায়ক মন যদি কিছুতেই রঞ্জিত না হয়, তবেই সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত বলা

যাইতে পারে। ইহা শুধু আমাদের দেশের আদর্শ নহে; খৃষ্টদেব বলিয়াছেন—

"I say unto you, he who looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart".

সত্ত্বগুণোৎকর্ষ হেতু সাত্ত্বিক আহার ও উপবাসের উপকারিতা।

তাই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ করিতে হইলে আহার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত ও অবশ্য কর্ত্তব্য। আহার্য্যের দ্বারাই মন প্রাণ ইত্যাদি বাধিত হয়। ভুক্ত অন্ন, মৎস্য, মাংস প্রভৃতির নিকৃষ্ট অংশ বিষ্ঠা, মধ্যম অংশ মাংস ও সূক্ষ্ম অংশ মনরূপে পরিণত হয়। তদ্ধেতু সত্ত্বগুণোৎকর্ষ করিতে হইলে মৎস্য, মাংস, মধু, অধিক পরিমাণে ঘৃত, মিষ্ট, অধিক লবণ, সর্ষপ, তিক্ত ও অম্ল আহার একেবারেই নিষিদ্ধ। উক্ত দ্রব্যাদি সত্ত্বগুণ হানিকর বিধায় হিন্দু বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার জন্য ঋষিকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপবাসাদি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য প্রভূত পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। উপবাস বলিতে একেবারেই লঙ্ঘন নহে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যাচ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্।"

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ঔষধ ব্রাহ্মণপ্রার্থিত হইয়া ও গুরুর আজ্ঞায় অন্নাদিভোজনেও উপবাসের হানি হয় না।

জ্যোতিঃদর্শনও গুরুর নিকট হইতে শক্তি-আকর্ষণের উপায়।

সাধক এইরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিদিন নিয়মিত সময় প্রাণায়াম ইত্যাদি গুরূপদিষ্ট প্রক্রিয়ান্তর জপে বসিবেন। একমনে জপ করিতে করিতে ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত হইবে। এবং ধীরে ধীরে শরীরে অস্তিত্ববোধ রহিত হইয়া যাইবে। তখন দলিতা ফণিনী যেমন সুমধুর বংশীধ্বনিতে তন্ময় হইয়া যায়, তদ্রূপ মানস উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনিতে তন্ময় হইয়া গিয়া সাধকের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইবে এবং হৃদয়াভ্যান্তর প্রথমতঃ ধূম্রময় বলিয়া বোধ হইবে। পরে ধূম ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া জ্যোতিঃমণ্ডলে পরিণত হইবে। এবং তন্মধ্যে সাধকের ইষ্টদেবের সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে। কিছুদিবস এইরূপ চলিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থা আনয়ন করিতে সাধকের অন্ততঃপক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় এক সহস্র জপ করিতে হয়। প্রতি সন্ধ্যায় সহস্র জপের কমে গুরুর নিকট হইতে শক্তি লাভ করা যায় না। সহস্র জপ করিতে সাধকের ন্যূনপক্ষে একঘণ্টা সাত মিনিট সময়ের প্রয়োজন; কারণ জীবগণের মধ্যে মনুষ্য ও সর্প দিন রাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাসগ্রহণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য উভয়েরই আয়ুষ্কাল প্রায় সমান। সাধকের জপসংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই—ঘণ্টানুসারে ক্রমেই সময় দীর্ঘ করিতে অভ্যাস করিবেন।

সাধন বিঘ্ন

কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে সাধকের মনোময়ী ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং তখন সাধক ইষ্টদেবতার সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। এই সময় সাধকের সাধনাবিঘ্নকারী বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার সুযোগ ও প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত হয়, কখনও দারিদ্র্য শতমুখী হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিবে। গুরুর প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। স্বয়ং বুদ্ধদেবও এইরূপ উৎপাতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই—অন্য সাধকের কথা ত স্বতন্ত্র। এরূপ সাধনা প্রত্যেক সাধকের

জীবনে অবশ্য ঘটনীয়। সাধক তখন ধৈর্য্য অবলম্বন ও একান্ত will force অবলম্বনে এ সমস্তে বিচলিত হইবেন না। তিনি তখন স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকিবেন এবং নিতান্ত দীনভাবে দিনপাত করিবেন। দীন অর্থে দরিদ্রভাবে নহে। দীনতাঅর্থে সর্ব্বস্ববিহীনতা।

দীনতা ও দারিদ্র্য অর্থাৎ জগতের কোন পদার্থে আসক্ত না হইয়া একমাত্র ভগবানে নিঃসংশয় হইয়া নির্ভরশীল হইবেন। দারিদ্র্যে দীনতায় এই প্রভেদ যে দরিদ্রের সব আছে, সে শুধু অর্থের কাঙ্গাল, আর দীনের কিছু নাই—সর্ব্বস্ব-বিহীন—থাকিলেও অনাসক্ত, তাই শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

এরূপ অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিলে সাধক তখন বাক্‌সিদ্ধি ও রোগ আরোগ্যাদির ক্ষমতালাভ করেন। তৎপরে কুণ্ডলিনী এক পদ্ম বা চক্র ভেদ করিয়া বিশুদ্ধচক্রে উত্থান করিলে সাধক অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, অবিশ্বাস, ক্রুরতা, লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষ্যা, সুষুপ্তি, বিষয়, তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা, ভয়, আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, অহঙ্কার, কপটতা, বিতর্ক, ও অনুতাপ প্রভৃতি বৃত্তিতে অভিভূত হন না। তখন তিনি ধ্যানস্থ হইলেই যেন কোন এক অতীন্দ্রিয়রাজ্যে তাঁহার আগমন হয়—কারণ তখন সাধকের স্থূলদেহ লিঙ্গ-শরীরে এবং লিঙ্গশরীর কারণ শরীরে বিলীন হওয়ায় সাধক সবিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকেন।

সিদ্ধি যে সাধক রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন—তিনি সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ভিতর অষ্টদলপদ্মের উপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধাভাবে আনন্দবিলাসে মগ্ন থাকেন—সখীভাবে ভজনা করিলে সাধক কোন এক সখীরূপে রাসমণ্ডলে যুগল-মিলনের আনন্দানুভব করেন। ক্রমশঃ জ্যোতিঃমণ্ডল বা ধ্যান মস্তকস্থ হয় এবং যিনি রাধাভাবে সাধনা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দশৃঙ্গারে মগ্ন হওয়ায় দ্বৈত ভাব রহিত হইয়া গিয়া অর্থাৎ নিজে রাধা এবং প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়জ্ঞানের অভাব হওয়ায় একমাত্র আনন্দই অবশিষ্ট থাকে, কারণ উভয়ের মিলনের আনন্দাতিশয্যে উভয়ের জ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান আনন্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। আর যিনি সখীভাবে যুগলের উপাসনা করেন—তিনি অদ্বৈতজ্ঞানে আনন্দমাধুর্য্যে বিভোর হইয়া থাকেন। নিত্য রাসরস ভোগ করেন। ইহাই সিদ্ধির অবস্থা।

মৃত্যুর পরে, রাধাভাবে যে সাধক সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—তাহার অদ্বৈতজ্ঞান হওয়ায়

পারলৌকিক অবস্থা প্রথমতঃ অপ্রাকৃত বৃন্দা-বনে গমন করেন; তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন। আর যিনি সখীভাবে সাধনা করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিও ব্যোমাতীত গোলোক বা বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসরস-লীলা দর্শন করেন এবং কল্পান্তে শ্রীভগবানে লীন হন।

"ভক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ দেহান্তে ঈশ্বরলোকে বাস করেন; তৎপরে কল্পান্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন।"

আর যাঁহারা শত চেষ্টায়ও এতাদৃশ অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই—যাঁহারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকর আহার্য্যভোজন ও উপাসনাদি দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য দূর করার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর হইতে কামের মূলোৎপাটন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মৃত্যুর পর ভুবঃলোকের নিম্নস্তরে যাতনাময় দেহে আত্ত

অল্প সময় মাত্র অবস্থান করিয়া পরে উচ্চস্তরে গিয়া ভূলোকে যেরূপ মূর্ত্তি ইত্যাদি পূজা করিতেন—তদ্রূপ পূজা ইত্যাদিতে রত থাকেন। এবং সমশ্রেণীর আত্মার সঙ্গে কীর্ত্তন ইত্যাদিতে সময়াতিবাহন করেন। পরে ভুবঃ লোকের দেহ নষ্ট হইলে স্বর্লোকে গিয়া তথায় তাঁহার চিরাভিলষিত রূপ—যে রূপ তিনি চিরজীবন উপাসনা করিয়া আসিয়াছিলেন—সেই রূপ চিন্তা মাত্রেই তাহার নিকট সজীব ভাবে উপস্থিত হন এবং তাহার সহিত ক্রীড়া করেন। সাধক তখন মনে করেন যে ইহাই গোলোক বৃন্দাবন—কিন্তু তাহা নহে। পরে পুণ্য ক্ষয়ে পুনরায় পিতৃযানে ভূলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন ও সফল মনোরথ হইয়া থাকেন। (সমাপ্ত)

একনাথ

—*—

শ্রীমৎ জ্ঞানেশ্বর একনাথের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অসামান্য পাণ্ডিত ছিলেন। আমাদের একনাথও কিরূপ তীক্ষ্ণমেধাসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমরা জানি। এই দুই আচার্য্যই অদ্বৈতজ্ঞানী বৈদান্তিক ছিলেন। কিন্তু ইহাঁরা যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া মহারাষ্ট্রভূমিতে যুগান্তর আনয়ন করেন এবং নবোদিত ইস্‌লামিক সদাচার প্রতিরোধ করেন, তাহা সার্ব্বভৌম ভাগবত-ধর্ম্ম। উভয় আচার্য্যই জ্ঞানের সমুন্নত শৃঙ্গে অধিরূঢ় থাকিয়াও লোকহিতার্থে সর্ব্বজনসাধ্য ভক্তিধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন। এই কথাটী আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। আপামর সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করাই ইহাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই ইহাঁরা প্রচারের সময় দূরে রাখিয়াছিলেন। এই জন্য কেহ কেহ সন্দেহ করেন, ইহাঁরা বেদবিরোধী ছিলেন, এবং সমাজ সংস্কার করাও ইহাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বলাবাহুল্য ইহা অর্ব্বাচীনযুগের স্বকপোল কল্পিত মত। যে কেহ ধীরভাবে ইহাঁদের সাধনজীবন পর্য্যালোচনা করিবে এবং মহাপুরুষেরা কোন্ শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লোকহিতে প্রবর্ত্তিত হন তাহা অনুধাবন করিবে, সেই বুঝিতে পারিবে, এই মত কতদূর অসার। এই কথাটুকু বুঝা উচিত যে কোনও সামাজিকধর্ম্মই চিরন্তন নহে, কিম্বা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য নহে। ব্রহ্মানন্দরসিক মহাপুরুষদগকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সমাজের বিধিনিধানের সৃষ্টি, এ কথা কোনও সামাজিকই বলিবেন না। মহাপুরুষেরা করুণাপ্রেরিত হইয়া যদি কখনও সমাজধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া চলেন, তবে সমাজ অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লয়, কিন্তু হুজুগে পড়িয়া তাঁহাদের অনুকরণ-করাটাকেই পুরুষার্থ মনে করে না কিম্বা এমন কথা মনে করে না, সমাজ সংস্কার করাই উক্ত মহাপুরুষের সামাজিকবিধি লঙ্ঘন করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। শাস্ত্রাদিতে যে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ আর্ষপ্রয়োগ দেখা যায়, উহাকে

সাহিত্যিকমাত্রই শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু অনুকরণ করেন না কিম্বা বলেন না যে ঋষি ব্যাকরণ মানিতেন না বলিয়াই ঐরূপ করিয়াছেন;

অবশ্য মহাপুরুষদিগের ঈদৃশ আচরণে সমাজের জড়ত্ব নষ্ট হইয়া প্রাণশক্তিরই স্ফূর্ত্তি হয়। সব জায়গাতেই বিধিনিষেধের আঁটাআঁটি, অথচ এক জায়গায় তাহা খসিয়া পড়িয়াছে—ইহা দেখিলে আমরা লোকোত্তরধর্ম্মের আভাস পাইয়া সেই আদর্শে নিজকে গঠিত করিতে উদ্বুদ্ধ হই। কিন্তু মহাপুরুষের কার্য্যের মূলে আছে অলৌকিকভাবের প্রেরণা—কোনও লৌকিক ফন্দিবাজী নয়।

এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, জ্ঞানেশ্বর কিম্বা একনাথ কখনও কখনও তদানীন্তন সামাজিক আচার ও ধর্ম্মের অননুমোদিত কোনও কাজ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কোথায়ও স্বীয় কার্য্য সমর্থন করিবার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করেন নাই, কিম্বা কাহারও নিন্দাবাদও করেন নাই।

একনাথ সর্ব্বসাধারণ্যে ভক্তিধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"ভগবানকে পাইতে হইলে যে সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতে হইবে, এমন কি কথা আছে? তপস্যাদ্বারা শরীর নষ্ট না করিলে যে মনঃসংযম হইবে না এমন নয়। যদি শ্রীহরির সেবা কর,—নামকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে মুক্তি তোমার করতলগত। গোপীদিগের কথা ভাব দেখি। তাহাদের কি বিদ্যা ছিল না তপস্যা ছিল? তাহাদের একমাত্র সম্বল ছিল ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রাণের টান। আর কিছুর প্রয়োজনও হয় নাই। ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য এত ব্যস্ততা কেন? বিষয় হইতে দূরে পলাইবার চেষ্টা কেন? তোমার যাহা কিছু আছে, সব তাঁহাকে সঁপিয়া দিয়া কেবল তাঁহার নাম গান কর। ধ্যান-ধারণা করিতে হইলে মেধা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ সকলেই কি মেধাবী? তাহা হইলে তাহাদের উপায় কি হইবে? যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও নিখুঁত হওয়া চাই—নহিলে তাহাতে ফল হইবে না। কিন্তু তাহা কত দীর্ঘদিনের অভ্যাস-সাপেক্ষ। ভক্তের এ সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন নাই। ভক্ত ভগবানের কাছে যান—রাজপুত্র যেমন যান রাজার কাছে। আর সকলে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু রাজপুত্র একেবারে সোজা পিতার কাছে চলিয়া যায়—তাঁর সঙ্গে কথা কয়। তাই যোগীকে অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ভক্ত সহজেই মুক্তি করায়ত্ত করেন। তাই বলি, যাঁহারা মনীষী তাঁহারা জ্ঞানবিচার লইয়া থাকুন, যাঁহারা অনুষ্ঠান ভালবাসেন, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড লইয়া থাকুন—তুমি ভক্তির সহজ ও সরল পথে মুক্তিধামে চলিয়া যাও।"

চিরকালই একদল লোক মহাপুরুষদিগের বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে। তাই রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ইহারা জটিলা-কুটিলা, ইহাদের ছাড়া লীলা পোষ্টাই হয় না। একনাথ যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে বৈদিকজ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের খরপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। পণ্ডিতেরা আপনাদের পাণ্ডিত্য ও কর্ম্মের অভিমান লইয়াই ব্যস্ত। সর্ব্বসাধারণের তাহাতে অবশ্য অধিকার নাই। এমন কি তাহাদিগের দিকে ফিরিয়া চাহিবারও কেহ নাই। এই সময় একনাথ ভক্তিধর্ম্ম ও কীর্ত্তনানন্দ লইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সরল, ইহাতে অনুষ্ঠানের বাহুল্য নাই, পাণ্ডিত্যের কচকচি নাই, অথচ ইহা সাধারণের অনায়াসগম্য। কাজেই এক-

নাথের প্রচার প্রচণ্ডবেগে চলিতে লাগিল। দলে দলে লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে বিপক্ষদল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—"জনার্দ্দস্বামীর চেলা একনাথের কাণ্ডটা দেখ। জগৎশুদ্ধ লোক খেপাইয়া হরিভজা করিয়া তুলিয়াছে। মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োজন নাই, যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নাই, কেবল হরি হরি বলিয়া চীৎকার করিলেই হইল! আবার ব্যাটা যাদু জানে না কি? লোকগুলাও উহাকে দেখিলে যেন পাগল হইয়া যায়। অন্ততঃ এমন কথাও তো শুনিলাম না যে একনাথ কাহাকেও মন্ত্র দিয়া চেলা করিয়াছে। এ কেমন ধর্ম্ম বাবা!"

প্রাণহীন অনুষ্ঠানের জঞ্জাল হইতে ধর্ম্মকে মুক্ত করাই তো একনাথের ব্রত ছিল। মহারাষ্ট্রের অন্যতম মহাপুরুষ চোকমেলার মত তিনিও বলিতেন, "যদি দেখ ঈশ্বরে কাহারও অনুরাগ আছে, মানুষকে সে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার জাতিকুলের কথা তুলিও না। ভগবান মানুষের কাছে শ্রদ্ধা-ভক্তিই চান—জাতিকুল চান না।" তিনি আরও বলিতেন, "হরিনামের তুল্য জগতে আর কিছুই নাই। হরিনাম বেদেরও বাড়া—কেন না হরিনামে কাহারও বাধা নাই, তথাকথিত অন্ত্যজেরও নামে অধিকার আছে।"

শ্রীগুরুর শিক্ষা একনাথের জীবনে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অদ্বৈততত্ত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—"সেই তিনিই এই জীবজগৎ হইয়াছেন!" সমস্ত জীবকে তিনি আত্মস্বরূপে ভালবাসিতেন। তাঁহার করুণাবিগলিত হৃদয়ের কাছে সামাজিক বিধি-বিধানে কঠোরতা কোথায় ভাসিয়া যাইত। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকেরা এই বিষয়ের প্রমাণ পাইবেন।

সেদেশে "মাহার" এক অন্ত্যজ জাতি। ব্রাহ্মণ তাহাকে স্পর্শ করিবে না। একদিন একনাথ গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইতেছেন—পথের ধারে দেখিলেন একটী মাহারশিশু ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে। ছোট ছেলে—বোধ হয় খেলুড়েদের সঙ্গে এত দূর চলিয়া আসিয়াছে, তাহারা ফেলিয়া যাওয়াতে এমন আকুল হইয়া মায়ের জন্য কাঁদিতেছে। একনাথ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ধূলিধূসরিত শিশুকে বুকে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে কোলে করিয়া মায়ের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। আর এক বার একনাথ দেখেন, রাস্তার ধারে এক পীড়িত মাহার যুবক পড়িয়া আছে। বেচারী কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়াছে—এখন সে নিঃসহায়, তদুপরি ব্যাধিগ্রস্ত। দয়ার সাগর একনাথ, তাহাকে কোলে করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং ঔষধ দিয়া ও সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আর এক দিন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে বাড়ীতে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাক হইতেছে, এমন সময়ে কয়েকটী মাহার একনাথের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। রান্নার সুগন্ধে মোহিত হইয়া বেচারীরা বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা এমন খাবার কোনও দিন আমাদের কপালে জুটিবে না।" কথাটা একনাথের কানে গেল। অমনি তিনি ছুটিয়া মাহারদিগকে বাড়ী ডাকিয়া আনিলেন এবং ব্রাহ্মণভোজনের সমস্ত অন্নব্যঞ্জন আনিয়া স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন—ক্রুদ্ধ সমাজের গর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপ

করিলেন না। এইরূপ আরও কত দৃষ্টান্তে তাঁহার জীবে শিবজ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেন—

যে উত্তমভক্ত, সে জগতের সর্ব্ব বস্তুতে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে। বেদ বলিয়াছেন বটে, 'যে কর্ম্ম হইতে চ্যুত, তাহার মুখদর্শন করিবে না'—কিন্তু এ আদেশ কেবল প্রবর্ত্ত সাধকের পক্ষে। অন্ধকার থাকিলেই প্রদীপের প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইলে সেরূপ প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রবিৎ শুচি ব্রাহ্মণেও যে ভগবান্, অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মধ্যেও সেই ভগবান—এই দর্শন যাহার হইয়াছে, সেই যথার্থ ভক্ত। সূর্য্যও যে আলো জোনাকীতেও তাই—কেবল শক্তির তারতম্য বিশেষ। একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলই সেই বিভুরই মূর্ত্তি। গাছের গোড়ায় যে জল ঢালে, আর যে গাছকে কাটিয়া ফেলে—গাছ উভয়কেই ফুল, ফল, ছায়া দেয়। ভক্তও এই জীব জগৎকে এই দৃষ্টিতে দেখিবেন। সর্ব্বত্র সম দর্শনই যথার্থ ধর্ম্ম।"

ক্ষমা একনাথের চরিত্রের আর একটা উজ্জ্বল বিভাব। আমরা দেখিয়াছি, ছোট বেলা হইতেই পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইলেও একনাথ কোনও দিন উদ্ধত ছিলেন না। পরিণত জীবনে এই বিনয় ভক্তির সহিত মিশিয়া আশ্চর্য্য তিতিক্ষা ও মৈত্রীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমরা ইহার দু' একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। এক দিন একনাথ গোদাবরী হইতে স্নান করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একটা মুসলমান আসিয়া তাঁহার গায়ে থুতু দিল। বোধ হয় লোকটা বিপক্ষ দলের কাহারও দ্বারা নিযুক্ত। একনাথ একটা কথা না বলিয়া আবার গোদাবরীতে গিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিতে লোকটা আবার তাঁহার গায়ে থুতু দিল। একনাথ তবুও একটা কথা না বলিয়া আবার স্নান করিয়া আসিলেন। লোকটা আবারও থুতু দিল—একনাথও আবার স্নান করিলেন। এইরূপ বহুবার ঘটিল—কিন্তু তথাপি একনাথের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না। অবশেষে লোকটা নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া একনাথের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। একনাথ মিষ্টবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিয়া বিদায় দিলেন।

আর একবার কয়েকটা চোর একনাথের বাড়ীতে চুরী করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া পলাইয়া যাইতেছিল। একনাথ ছুটিয়া গিয়া তাহাদের থামাইয়া বলিলেন, "বাছা, তোমাদের কি দরকার আমাকে বল, আমি দিতেছি। খালি হাতে ফিরিয়া যাইবে কেন?" চোরেরা তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল, কিন্তু একনাথ তাহাদিগকে ছাড়িলেন না। বলিলেন, "আর না হোক্ দুটো খাইয়া যাইতে হইবে।" এই বলিয়া তাহাদিগকে বাড়ীতে আনিয়া খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। •

চতুরাশ্রম

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কিছু না কিছু কর্ম্ম সকলেরই সঞ্চিত রহিয়াছে। এইটুকু খণ্ডন করিবার জন্য কিছুদিনের জন্য সকলকেই সংসারের আশ্রয় করিতে হয়। তবে এ কথা স্মরণ রাখা ভাল, কর্ম্ম আত্মার স্বভাব নয়, উহার নিবৃত্তিই লক্ষ্য। কর্ম্ম যেমন বন্ধনের কারণ, তেমনি উহা সাধককে মুক্তির পথেও অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। সুতরাং যাহাতে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় এই উদ্দেশ্যেই সকলের কর্ম্ম করা উচিত।

এইরূপ বিচারে বুঝি, দিন দিন আসক্তি বাড়ুক, এই জন্য শাস্ত্রে সংসার করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। আসক্তি ক্ষয় করিবার জন্যই, সংসার করা। সকলেই একজন্মের মানুষ নয়, সুতরাং সকলেরই কর্ম্মফল একরকম নয়। জন্ম-জন্মান্তর সংসারে আবর্ত্তিত হইয়া কাহারও হয়ত ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বাল্যকাল হইতেই তাহার সংসারে স্বাভাবিক বিরক্তি আসিতে পারে। কাহারও হয়ত তাহা হয় নাই, এখনও তাহার ভোগের পিপাসাই প্রবল। কিন্তু একদিন তাহারও আসক্তির শেষ হইবে, এই কথা ভাবিয়া পরিণামদর্শী শাস্ত্রকার তাহার পক্ষেও সংসারের ভোগকে সংযমের ডোরে বাঁধিয়া দিলেন।

মানুষের পরিণাম কি, তাহা আমরা সকলে জানি না। সুতরাং মানুষের পক্ষে যথার্থ কল্যাণ কি, তাহাও বুঝিতে পারি না। প্রবৃত্তিপথে চলিতে ভাল লাগে, কিন্তু তাই বলিয়া উহাকেই কেহ বরণ করিয়া লইবে না। শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ের একটা দ্বন্দ্ব মানুষের আছেই। এই দ্বন্দ্ব মীমাংসা করিতে পারেন একমাত্র তিনি, যিনি উভয়ের অন্ত দর্শন করিয়াছেন। আত্মার স্বরূপ না জানিলে মানুষের যথার্থ কল্যাণ কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ছোট ছেলে আপন খেয়ালমত চলিতে পারিলেই খুসী। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী পিতা-মাতা তাহাকে তাহা করিতে দেন না। তাঁহারা ছেলের চেয়ে বেশী দেখিয়াছেন, বেশী বোঝেন, তাই ছেলের যথার্থ হিতকর ব্যবস্থাও করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা সকল সময় ছেলের প্রবৃত্তির অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আত্মদর্শী গুরুর পক্ষে এই কথা আরও বিশেষ করিয়া খাটে। মানুষের চরম পরিণাম কি, তাহা একমাত্র গুরুই জানেন, স্বয়ই জানেন—কেননা চরম সত্য তাঁহারা সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। এই সত্য জানিয়া মিথ্যার পথে কাহাকেও পরিচালিত করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। বলিয়াছি, সকলের অবস্থা একরকম নহে। কিন্তু তাহা হইলেও পরিণামের দিকে চাহিয়া তদনুকূল ব্যবস্থা করাই উচিত। সংসারনিবৃত্তি মানবাত্মার চরম পরিণাম। আজ আমি চরম লক্ষ্য হইতে যতদূরেই থাকি না কেন, সত্যদর্শী গুরু আমাকে সেইদিকেই পরিচালিত করিবেন, কদাচ বিপরীতমুখে চলিতে বলিবেন না।

নিবৃত্তিমুখী আকর্ষণ যাহাতে সহজ হয়, তাহার জন্যই প্রাচীনকালে বাল্যে গুরুগৃহ-বাসের ব্যবস্থা ছিল। গুরুগৃহে মনুষ্যত্বের শিক্ষা হইত। উপাধি বিভিন্ন হইলেও সবাই যে মানুষ, এবং সকলের পরিণতি যে এক—এই সত্যের উপরই ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষার ভিত্তি।

এই জন্য এই শিক্ষার মাঝে রকমারী ব্যবস্থা বা ব্যভিচার ছিল না। রাজার ছেলেই হউক, আর কাঙ্গালের ছেলেই হউক—সবার জন্যই এক ব্যবস্থা। স্বরূপতঃ সবাই কি, ইহাই বুঝিতে দিতে হইবে; আর চরমে কি হইবে, তাহাও জানাইতে হইবে। অবশ্য সকল মানুষ যে এক কর্ম্মফল নিয়া জন্মায় নাই, গুরু যে তাহা বুঝিতে পারিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার লক্ষ্য হইতেছে, কর্ম্ম ও তাহার ফলের অতীত যে স্বরূপ মানুষ—সেই। শুধু একজন্ম লইয়া যদি কারবার হইত, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-অনুযায়ী রকমারী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই শিক্ষার ফল তো শুধু একজন্ম ব্যাপিয়াই ফলিবে না—উহা যে জন্মান্তরেও ব্যাপ্ত হইবে। স্বরূপ সম্বন্ধে একটা সংস্কার উৎপন্ন করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মফলের প্রভাব হেতু এই সংস্কার সম্পূর্ণ কার্য্যকরী না হইলেও গুরু জানেন, ইহা শিষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নত জন্মগ্রহণের অনুকূল হইবে। প্রাচীন-কালের শিক্ষা এইরূপ ব্যাপক ও গভীর ছিল বলিয়াই উহা ব্যক্তিগত কর্ম্মবৈচিত্র্যের উপর বেশী জোর দেয় নাই। কর্ম্মফল থাকিবেই। কিন্তু কর্ম্মই স্বরূপ নহে। স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মরোধ করাই পুরুষার্থ। এই জন্য কর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যাহাতে আয়ত্ত করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিদ্ গুরু ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীর মাঝে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন। ইহাই হইল ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার মর্ম্ম।

এই শিক্ষা লইয়া সংসারে যাহারা প্রবেশ করিবে, সংসার তাহাদের পক্ষে ভোগের আয়তন নহে। এই জন্য সংসারেও কঠোর সংযমের ব্যবস্থা। সংসারে থাকিয়াও নিবৃত্তি-পথের অনুশীলন যে কতখানি প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। ভোগের মাঝে রাজভোগ যে শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই বলি। প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী এই রাজার জীবনই কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা আলোচনা করা হউক। প্রথমতঃ রাজপুত্রের মনুষ্যত্ব শিক্ষা। আর সকলের সঙ্গে তাঁহাকেও গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন করিতে হইত। প্রাথমিক জীবনে এইরূপ সংযম অভ্যাস করাইয়া তারপর রাজাকে ভোগের সংসারে আনিয়া ফেলা হইত। কিন্তু এখানেও কি রাজার যথেচ্ছ ভোগের অধিকার আছে? রাজার কাছে দেশের সমস্ত ধন আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। ধরিতে গেলে রাজা যেন সমস্ত জাতির ধনরক্ষক। এই বিপুল ভোগ-সঞ্চয়ের সঙ্গে ঋষি একটা অপরিহার্য্য রাজধর্ম্ম জুড়িয়া দিয়াছেন—দান। রাজার ভোগে অধিকার নাই—দানে তাঁহাকে কল্পতরু হইতে হইবে। কর্ম্মের বৈচিত্র্যবশতঃ সকলের সমান ভোগসম্পদ হয় না। অথচ ভোগসাম্য ঘটুক, মানুষ ইহা চায়। এই জন্যই পাশ্চাত্যদেশের socialism, communism, প্রভৃতি নূতন নূতন বাদের সৃষ্টি। কিন্তু ইহাতেও পরস্পর রেষারেষিই চলিতেছে। কিন্তু ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা socialism সমস্যার কি আশ্চর্য্য সমাধান করিয়াছে। অপর্য্যাপ্তভোগে কাহারও অধিকার নাই। ভোগোপকরণ যাহার নিকট সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাকেই দান-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। রাজা সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয়ী—কাজে কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাতাও বটে। দানের পাত্রাপাত্রবিচার রাজাই সকলের চেয়ে ভাল

করিতে পারেন। সুতরাং সমগ্র জাতীয়-সম্পদের সঞ্চয় ও যথাযথ বিতরণ রাজধর্ম্ম। মানুষকে সংযম অভ্যাস করাইয়া, তাহার অন্তর্নিহিত ত্যাগবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এই যে socialismর ব্যবস্থা, ইহাতে বিপ্লবের আশঙ্কা নাই। ইহা যথার্থই মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল। অতএব ইহা ধর্ম্ম।

তারপর গুরুগৃহ হইতে রাজপুত্র আসিয়া যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন গুরুদেবও আসিয়া মন্ত্রী হইয়া পাশে দাঁড়াইলেন। যথেচ্ছাচারের অবকাশ নাই, উচ্ছৃঙ্খল ভোগের অবসর নাই। পার্শ্বেই ব্রহ্মবিদ্ গুরু—তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে প্রজাহিতে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আজকাল আমাদের দেশীয় ধনিসম্প্রদায়ের যদি এইরূপ এক এক শাসক গুরু থাকিতেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইত, সন্দেহ নাই।

তারপর রাজা দেশের সকলের নিকট সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা দায়ী। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া আজকাল আমরা হাসিয়া উঠিব; কিন্তু রাজার উপর কতখানি বিশ্বাস থাকিলে এবং কত গুরুতর দায়িত্বভার ন্যস্ত হইলে এইরূপ দাবী সম্ভবপর, তাহা বিবেচ্য। রাজা যেন প্রজাশক্তির ঘনবিগ্রহ—অষ্টলোকপালের তেজে তাঁহার দেহ গঠিত, ইহাই প্রাচীনদিগের বিশ্বাস। ইহার মূলে কত বড় আত্মপ্রসারের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তারপর রাজার পক্ষেও বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম, রাজার ভোগের অবকাশ কোথায়? অথচ রাজা ভোগোপকরণে আকণ্ঠ মজ্জিত।

রাজার রাজ্য ভোগ্য সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা, সাধারণ গৃহস্থের ক্ষুদ্র সংসারেও সেই ব্যবস্থা। কোথায়ও ভোগের স্থান নাই। ভোগে যাহাতে আসক্তি না হয়, সেই জন্যই বাল্যে সংযমের ব্যবস্থা। অনাসক্তি আজ ভাল না লাগিলেও, শাস্ত্রের অনুশাসনে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে। যদি একটা জন্মেই সব শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে না হয় বলিতে পারিতাম, আহা, বেচারীর ভোগের পিপাসা রহিয়াছে, মিটাইয়া লইতে দাও—আর তো তাহার ভোগের সুযোগ মিলিবে না। আমাদের ধর্ম্ম জন্মান্তর স্বীকার করে, সুতরাং শুধু একটা জন্ম ধরিয়াই এখানে কোনও ব্যবস্থা করা হয় না। দুই-চার জন্ম অনাসক্তি তিক্ত লাগিতে পারে, কিন্তু উন্নত সংস্কার সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসক্তির রস মরিয়া আসিলে জন্মান্তরে উহাই ভাল লাগিবে, এই দৃষ্টিতেই প্রবৃত্তি সত্ত্বেও হিন্দুর নিবৃত্তির ব্যবস্থা। অন্যান্য ধর্ম্ম জন্মান্তর স্বীকার করে না বলিয়া অনাসক্তির ভাবটা এত সহজে গ্রহণ করিতে পারে না, বরং ভোগের একমাত্র সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় উহা তাহাদের নিকট আত্মপীড়ন বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান কুশিক্ষাপ্রভাবে হিন্দুর মজ্জায়ও এই ভাবটা ক্রমশঃ প্রবেশ করিতেছে। ইহাই পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিষময় ফল।

সংসারধর্ম্ম উদ্‌যাপনের পর বানপ্রস্থের ব্যবস্থা, অনাসক্তির ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়। বাল্যে সংযম অভ্যস্ত হইয়াছে কি না, যৌবনে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছে কি না, বার্দ্ধক্যে তাহারই পরীক্ষা। আর

কাল অনেক স্থলেই দেখা যায়, সংসারে যুবক ও বৃদ্ধের মাঝে মত ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য নাই। বহু সংসারে ইহাই অশান্তির একমাত্র হেতু। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সংসারের মমতা কাটাইতে পারিতেছেন না। কর্ম্মক্ষম যুবক পুত্র সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়াছে—আত্মশক্তিতে তাহার পূর্ণ বিশ্বাস, বৃদ্ধের কথা মত চলিতে সে রাজী নয়। বৃদ্ধও কথা বলিতে ছাড়েন না—যুবকও কোন কথা শুনিবে না। অবশেষে বৃদ্ধ রাগ করিয়া কলিযুগের দোষ দিবেন, যুবক বৃদ্ধকে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। বৃদ্ধ ও যুবকের মাঝে এই প্রকার সম্বন্ধ বাস্তবিক বড়ই মর্ম্মান্তিক। আমরা বলি ইহা বৃদ্ধেরই কৃতকর্ম্মের ফল। যৌবনে স্বয়ং অনাসক্তি অভ্যাস করেন নাই এবং নিজ সন্তানকেও সংযম শিক্ষা দেন নাই—আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। আর ঐ যুবক আজ হাসিতেছে বটে, কিন্তু একদিন তাহারও ঠিক এই বৃদ্ধের দশা হইবে। আমাদের সংসারে এই অশান্তিরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

যৌবনে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। এই বিশ্বাস না থাকিলে কোন কাজ করা সম্ভবপর হয় না। যুবক সর্ব্বদাই সংসারের উজ্জ্বল দিকটা দেখিতে পায়। বিভীষিকাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া তাহার স্বভাব। ইহা প্রাণশক্তিরই বিকাশ। ইহাকে বাধা দিতে গেলে ফল ভাল হয় না। কিন্তু যাহাতে এই প্রাণশক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধারও সংমিশ্রণ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই শ্রদ্ধার বীজ বাল্যে রোপণ করিতে হয়। সংযম ভিন্ন শ্রদ্ধা দাঁড়াইতেই পারে না। অসংযত ভোগলোলুপ চিত্ত কোনও বিষয়েই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারে না—ইহা একেবারে অকাট্য সত্য। স্বয়ং আদর্শ হইয়া বাল্যকাল হইতে সন্তানকে সংযম শিক্ষা দিলে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষ আপনা হইতেই হয়। বালক সংযমকে সরল বিশ্বাসে যতটা সম্মানের চোখে দেখিতে পারে, পরিণত বয়স্ক ততটা পারে না। বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা সংযমের আদর্শ হইয়া সন্তানকে সংযম শিক্ষা দিতে পারিলে বার্দ্ধক্যে অনায়াসেই সন্তানের শ্রদ্ধাভক্তির অধিকারী হইবেন। যুবক পুত্রের যৌবনোচিত কর্ম্মোচ্ছ্বাসের সহিত যদি শ্রদ্ধাভক্তির মধুর সম্মিলন হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধ পিতামাতা অনায়াসেই সংসারের ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সংযম অভ্যস্ত থাকায় সংসারের মায়া কাটানো তাঁহাদের পক্ষে যেমন সহজ হইবে, তাঁহাদিগকে অনাসক্ত জানিয়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন যুবক পুত্রও তাঁহাদিগের হিতোপদেশে আরও অধিকতর আকৃষ্ট হইবে। একমাত্র সর্ব্বাবস্থায় সংযম অভ্যাসের দ্বারা প্রাকৃত নিয়মেই সংসার সুখের নিদান হইতে পারে।

অতঃপর অনাসক্তির সংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য প্রাচীনকালে চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। মানব জীবনের ইহাই লক্ষ্য। সংসারে কিছু চিরদিন থাকিতে পারিবে না। একদিন বিদায় লইতেই হইবে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া আগে হইতে তাহার জন্য যে তৈরী থাকিতে পারে, তাহার আর কোনও অবস্থাতেই কষ্ট পাইতে হয় না। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী সংসার ত্যাগের পরওয়ানা একদিন আসিবেই। তবে সেদিন রঙ্গমঞ্চ হইতে গলাধাক্কা খাইয়া বিদায় লইব কেন? আপন ইচ্ছায় জানিয়া শুনিয়াই বিদায় লইব। প্রকৃতির রহস্য জানিয়া তদনুযায়ী নিজকে পরিচালিত করিতে পারাই যথার্থ কৃতিত্ব। ইহাতে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকে, নিজের স্বাতন্ত্র্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাই জ্ঞানীর লক্ষণ। জানিয়া শুনিয়া সংসার করিব—ইহা গৃহস্থমাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভাবের অঙ্কুর

—•—

আশাবন্ধ

পঞ্চম ভাবাঙ্কুর আশাবন্ধ। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী তাহার লক্ষণ বলিতেছেন—"কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি মানে।"

ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, এ কথা বলিবার যোগ্যতা সহজে লাভ হয় না। কথাটীর মাঝে দুইটী ভাব আছে—এক সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ ইষ্টনির্ভরতা। আপাতদৃষ্টিতে দুয়ের মাঝে যেন বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সাধনজীবনের রহস্য পর্য্যালোচনা করিলে এই ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। যথার্থ আত্মপ্রত্যয় অথবা যথার্থ ইষ্টনির্ভরতা যে কি বস্তু, তাহা আমাদের অনুভবে আসে না, তাই শুধু দুইটী শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরিয়া আমরা উভয়ের মাঝে বিরোধের কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে কয়টী ভাবাঙ্কুরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধকজীবনে তাহার সমাবেশ ও স্ফূর্ত্তি ধারণা করিতে পারিলে সহজেই বুঝিতে পারেন, কিরূপ কোমলে কঠোরে সংমিশ্রণ কি করিয়া সম্ভবপর হইল।

প্রাকৃত ক্ষোভ যাঁহার চিত্তকে বিচালিত করিতে পারে না (ক্ষান্তি), যাঁহার একনিষ্ঠ ইষ্টসাধনা নিরবচ্ছিন্ন (অব্যর্থকালত্ব), বিষয়বাসনাকে যিনি দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন (বিরক্তি), তাঁহার মাঝে যে সুমহৎ বীর্য্যের আবির্ভাব হইবে, ইহা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু এত বীর্য্য কঠিন হৃদয়কে আবার স্নিগ্ধ করিয়াছে—মানশূন্যতা। যিনি একাধারে মহাশক্তিশালী অথচ লেশমাত্র অভিমানশূন্য, কোমলে কঠোরে সমন্বয় তাঁহার মাঝেই সম্ভব এমন বীরভক্তই বলিতে পারেন—"কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি মানে।"

এই "দৃঢ় করি মানা" স্পর্দ্ধা নয়—বিশ্বাস। ভাবুক আত্মশক্তির স্পর্দ্ধায় প্রমত্ত হইয়া বলিতেছেন না যে, "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন"; তাহা হইলে কৃপার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই অসমীচীন হইত। তাঁহার নিজের কোনও কৃতিত্বাভিমান নাই বলিয়াই তিনি বলিতেছেন, আমি কৃপার ভিখারী—তুমি দয়া করিয়া নিজগুণে আমাকে টানিয়া লও। এইটুকু হইল তাঁহার ভাবুকতা—তাঁহার মাধুর্য্য। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখি, ভাবুকের চিত্ত অতি সুকুমার, অতি বিহ্বল। কিন্তু এতদিনের সাধনার্জ্জিত শক্তিও তো তাঁহার মাঝে সঞ্চিত রহিয়াছে—তাহার দীপ্তিও তো তাঁহার মাঝে ফুটিয়া উঠিবে। সেই সঞ্চিত সাধনবীর্য্যই বিশ্বাসের আকারে, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বীর্য্য মাধুর্য্যে স্নিগ্ধ হইয়াই আশার সুকোমল রাগে ভাবুকের চিত্ত রাঙাইয়া তুলিয়াছে।

চিত্তকে বিষয় হইতে বিমুখ করিয়া ভগবানে বিলীন করিয়া রাখিতে পারিলে তবে না তাঁহার সহিত আমাদের সত্য সম্বন্ধের পরিচয় পাইব। "দয়াল, আমার শক্তিতে তোমাকে পাইব না, তোমার শক্তিতে আমায় টানিয়া লও"—এই চরম নির্ভরের কথা তিনিই বলিতে পারেন, যিনি শক্তির পরিচালনা করিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে

পারিয়াছেন। ভগবানের শক্তিতেই সব হইতেছে—এ কথা অভিমান না গেলে বলা চলে না। আর অভিমান তাড়ানো কি কাপুরুষের কর্ম্ম? মনে কোনও অভিমান রাখিব না, এ কথা কি মুখে বলা চলে? যত সাবধান হও না কেন, একটু শক্তির পরিচালনা করিতেই দেখিবে, কোথা হইতে "আমি" আসিয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছে। তখন সাধনপথের অন্য বাধা আর দূর করিব কি?—আমিই যে আমার কাছে এক মহাজঞ্জাল। এই আমিত্বের জঞ্জাল দূর করিতে গেলেই যথার্থ সাধনসমরের আরম্ভ হয়। আর এই সংগ্রাম হইতে চিত্ত দিন দিন সত্যভাবে পরিপূর্ণ মহাবীর্য্যের আধার হইতে থাকে। চিত্তনিরোধ করিবার বীর্য্য সঞ্চিত হইলে তখন বলা যাইতে পারে, এবং তখন করামলকবৎ বুঝাও যায় যে শক্তি আমার নয় শক্তি তাঁরই। তখনই ভগবানের সঙ্গে জীবের সত্য সম্পর্ক নিরূপিত হয়—ভগবদ্ভক্তি যথার্থ হয়। এইরূপ নিরভিমান তেজস্বী ভাবুকের নির্ভরই আশাবন্ধ।

"তোমাকে পাইবই"—এ তো আশা নয় শুধু—এ যে আবদার। আপনজনের উপর জোর না থাকিলে কি আবদার করা চলে? এখনও তাঁহাকে পাই নাই, কিন্তু পাইবই—এমন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ড তেজ থাকা চাই। আর সেই তেজই সাধককে সাধনার পথে ঠেলিয়া লইয়া যায়। ভাবুকের আশাবন্ধ তো শুধু নিষ্কর্ম্মার বুলি নয়—সে যে কর্ম্মী সাধকের প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রেরণা।

চিত্তে বসন্ত-নিকুঞ্জে কোকিলের পঞ্চমস্বর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে—বুঝি এইবার মাধব আসিবেন। সে যে আসিবেই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার কি আয়োজন আছে—কি দিয়া আমি তাহাকে বরণ করিব? প্রেমের প্রথম পুলকশিহরণে সমস্তজীবন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে—কোথায় আমার ভূষণ, কোথায় আমার সজ্জা? এ কি বিষামৃত রসায়নে সমস্ত হৃদয় আবেগে অসম্বৃত হইয়া পড়িল—আমাকে তো আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই অসম্বৃত মিলনের নিদারুণ লজ্জা হইতে কি করিয়া বাঁচিব?—এই তো আশার মোহন স্বপ্ন।

এই আশার বেদনায়, অসহ্য পুলকে পীড়িত হইয়া শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী একদিন বলিয়াছেন

> ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
> জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা;
> হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
> হে গোপীজনবল্লভ! ব্যথয়তে, হা হা—মদাশৈব মাম্!

—আমার প্রেম নাই, শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি নাই—যোগ, জ্ঞান, বৈষ্ণবাচার বা বিন্দুমাত্র সৎকর্ম্মের সঞ্চয়ও নাই। এমন কি জাতি গৌরবও আমার নাই। কিন্তু আমি জানি, যাহার কিছুই থাকে না, তুমিই তাহাকে বেশী আপন করিয়া লও। তাই হে গোপীজনবল্লভ, তোমারই আশাপথ চাহিয়া আমি বসিয়া আছি। কিছুতেই তো এ আশার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলাম না। হায়, হায়, এই নিদারুণ আশাবন্ধ যে আমারই মর্ম্ম পীড়িয়া মারিল

সমুৎকণ্ঠা

এই পর্য্যন্ত যে ভাবাঙ্কুর সমূহের আলোচনা হইল, সাধকজীবনে তাহাদিগের মনন করা চলে, সুতরাং তাহাদিগকে সাধ্যসাধনার সীমার অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ ইহাদের আদর্শ ধারণা করিয়া সেই আদর্শের আচরণ ও মনন করিয়া জীবনে ইহাদিগকে ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধনজীবনে অগ্রসর হইলে এমন একটা সংযোগস্থলে আমরা পৌছাই, যেখান হইতে আর নিজের চেষ্টায় সাধনসামগ্রী সঞ্চয় করিতে হয় না—যাহার পর যাহা হইবার, তাহা আপনা হইতেই হইতে থাকে এবং সাধ্যাভিমুখী গতিবেগ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। প্রাকৃত জগৎ হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই বিষয়টী সুপরিস্ফুট হইবে।

প্রাকৃতজগতে একটা নিয়ম আছে, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। দুইটী পিণ্ড সন্নিহিত হইলে, যেটী বড়, তাহার আকর্ষণে ছোটটী বড়র দিকে ছুটিয়া আসিবে। এইরূপে পৃথিবীর আকর্ষণে আমরা ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া রহিয়াছি। এক্ষণে পৃথিবী হইতে দূরে অবস্থিত অপর একটী বৃহৎ পিণ্ডের দিকে যদি একটা কিছু ছুঁড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ পার্থিব আকর্ষণে তাহার গতি ব্যাহত হইবে সুতরাং প্রাক্‌সঞ্চারিত গতিবেগে পৃথিবীর আকর্ষণকে বলপূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া তাহাকে লক্ষ্যপথের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। সুতরাং এই অগ্রগমনকে প্রাক্‌সঞ্চারিত গতিবেগের ফলস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুটী যখন পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা ছাড়াইয়া লক্ষ্যীভূত পিণ্ডের আকর্ষণসীমায় গিয়া পড়িবে, তখন তাহার লক্ষ্যীভূত গতিবেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় সে অনায়াসে এবং অতি দ্রুত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইবে।

সংসারের আকর্ষণ ও ভগবানের আকর্ষণের মাঝে পড়িয়া আমাদিগের এই দশা হয়। এদিককার আকর্ষণ যতদিন প্রবল থাকে, ততদিনই সাধ্য-সাধনার বেগ অনুভব করি। কিন্তু এখানকার গণ্ডী পার হইয়া গেলে পর ওদিককার আকর্ষণ যখন প্রবল হয়, তখন দেখি, সাধন করিব কি? সে যে অসাধনের ধন—সে যে

ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ
তা সবার বলে হরে মন;
পতিব্রতা শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ।

সাধন করিয়া সাধক তখন এই সারসত্য বুঝিতে পারেন যে তাঁহাকে সাধন করিয়া পাওয়া যায় না; তিনি সাধনে দুর্লভ হইয়াই অসাধনে সুলভ। সাধন মায়ামাত্র; তিনি তো মায়ার বশীভূত নহেন; একমাত্র অমায়িক অনুরাগেরই তিনি বশ। আর সেই অনুরাগ সাধকের মাঝে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তিনিই তাহাকে আপনার পানে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। তাই তিনি মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণ, তাই "তাঁর রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।"

এই আকর্ষণ সহজ। ইহাকে ধারণা করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। এই সংসার যেন আবর্ত্তের মত—এখানে স্রোতের গতি উভয় দিক হইতে তাড়িত হইয়া কেবল ঘুরাইয়াই মারিতেছে। প্রাণপণ শক্তিবলে একবার এই আবর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সহজের স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়াই মানবজীবনের কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের এই সহজ আকর্ষণে

স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

—যে মুনিরা আত্মারাম, অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—শ্রীহরির এমনই গুণ। এই অচিন্ত্য মনোহরণ গুণ আছে বলিয়াই তো তিনি শ্রীহরি।

এই আকর্ষণের তীব্র উন্মাদনা যখন অন্তরে পশিয়া মর্ম্মের গ্রন্থিগুলিতে টান দেয়, তখন যে তীব্রমধুর আনন্দবেদনায় মর্ম্ম কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহা অনুভব ছাড়া কে বুঝাইবে? এই উৎকণ্ঠার আবেগ এক দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। প্রেমিকশিরোমণি বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মত্ত কুররীর করুণসুরে মহাপ্রভু ফুকারিয়া উঠিলেন—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ—
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি!

"তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রিদিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন।"

উঠিল ভাব-চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
"অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন"
কৃষ্ণঠাঞি পুছেন উপায়॥

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥

"তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ,
কোনোপায়ে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহত আপনি।"

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত
যাই কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি আমার দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত্ত,
মোর ভাগ্যে কেনে আগমন॥
ভুবনের নারীগণ, সবা কর আকর্ষণ,
যাই কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্ত হর, ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কে না করে মান॥
তোমার চপলমতি, না হয় একত্র স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কোন দোষ।
তুমি তো করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস॥
মোর বাক্য নিন্দা জানি,
কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি,
শুন মোর এ স্তুতিবচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ
হা হা পুনঃ দেহ দরশন॥"

—*—

শান্ত উপাসীত

চাই প্রশান্তি—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ" একটা ভাব। চিত্ত যত প্রশান্ত হবে, ততই তার শক্তি বাড়বে।

স্বভাবতঃ প্রশান্তি আমাদের মনে আসে না—সত্যের জন্য দশজনের সঙ্গে আমরা রেষারেষি করেই চলতে চাই। আমরা এতই হিসাবী হয়ে পড়ি যে, বিনামূল্যে একটু আঘাত আমরা সহ্য করতে চাই না। যিশু-খৃষ্টের জীবনে কি কম বড় আঘাত এসেছিল?—তিনি তো নীরবে তার প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা মাত্র না করে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে গিয়েছেন। কেন না সত্যকে অন্তরে তিনি বাইরের চেয়ে মহান্ বলে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই দেহ বা বাইরের প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল। উদারতা তাঁর স্বভাবে নিহিত ছিল, তাই তো এমন নীরব! কিন্তু আমরা একটা কিছুকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না করতেই বাইরে তাকে কে দেখল না দেখল, তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাই আমাদের উদারতায় কোলাহল বেশী—অন্তরে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হতে গিয়ে বাইরে আমরা "অহং"-এর প্রতিষ্ঠা করে ফেলি।

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল হয়ে উঠলে তার বিরুদ্ধে চলব বলে মনে যে একটা উত্তেজনা আসে, সেটাকেই অনেক সময়ে তেজ-বীর্য্য বলে মনে হয়। এই মনে হওয়াটা অযৌক্তিক নয়। তবুও বলব, শক্তির চরম বিকাশ এই পর্য্যন্ত, এ মনে করাটাও ভুল। সংযমে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। এই উত্তেজনার মাঝেও আত্ম-[illegible] সাধনা আছে। এই তেজবীর্য্য উত্তেজনার মাঝে যদি মনকে আরও গভীর ভাবে অন্তর্মুখী করা যায়, তাতে প্রাণে আরও শক্তি পাওয়া যায়। উত্তেজনার মাঝে যত বড় শক্তি পেয়েছি, এর চেয়ে বড় শক্তি ভিতরে পেতে পারি,—এই উত্তাল তরঙ্গের মত বীর্য্যোন্মাদনাকে যদি সংযত করি।

বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সুখ পাচ্ছি, সে সুখ পরিণামী। ধর্ম্মের জন্য বা সত্যের জন্য যে উত্তেজনা, তাতেও সুখ আছে বটে কিন্তু সে সুখও পরিণামী। হয়ত মনে হবে, "এ সুখও তো তাঁরি আনন্দের একটা রূপ। মূলে সেই একই আনন্দ—কোথাও তার স্থূল প্রকাশ, কোথাও তার সূক্ষ্ম প্রকাশ—এদেরই বা ছাড়ব কেন?"

কিন্তু ছাড়তে তো বলা হচ্ছে না—এদের চরম মনে করে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হচ্ছে। মানুষ একটা কিছু চায়, যা চিরদিন থাকবে। আবার দুদিনের সব ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের একটা কিছু পাবার জন্য হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেও তার চলবে না। তাকে সবই করতে হবে, সবই তার মাঝে আসবে—তবে কথা হচ্ছে, তাতে নির্লিপ্ত থাকা। জগৎ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেই তো আমাদের সব মিটে যাচ্ছে না। দুদিনের যা তাও থাকবে, হয়ত দুদিন পরে তার রূপ পরিবর্ত্তন ঘটবে মাত্র;—আর যা চিরদিনের তা তো আছেই। এই দুটোর মাঝে একটা সামঞ্জস্য করে মানুষকে চলতে হবে—তাই হল প্রকৃত পথ। চিরদিনের যিনি, তাঁকে জেনে দু'দিনের বস্তুর মাঝে অনাসক্ত হয়ে চলতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির

বিকাশ বা উত্তেজনাগুলিকে দাবিয়ে রেখে ক্রমশঃ সেই মহাশক্তিকে অন্তরে পাবার চেষ্টা করতে হবে। দু'দিনের বস্তুকে যথাসম্ভব কেটেছেঁটে চলার নামই সংযম—সংযমে সমস্ত উত্তেজনা শান্ত হলে ক্রমশঃ সেই নির্ব্বিকার মহাশক্তির সাক্ষাৎ মিলে।

বাইরের তৃপ্তিকে যদি ছাড়িয়ে যেতে পার, তবে দেখবে, এমন একটা তৃপ্তি পেয়েছ, যা বাইর ভিতর সমস্তকে জড়িয়ে। প্রথমে উত্তেজনা উন্মাদনায় যে সুখ পেয়েছিলে, তার মাঝেও স্তব্ধ হয়ে যাও—দেখবে, এই অসীম নিঃস্তব্ধতার পরপার হতে এমন একটা শক্তি তোমার মাঝে এসেছে, যা সমুদ্রের মত প্রশান্ত, মেরুর মত অটল, অথচ চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধ ও সুপ্রকাশ। উত্তেজনার শক্তি সসীম, কিন্তু সংযমের পরপারে এই যে প্রশান্তি, এর শক্তি অসীম। প্রশান্ত সমুদ্রের মাঝে যেমন নক্র আছে কি রত্ন আছে বোঝা যায় না, তেমনি এই প্রশান্তির মাঝে কোথায় তোমার বাহ্য সুখ, আর কোথায় অতীন্দ্রিয় সুখ, কিছুই বোঝা যায় না—সব একাকার হয়ে এক সর্ব্বংসহ মহাশক্তিকে অন্তরে জাগ্রত করে।

কিন্তু এ কি একদিনের সাধন? "পাওয়া যায়" বল্লেই কি পেয়ে ফেলেছ? পলে পলে নিমেষে নিমেষে এর জন্য সাধনা চলবে—তবেই পলে পলে তাঁকে পাবে। এই জন্য তাকে "পেয়েছি" বলা চলে না—যে পায়, সেও বলতে পারে না। যেদিন থেকে পাওয়া যায় বলে জেনেছি—সেদিন থেকে পাওয়া শুরু হয়েছে। পলে পলে পাওয়া এবং পাওয়ার চেষ্টাই সাধন। দেশ এবং কালকে সাধনা যত ব্যাপ্ত করতে পারবে—সিদ্ধিও তত স্থায়ী হবে। একটা কিছু করে ফেলেছি মনে করাই মোহ—আর সমস্ত কিছুতে অনাসক্ত হওয়াই মুক্তি। মোহকে মিথ্যা বলে নাকচ করে দেওয়া যায় না—অনাসক্ত হয়ে কার্য্য করলে অন্তরে মোহ না বন্ধনই মুক্তি বা শান্তি [illegible] ওঠে। অন্তরের যে কোনও ক্রিয়ায় বাইরে হতে জবাব না দিলে এই চিরপ্রশান্তিকে অনুভব করা যায়। এই প্রশান্তিই একমাত্র সত্য। প্রশান্তিকে দেশ কালের অতীত বলে জানা জ্ঞান, আবার সমগ্র দেশ কালের মাঝে পাওয়া প্রেম।

বাইরের যা কিছু আসুক, হোক্ না তা প্রতিকূল নিজের শান্তি হারিয়ে তার প্রতীকার করো না; হোক্ না তা অনুকূল—অনাসক্তির আনন্দ হারিয়ে তাতে মজে যেও না। সকল অবস্থার মাঝে তোমার মনকে তুমি একভাবে রাখ। যা সর্ব্বদা একক, সর্ব্বব্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন, সেই সত্তাকে অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে সর্ব্বাবস্থায় অনুভব করে তবে তুমি কাজে হাত দাও। কুপ্রবৃত্তির তাড়না আপনা হতেই চলে যাবে—সুপ্রবৃত্তির জন্য লোভ বা উত্তেজনার কোন প্রয়োজন নাই—আপনা হতে সবই তোমার হবে। জগতের স্ব-ভাবই সুখ—তাকে ভুল বুঝি বলে যা চাই তা পাই না, অমনি দুঃখ মনে হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নেচে বেড়ালে প্রকৃত সত্তাকে পাওয়া যায় না। কেননা বাইরের অবস্থার যে চঞ্চলতা, এ থাকবেই—থাকবার জন্যই এর সৃষ্টি। বিক্ষোভও চিরদিনের, প্রশান্তিও চিরদিনের—তবে বিক্ষোভের পরিণাম আছে, প্রশান্তি অপরিণামী। অপরিণামী সত্তা মূলে আছে বলেই বিক্ষোভের লীলা হচ্ছে।—অপরিণামী বিভুই পরিণামশীল জগতের কারণ। সত্তা

স্বরূপকে চিনবার জন্যই জগতে মিথ্যার অভিনয় চলছে—এই সত্যকে উপলব্ধি কর—সহস্র রূপের মাঝে বিক্ষুব্ধ না হয়ে তার মাঝেও সেই অরূপ একক দর্শন কর—তাতেই প্রকৃত শান্তিলাভ হবে। মুস্কিল আর আসান, উভয়ই তাঁর রূপ, সহজ দৃষ্টিতে উভয়ের মাঝেই তাঁকে দেখতে হবে—নইলে বিক্ষোভ মিটবে না।

তাঁর পরিণাম নাই—ধ্যান ধরে নিজের মনে নিজে তলিয়ে গেলে, বিচার বুদ্ধির বিক্ষোভ শান্ত হলে বিনা প্রমাণে এই এতটুকু হৃদয়ের মাঝে তাঁকে সকল দিক দিয়ে পাওয়া যায়। আগে ভিতরে পেলে তবে বাইরে তাঁকে দেখবার শক্তি জন্মাবে। বাইরে বাইরে ছিটকিয়ে বেড়ালে সমস্ত জগৎ ঢুঁড়েও তাঁকে পাওয়া যাবে না। গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে ভাবলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে এমন একটা শান্তি আসবে—যার কাছে সমস্ত বিক্ষোভ তুচ্ছ। সে ভাবটাকে চোখ না বুজেই মনের মাঝে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। আসল কথা হচ্ছে মনকে একাগ্র করা। একাগ্র হলে সে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে যেখানে থেকে বাইরে ভিতরে উভয়ত্রই সে তাল ঠিক রাখতে পারে।

———*———

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭১।৩

যে ছোট, সেই বড়র গায়ে দাগ কাটতে পারে, বড়র সে সাধ্য নাই। ক্ষণস্থায়ী সুখ চিরস্থায়ী সুখকে দিনের পর দিন আহত করে যাচ্ছে, কিন্তু সে তো এর জন্য তাকে কোন শাস্তি দিতে চায় না। প্রেমে গলে বুকে তুলে নিতেই সে জানে—কেন না আনন্দ যে বড়, তার কাছে সুখের যে স্থান, দুঃখেরও সেই স্থান। প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ কতদিকে দেখছি, চিত্তের মহৎ অবস্থার উপর ক্ষুদ্রের আঘাত কত আসছে; কিন্তু তার জন্য কি করব? করবার কিছুই নাই—মহৎকে বজায় রেখে ক্ষুদ্রের অত্যাচারকে সইতে হবে—চিরদিন ওরা অত্যাচার করবে না, এটা ধ্রুব।

*

ভালবাসাকে উচিত মনে করে কিম্বা প্রয়োজন মনে করে খাটাতে গেলেই তা কৃত্রিম হয়ে পড়ে। আসলে যার খাঁটী ভাব নাই, সে কি নকলে কাউকে আপন করতে পারে? হয়ত যে আমার কথা বোঝে বা আমাকে দুটো কথা বলতে পারে, তাকে ক্ষণিকের জন্য ভুলানো যায়। কিন্তু যার কথা বুঝবার বা বলবার শক্তি নাই অথচ ভাব গ্রহণ করবার হৃদয় আছে—তাকে আমি কি দেব? যেমন একটা পশু; সে তো কথা বুঝবে না; কিন্তু আমার হৃদয়ে যদি তার প্রতি খাঁটী ভাব থাকে, তবে সে আপনা হতেই নত হয়ে পড়বে—কেন না সে ভাবের চাতুরী জানে না, রূপের বৈচিত্র্য জানে না। অরূপ

ভাব বা হৃদয়ই জীবের মাঝে সত্য। হৃদয় যেখানে হৃদয়ের স্পর্শে নত হয়ে পড়ে—দেহ কি সেখানে হৃদয়ের সঙ্গে নত হয়ে পড়াকে দাসত্বের বন্ধন বা কর্ত্তব্যের প্রয়োজন বলে ভাববার অবসর পায়?

*

সর্ব্বত্রই নিজের মাঝে একটা শুদ্ধ ভাব চাই, যা কামনায় পঙ্কিল নয়, বাধার অতীত। কাউকে বশ করতে চাই না, কারো বশ হতে চাই না—সহজ সুন্দর ভাব নিয়ে সকলের প্রাণ বুঝতে চাই। অধীনতা-স্বাধীনতা বাইরের জঞ্জাল—আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলে, যতটুকু আমার প্রাপ্য, তা আপনি আসবে।

আমার উপর যে আমার বিশ্বাস আসছে না—এর কারণ নিজের কাছে নিজে খাঁটী নই। নিজের কাছে খাঁটী থেকে যে কাজই করব, তাই খাঁটী হবে—আজ হোক্, কাল হোক, তার জন্য চিত্তে দৃঢ়তা আমি পাবই। দৃঢ়তা, একাগ্রতা, এইগুলিই তো চিত্তের শক্তি। যার শক্তি আছে, সে আসক্ত হয় না—জগতে অশক্তেরাই আসক্ত বা বদ্ধ। প্রথমে পবিত্র হতে হবে, পবিত্র হলে বিশ্বাস আসবে,—আত্মবিশ্বাস থেকেই শক্তি পাওয়া যাবে।

*

আত্মবিশ্বাস দুই রূপে আমাদের মাঝে প্রকাশ পাইতে পারে—এক কল্পনায় অপর অনুভূতিতে। কল্পনার আত্মবিশ্বাস হইতে জন্মে উচ্ছাস, আর অনুভূত আত্মবিশ্বাসে যথার্থবোধ বা জ্ঞানের সাক্ষাৎকার মিলে। কাজেই নিজকে বিশ্বাস করিতে হইবে বুঝিয়া এবং বাছিয়া, নতুবা ঠকিতে হইবে।

*

ধৈর্য্যের সঙ্গে সত্যকে অবলম্বন করে মুখ বুজে পড়ে থাকলে দেখা যায়, দু'দশ দিন পরে সমস্ত মিথ্যার বন্ধন আপনা হতে আলগা হয়ে এসেছে। কিন্তু এই ধৈর্য্যটুকু আমাদের সকল সময়ে থাকে না—সত্য-মিথ্যার বিরোধ স্থলে সেখানে আঘাত পেতে হয়, সেখানেই আমরা অধীর হয়ে সত্যকে অবিশ্বাস করি। কিন্তু এ সবই হচ্ছে বাইরের দ্বন্দ্ব। বাইরের দ্বন্দ্ব কোনো দিন মিটবার নয়—কেননা না মিটবার জন্যই তাদের সৃষ্টি। বাইরের সমস্ত দ্বন্দ্বের মাঝেও সত্যাশ্রয়ী ও নিরুদ্বেগ থাকতে চেষ্টা করতে হবে—নিয়ত চেষ্টা থাকলে দু'দিন ঠকলেও তিন দিনের দিন কিছু না কিছু ফল পাবই।

*

আমি তো শুধু বাইরের নই—যেমনি বাইরে, তেমনি ভিতরেও আমি আছি। চেষ্টার ফলে বাহ্যজগতে যেমন পরিণাম ঘটছে, ক্রম-বিকাশ ঘটছে—অন্তর্জ্জগতেও তেমনি হবে। অন্তর্জ্জগতে পরিণাম ঘটানোটাই শক্ত তাতে মানুষকে যত বেগ পেতে হয়, বাইরে ততটা নয়। মানুষ অন্তরে বাইরে উভয়ত্র সম-বিকশিত ও সমঞ্জস হতে পারে—এইটুকুই মানুষের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটুকু যথার্থতঃ ফুটিয়ে না তোলা পর্য্যন্ত মুক্তি বা নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ হবে না। অন্তরের অন্তরে নির্ব্বিশেষের প্রতি মহতী প্রেরণা আমাদের সকলের মাঝেই আছে—তাই কোন বিশেষই আমাদের তৃপ্ত করতে পারে না; এই কথাটুকু সর্ব্বদা মনে রেখে বিশেষের মাঝেই যত দিন ঘুরবার বেগ রয়েছে ঘুরতেই হবে—কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে নির্ব্বিশেষ অবস্থার দিকে।

*

শুধু কতকগুলো কথায় তৃপ্তি পাওয়া যায় না—অন্তরে প্রকৃত শক্তিও চাই। অনুকরণ বৃত্তির সহায়ে কল্পনায় নিজকে বড় বড় করেই

দেখি না কেন—শুধু তাতেই নিজের ভিতর জোর পাওয়া যায় না। ভোগে পূর্ণ অনাসক্তি যদি থাকে, তবেই তোমার কল্পনা সত্য। ভোগ কামনায় চিত্ত যতক্ষণ পঙ্কিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কল্পনায় তোমার আড়ম্বর থাকবেই। কাজেই শুধু কল্পনার চাকচিক্য দেখেই নিজকে একটা কিছু মনে করতে নাই। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে বুঝি, আমরা যে ভগবচ্চিন্তার চেষ্টা করি, তার মাঝেও আত্মতৃপ্তির একটা আশা আছে, উলটা দিকে—যে তৃপ্তিকে একটু ঝাঁকিয়ে তুললেই মনে অভিমান এসে পড়ে, ভগবান্ কোথায় মিলিয়ে যান। কাজেই বাহ্যতৃপ্তিতে নিরপেক্ষ তো হবেই—আবার তার ফলস্বরূপ যে আন্তর তৃপ্তি, তাতেও নিরপেক্ষ হতে হবে।

*

যে কাজ অভ্যাসের বশে করি, অনেক সময় তা আমার অজ্ঞাতসারেই আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বা হবে কেন? সমগ্র জগতের স্বরূপ একত্র অনুভব করতে পারি না পারি, আমার মাঝে বা আমার কাছে যা আসছে, তার স্বরূপ বুঝতেই হবে। প্রত্যেক কাজকে জেনে করতে হবে—নতুবা 'আমি' থাকলাম কোথায়? মন্দ অভ্যাসকে ভাল অভ্যাসের সহায়ে জয় করতে হবে কিন্তু কোনোটাতেই মজলে চলবে না। সব সময়েই নিজকে উর্দ্ধে রাখতে হবে।

*

যে ভাবকে মনে প্রতিষ্ঠিত করবে, তা চিরদিনের জন্য এবং প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য। আজ আছে, কাল নাই—অথবা এখন আছে তখন নাই—এমন ভাবকে কখনো আদর্শ বলা যায় না। যেমনি নিজের মনে, তেমনি সকলের প্রতি এক ভাব রাখতে হবে। ব্যবস্থিতচিত্তের যে কোনো কাজের একটা মূল্য থাকে—কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ততা নিয়ে পুণ্য করলেও আমার প্রতি আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি না।

*

সর্ব্বসমঞ্জস হতে হলে নিজের স্বভাবকে আগে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। প্রত্যেকের স্বভাবের একটা বাঁধাধরা গৎ থাকাটাই সঙ্কীর্ণতা। বৈশিষ্ট্যেই জগৎ লীলাপূর্ণ, বিচিত্র। এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে জগৎসৃষ্টির কোন প্রয়োজনই ছিল না—কাজেই বৈশিষ্ট্য থাকবেই। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মাঝে যদি ব্যক্তিগত ভাবের খাদ থাকে, তবেই এক বিশেষের সঙ্গে অপর বিশেষের বিরোধ উপস্থিত হয়। নির্ব্বোধ ভাবের অনুক্ষণ মনন দ্বারা এই খাদ কাটালে তারপর যে পবিত্র বৈশিষ্ট্য থাকে তা সকল থেকে বিভিন্ন হয়েও সকলের মাঝে সমানভাবে নিজকে ছড়িয়ে দিতে পারে। তখন বৈচিত্র্য থাকবে সকলের মাঝে, কিন্তু আমার সঙ্গে বিরোধ থাকবে না। সকলের মাঝেই এক সুর, এক আনন্দ রয়েছে—তাকে অনুভব করাই সর্ব্বসমঞ্জস হওয়া। এর জন্য ছাড়তে হয় অনেক, দিতে হয় অনেক—কিন্তু সে দেওয়ায় অভাববোধ থাকে না। পাওয়াও যায় অনেক—কিন্তু সে পাওয়ায় জীবনের ভার কখনো দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে না। তাদের প্রেমের স্থান দাতা-গ্রহীতারও উর্দ্ধে।

*

সুখ-দুঃখ অনুভব করবার শক্তি থাক, তাতে তো আপত্তি নাই; কিন্তু তাতে আনন্দময় ভাবে কোনো আবরণ না পড়ে, এই লক্ষ্য। অনুভব শক্তি হারানোর নাম সুখ-

দুঃখে সমজ্ঞান নয়। সে সমজ্ঞান তো নির্জীব—সে রকম সমজ্ঞান হলে তুমি আর একটা মাটীর ডেলায় প্রভেদ রইল কি? প্রকৃত সমজ্ঞান হচ্ছে জাগ্রত, আত্মশক্তিজনিত তেজে পরিপূর্ণ। তাতে এমন এক অবস্থা আসে, যে অবস্থায় সাধক সব জানে অথচ কিছুই জানে না অর্থাৎ কিছুর মাঝে থেকেও সে কিছুর দ্বারা আবিষ্ট নয়।

*

অজ্ঞানী জীব যা জীবাচারী জ্ঞানীও তাই। তবে জ্ঞানীর বিশেষত্ব এই যে, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন জীব। সত্যমিথ্যা উভয়ের মাঝ দিয়ে অজ্ঞানী অজ্ঞাতে নিজের প্রারব্ধপথে ভেসে চলে; আর জ্ঞানী সব জেনে সত্যমিথ্যা উভয়কে হৃদয়ঙ্গম করে আপন শক্তিতে আপনাকে লীলাপরায়ণ করেন। বিশ্বব্যাপী যে মহাশক্তি, তাই হল জ্ঞানীর অনুভূত শক্তি। কিন্তু অজ্ঞানী তো তা জানছে না—তাই তাকে ভেসে চল্‌তে হয়।

*

ভাব হবে কাজের রসায়ন—কাজের সঙ্গে তার বিরোধ হবে কেন? ভাব কর্‌তে গিয়ে যে কাজের ক্ষতি করে, তার ভাবের মাঝেই গলদ থাকা সম্ভব। সারাদিন কর্ম্মের জোয়ার ঠেলে অগ্রসর হতে হবে—কিন্তু মনে মনে চলবে ভাবের মনন, ভাবময়ের ধ্যান—এ নইলে কাজের সার্থকতা কি?—শুধু রক্তচালনা আর দৈহিক পরিণাম? দৈহিক সৌন্দর্য্যও দেহের পরিণাম হতে পূর্ণভাবে আসে না—প্রকৃত সৌন্দর্য্য আসে ভাব ও পবিত্রতা হতে। কাজের সময় যদি মনকে ভাবসিক্ত ও পবিত্র রাখ্‌তে না পারি, তবে কাজ করাই বৃথা। নিছক কাজ মানুষকে নীচের দিকেই নামায়। কাজ কর্‌তে কর্‌তেই যদি কর্ম্মবন্ধন ছেদ কর্‌তে চাই—তবে দেহকে পবিত্র, অপাপবিদ্ধ ও মনকে ভাবসিক্ত রাখ্‌তে হবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

দানপ্রাপ্তি

ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমের দালান সংস্কার, বৃহৎপুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও ঋষি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পাঁচ(?) ভয়ে ৫৲ টাকার অনধিক দাতাদের নাম পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ না করিয়া গ্রামের নামে প্রকাশ করা হইল এবং অপ্রকাশ্য গ্রামের দান পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সহিত একত্র করিয়া প্রকাশ করা হইল।

জেলা ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ সহর ... ৩৭।০

প্রীতপুর

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রায় ... ৫০৲

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ রায় কাঠও নগদে ৬০৲

কালীবাড়ী

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দে নগদ ... ১০৲

এবং লোন্ অফিসের ১০০৲ টাকার অংশ খরিদ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দে ১০৲

দত্তের বাজার

শ্রীযুক্ত শ্যাম চরণ সিংহ ... ১০৲

সংগৃহীত ৩৭৸০

ঝগড়ার চর

শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মোদক ১০৲

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মোদক ৫৲

শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র মোদক ৫৲

শ্রীযুক্ত রাধা কান্ত মোদক ৫৲

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র মোদক ... ৫৲

শ্রীযুক্ত দশরথ মোদক ... ৫৲

সংগৃহীত ... ৪॥০

বেণুয়ার চর ... ২॥০

গোপাল নগর ৫৲

ফুলকার চর—

শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র মোদক ৫৲

বালীজুরী

শ্রীযুক্ত রামদাস ভট্টাচার্য্য ৫৲

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার (দ্বিতীয় বার) ৫৲

শ্রীযুক্ত মধুসূদন পাল ৫৲

মাড়োয়ারী সম্প্রদায় ১১৲

সংগৃহীত ২৪॥০

মেষের চর—

শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীল ৫৲

বক্সীগঞ্জ ২৭॥০

মটখোলা ৫৲

ধলা ২৲

কানীহারী ১৲

উপাদি ৩৲

উথরী ৬৲

গফরগাঁও রাজকাছারী ১৲

ঈশ্বরগঞ্জ ১১৲

কিশোরগঞ্জ ১৬॥০

আঠারবাড়ী ৬৲

গৌরীপুর ২৲

কালীপুর ১॥০

রাম গোপালপুর ১৲

তালতলা কাছারী ১৲

নেত্রকোণা ৮৲

জেলা ঢাকা—

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় কাঠেরজিনিষ শ্বেত পাথর ও ছাপা খরচ বাবদে ৮০৲

শ্রীযুক্ত শশী কুমার দত্ত ৫৲

সংগৃহীত ১০৲

গোদনাইল

শ্রীযুক্ত জানকী নাথ দাস (দ্বিতীয় বার) ৫৲

শোলাপাড়া

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দত্ত ৫৲

সংগৃহীত ৯৲

বারদী ৬।০

কাওরাইদ ৯৲

মির্জাপুরবাজার ৬৸৵
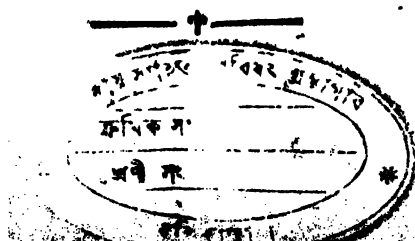
(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৭শ বর্ষ } চৈত্র { ১২শ সংখ্যা

রুদ্রঃ

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৪।১]

আ তে পিতর্ম্মরুতাং সুম্নমেতু
মা নঃ সূর্য্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ।
অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেত
প্রজায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ॥

ত্বাদত্তেভী রুদ্র শন্তমেভিঃ
শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহো
ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ॥

শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি
তবস্তমস্তবসা৽ বজ্রবাহো।
পর্ষি ণঃ পারমংহসঃ স্বস্তি
বিশ্বা অভীতী রপসো যুযোধি॥

মা ত্বা রুদ্র চক্রুধামা নমোভিঃ
মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী।
উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভিঃ
ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি॥

মরুতের পিতা রুদ্র, দিয়াছ যে সুবিপুল সুখ,
তাহে উল্লসিত নিত্য হেরি যেন সবিতার মুখ!
লভি হেন বীরপুত্র—শত্রু সেনা করে নিরমূল,
বিতর আশিষ রুদ্র, পুত্রনাতে স্ফীত হোক্ কুল।

দিলে যে ভেষজ, রুদ্র, জানি তাহা নরের কল্যাণ—
তারি বীর্য্যে মহানন্দে ভুঞ্জি শত বসন্তের দান।
দূর কর শত্রু যত—দূর কর ঘৃণ্য যত পাপ—
সকল শরীরব্যাপী দূর কর ব্যাধির সন্তাপ।

বজ্রবাহু রুদ্রদেব শ্রেষ্ঠজাত তুমি সবাকার—
নিখিল বীরের মাঝে তুমি যেন বীর্য্যপারাবার।
পাপের অপর পারে নিয়ে যাও—স্বস্তি কর দান,
যুঝি দূর করি দাও, হে দেবতা যত অকল্যাণ।

স্তুতি, নতি, আবাহনে নিতি নিতি ঘটে কত দোষ—
নিবার প্রমাদ যত, কল্পতরু, নাহি করো রোষ।
তোমার ভেষজবীর্য্যে পুষ্ট কর মোদের তনয়—
ভিষকের রাজা তুমি শুনিয়াছি—মিথ্যা সে তো নয়।

বেদান্তীর বৈঠক

—•—

"'আমি আত্মস্বরূপ', এ কথা কে বলে ?"

আত্মা বচনের অতীত। সে ভূমিতে দাঁড়িয়ে "আমি ব্রহ্ম", কি "আমি এই"—এমন কোনও কথা বলা যায় না। বাক্য আত্মাকে নাগাল পায় না—তিনি মনোবচনের অতীত। আত্মা বচনের অতীত বলেই আত্মা কখনও বলতে পারেন না, "আমি ব্রহ্ম" বা "আমি আত্মা।" এ সমস্ত উক্তি বুদ্ধির বা সূক্ষ্ম শরীরের। ইচ্ছা হয়, অন্য কোনও নামও দিতে পার। কথা হচ্ছে, মন যদি বলে, "আমি ব্রহ্ম", তা হলে মন যখন বাস্তবিক ব্রহ্ম নয়, তখন সে এ কথা বলে কোন্ অধিকারে ? বেদান্ত বলেন, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, মন-বুদ্ধি ব্রহ্ম নয়; আবার আর এক দিক থেকে দেখলে মন-বুদ্ধি ব্রহ্ম ছাড়াই বা কি হবে ? সে হিসাবে, দেহও তো ব্রহ্ম—সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়। ধর, যদি বলি, "ওই কালো সাপটা একটা দড়ি", তা হলে 'কালো' এই বিশেষণটা সাপে যেমন খাটে, 'দড়ি'টা কিন্তু তেমন খাটে না। সাপটা কালো। এখানে কালো বিশেষণটা সাপের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বটে। যখন বলা হয়, 'সাপটা দড়ি'; তখন দড়িটা সাপের কোনও ধর্ম্ম নয়। তেমনি যখন বলি, দেহ মন বুদ্ধি ব্রহ্ম, তখন দেহ-মন-বুদ্ধিকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলে স্বীকার করি না। কথাটার একটা অর্থ এই যে, দেহ মন বুদ্ধি তাদের আপাতপ্রতীয়মান স্বভাব ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মস্বভাব অঙ্গীকার করছে। তাই যখন বলি, "আমি ব্রহ্ম"—তখন কথাটার এমন অর্থ নয় যে ব্রহ্ম আমার একটা ধর্ম্ম। 'আমি রাজা' বললে বোঝায় রাজত্ব আমার একটা ধর্ম্ম। কিন্তু ব্রহ্ম তেমনি আমার ধর্ম্ম নয় তো। 'আমি ব্রহ্ম' বা 'সাপটা কালো'—দুটা এক শ্রেণীর বাক্য নয়। 'আমি ব্রহ্ম' এ কথায় যদি বোঝাত যে, ব্রহ্ম আমার একটা ধর্ম্ম, তা হলে ওটো পুরোপুরি নাস্তিকবাদ হত। কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যবহারিক 'আমি'কে মিথ্যা বলে অনুভব করতে হবে এবং ব্রহ্মস্বরূপকে পূর্ণ ভাবে প্রকট করতে হবে। হাঁ—অহং ব্রহ্মাস্মি !

হে বিশ্ববাসী, তোমরা আমাকে "স্বামী" বল, "রাম" বল, কি যাই বল না কেন, সব তোমাদের ভুল। অহং ব্রহ্মাস্মি—এই দেহ আমি নই।

একটা লোক ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখল, সে চুরীর দায়ে ধরা পড়েছে; কি সে ভিখারী হয়েছে—তার দুঃখের আর সীমা নাই। স্বপ্নেই, মুক্তি পাবার জন্য কত দেবতাকে সে ডাকল, কত কাছারী ঘুরল, কত উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করল, বন্ধু বান্ধবদের কত কাকুতি মিনতি করল—কিন্তু সব বৃথা হল। শেষটায় তার জেল হয়ে গেল—নিরুপায় দেখে বেচারী কাঁদতে লাগল। এমন সময়ে স্বপ্নেই একটা সাপ এসে তাকে কামড়ে দিল। সাপের কামড়ে তার এত যন্ত্রণা হতে লাগল যে অবশেষে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নের সাপটাকে খুব লক্ষ্মী সাপ বলতে হবে। দেখবে, স্বপ্নে যখনি আমরা কোন বিষাদ বা বিভীষিকার ছবি দেখি, বা যখনই আমাদের মুখ-চাপায় এসে ধরে, তখনি কিন্তু জেগে যাই। ওই সাপটাও তেমনি করে লোকটাকে জাগিয়ে দিল। জেগে দেখে, সে বিছানাতেই শুয়ে

আছে—স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সব কাছেই। তখন তার সকল দুঃখ দূর হয়ে গেল। স্বপ্নে সে বাঁধা ছিল, আর কি করে মুক্তি পাবে, তারই চেষ্টা করছিল। এমন সময়ে সেই স্বপ্নেই একটা সাপ এল। স্বপ্নের আর আর জিনিষের মত সাপটাও ফাঁকি, কিন্তু তফাৎ এই যে সাপটা তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল, চমকে দিয়ে গেল। ওই স্বপ্নের সাপেই তাকে খেল। মানুষটাকে খেল বলছি না,—স্বপ্নের আমিটাকে খেল, তাই বলছি। স্বপ্নের আমিও অন্যান্য স্বপ্নবস্তুর মতই বটে। সাপটা স্বপ্নের আমিকে তো খেলই, আর যত স্বপ্ন বস্তু ছিল, সেগুলিও খেল—অর্থাৎ দারোগা, সিপাই, শান্ত্রী, জেলখানা, সবশুদ্ধ খেয়ে ফেল্‌ল। কিন্তু এই সাপটাও এক আশ্চর্য্য সাপ। সে করল কি, নিজকেও সে খেয়ে ফেল্‌ল। কেননা মানুষটা যখন জাগল, তখন সে আর সাপটাকেও দেখ্‌তে পেল না।

বেদান্ত বলেন, এই যে জগৎ দেখ্‌ছ, এটা স্বপ্নবৎ—মায়া। তবে তুমি যে স্বপ্ন দেখ্‌ছ, তুমি কি? তুমি স্বপ্নের অহং—স্বপ্নের চোর, স্বপ্নের কয়েদী, আরও কত কি। তোমার বন্ধু বান্ধবেরাও এই কারাগারে তোমার সঙ্গী। মুক্ত হবার জন্য তাদের কাছে কত কান্নাকাটী করেছ—স্বর্গের দেবতাদের কাছে কত মাথা খুঁড়েছ। কিন্তু কেউ তোমাকে মুক্ত করতে পারে নি। বন্ধুর কাছে শান্তি পেতে, সাহায্য ভিক্ষা করতে গেলে—কিন্তু কোথায়ও যথার্থ শান্তি পেলে না, সাহায্য পেলে না। যে পর্য্যন্ত সাপে এসে কামড়ায়নি, সে পর্য্যন্ত যথার্থ শান্তি, যথার্থ আনন্দ তুমি মোটেই পাওনি। কিন্তু এই সাপটা কি?—এ হচ্ছে বৈরাগ্যের সাপ। বৈরাগ্য সর্পের মত নিষ্ঠুর, সেই এসে তোমায় দংশন করেছে। বৈরাগ্য তোমার কাছে ভীষণ বলে মনে হয়—সে যেন তোমায় দংশন করে হলাহল ঢেলে দেয়। যথার্থ বৈরাগ্য হচ্ছে জ্ঞান—বেদান্ত।

বৈরাগ্য হলেই জ্ঞান হবে—তখনি ঠিক বোঝা যায়, "আমি ব্রহ্ম" এই কথার তাৎপর্য্য কি? ইউরোপ আর আমেরিকার লোকের কানে "আমি ব্রহ্ম" কথাটা যেন সাপের ফোঁসের মত মনে হয়। ঠিক জানবে, এই সাপই একদিন তোমাদের কামড়াবে—আজ যতই বলনা কেন, "আমি ব্রহ্ম—এমন ভীষণ কথা বলি কি করে?"

দিক্ না ভাই সাপে কামড়ে! সাপের কামড় তো ভাল ওষুধ। তুমি মুক্ত হবে তাহলে, সমস্ত ভাবনা চিন্তার হাত এড়াবে। এ সত্য তো তোমায় বিষে জর্জ্জরিত করবে না—এ যে তোমায় অমৃতে পরিপূর্ণ করবে। তখন জেগে দেখবে, স্বপ্নের আমি মিলিয়ে গিয়েছে—জগৎও কোথায় মিলিয়ে গেছে।

রাম এসব আন্দাজী কথা বল্‌ছেন না। এ খাঁটী সত্য; ইচ্ছা হয় নিজেরা যাচাই করে দেখতে পার! সমস্ত দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা এই মুহূর্ত্তে দূর হয়ে যাবে।

স্বপ্নের চোরও একথা বল্‌তে পারে, "আমি দেহ নই।" তুমি যে ব্রহ্মকে চুরি করেছ, সত্যকে চুরি করেছ, স্বরূপ আবৃত করেছ—কাজেই তুমিই তো চোর। তবে কিনা তুমি স্বপ্নের চোর। আর সেই চোরকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ মহাবাক্য এসে দংশন করল। যে দংশনে প্রাণ জেগে ওঠে, সেই মহাবাক্যের দংশনে স্বপ্নের আমি ছুটে গেল, আত্মা পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটে উঠ্‌লেন। এই আত্মা অবাঙ্‌মানসগোচর। তিনি অবর্ণনীয়, বাক্য দিয়ে তাকে ছোঁয়া যায় না।

"মৃত্যু জীবন্তের নিদ্রা। তার অর্থ কি এই যে, মৃত্যুর জগতে কি চলছে, তা আমরা কিছুই জানতে পারি না?"

মৃত্যুনিদ্রায় যখন আচ্ছন্ন থাক, তখন তোমারই সৃষ্ট জগতে বিচরণ কর। জাগ্রতেও নিজের সৃষ্ট জগতেই বিচরণ কর। চারিদিকে যে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ জগৎ পরিকল্পনা করেছ, তাতেই তোমার বাস। তেমনি মৃত্যুতেও নিজের সৃষ্ট একটা জগতেই বাস কর। স্বপ্নের সঙ্গে জাগ্রতের যে সম্পর্ক, মৃত্যুনিদ্রার সঙ্গেও জাগ্রতের সেই সম্পর্ক।

"আত্মার যখন বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, তখন ঘুমায় কে?"

আত্মা কখনও ঘুমান না। নিদ্রা তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। বেদান্ত বলেন, জাগ্রৎ আর নিদ্রা, দুটোই মায়া। নিদ্রা চিত্ত বা মিথ্যা আমির ভ্রান্তি। নিদ্রার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের যা সম্পর্ক। সূক্ষ্ম শরীর তো স্বরূপ নয়। নিদ্রা তোমার মিথ্যা আমিরই একটা বিভাব।

"সম্মোহনের মিডিয়ামেরা কি প্রেতাত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালায়?"

রাম বলেন, জাগ্রৎ অবস্থাতেও তুমি যত খবরাখবর পাও, সব তোমার ভিতর থেকেই পাও। জাগ্রৎ অবস্থায় যা দেখ বলে মনে হয়, আসলে তা তোমার ভিতরেই। সম্মোহনেও তেমনি সব তোমার ভিতর থেকেই আসে। বেদান্ত যে জগৎটাকে প্রতিভাস বলেন, সে তোমার স্বরূপের উপর জোর দিয়েই বলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি জড় বলে যা কিছু দেখছ, সব তোমারই সৃষ্টি—বেদান্ত এই কথাটার উপরই জোর দেন। লক্ষ লক্ষ সাধু মহাত্মা তোমার মাঝেই রয়েছেন। তোমার বাইরে কেউ নাই।

পারস্য ভাষায় হাফেজের লেখা একটা সুন্দর কবিতা আছে। হাফেজ জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। ইমার্সন মোটামুটি তার কবিতার অনুবাদ করেছেন। যে কবিতাটির কথা বলছি, সেটির ভাবার্থ এই—"মন, সংশয় আর যুক্তি-বিচার ছুঁড়ে ফেলে এস সরাবের রাঙ্গা পেয়ালা নিয়ে—স্বর্গের দুয়ার খুলে যাক্।" এতে তোমায় মদ খেয়ে মাতাল হতে বলা হচ্ছে না। এর অর্থ এই যে ব্রহ্মামৃতই সুরার তুল্য; আমরা এমন নেশা চাই, যাতে তাঁর প্রেমে পাগল হতে পারি। যে সর্প স্বপ্নে চোরকে দংশন করে জাগিয়ে দিয়েছিল, সেই সর্প এসে আমাদেরও দংশন করুক—স্বর্গের দুয়ার আপনি খুলে যাবে। তাই রাম বলছেন, ছেড়ে দাও ভাই বাসনা-কামনার আর প্রশ্ন করার বাতিক। এসো, রামের সঙ্গে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য স্বরূপানন্দে পাগল হয়ে যাও। রাম আর চুপ করে থাকতে পারছেন না—তাঁর বুক ঠেলে কথা বেরিয়ে আসছে। তোমরা কি ভাব, কি চাও, সে বিচার করে আর তিনি পারছেন না—তোমাদের মন জুগিয়ে আর চলা যাবে না।

হে আমেরিকাবাসী, হে জগদ্বাসী, শোন—একই সঙ্গে শিব আর কুবেরের পূজা হতে পারে না। দু' মনিবের হুকুম তোমরা তামিল করে উঠতে পারবে না। ভোগও করব, সত্যও উপলব্ধি করব—এ হয়ে উঠবে না।

সত্য জানতে হলে বাসনা ছাড়তে হবে; সংসারের অনুরাগ বিরাগ ছাড়তে হবে; সমস্ত দাসত্ববন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এই সব তোমাকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। এই হচ্ছে সত্যের মূল্য—এর বিনিময়ে তাকে লাভ করতে পার। যদি দাম না দাও, তা হলে দুঃখনিয়তিতে জ্বলে পুড়ে মর! যদি ভগবানকে

চাও, তবে সব ছেড়ে এস—সব পাবে। খৃষ্ট বজ্রকণ্ঠে এই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তোমরা তার অর্থবিকৃতি ঘটিয়েছ, দশের মন জুগাবার জন্য তার কদর্থ করছে।*

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা,—জানুয়ারী, ১৯০৩)

—*—

ওঙ্কার সাধন

(শব্দব্রহ্ম মার্গে মনোলয়)

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিসংযোগে সগুণ হইয়া স্বীয় স্বভাববশতঃ সৃষ্টোন্মুখ হইয়াছিলেন, যখন মহাশূন্যে ওঁকাররূপ এক বিরাট শব্দের তরঙ্গ হইয়াছিল। শব্দের তরঙ্গ স্বভাবতঃ বক্র বা ঠিক সমুদ্রতরঙ্গবৎ, যথা—⁀⁀⁀। এই তিনটী শব্দতরঙ্গদ্বারাই স্বর্লোক, ভুবর্লোক ও ভূলোক গঠিত হইয়াছিল। বিন্দু ও নাদের যোগে অউম্‌ বা ওম্‌ শব্দ প্রস্তুত হয়। ওমের ওকারের উপরিস্থিত নাদের প্রতীক স্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকারের উপরে একটী বিন্দু লক্ষিত হইয়া থাকে। বিদ্‌ ধাতু উ প্রত্যয়ে বিন্দুশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিন্দু অর্থে জ্ঞাতা বা সর্ব্বজ্ঞ; একমাত্র চৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ বা জ্ঞাতা। অর্থাৎ চৈতন্য বা বিন্দুর সহিত নাদ অনুগত হইয়া ইহাই দেখাইয়াছে যে নাদ ও বিন্দু যোগে ওম্‌ শব্দ প্রস্তুত হয় এবং ওম্‌ এই শব্দের কম্পনে জগৎ সৃষ্ট হয়; তজ্জন্য এই জগৎকে বিন্দুনাদাত্মক জগৎ বলা হইয়া থাকে। কারণ শব্দের কম্পনে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে রস ও রস হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে অগ্রে শব্দ ও শব্দের তরঙ্গের কম্পনেই বায়ুর উৎপত্তি। বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত ইহা স্বীকার করিবেন না—তাঁহারা বলিবেন যে বায়ুতেই শব্দের তরঙ্গ হইয়া থাকে। এই মতদ্বৈধের বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক ওঁকার স্বরূপ এবং এই ওঁকারই সগুণ ব্রহ্ম। ইহা বর্ণগত নহে। ওঙ্কার শব্দ। শব্দের আত্মপ্রকাশের জন্যই বর্ণ ও ভাষা। শব্দের দ্বারাই ভাবের অভিব্যক্তি হয়; সেই আত্মভাব জগতে সংরক্ষিত করিবার জন্যই বর্ণ; তাই শব্দব্রহ্ম ও বর্ণব্রহ্ম উভয়ই ওঙ্কার। এই বর্ণ পুনঃ পুনঃ চিন্তন বা এই শব্দের পুনঃ পুনঃ জপে বর্ণ ও শব্দজ্ঞান দূরীভূত হইয়া ওঙ্কারের স্বারূপ্য লাভ হইয়া থাকে।

বিশ্বে এই একটা শব্দ ভিন্ন দ্বিতীয় শব্দ নাই। যেমন বিদ্যুৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ইহা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা বশে আনিতে পারিলে সুদূর দেশের বার্ত্তা আনয়ন করে, গৃহ আলোকিত করে, ব্যজন দ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করে, বিরাট যন্ত্র চালিত করে, তদ্রূপ জগতে এই একটা মাত্র শব্দ আছে। এই শব্দ বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শব্দ প্রত্যেক জীবের ভিতরে স্বতঃই উত্থিত হইতেছে

ইহা মূলাধারে পরা, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী; হৃদয়ে মধ্যমা ও মুখে বৈখরী রূপে পরিজ্ঞাত। শ্রুতি বলিয়াছেন

"হকারেণ বহির্গতঃ সকারেণ বিশতি পুনঃ"

শ্বাস প্রশ্বাসে এই শব্দটী জীবহৃদয়ে সততই ধ্বনিত হইতেছে। শ্বাসবায়ু যখন বহির্গত হয়, তখন হং শব্দ ধ্বনিত হয়, আবার যখন প্রবেশ করে, তখন স শব্দধ্বনিত হইয়া থাকে সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাসে "হংস" শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। "হংস" "হংস" পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হওয়ায়—"সোহহং" এ পরিণত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে "সোহহং"এর ভিতর এক "ওঁ"ই সংরক্ষিত; কারণ পুনঃ পুনঃ "সোহহং" ধ্বনিত হওয়ায় স এবং হ লুপ্ত হইয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন—

"ওঁমিত্যেবমগ্রআসীৎ"

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র "ওঁ"ই ছিল। অন্যত্র—

"প্রথমোঙ্কারাত্মকমাসীৎ, তস্মাৎ নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে প্রলীয়ন্তে তত্রৈব।"

ব্রহ্মস্বরূপ ওঁকার সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিলেন, তাহা হইতেই সমস্তই নির্গত হইয়াছে—আবার তাহাতেই সমস্ত লীন হইবে। এই ব্রহ্মস্বরূপ ওঁকারে শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তি যথা—সৃজন [creative energy] পালন-শক্তি [preservative energy] ও সংহার-শক্তি [destructive energy] নিহিত আছে। এই প্রণব সগুণ ব্রহ্ম। কারণ—

অকারঃ পীতবর্ণঃ স্যাদ্রজোগুণ উদীরিত।
উকারঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো মকারঃ কৃষ্ণতামসঃ।"

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সমবায়ে প্রকৃতি; প্রকৃতির সহিত চৈতন্য অন্বিত হইয়াই সৃজন পালন ও সংহার হইয়া থাকে। তাই এই প্রণব সাধনায় জীব ত্রিগুণাতীত হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য-মুচ্যতে।"

প্রণবকে ধনুস্বরূপ মনে করিয়া আত্মারূপ শর দ্বারা আমাদের পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে হইবে। লক্ষ্যে উপনীত হইলেই ব্রহ্মস্বরূপতা বা অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিভাত হইবে এবং এই বিশ্বকে এক অখণ্ড বা এক ওঙ্কারের বিস্তার বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে, ওঙ্কার সাধনায় যদি দ্বৈতজ্ঞান লোপ হয়, তবে কি দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা? যদি মিথ্যা হয়, তবে ব্যবহারিক জগতে ইহার সত্তা প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি হইতেছে কেন? দ্বৈতজ্ঞানই বা শাস্ত্রোপদিষ্ট কেন? শাস্ত্র-কারগণ হিন্দুধর্ম্মে অধিকারিভেদ রূপ একটা বিধান করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই দ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা—তাই পরমহংসদেব বলিয়াছেন :—

"প্রথমে সৃষ্টি ও স্রষ্টা বা জগৎ ও ব্রহ্ম এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে (হিন্দুশাস্ত্র-কারগণ) বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া অবশেষে শিব ও শক্তির একত্র সম্মিলন দেখাইয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা উপাস্য ও উপাসক এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ঐক্য জ্ঞান দ্বারা অদ্বৈতবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন। পরিশেষে সাকার ও নিরাকার ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সাকারকে পুনরায় নিরাকারে লয় করিয়া অদ্বৈতবাদ দেখাইয়াছেন।"

অন্য প্রকার সাধনায় অদ্বৈতজ্ঞান হইলেও প্রণবসাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র অদ্বৈতজ্ঞান প্রাদুর্ভাব হয়। তবে প্রণব সাধন বড়ই কঠিন এবং তজ্জন্য প্রকৃত সন্ন্যাসীই ইহার একমাত্র অধিকারী। মন্ত্র মধ্যে শক্তিমন্ত্র, ভক্তিমন্ত্র ও ও প্রণব উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বমন্ত্রের পারগতি। তজ্জন্য মন্ত্রমাত্রেরই বন্ধন বা সেতুস্বরূপ প্রণব সর্ব্বমন্ত্রের সহিত যোজিত হয়, কারণ মন্ত্র উচ্চারণের অস্পষ্টতা, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের অনুচ্চারণপূর্ব্বক জপদোষ উহাতে অপনোদিত হইয়া থাকে। শক্তিমন্ত্র সাধনায় শক্তি জিত হইলে অর্থাৎ রজোগুণ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া যখন আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তখন সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব হয়, —আরও স্পষ্টভাবে বলিতে হইল—শক্তিমন্ত্র সাধনায় যখন সাধকের ভগবৎ শক্তি কি প্রকারে বিশ্বে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে, এই জ্ঞান হইবে, তখনই ভগবৎসত্তা সর্ব্বত্র উপলব্ধ হইবে এবং ভক্তি আসিয়া হৃদয়ে জুড়িয়া বসিবে। সাধক তখনই ভক্তিমন্ত্রের অধিকারী বা শক্তি ও শক্তিমানের অপূর্ব্ব মিলনরূপ যুগলের উপাসনায় অধিকারী হইবে। যুগল উপাসনা পূর্ণভাবে অদ্বৈতজ্ঞান বা ওঙ্কার প্রতিপাদক। কিন্তু বৈষ্ণবগণ জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন; এই ভাব তাঁহাদের পক্ষে নহে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রীরাধা সত্তা। সত্তামাত্রেই চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত। এই চৈতন্যের ও সত্তার একটী নিত্য সম্বন্ধ বা মিলন আছে। সেই মিলনই যখন শাশ্বত ও নিত্য বলিয়া মনে হইবে, তখনই, যুগলের মিলনজনিত আনন্দধারায় সাধক ভাসিয়া যাইবে। আধুনিক বৈষ্ণবগণ এই ভাবকে বিস্তৃত ভাবে না দেখিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে বা মূর্ত্ত রাধাকৃষ্ণ নিতাই বিচার করেন, এই ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া এই যুগল উপাসনার ভিতর যে ব্যাপক ভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা অগ্রাহ্য করেন। তাই তাঁহাদের দ্বৈতজ্ঞান লোপ পায় না। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ অদ্বৈত জ্ঞান লাভের আশায় ওঙ্কার সাধনরূপ কঠোর সাধনায় শীঘ্রই ফল লাভ করেন।

অন্যান্য মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হইলে সেই সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতার ক্ষমতা সাধক অর্জ্জন করিয়া থাকেন—কিন্তু প্রণবসাধনায় মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

হ্রস্বো দহতি পাপানি,
দীর্ঘঃ সম্পৎপ্রদোঽব্যয়ঃ।
সর্ব্বাত্রাসম যুক্তঃ
প্রণবো মোক্ষদায়কঃ॥

সন্ন্যাসী সাধক অবন্ধুর আসনে সরলভাবে উপবিষ্ট হইবেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যাঘ্রচর্ম্মই প্রশস্ত, কারণ "মোক্ষঃ স্যাৎ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।" তবে ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া তাহার চর্ম্ম না হইলে যে হইবে না এরূপ নহে। কম্বলও প্রশস্ত, তবে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে।

সাধক ত্রিসন্ধ্যায় আসনে স্থির ও সুস্থভাবে উপবেশন করিয়া ওঙ্কারের প্লুতস্বরে মানসজপ করিবেন। স্বরের তিনটী অবস্থা আছে—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া একবার সাধারণ ভাবে নিশ্বাস গ্রহণই হ্রস্ব; ঐ নিশ্বাসের দ্বিগুণ সময় ব্যাপী উচ্চারণ বা জপ দীর্ঘ; এবং ত্রিগুণ সময় ব্যাপী একটানা জপ প্লুত। অর্থাৎ সাধারণ নিশ্বাসের ত্রিগুণ পরিমিত নিশ্বাস লইতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন, সেই সময়ব্যাপী একটানা উচ্চারণই প্লুত উচ্চারণ। ওঙ্কারের এই প্লুত মানস জপের ধ্বনি স্বাধিষ্ঠান স্নায়ুকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া অনাহত স্নায়ুকেন্দ্রে প্রতিধ্বনি

করিয়া সহস্রারে লীন হইবে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানে ঐ ধ্বনি উদারা, অনাহতে মুদারা ও সহস্রারে তারা রাগিণীতে পরিণত হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে মানস কর্ণে ঐ ধ্বনি শ্রবণ—মানস নয়নে মৃণালসূত্রবৎ ওঙ্কারকে দর্শন করিবেন ও ঐ মৃণাল সূত্রবৎ ওঙ্কারকে স্বাধিষ্ঠান হইতে সহস্রারে লইয়া কোটি সূর্য্যসম বিন্দুর সহিত সংযুক্ত করিবেন। এইরূপ ওঙ্কার জপ করিতে করিতে সাধক প্রণবের অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পরমাণু ও ইন্দ্রিয়, অহংতত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অতিক্রম করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঙ্কারের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি এক এক পাদ অতিক্রম করিয়া চতুষ্পাদ বা তুরীয় স্বরূপে অবস্থান করিবেন। প্রণবের যৌগিক জাগরণ-স্বপ্ন প্রভৃতির সহিত স্থূল জাগরণ-স্বপ্ন প্রভৃতির কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এই ক্ষণে প্রণব সাধনায় কি ভাবে এক এক পাদ অতিক্রম করিয়া তুরীয় স্বরূপতা লাভ হয়, তাহা দেখিতে হইবে। জীবাত্মা যখন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বাহ্য বিষয় অনুভব করেন বা জাগ্রৎ অভিমানী, তখন তিনি বহিঃপ্রাজ্ঞ, যখন স্বপ্নে অভিমান করেন বা জাগ্রৎ কালের দৃষ্ট স্থূল পদার্থের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা স্থূল বস্তু বাসনার পরিণত অবস্থা অনুভব করেন, তখন তিনি অন্তঃপ্রাজ্ঞ। আবার যখন জীবাত্মা সুষুপ্তিতে অভিমানী বা জাগ্রতের স্থূল বস্তুর সূক্ষ্ম পরিণতি অথবা স্বপ্নের সূক্ষ্ম অনুভূতি যখন কারণে পরিণত, বা আরও স্পষ্ট বলিতে গেলে যখন নাম ও রূপ লয় পায়, পৃথক পৃথক বস্তুর একটা মিশ্রিত জ্ঞান মাত্র হয়-ও একাকার বোধ হয়, তখন প্রজ্ঞান-ঘন।

কিন্তু যৌগিক জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তাহাদের পরিণতি হইতে তুরীয় অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। তুরীয় অবস্থাই ওঁকার অবস্থা। এই অবস্থাই ওঁকার সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে অ উকারে; উকার মকারে লয় করিলে পরে ওঙ্কারে পৌছিতে পারা যায়। অ অর্থে জাগরণ, উ অর্থে স্বপ্ন, ম—সুষুপ্তি এবং ৺ তুরীয়স্বরূপ। এই অকারকে উকারে লয় বা জাগরণকে ধ্বংস করিয়া স্বপ্নে পরিণত করিতে হইবে;—আবার উকারকে বা স্বপ্নকে ধ্বংস করিয়া মকার বা সুষুপ্তিতে লয় করিতে হইবে। এই সুষুপ্তিই পরে তুরীয় অবস্থা আনয়ন করে।

কিন্তু কি প্রকারে এই যৌগিক সুষুপ্তি আনয়ন করা যাইতে পারে? এক জাগ্রত-কালেই জীবমাত্রের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে—স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে কিছুমাত্র থাকে না। সাধক এইটুকু শুধু বুঝিবেন যে জাগ্রৎকালের ক্রিয়ার উপর—সাধকের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা নির্ভর করিতেছে। জাগ্রৎকালে মানব ভোগ করিবার জন্য সততই ব্যস্ত থাকে। এই ভোগের প্রবৃত্তিকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিয়া সততই শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও লীলাদি চিন্তনদ্বারা সর্ব্বদাই ভাবনা-রাজ্যে বিচরণ করিতে হইবে। প্রতি সন্ধ্যায় সাধক জপ নিবিষ্ট হইবেন। প্রতি শ্বাসে জপ করিতে করিতে সাধকের স্নায়ুমণ্ডল শান্ত হইলে ক্রমশঃই মন অন্তর্মুখী হইবে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গ আর কার্য্য করিবে না; এবং শ্বাসবায়ুও স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তখন অঙ্গুলী দ্বারা অস্বাভাবিক উপায়ে নাসারন্ধ্র বন্ধ করিতে হইবে না—আপনা হইতেই প্রাণায়াম বা প্রাণবায়ুর স্থিরতা লাভ হইবে।

রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি স্মৃতঃ॥

এইরূপ একরূপ প্রাণায়াম বা প্রাণবায়ুর স্থিরতা বিবিধ ভাবে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জপ করিতে করিতে—জপে তন্ময় হওয়ায় বায়ু স্থির হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ পুনঃ পুনঃ প্রশ্বাসে অঙ্গারযান বাহির হওয়ায় এবং নিশ্বাসের সহিত ঐ অঙ্গারযান দেহাভ্যন্তরে পুনঃ প্রবেশের জন্য বাহ্য চৈতন্য লোপ হইয়া যায়; কিন্তু অন্তশ্চৈতন্য বিদ্যমান থাকে। এইরূপে বাহ্যচৈতন্য লোপ হইলে সাধকের যৌগিক স্বপ্নাবস্থা লাভ হয়। এই সময় সাধক অন্তর রাজ্যে তন্ময় হন এবং বহির্জ্জগতে তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ নিদ্রিত হইয়া পড়ে। এইরূপ সাধকের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ শ্বাসবায়ু সুষুম্না নালের ভিতর দিয়া বিচরণ করিতে করিতে চক্র হইতে চক্রান্তরে গমন করিবে এবং সাধক তখন কোন এক অভিনব স্বর্গরাজ্যে বা চিরসুখের রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকিবেন। এইরূপ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ রাজ্যে ভ্রমণ ও আন্তর ম্ননের গাঢ়তা সুষুপ্তির অবস্থা আনয়ন করে। পরে সহস্রারে গমন করিয়া ওঙ্কারকে বিন্দু সংযুক্ত করেন বা নাদ তখন বিন্দুতে লয় পায় বা জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হন।

নিঃশব্দং তৎ পরং ব্রহ্ম সমীরতে।
নাদো যাবন্মনস্তাবন্নাদান্তেঽপি মনোন্মনী॥

এইরূপ অবস্থায় তুরীয় স্বরূপে অবস্থান—তখনকার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

সজাতীয়ং ন মে কিঞ্চিৎ
বিজাতীয়ং ন মে কচিৎ।
স্বগতং চ ন মে কিঞ্চিৎ
ন মে ভেদত্রয়ং কচিৎ॥

অর্থাৎ যেমন "একমেবাদ্বিতীয়ং" অবস্থা; যে অবস্থা সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত হইয়া একমাত্র পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। তখন আত্মা—"চক্ষুষো দ্রষ্টা, শ্রোত্রস্য দ্রষ্টা, বাচো দ্রষ্টা, মনসো দ্রষ্টা, বুদ্ধেঃ দ্রষ্টা প্রাণস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য সাক্ষী" রূপে নিত্যানন্দ একরস ভাবে অবস্থান করেন।

ইহার পর সাধকের আর একটা অবস্থা আছে, উহাকে নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞান বলে। উহা গুণাতীত অবস্থা।

এইরূপ অবস্থার পর জ্ঞানী যোগবলে দেহ ত্যাগ করেন এবং পরম পদের অধিকারী হন।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

সেবাধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম

জীবের বাঞ্ছনীয় কি? বাঞ্ছনীয় তিনটী, যথা—মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ—মনুষ্যজন্ম, ভগবৎলাভের বা মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ। এই তিনটী জীব মাত্রেরই প্রার্থনীয়। সকল প্রকার জীবদেহের মধ্যে মানুষ দেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সাধন দ্বারা আত্মোন্নতি ভিন্ন আর জীবের পন্থা নাই। দেবদেহাদি সবই ভোগায়তন দেহ। ভোগ অন্তে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র মানবই জীবদেহে মুক্তির, পরম প্রেমের চরম অধিকারী হইতে পারে। তাই

মহাজনগণ মানবজনমকে "দুর্লভ মানব জন্ম" বলিয়াছেন। এই দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার একমাত্র সার্থকতাই মুক্তি বা মায়ামোহ হইতে উদ্ধারের জন্য অদম্য স্পৃহা। মুক্তির জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিতচিত্ত মানবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান মহাপুরুষরূপে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন; ইহাই মানবজীবনে অধোগতি রুদ্ধ করার একমাত্র উপায়। অতঃপর আর তাহার পতনের ভয় থাকে না। নির্ভরশীল সাধক মহাপুরুষরূপী গুরুর আশ্রয়ে অঘটন ঘটাইয়া মহানন্দে ভবনদী পার হইয়া যায়। এই ত্রিবিধ প্রার্থনীয় বিষয়ের মধ্যে কোনটীকে পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির পথে অধিরোহণ করা সম্ভবপর নয়। মানবজীবন লাভ করিয়া যদি মুমুক্ষুত্ব—ভগবৎলাভেচ্ছা না জাগে, তবে তাহার পশুত্ব দূর হয় না। আবার যদি মনুষ্যত্ব ও মুমুক্ষুত্ব লাভ হওয়া সত্ত্বেও মহাজনের কৃপা না হয়, তবেও জন্মের কোন সার্থকতাই সম্পাদিত হয় না এবং এরূপ জীবন সাধারণতঃ বিফলে কাটিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষা উপস্থিত হইলে দয়াল, ধ্রুব প্রহ্লাদের মত দয়া করিয়া তাহাদের সকল বন্ধন মোচন করিয়া থাকেন। যদি ভগবৎকৃপায় কাহারও ভাগ্যে এই তিনটী সুযোগই জুটিয়া যায়, তবে তাঁহার জীবনের সার্থকতার জন্য আরও দুইটী কার্য্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়; এবং তখন তিনি "আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায়" দেহ ধারণ করেন। নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের হিতের জন্যই তিনি তখন জগতে বিচরণ করেন। মুমুক্ষুত্বের প্রভাবে সাধন সহায়ে যখন জীবের মায়াবন্ধন ছিন্ন হয় এবং আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়, তখন তিনি মুক্ত। তিনি তখন জীবে জীবে শিবের প্রকাশ দেখিয়া ধন্য হন। শিবস্বরূপ "আমি"কে জানিয়া কৃতকৃতার্থ হন। তিনি তখন নিজকে জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে দেখিতে পান এবং জীবে জীবে নিজ প্রেমস্বরূপের প্রকাশ দেখিয়া প্রেমস্বভাব প্রাপ্ত হন।

এইরূপে বন্ধনমুক্ত হইলে তখনই সেই ভাগ্যবান্ প্রকৃত জগদ্ধিতায় নিজকে উৎসর্গ করিতে পারেন। প্রেম ভিন্ন জগতে কোন কর্ম্মই সাধিত হয় না। প্রেমের আকরভূমি "আমি"ই যখন দেশ কাল ব্যাহত করিয়া সকল জীবে বিরাজমান, তখন জগতের হিতে নিজের হিত এবং জগতের সেবায় নিজের সেবারই অনুষ্ঠান করা হয়—প্রেমস্বরূপ "আমি"রই সেবা করা হয়। এই আমিই জ্ঞানীর ব্রহ্ম আর ভক্তের হৃদ্‌নিকুঞ্জবিহারী শ্রীভগবান্। যত্র জীব, তত্র শিব। অতএব জীবসেবায় শিবের—ভগবানেরই সেবা করা হয়। সেবারূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হয়, মন পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, জগৎ জোড়া বিষ্ণুর বিকাশ সর্ব্বভূতে দেখিয়া সেবক জীবন ধন্য হয়। কলিতে অন্নগত প্রাণ জীবের পক্ষে সেবাধর্ম্ম সহজ দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সাধন-ভজনের পরিবর্ত্তে নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। আজ সন্ন্যাসিপ্রবর্ত্তিত সেই সেবাধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নানাস্থানে সেবাশ্রম ও সেবা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং গৃহী কর্ম্মিগণও এই সেবাকার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সেবাধর্ম্মই মানবের সহজ ধর্ম্ম, কারণ ইহা মানবের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দে স্বভাবের অনুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বুঝায়। যে কর্ম্ম যাহার স্বভাবের যত অনুকূল, সে

তাহা তত বেশী ভালবাসে এবং তাহা আচরণ করিতে তত বেশী প্রয়াস করে, কাজেই ধর্ম্মসাধন জন্য প্রবর্ত্তিত যে কর্ম্ম, তাহা আমাদের যতটা স্বভাবের অনুকূল হইবে, আমরা তত বেশী তাহার অনুষ্ঠান-তৎপর হইব সন্দেহ নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া মায়ের "সেবায়" ক্রমে পুষ্টি লাভ করে, বয়স্ক হইয়া নিজসন্তানগণ ও পরিবারবর্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র-কন্যাগণের সেবায় রক্ষিত হইয়া তাহাদের সেবার মধ্যেই দেহরক্ষা করে। ইহাতে দেখা যায় আমরা জন্মিয়া সেবায় লালিত-পালিত এবং বর্দ্ধিত হই এবং সেবায় দেহত্যাগ করি। জীবনের বিভিন্ন স্তরের এই সকলগুলিকে আমরা প্রকাশ্যে সেবারূপে গ্রহণ না করিলেও জীবনে অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে এই সেবাকার্য্য আমরা করিতেছি। কাজেই আমরা এই সেবাধর্ম্মকে নিঃসন্দেহে আমাদের সহজাত বা স্বভাবজাত ধর্ম্ম বলিতে পারি এবং যেহেতু স্বভাবের অনুকূলকর্ম্মই সহজ অনুষ্ঠেয়, এই সেবাকার্য্যও তেমনি সহজ অনুষ্ঠেয়। সেবাকার্য্যের পারিপার্শ্বিক নিষ্কাম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সেবাধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগের অবলম্বনীয় ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম। গীতোক্ত নিষ্কামকর্ম্মের সাধনা এই সেবাকার্য্যে অতি সহজে সম্পাদিত হইতে পারে।

আমরা নানাভাবে এই সেবাধর্ম্ম আচরণ করিতে পারি। জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই সেবারই অন্তর্গত। এই সেবাকার্য্য গৃহ হইতে গৃহান্তরে দুঃস্থ রুগ্ন প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে চলিতে পারে। যদি পরদুঃখে প্রাণ আকুল হয়, তবে তাহাতে সেবারই অনুষ্ঠান করা হয়। ভাব ঐকান্তিক হইলে কখনও কোন আরব্ধ কার্য্য অর্থ বা লোকের অভাবে পড়িয়া থাকে না।

কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ। আহার-কষ্ট মানুষের পক্ষে অসহ্য। দ্বিতীয়তঃ মানুষ অল্পায়ু। শত বৎসরের অধিক আজকাল বড় বেশী কাহাকে বাঁচিতে দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ মানুষ স্বাস্থ্যহীন। ব্রহ্মচর্য্য না থাকায় দেহখানি নানাবিধ ব্যাধির আকর এবং কষ্টসাধ্য কর্ম্মে সম্পূর্ণ অপটু। এমতাবস্থায় শাস্ত্রীয় পন্থায় সুদীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যাদি করিয়া নানাবিধ দৈহিক ক্লেশকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া অতীব কঠিন ব্যাপার। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ কেহ দশ হাজার, কেহ পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যায় কাটাইয়া দিতেন এবং অসীম ধৈর্য্যের সহিত সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী থাকিতেন। তাঁহারা ঊর্দ্ধপদ হেটমুণ্ড হইয়া শীতে জলে দেহ ডুবাইয়া রাখিতেন, গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় নিশিদিন যাপন করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এরূপ কঠিন তপস্যা পূর্ব্বোক্ত কারণে অসম্ভব। তৎপর ব্রহ্মচর্য্য না থাকায় চিত্তও সর্ব্বদা চঞ্চল, কোনও পন্থা বা বস্তুবিশেষে তাহার সংযোগ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় এমন সাধনপন্থা আমাদের অবলম্বন করা চাই, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত রূপ কোন বিপদ বা অসুবিধা নাই, বরং সময় ও স্বভাবের উপযোগী হওয়ায় সেই পন্থাই আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়। বেদান্তের এই মুখ্য সত্যের প্রচার, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাসত্য কর্ম্মজীবনে প্রতিফলিত করিবার একটী প্রকৃষ্ট পন্থাই "নারায়ণ জ্ঞানে জীব-সেবা।" গভীরে

আবদ্ধ "আমিকে" বিসর্জ্জন বা ক্ষুণ্ণ না করিতে পারিলে প্রাণে এই সেবা-ধর্ম্মের স্ফুরণ হয় না। কাজেই সাধনভজনের চরম ফলই সেবার প্রথম সোপানে সন্নিবিষ্ট। তাই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত প্রেমিকের পক্ষে সেবা-ধর্ম্মই সুপ্রশস্ত। ইহা সকল শ্রেণীর মানবই সকল অবস্থায় আচরণ করিতে পারে। ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসীই যে সর্ব্বতোভাবে এই কর্ম্মের উপযোগী, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই সাধনায় গৃহীও যে আনন্দে আত্ম-নিয়োগ করিয়া জড় আবিলতা-ময় সংসার মরুক্ষেত্রে প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা কর্ত্তব্য।

সেবার প্রথম সোপানই গৃহস্থের গৃহে—অন্দরমহলে অবস্থিত। সেখানে রমণী অসূর্য্য-স্পশ্যা হইয়াও জননীর আসনে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া সেবা ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করিতেছেন। আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেহের সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া সন্তানের সেবায় তিনি নিবিষ্ট চিত্তে নিরত। আপনভোলা বাৎসল্যমুগ্ধ সন্তানগতপ্রাণ এমন সেবিকা আর কোথায় মিলিবে? তৎপর পিতা—গৃহস্থ—তিনি সেবার মূর্ত্ত বিকাশ। নিশিদিন সংসারসেবায় আত্মীয়স্বজন স্ত্রীপুত্রকন্যার সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া আপনহারা। বয়ঃস্থ পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতার সেবায় নিরত রহিয়াছে। কাজেই গৃহস্থের এই গৃহ, এই গার্হস্থ্যজীবন সেবাধর্ম্ম সাধনার প্রধান উপায়। এই সেবা দরিদ্রের দরিদ্রতা দূরী-করণে, অসহায়ের সাহায্যে, রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় প্রকাশিত হইয়াছে। অজ্ঞানে জ্ঞান-দান, নিরক্ষরকে বিদ্যাদানও এই সেবারই অন্তর্গত। এগুলি সবই গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহারা এই সকল আচরণ করিয়া যাইতেছে। গৃহেই সেবার প্রথম বিকাশ। ইহার বিস্তার প্রতিবেশীর মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যে ক্রমে সাধিত হয়। স্বামী-স্ত্রী একত্রে প্রতিবেশীর রোগশয্যায় সেবা-নিরত দেখিতে কি মনোহারী! এ দৃশ্য চিন্তা করিলেও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। হায়, কবে এমন শুভ দিন আসিবে, যেদিন এই স্বভাবজাত ধর্ম্ম জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে আমাদিগকে সেবায় নিরত করিবে। আমরা নীচ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া প্রতিবেশীর বক্ষে ছুরিকাঘাত না করিয়া সেবা দ্বারা তাহার ব্যথিত বক্ষের যাতনা দূর করিব। এই সুমহান সেবার আদর্শ দ্বারা আমরা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরম প্রেম লাভ করতঃ মানব জন্ম ধন্য করিব? সেবার সাহায্যে আমরা নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ করিতে শিখিব এবং তাহা হইতে পরা শান্তির অধিকারী হইব।

*

অভিনন্দন

—•—

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি

• •

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রাবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥

এক সময়ে যে স্থানটী স্বর্গীয় মহারাজ-চক্রবর্ত্তী রাজা কমলাঙ্কের অধিবাসভূমি ছিল, যাঁর নামে অদ্যাপি ত্রিপুরা জিলার নাম কুমিল্লা বলিয়া স্মৃত চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারই ঠাকুরবাটীতে এবং যে স্থানটীতে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ গিরি, মহামায়ার মায়ায় সংসারী সাজিয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন; সেই পুণ্যভূমি ময়নামতীতে বহুপুণ্যফলে, পুণ্য মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীপাদপদ্মে সভক্তি প্রণতিপূর্ব্বক আমাদের প্রেমাস্পদ ধর্ম্মভ্রাতৃবৃন্দকে সাদরে প্রেমসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ময়নামতী কেন্দ্রের ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আগন্তুক ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

ত্রিদিবে নন্দনকানন ও দেবসভার কথা শুনিয়া আসিতেছি। তাহা আজ প্রত্যক্ষীভূত হইল। আজ সেই আনন্দময়ীর জন্মভূমি আনন্দ আশ্রমে, পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রী-গুরুমহারাজকে অবলোকন করিয়া আমরা ত্রিদিবের দিব্যজ্যোতিঃতে জ্যোতিষ্মান এবং সৌরভে মাতোয়ারা। আজ অমৃতধারার সঞ্জীবনী শক্তিতে যেন নবজীবন লাভ করিলাম। ত্রিতাপ জ্বালা বিদূরিত হইল, জীবন সার্থক হইল।

আশ্রমের বিশেষত্বঃ— শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বিভিন্ন স্থানে যে সব শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ আশ্রমস্থানই পরম ভাগবত ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। কিন্তু ময়নামতী আশ্রমটী সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। ইহাতেই অনুমান করা যায়, এ স্থানটীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি দয়ালু, তাই নামের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্য এ অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহা আমাদের কেন, এ দেশবাসিগণেরও পরম সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। আমরা ধনে ও ধারণায় উভয়তঃ গরীব; কাজেই সর্ব্বান্তরস্থ ও সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুর আশ্রমকার্য্যের পূর্ণতাসাধনে উদাসীন। ময়নামতীর প্রত্নতত্ত্বসঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ কুমার দত্ত বলেন, আশ্রমের জন্য নির্ব্বাচিত শৈলশিখরে এক সময়ে অনধিক দুই সহস্র সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেন। আরও এতদ্দেশে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ সাধক মীননাথ ও গোরক্ষনাথ এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কিরূপ অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যের উদ্বোধক, তাহা ভাবুক মাত্রেরই অনুভবনীয়।

আশ্রমের উদ্দেশ্যঃ— জাতীয়শিক্ষার আদর্শ প্রবর্ত্তনকল্পে, আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ নিজ তত্ত্বাবধানে ঋষিবিদ্যালয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও বৈদিক নিয়মে শিক্ষাকল্পে আসাম অন্তর্গত কোকিলামুখ

বগুড়া, জয়দেবপুর, ময়নামতী, হালিসহর ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই রূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। দেশের মহামান্য নেতাগণ ও সমাজসংস্কারকগণ! একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন, ব্রহ্মচর্য্য অভাবে দেশের কি শোচনীয় অবস্থা, কি বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে—হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে; বর্ত্তমানে দুর্দ্দশার চরম সীমায় দেশবাসী উপনীত হইয়াছে। অতএব যদি দেশের প্রকৃত উন্নতির ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ধন, প্রাণ, জ্ঞান এবং অধ্যবসায় লইয়া আর্য্য মুনি-ঋষি প্রবর্ত্তিত সেই সনাতন ঋষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার্থে প্রকৃত কার্য্যের সহায় হউন।

আমরা সংসারের জীব, শান্তিলাভের আশায় সর্ব্বদা পরিবার পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি। কিন্তু বিধাতার কি বিধান, তিনি মায়িক জীবকে প্রকৃত শান্তি ধনে বঞ্চিত করিয়াছেন। ভক্তসম্মিলনীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে এই শান্তি লাভের যে ত্রিবিধ উপায় সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই স্থানে দিতেছি।

১। আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন।

২। সঙ্ঘ শক্তির প্রতিষ্ঠা।

৩। ভাব বিনিময়।

যাহাতে নবপ্রেরিত ভাবরাশি গৃহের সকলের প্রাণে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হয়, তাহাই করিতে হইবে। জীবনে সাধন ভজন যে অবশ্য করণীয়, ইহা যাহাতে সকলের প্রাণে জাগরূক থাকে, এবং সকলে পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ও উচ্ছৃঙ্খলভাব রহিত হয়, তজ্জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণসহ জপধ্যান, স্তোত্র, পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন এবং গুরুজনকে প্রণাম, এই কয়েকটী কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

সঙ্ঘশক্তিলাভকল্পে উক্ত প্রকার গৃহীদের একত্র হওয়া আবশ্যক। পরস্পরের মধ্যে যাহাতে ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং শ্রীশ্রীগুরু চরণে যাহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং নির্ভরতার উদ্রেক হয়, প্রাণ যাহাতে বিষয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া ত্যাগ বৈরাগ্যের দিকে ধাবিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টিত থাকিবে। জগতে যত প্রকার সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সমস্তই সঙ্ঘশক্তির মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সঙ্ঘশক্তির মূলমন্ত্র একপ্রাণতা। হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া একই উদ্দেশ্যে সমবেত ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলেই সঙ্ঘশক্তির উন্মেষ হয়।

জগতে সকলেই মানুষ চায়। কিন্তু তেমন মানুষ গড়িবার ব্যবস্থায় সকলেই উদাসীন। যদি দেশের উন্নতি করিতে চাও, দেশের দশের দৈন্য ঘুচাইতে চাও, তবে মুনিঋষিদের প্রবর্ত্তিত পন্থা অবলম্বন কর। অচিরাৎ গৃহীর গৃহে আদর্শ পুরুষ, ঋষিমুনির আবির্ভাব দেখিবে। অতএব গার্হস্থ্য জীবনের সুপ্রতিষ্ঠাই প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সকল প্রকার সংহত শক্তি ইহারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়োগ করা আবশ্যক।

পরস্পর ভাব বিনিময় আমাদের আত্ম-রক্ষার প্রধান সহায়। সংসারের নানাবিধ বিষয়াবর্ত্তে আমরা জর্জ্জরিত। মন কাম-কামনায় মুগ্ধ থাকায় সর্ব্বদা সশঙ্ক ও সন্দিগ্ধ; কাজেই এইরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীগুরু চরণে বিশ্বাস ও একনিষ্ঠাই একমাত্র সংসার-সাগরের তরণী।

সময়ের অল্পতা নিবন্ধন বিস্তারিত বর্ণনে অসমর্থ। কাজেই এ আশ্রম সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ

দর্শন করিয়াই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী উপসংহার করিব।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের দুই জন ভক্ত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত গোলক নাথ দে, উভয়ের উদ্যম, উৎসাহ ও বিশেষ চেষ্টার ফলে আশ্রম স্থানটী শ্রীশ্রীঠাকুরের হস্তগত হয়। এই কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী। প্রার্থনা করি তাঁহাদের এ ভাব অক্ষুণ্ন থাকিয়া চির বর্দ্ধিত হউক।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ প্রায় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে স্থানটী হস্তগত করিয়াছেন। আশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমারানন্দ ব্রহ্মচারীর অশেষ যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা আশ্রমের যোগ্য হইয়াছে। দুই খানা ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির ও ৪।৫ খানা ছোট ঘর উঠিয়াছে কিন্তু তাহারও অনেক কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের অনেক অভাব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। স্থানটী অগৌণে "তারের" দ্বারা বেষ্টন করা আবশ্যক। কারণ আশ্রমোচিত ফলবান্ বৃক্ষাদি রোপণ পক্ষে অনেক বিঘ্ন ঘটিতেছে। আশ্রমের জন্য জলাশয় খনন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। উক্ত ব্রহ্মচারীর সহিত আরও তিন জন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী আশ্রমে আছেন। তাঁহাদের ভরণপোষণ উপযোগী ফসলযোগ্য ভূমির অভাব আছে। ক্রমে কিছু কিছু জমি আয়ত্ত করিতে পারিলে আশ্রম পরিচালন পক্ষে সুবিধা হইবে। এ সমস্ত অভাব পূরণ জন্য সম্প্রতি ১০০০০৲ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত সত্বর যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

আশ্রমটীর প্রতি স্থানীয় লোকের সহানুভূতি বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না, আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। এবং যাহাতে ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা কিম্বা মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা হয়, তাহারই বিধান করিলে আশ্রমটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং ব্রহ্মচারিগণের উদরান্নের সংস্থান হইতে পারে। আশ্রমের অন্যতম সদস্য শ্রীহট্ট মৌলবীবাজার নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত নর্ম্মদা কুমার সেন রুগ্ন অবস্থায় পূর্ণ উদ্যমে, আশ্রম কার্য্যের অর্থ সংগ্রহে ব্রতী থাকিয়া ৯০০৲ নয় শত টাকা দিয়াছেন। নোয়াখালীর সদস্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অর্থ সংগ্রহে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু চটগ্রামের সদস্য শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র দেব এবং ত্রিপুরা জিলার সদস্য কুমিল্লার উকিল শ্রীযুক্ত হলধর দে মহাশয় কর্ত্তব্য কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বিভাগীয় সদস্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাশগুপ্ত সব্‌জজ্‌ মহাশয় তাঁহার পারিবারিক অশান্তি নিবন্ধন আশানুরূপ কার্য্যসাধন করিতে পারেন নাই। তবু তিনি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। প্রার্থনা করি, সদস্য মহাশয়গণের প্রত্যেকের প্রাণে সমভাবে প্রেরণার সঞ্চার হউক, তাঁহাদের প্রত্যেকের কার্য্য দ্বারা, আশ্রমের যাবতীয় অভাব অভিযোগ বিদূরিত হউক, আশ্রমটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হউক।

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠে আশ্রমের কার্য্যের জন্য ৪০ জন ব্রহ্মচারী আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া জন সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বিগত ১০২২ সনের ১১ই পৌষ ভক্ত সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন আসাম বঙ্গীয় "সারস্বত মঠ" কোকিলামুখ পুণ্য স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বৎসর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে ৯ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রত্যেক

সম্মিলনী ধর্ম্মভ্রাতৃগণের প্রাণে যেরূপ ভাবের বিকাশ করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

পরিশেষে আমাদের গুরুভ্রাতৃগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা অনভিজ্ঞ, কাজেই তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা এবং আহারাদির আশানুরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। ভ্রাতৃজ্ঞানে আমাদের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুচরণে শুদ্ধা ভক্তি ও অচলা ভক্তি হয় এবং তাঁহার কার্য্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হয়, ইহাই প্রার্থনা।

সমাগত ভ্রাতৃবৃন্দ! আজ ময়নামতী সারস্বত আশ্রমে আপনাদের শুভসমাগমে আমরা যে কত আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহা বর্ণনাতীত। এবার ময়নামতীর আশ্রমে ভক্তগণ সম্মিলিত হইবেন, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের এইরূপ আদেশ ছিল। এখানকার আশ্রমের অনেক অভাব রহিয়াছে। স্থান সংগ্রহ করিতেই অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে যে সকল অভাব দূরীকরণার্থে বিশেষ চেষ্টা করা হয়। গুরুভাইদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষারম্ভে সমাগত হইয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যথাসময় তাঁহাদের তেমন উৎসাহ ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মফঃস্বলের গুরুভাইদিগের মধ্যে মোগলটোলার শ্রীযুক্ত নর্ম্মদাকুমার সেন উকিল অ.শা.তিরিক্ত সাহায্য করিয়াছেন। রুগ্ন দেহে, নানা বিঘ্ন বিপত্তির ভিতরেও তিনি আশ্রমের কার্য্যে যেরূপ অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।

সর্ব্বাগ্রেই আমি আপনাদের নিকট আশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিতেছি। এ পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে ১৭৭০৲ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ ২৭২২।৶০ আনা দৃষ্ট হইবে। সুতরাং অত্যন্ত অভাবে থাকিয়াও আমাদিগকে এই ভক্ত মহাসম্মিলনীর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। আপনারা অনেকেই দূরদেশ হইতে এখানে পরিশ্রান্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। আপনাদের উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিব, তেমন আয়োজন, আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই অনিচ্ছা-সঞ্জাত ত্রুটীর জন্য বারম্বার ক্ষমা চাহিতেছি।

ভ্রাতৃবৃন্দ! যাঁহারা দুই অধিবেশনে ভক্ত সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা জানেন, আমাদের পক্ষে উহা কি এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার। শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ তাঁহার বিশেষ আশীর্ব্বাদরূপে, ভক্তশিষ্যগণের কল্যাণকামনায় এই অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মহর্ষি অত্রি বলেন—

"হাস্যেঽপি বহবো যত্র বিনাধর্ম্মং বদন্তি হি,
বিনাপি ধর্ম্মশাস্ত্রেণ স ধর্ম্মঃ পাবনঃ স্মৃতিঃ।
—অত্রিসংহিতা, ৩০৭ শ্লোক।

"যেখানে হাস্য-পরিহাসকালেও অধর্ম্ম ব্যতিরেকে (পুণ্যকথা) বলে, ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলেও সে স্থান অতীব ধর্ম্মপূর্ণ, সুতরাং পবিত্র।"

আমরা ইহার বিশেষত্ব আরও অধিক উপলব্ধি করিয়াছি। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের দয়া এখানে সঙ্ঘশক্তির উপর অচিন্তনীয় রূপে কার্য্য করে।

কথায় বলে 'The more the merrier' যত অধিকসংখ্যক লোক একপ্রাণতায় আবদ্ধ হইয়া একই মন্ত্রের উদ্বোধনে তৎপর হন, ততই অধিক আনন্দ অনুভূত হইতে

থাকে। ইহা অধ্যাত্মজগতের কথা। সমবেদনা বা সহানুভূতি মানবমাত্রকেই এক সূত্রে গ্রথিত করে। আমরা সকলেই দরিদ্র ও নিঃসম্বল। ঋষিরা বলিতেন ;—

"এবমস্মিন্ সততপাপিনি সংসারে ন কিঞ্চিৎ সুখম্।"

এই সংসার পাপসঙ্কুল ও ক্ষণবিধ্বংসী। ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও সুখ নাই।

"যদপি কিঞ্চিৎ দুঃখাপেক্ষয়া সুখসংজ্ঞং তদপ্যনিত্যম্।"

যদিও দুঃখের তুলনায় সুখনামক কোন কিছু আছে মনে হয়, তাহাও অনিত্য।

"তৎ সেবাশক্ত্যালাভেন বা মহদ্দুঃখম্।"

আবার সেই সুখ ভোগে অশক্ত হইলে অথবা তাহার অলাভে মহৎ দুঃখ উপস্থিত হয়। আর এই দেহই বা কি ?

"বসা-রুধির মাংসাস্থি-মেদো-মজ্জা-শুক্র-ত্মকম্"

কতকগুলি বসা, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রের সমবায়ে উহা নির্ম্মিত, চর্ম্মাবরণে আবৃত, দুর্গন্ধপূর্ণ ও মূত্রপুরীষাদির দ্বারা অনুলিপ্ত। এই দেহ

"সুখশতৈরপি আবৃতো বিকারী।"

সুখ শত সংবৃত হইলেও বিকারী—

"প্রযত্নাদ্ধৃতমপি বিনাশি।"

উহার ধারণ ও পোষণে যত কেন যত্ন করি না, উহা বিনাশী।

'কাম ক্রোধ-লোভ মোহ-মদ মাৎসর্য্যস্থানম্।'

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, নামক ষড় রিপু তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই সকল চিন্তা করিলে হৃদয় অবসন্ন হয় এবং স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—কঃ পন্থাঃ ?

ভক্ত সম্মিলনীতে এইরূপ কাতর, দীন, সংসারভীতিসন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণই পথ খুঁজিতে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের অশ্রু-অভিষিক্ত আননে ব্যাকুলতা পরিচিহ্নিত থাকে। বুভুক্ষিত আত্মা, অমৃতের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সতীর্থ কাহাকেও দেখিলেই আর কোন কথা থাকে না। একে অন্যের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

সে দুঃখ বড়ই মধুর। সে নির্জ্জনতায় গাম্ভীর্য্য থাকে, বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে। এখানেও অধ্যাত্ম জগতের আর একটী অচিন্ত্যনীয় অবস্থা পরিস্ফুট হয়। নীরব সাধনায়, সমবেত সাধুসজ্জনের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই তাহার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পায়। কেউ কাহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না, অথচ প্রাণ ভরপুর হইয়া উঠে ; যেন হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি বাজিতে থাকে, তাহাতে বাহিরের নিস্তব্ধতা ঘনীভূত হয় সত্য, কিন্তু অন্তর রাজ্যে প্রেরণা আইসে, বন্যা ছুটে। পাশ্চাত্য ভাবুক মহাত্মা Lamb এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন silence multiplied হয় অর্থাৎ নিস্তব্ধতার স্তর আছে। উহা জনসঙ্ঘের আধিক্য অনুসারে, দ্বিগুণ ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ হইতে পারে। একাকী যত কেন তদগত হইয়া ধ্যান করা হয় না, এই সঙ্ঘশক্তির প্রাদুর্ভাব সেখানে দুর্লভ হয়। দুই এক পশলা বৃষ্টিতে ক্ষীণতোয়া নির্ঝরিণী একটু উচ্ছসিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশব্যাপী প্লাবনে সকল স্থানকে উর্ব্বর ও শস্যসমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলে। আবার উহার প্রভাবও স্থায়ী হয়। দুই এক ঋতুতে অনাবৃষ্টি ঘটিলেও সে দেশে দুর্ভিক্ষ করাল বিস্তার করিতে পারে না। ভক্তের পক্ষে

এই সম্মিলন কত কল্যাণকর, ভক্তমাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ এই শুভ মুহূর্ত্তকেই শিষ্যবর্গের প্রাণে শক্তির বীজ আরোপ করিবার উপযুক্ত সময় মনে করেন। উষর ক্ষেত্রে বীজবপনে কোন ফলোদয় হয় না; নির্ম্মল আকাশে কে কখন বিদ্যুল্লতা পরিস্ফুরণ প্রত্যক্ষ করে? শিশির সম্পাতেই পুষ্প বিশেষে কিঞ্জকগুলি বহিরাবরণ ভেদ করিয়া প্রস্ফুটিত হয়। নিদাঘসন্তপ্ত মরুস্থানে কখনও উৎস উৎসারিত হয় না।

সাধনের জন্য অবস্থাবিশেষ যেমন অনুকূল হয়, স্থানমাহাত্ম্যে তেমন উৎকর্ষ ঘটে। আজ আমরা যে পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়াছি, প্রাকৃতিক দৃশ্যে উহা অতি মনোহর। এই অপূর্ব্ব পর্ব্বতাপথবে দাঁড়াইয়া যখন দৃষ্টি সঞ্চালন করি, তখন মনে হয়, প্রকৃতি উহাকে সাধনার উপযুক্ত করার জন্য কোন বিষয়ে কার্পণ্য করেন নাই। ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত চিরশব্দায়মান আকাশ ইহারই মহিমা কীর্ত্তন করে। নিম্নে শষ্পাচ্ছাদিত আস্তরণ ভূমি অভ্যাগতকে আসন ও অর্ঘ্য দিয়া থাকে। সতত প্রবহমান স্নিগ্ধ মলয়ানিল কতদূর হইতে প্রকৃতির শ্যামল অঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া সঞ্চারিত হয়। চারিদিকে বিটপিশ্রেণী সৌন্দর্য্য সম্ভার উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছে। ভাবুক তাহা উপভোগে সমর্থ হইবেন।

আর একটী কিম্বদন্তী আছে, এক সময় এখানে দুই সংস্র সন্ন্যাসী বাস করিতেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সারস্বত আশ্রমের জন্য এই স্থানটীকেই মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহার বাণী—"এই আশ্রমটী তাঁহার সকল আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে।" ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার অধিক আর কিছু বলিবার নাই।

আশ্রম প্রতিষ্ঠাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইবে। আশ্রম সংস্পৃষ্ট ঋষিবিদ্যালয়, আশ্রম রক্ষার জন্য ব্রহ্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা, গৃহস্থের সহিত এই আশ্রমের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় দীর্ঘ সমালোচনা আবশ্যক। আশা করি সতীর্থবর্গের মধ্যে অন্য কেহ সে বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

এক্ষণে গুরুদেবের আদেশে আমি আপনাদিগকে উৎসবের কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। কিন্তু পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে আর একটী কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যাঁহারা আশ্রমের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহাদের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান আমাদের আদর্শস্থানবর্ত্তী হইবে, তেমন সতীর্থ কাহাকেও আজ এই সম্মিলনীতে দেখিতেছি না। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা স্বরূপানন্দ আর ইহলোকে নাই। শ্রীগুরুর কৃপায় তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনি চলিয়া গেলেন। যদিও তাঁহার অভাব আজ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে উপলব্ধি করিতেছি, তবু শোক করিব না। কারণ—

> মনুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
> যঃ করোতি সঃ সম্মূঢ়ো জলবুদ্‌বুদসন্নিভে॥

যে ব্যক্তি প্রাণিগণের কদলীস্তম্ভসদৃশ নিঃসার, জলবুদ্‌বুদের মত ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্বের উপর স্থিরতা আরোপ করে, সে অতিশয় মূঢ়।

> গঙ্গা বসুমতী নাশম্ উদধিঃ দৈবতানি চ—

সুতরাং খেদের কোন কারণ নাই।

> পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ
> কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈঃ তত্র কা পরিবেদনা॥

তবে তাঁহার স্মৃতি আমাদের চিত্তে জাগরূক থাকিবে। তাঁহার উৎসর্গনিষ্ঠা, একপ্রাণতা, সংযম, আচার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা, আমরা ভুলিব না। জীবনে তিনি আমাদের সহায় ছিলেন, মরণেও সুহৃদ থাকিবেন।

ওঁ শান্তি ওম্ *

---

* কুমিল্লা ময়নামতী সারস্বত আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর ১০ম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন বি, এ, কর্ত্তৃক পঠিত।

জিজ্ঞাসা

সগুণ ও নির্গুণ
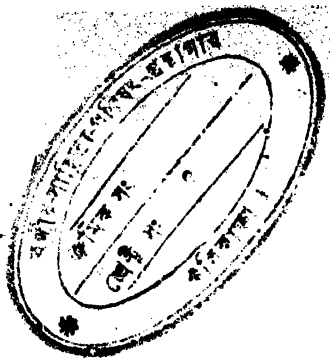
নির্গুণ ও সগুণ একই বস্তুর অবস্থান্তর মাত্র। চৈতন্যই (consciousness) সেই একমাত্র বস্তু। চৈতন্য যখন অব্যক্ত (unmanifested) তখনই তিনি নির্গুণ; আবার যখন সেই চৈতন্য স্বীয় প্রকৃতি বা শক্তির স্ফূরণ করেন, তখন তিনি সগুণ (manifested)। নির্গুণ সঙ্কোচের (re-absorption এর) অবস্থা আর সগুণ সম্প্রসারণের (re production এর) অবস্থা। এই সঙ্কোচ ও সম্প্রসারণই প্রলয় ও সৃষ্টি বা সুষুপ্তি ও জাগরণ। চৈতন্যের স্বভাবই প্রকাশ, তজ্জন্য সম্প্রসারণ। শুদ্ধ বিকারশূন্য চৈতন্য (static consciousness) প্রকাশ-স্বভাব হেতু স্বীয় শক্তির (kinetic aspect of consciousness) সাহায্যে পঞ্চীকরণদ্বারা এই জগৎ ও জীবে পরিণত হইলেন।

এই শক্তিকেই আমরা প্রকৃতি বলিতেছি। এ শক্তি তাঁহারই স্বরূপ শক্তি—নির্গুণ অবস্থায় ব্রহ্মে বা চৈতন্যে স্তিমিতভাবে ছিলেন। চিচ্ছক্তি সৃষ্ট্যুন্মুখ হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণে পরিণত হন। এই তিন গুণের সমবায়ে প্রকৃতি। এই তিনটী গুণ সমভাবে মিশ্রিত হইলেই গুণের তিরোধান হয়। কারণ উত্তম—মধ্যম—অধম, এই তিনটী গুণ সম-পরিমাণ হইলে গুণের লোপ হয়, সুতরাং তখন শক্তির ক্রিয়াশীলতার হানি হয় ও ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা আসে বা তখন ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করেন। তবে কি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা? হাঁ, পারমার্থিকভাবে জগৎ মিথ্যা, কারণ জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কেবল "অজ্ঞানাবস্থায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান যেমন সত্য—তদ্রূপ অজ্ঞানাবস্থায় জগৎও ব্যবহারিকজ্ঞানে সত্য। কিন্তু ভ্রম দূর হইলে যেমন সর্প ও রজতজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া রজ্জু ও শুক্তিমাত্র বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানাবস্থায় জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়—তাই জগৎ অসত্য।" বড়ই ভয়ানক কথা! তাহা হইলে ব্রহ্মই জড়রূপে রূপান্তরিত হইয়া আবার সেই জড়ের অন্তরালে ভরপুর বা ওতপ্রোত হইয়া জগতের পক্ষে সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, ভোক্তা ও অভিরক্ষিতা। বেশ, তাহা হইলে নির্গুণাবস্থায় কোন সময় কিছু ছিল না, এরূপ বলা যায় কি? না—কারণ নির্গুণ বা অব্যক্ত বলিলে চৈতন্যের অস্তিত্বের বা বিদ্যমানতার একান্ত অভাব হইতে পারে না। একান্ত অভাব হইলে ভাব বা ব্যক্ত হয় কি প্রকারে? যাহা কখনও ছিল না, তাহা কখনও আসিতে পারে না। এই অনন্ত শূন্যের মাঝে "একাংশেন স্থিতং জগৎ" বা এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগৎ। অনন্ত জলধির মাঝে কোন স্থানে আত্যন্তিক শৈত্য সংযোগে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় ও পুনরায় বরফ গলিয়া জলে পরিণত হয়—নির্গুণ ও সগুণ ঠিক তদ্রূপ নহে। কারণ সমুদ্রের জলের পক্ষে শৈত্য বাহ্য পদার্থ—তাহার সংযোগে জল বরফ হয়—জলের

নিজের শক্তিতে নহে। আর জগৎ ব্রহ্মের নিজ শক্তির রূপান্তর।

চৈতন্য পূর্ণযোগ—তবে তাঁহার এই সৃজন বাসনা কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—চৈতন্য প্রকাশশীল! পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির যে সমস্ত subconscious impressions বা সংস্কার ছিল, প্রকাশের সময় হইলে আবার সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনটী গুণের একটীর আধিক্য হওয়ায় পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয় ও জীবজগতে পরিণত হয়। প্রকাশই তাঁহার ধর্ম্ম এবং গুণের ভিতর দিয়া তিনি প্রকাশিত হন। সেই অসীম (Infinite) সসীম (Finite) হইয়া নিজকে প্রকাশিত করেন। তজ্জন্য তিনিই বিশ্বের একমাত্র দ্রষ্টা, ভোক্তা ও অভিরক্ষিতা। বেশ—যদি তিনি অভিরক্ষিতাই হন, তবে শ্রীভগবান

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ"

অর্থাৎ ভূতগণ আমাতে অবস্থিত আমি সে সকলে অবস্থিত নহি—কেন বলিলেন? তাহা হইলে "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" এ প্রতিশ্রুতির সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তর শ্রীধরস্বামী দিয়াছেন:—

"যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টঃ তিষ্ঠতে, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি নিরহঙ্কারাৎ তেষু ন তিষ্ঠামি।"

অর্থাৎ জীব যেমন দেহ ধারণ ও পালন করিলেও অহঙ্কারবশতঃ দেহাত্মবোধপ্রধান জ্ঞান থাকায় দেহে মিলিত থাকে, কিন্তু শ্রীভগবান যখন সর্ব্বগত, সর্ব্বময়, তখন তাঁহার অহঙ্কার কোথায়? নিরহঙ্কারবশতঃ তিনি ভূতগণকে ধারণ ও পালন করিয়াও সেরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। অহংবুদ্ধি থাকিলেই "আমি রাম নহি" "শ্যাম নহি" "গাছ পাথর নহি" ইত্যাদি ভেদজ্ঞান থাকে। ঈশ্বরের তাহা অসম্ভব। কারণ তাঁহার অতিরিক্ত পদার্থ থাকিলেই তাঁহার অহঙ্কার সম্ভব হইত। তিনি যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তিনি এক। বিশেষতঃ সূক্ষ্মতা হেতু নিরবয়ব, সুতরাং বিশ্লেষের সম্ভাবনা নাই। বেশ—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভগবান এক নিশ্বাসে বলিলেন যে "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" এই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য হয় কি প্রকারে? উত্তর—

"যথা অগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদি দুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্প বৃক্ষস্য তথাপি ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি।"

অর্থাৎ যেমন অগ্নিসেবী ব্যক্তিগণে অগ্নির পক্ষে অন্ধকার ও শীতাদি দুঃখ নিবারণ বিষয়ে কোন বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্বদোষ নাই—জীবের নৈকট্য ও দূরত্বাদি কারণেই বৈষম্য কারণ বোধ হয়; কিম্বা কল্পবৃক্ষের সেবকগণ সম্বন্ধে বৈষম্য নাই, তদ্রূপ ভক্ত ও অভক্তে তাঁহার বৈষম্য নাই। প্রকৃত কথা এই যে, যে তাঁহার ভজনা করে, সে সর্ব্বদা ভগবানের অতি নিকটে অবস্থান করে বা ভগবানের নিকটে অগ্রসর হয়। বেশ—ভগবানের নিকটে পৌঁছান যায় ভজনা দ্বারা; কিন্তু সগুণ কি নির্গুণ—কি প্রকার ভজনা দ্বারা তিনি সহজ লভ্য?

এই উভয়বিধ উপাসনার তাৎপর্য্য শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

অর্থাৎ যাহারা নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তায় আসক্ত-চিত্ত, তাহাদের সিদ্ধিলাভে অধিকতর

ক্লেশ হইয়া থাকে—কারণ দেহিগণ অতি কষ্টে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয় নিষ্ঠা লাভ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষুদ্র মানব—তার জ্ঞান কতটুকু? সে কি প্রকারে ইন্দ্রিয়াপরিশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, হেতু চিন্তার অতীত ব্রহ্মকে ধারণা করিবে? এ অবস্থা ত সিদ্ধিলাভের পরাবস্থা। নির্গুণ ব্রহ্মে মন্ত্র তন্ত্র, ধ্যান ধারণা স্তব-স্তুতি কিছুই পৌঁছায় না। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যোগেশ গূঢ় বিষয় উপদেশার্থে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরঞ্চ
অতালুকণ্ঠোষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং পরমূষ্মবর্জ্জিতং
তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥"

তাই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতেই সগুণোপাসনা চাই এবং সগুণোপাসকগণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে বলিয়াছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"

—কিন্তু যাঁহারা আমাকে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ সহকারে আমার আরাধনা করে—হে পার্থ আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই সকল মহাত্মাদিগকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করি।

বেশ, তাহা হইলে "আমাকে" অর্থে "শ্রীকৃষ্ণকে" উপাসনা করিলে মুক্ত হইবে, আর অন্য দেবতাকে উপাসনা করিলে কি মুক্তি হইবে না? ইহার উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন—বলিয়াছেন, "ব্রহ্মণোহিপ্রতিষ্ঠাহং" আমিই ব্রহ্মের ঘনীভূত মূর্ত্তি। কিন্তু আমি যে কে, তাহা আর কেহ জানে না—কারণ আমাকে সামান্য মানব মনে করিয়া লোকে অবজ্ঞা করে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

মূর্খ মানবগণ সর্ব্বভূত-মহেশ্বর আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া (বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়াও ভক্তেচ্ছাবশতঃ) নরদেহধারী বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। এই সমস্ত অবজ্ঞাকারিগণ ঘোর রজঃ ও তমোগুণযুক্ত।

"মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

—বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী ও আসুরী—রজঃ ও তমোগুণযুক্ত এই সমস্ত মূর্খগণ (যন্তুঃ অন্যদেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীতি এবম্ভূতাঃ) অন্য দেবতা আমা অপেক্ষা শীঘ্র ফল দিবেন এইরূপ বিফলাশাবিশিষ্ট—বিফল কর্ম্মা নিষ্ফলজ্ঞানবিশিষ্ট ও বিক্ষিপ্তচিত্ত। কেবলমাত্র দৈবীপ্রকৃতিবিশিষ্ট যাহারা—তাহারাই আমাকে নানাভাবে ভজনা করেন।

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥"

—কেহ কেহ সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিদ্বারা কীর্ত্তন করিয়া, কেহ দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি বিষয়ে প্রযত্ন করিয়া, কেহ ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, কেহ বা সর্ব্বদা একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন। আবার কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ সর্ব্বত্র আত্ম-দর্শনরূপ জ্ঞান দ্বারা আমার আরাধনা করেন—

কেহ বা নিজকে আমার সহিত অভেদ ভাবিয়া, কেহ বা দাসভাবে—কেহ বা সর্ব্বদেবময় আমাকে ব্রহ্মরুদ্ররূপে উপাসনা করেন।

দেবতাসকল শ্রীভগবানের বিভূতি হইলেও উপাসনা এবং "ব্রহ্মবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ" প্রভৃতির উপাসনার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার বিভূতিস্বরূপ যে সমস্ত দেবতা আছেন - যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিলেও ইচ্ছামাত্রে ভক্তেচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন—তাঁহাদের উপাসক তৎ তৎ দেবলোকে গমন করে ও পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যে আগমন করে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত ব্রহ্মাদি প্রকৃতির জন্ম ও প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাশ হয়। এইরূপ কত কত "সম্ভূত" ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি মানবের আধিনায়করূপে শ্রীভগবানের বিশাল শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতীক বা শ্রীভগবানের ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি আছে। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি এই সমস্ত দেবতার সহিত অভেদ। কিন্তু ভক্ত এই অভেদভাব হারাইয়া বসে। শুধু তাঁহার ভক্তের এই আশঙ্কা নাই—সৃষ্টিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নাশের সম্ভাবনা নাই। ভক্তগণ তাঁহার নিত্যধামের নিত্যলীলার পরিকরস্বরূপ নিত্যবৃন্দাবনে অবস্থান করেন। কিন্তু এই দৈবী প্রকৃতির ভক্তমাত্রেই কি তাঁহাকে পায়?

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

—বহু বহু জন্মে অল্প অল্প পুণ্যসঞ্চয়ে শেষ জন্মে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বময় এই জ্ঞান হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। এখানে "বাসুদেব" শব্দে স্পষ্টই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, এমন কি তিনি বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণভক্ত অন্যান্য দেবতার প্রতি আসক্তিহীন হইলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই—কারণ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে শাখা পল্লবে জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভজনশীল হইয়া আমার ভজনা করেন, তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য হন, কারণ তিনি উত্তম অধ্যবসায়যুক্ত।

কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি কিরূপ? সত্যই কি তিনি ভক্তগণের সেই "নবীনজলদপ্রভ" শ্যামসুন্দর রূপ? সত্যই কি তিনি "নীল কলেবর?" ঐ যে আকাশ, উহা কি সত্যই নীল—ঐ যে বিপুল জলধি উহা কি সত্যই নীল? উহা ত নীল নহে—উহা স্বচ্ছ—দূর থেকেই স্বচ্ছ পদার্থ নীল প্রতীয়মান হয়। ব্যোমযানে চড়িয়া উপরে উঠিলেই দেখিবে উহা নীল নহে স্বচ্ছ। বাষ্পীয় যানে চড়িয়া সমুদ্র ভেদ করিলেই দেখিবে উহা নীল নহে—স্বচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে আমরা অনেক দূরে পড়িয়াছি—তাই আমরা তাঁহাকে এখন নবীন জলধর, সুন্দর নীলকলেবর ও দ্বিভুজ মুরলীধর বলিয়া মনে করি। যতই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইব, ততই তাঁহার নীলিমা অন্তর্হিত হইতে থাকিবে; তারপর এক সময় আসিবে, যখন রূপের লয় হইবে। যাহা থাকিবে, তাহা তাঁহার স্বরূপ একান্ত স্বচ্ছতা—স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। তাই শাস্ত্রে সত্ত্বগুণ সাদা। তাই শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপম্ অজস্রম্।"

একনাথ

একনাথের প্রচারকার্য্যের এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা নীরবেই দিয়াছেন, প্রচারের মাঝে আয়োজনের বাহুল্য তাঁহার কোন দিনই ছিল না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য জ্ঞানেশ্বর আপন সম্প্রদায় লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জ্ঞানেশ্বর গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু একনাথ শান্ত গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন—কাজে কাজেই দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ানো তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রচারকার্য্য যে তাঁহার জীবনের লক্ষ্যীভূত ছিল না, এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না। জীবহিতার্থে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জীবশিক্ষার জন্যই শ্রীগুরুর আদেশে সংসারী সাজিয়াছেন। তাঁহার এই ভক্তিবিহ্বল কর্ম্মময় নীরব জীবনই তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রচারকার্য্য বলিতে হইবে। অটুট ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শাস্ত্রাদির শ্রবণ-মনন দ্বারা তিনি অদ্বৈতজ্ঞান করামলকবৎ আয়ত্ত করিয়াছেন, তারপর জীবের দুঃখে বিগলিত হৃদয়ে তাহাদের মাঝেই নামিয়া আসিয়া তাহাদেরই অখ্যাত দৈনন্দিন জীবনকে পরম প্রেমে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহাদের মাঝে রহিয়াছেন, তাহাদের জীবনকে সরস ও শ্যামল করিবার জন্য সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মতই সঙ্গোপনে অবিশ্রান্ত রসের জোগান দিতেছেন—এই জীবনাদর্শকে কি আমরা জগতের যে কোনও প্রগল্‌ভ প্রচারকার্য্য অপেক্ষা হীন বলিতে পারি? বরং বলি, এই নীরব কর্ম্মীর অনায়াসসাধ্য আদর্শই আমাদের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হউক—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রতিগৃহই পুণ্যতীর্থ হইয়া উঠুক।

চল্লিশবৎসর বয়সের পূর্ব্বে একনাথ কোনও গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সমাবর্ত্তনের পর প্রতিষ্ঠানপুরীতে আসিয়া একবার "চতুঃশ্লোকী ভাগবতের" একখানা অতি উপাদেয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর এই সনের ষোল বৎসর পর্য্যন্ত আর পুস্তক রচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু তখন পাণ্ডিত্যের যুগ; একনাথ স্বয়ং মহাপণ্ডিত। তাঁহার সাধনফলভূত পাণ্ডিত্যের দান হইতে দেশবাসী বঞ্চিত হইবে—ইহা তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদিগের প্রাণে সহিল না। তাহারা বারবার তাঁহাকে একখানা গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাঁহার তিরোভাবের পরেও তাঁহার উপদেশরাজি লোকের অগোচর না হইয়া যায়, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া একনাথ অবশেষে গ্রন্থরচনায় স্বীকৃত হইলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই গ্রন্থ তিনি দেশভাষায় অর্থাৎ মারাঠিতে রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সে যুগে চলিতভাষা পণ্ডিতদের নিকট অবজ্ঞাত ছিল; গ্রন্থরচনা—বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থরচনা সংস্কৃতেই হইত, সুতরাং স্বয়ং মহাপণ্ডিত হইয়াও, এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর ভ্রুকুটীতে বিচলিত না হইয়াও শুধু সর্ব্বং

সাধারণের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তিনি যে মারাঠিতে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা তাঁহার অসমসাহসিকতা বলিতে হইবে। এ বিষয়ে আচার্য্য জ্ঞানেশ্বর তাঁহার পথপ্রদর্শক, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেশভাষাও যে অবজ্ঞেয় নয়, ইহা বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থারম্ভে তিনি বলিতেছেন—

"যাঁহারা সংস্কৃত লেখেন, তাঁহারা বড় লোক, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু মারাঠি লেখকেরাও যে নগণ্য, এ কথাই বা মনে করিব কেন?—একই সত্য তাঁহারা উভয়ে নিজেদের ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সোনার কমল পুরাণো হইলেই কি তাহার দাম বেশী হয়? একটা গাই দুধ দেয়; আর সবগুলি কি তা বলিয়া জল দেয়? একই ভাব যদি ভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়, তাহাতে কার কি ক্ষতি? তোমরা বল, সংস্কৃত দেবভাষা। কিন্তু মারাঠীও কি তাই নয়? এ কি চোর-ডাকাতের ভাষা? আসল কথা এই, সংস্কৃতেই বল, আর মারাঠীতেই বল, ভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাষার বিচারে কিছু আসে যায় না।" এমনি করিয়া এই সমস্ত ধর্ম্মাচার্য্যেরা সে যুগের সাহিত্যও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে কাশী ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্যাকেন্দ্র। দেশে একটা কিছু করিতে হইলে যে পর্য্যন্ত কাশীর পণ্ডিতদের সম্মতি না পাওয়া যাইত, সে পর্য্যন্ত তাহার প্রচার সহজসাধ্য ছিল না। একনাথ তাঁহার গ্রন্থের পাঁচটী মাত্র অধ্যায় লিখিয়াই গ্রন্থখানি যাচাই করিবার জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, কাশীতে তাঁহার বিরোধী লোকের অভাব হইল না। একনাথ নিতান্ত অখ্যাতনামা তো ছিলেন না। কিন্তু লোকটা যখন দেশী ভাষায় একখানা বই লিখিয়া কাশীর পণ্ডিতদের কাছে তাহার যাচাই করিতে আসিল, তখন তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া পণ্ডিতের দল মহা খাপ্পা হইয়া উঠিল। একনাথের সঙ্গে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা না রাখিয়া তাঁহার এই অনার্য্য রীতির প্রতিষেধকস্বরূপ তাহারা একেবারে লাঠৌষধির ব্যবস্থা করিল। প্রায় তিন শত লোক লাঠিসোটা লইয়া একনাথকে আক্রমণ করিতে আসিল। কিন্তু নিকটে আসিয়া তাঁহার সেই প্রেমস্নিগ্ধ প্রশান্ত মধুর দৃষ্টির সম্মুখে সবাই যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল—কাহারও মাঝে লাঠি তুলিবার মত উৎসাহটুকু আর রহিল না। কিন্তু তাই বলিয়া পণ্ডিতের দল সহজে নিবৃত্ত হইল না। একনাথের অনতিবর্ত্তনীয় প্রভাবে বাধ্য হইয়া তাহারা গ্রন্থ শ্রবণে স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের মাঝে কেহ কেহ একনাথের মত অনার্য্যের মুখ যাহাতে না দেখিতে হয়, সেজন্য পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া গ্রন্থ শোনার ব্যবস্থা করিয়া লইল। কিন্তু গ্রন্থ পাঠ সুরু হইলে ভক্তির মহিমায় ক্রমে অভক্তদেরও হৃদয় গলিতে লাগিল। চারিদিকে একনাথের উপর অজস্র সাধুবাদ বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মাঝেও একজন পণ্ডিত উঠিয়া প্রস্তাব করিল যে, একনাথের বইয়ের বিচার শুধু মানুষে করিলে চলিবে না; বইখানা গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হোক্, তাহাতে মা গঙ্গা যদি বইখানি না ডুবাইয়া, ভাসাইয়া তুলিয়া দেন, তবেই তাহার মর্য্যাদা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অবশেষে তাহাই করা হইল। মা গঙ্গা গ্রন্থখানি ডুবাইলেন না, তীরে তুলিয়া দিলেন।

চারিদিকে একনাথের জয়ধ্বনি নির্ঘোষিত হইতে লাগিল। শেষকালে পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত এত মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে একনাথের গ্রন্থখানি হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তাহা লইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা ভক্তি ও ভক্তের সৎকার করিলেন। পণ্ডিতদেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রায় দুই বৎসর কাল কাশীধামে অবস্থান করিয়া একনাথ তাঁহার গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। গ্রন্থখানি প্রায় বিংশতি সহস্র শ্লোকে পূর্ণ হইল। ইহার পর "রুক্মিণী-স্বয়ম্বর" নামে তিনি একখানা কাব্যও রচনা করেন।

কাশী হইতে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিয়া একনাথ আবার পৈঠানেই তাঁহার নিত্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত স্বগ্রাম ছাড়িয়া তিনি আর কোথায়ও যান নাই। এইবার তাঁহার ইচ্ছা হইল, একবার জ্ঞানেশ্বরের জন্মভূমি পন্ধরপুরে যাইয়া বিঠোবার ভক্তবৃন্দের সহিত ভক্তিরস আস্বাদন করেন। পন্ধরপুরের ভক্তেরা যে তাঁহাকে পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানে আসিয়া একনাথ লক্ষ্য করিলেন, আচার্য্য জ্ঞানেশ্বরের এ অঞ্চলে অসাধারণ প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানেশ্বরের গ্রন্থরাজ "জ্ঞানেশ্বরী" একরকম লোপ পাওয়ার মধ্যে। জ্ঞানেশ্বরী প্রাচীন গ্রন্থ, তাহার তেমন অধ্যয়ন অধ্যাপনা না হওয়াতে অনেকস্থল বিকৃত, অনেকস্থল দুর্ব্বোধ ও লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। একনাথ এই অমূল্য গ্রন্থখানির পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, গ্রন্থখানি সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আচার্য্যের ভাষায় হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার ভাবের ধর্ম্ম দীপ্তি ম্লান হইয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া পরিমার্জ্জনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। একনাথের অক্লান্ত পরিশ্রমে জ্ঞানেশ্বরীর সংশোধিত সংস্করণ পুনরায় লোকলোচনের গোচরীভূত হইল। কথিত আছে, এই সময়ে আচার্য্য স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দুরূহ স্থলের মীমাংসায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

একনাথের সংসারজীবন বড়ই সুখে ও শান্তিতে কাটিয়াছিল। এ বিষয়ে তুকারাম অপেক্ষা তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। কেবল শেষ বয়সে তাঁহার পুত্র হরি তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল। পুত্রটী সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যাভিমানীও বটে। পিতার প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম ও দেশভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর তাহার ততটা শ্রদ্ধা ছিল না। বিশেষতঃ মারাঠিতে গ্রন্থরচনা করিয়া পিতা বেদান্তের গৌরব হানি করিয়াছেন, ইহাই তাহার ধারণা। পিতাকে নিজের মত লওয়াইতে না পারিয়া অবশেষে অভিমানভরে পুত্র কাশীধাম চলিয়া যায়। পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের অনুসন্ধানে পুনরায় কাশীধাম যান এবং অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহাকে আবার বাড়ীতে লইয়া আসেন। পুত্র এই সর্ত্তে বাড়ীতে আসে যে, অতঃপর বেদান্ত-ব্যাখ্যার ভার একনাথ তাহার উপরেই অর্পণ করিবেন। পুত্র পাণ্ডিত্যসহকারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে লোকের মন গলিল না। অবশেষে সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পিতার অনুবর্ত্তী হইল।

শেষবয়সে একনাথ রামচরিত রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, এমন সময় তাঁহার কয়া প্রস্থানের

ডাক আসিল। আত্মীয়বান্ধব ও শিষ্যবর্গকে তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ বলিল, "আপনার রামায়ণ রচনা তো এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবির আয়ুকাল আপনি যেমন করিয়া বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া আপনারও পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া গ্রন্থখানা সমাপ্ত করিয়া যান।" একনাথ উত্তর করিলেন, "প্রয়োজন নাই। শ্রীরামের আজ্ঞায় গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আবার তাঁহার আজ্ঞাতেই চলিয়া যাইতেছি। গ্রন্থ শেষ হইবে না, এই যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি আবার মাঝখানে কামনার জঞ্জাল জমাই কেন?" শিষ্যেরা বার বার অনুরোধ করাতে একনাথ অবশেষে বলিলেন, "তোমরা বারবার কেন ও কথাই বলিতেছ? গ্রন্থ শেষ হওয়া যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ওই ছেলেটীর দ্বারাও তাহা হইতে পারে" বলিয়া একটী পঞ্চদশবর্ষীয় বালককে দেখাইয়া দিলেন। বালকটীর নিতান্ত মেধাবী বলিয়াও খ্যাতি ছিল না। সকলের চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি দেখিয়া একনাথ ছেলেটীকে কাছে ডাকিয়া রামায়ণ আবৃত্তি করিতে বলিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া শুনিল, ছেলেটী নিভুর্ল-ভাবে রামায়ণের একটী অধ্যায় আবৃত্তি করিল, কোথায়ও একটু বাধিল না।

ফাল্গুনের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি। প্রতিষ্ঠান-পুরে গোদাবরীতীরে আজ লোকে লোকারণ্য, সঙ্কীর্ত্তন ও হরিধ্বনিতে গগন মুখরিত? এক-নাথ সহস্র লোকের সম্মুখে ধীরে ধীরে গোদা-বরীর জলে প্রবেশ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আর জল হইতে উঠিয়া আসেন নাই। আবার কেহ বলেন, তিনি জানাতে তীরে উঠিয়া আসন বন্ধন করিয়া মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে মহা-রাষ্ট্রের এই মহাপুরুষ শাশ্বত জ্যোতিঃতে লীন হইয়া গেলেন। ওঁ শান্তিঃ। (সমাপ্ত)

দেশের ও দশের কথা

—*—

কালসমুদ্রে বুদ্বুদের মত আর একটী বৎসর মিলাইয়া গেল। অবিশ্রাম ভাসিয়া চলিয়াছি—কোথায় চলিয়াছি, তাহা জানি না, কবে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তাহাও জানি না। বর্ত্তমানের এই একটী বিন্দুতে দাঁড়াইয়া যদি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখি, আমাদের পশ্চাতে অনাদি কালস্রোত। কত সুখ দুঃখের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া সেই স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছি। অতীতের এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্ত্তমানকে গড়িয়া তুলিয়াছে, ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কিন্তু সেই অতীতে কতটুকু পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি চলে, স্রোতের কয়টা তরঙ্গ আমরা গুনিয়া রাখিয়াছি? স্মৃতি অতীতের সন্ধানে

কিছুদূর পর্য্যন্ত পিছাইয়া যায়, তার পর অনন্তের চক্রবালরেখায় তাহার ছায়া অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায়—অনন্ত অতীতের রহস্য উদ্ভেদ করিয়া বর্ত্তমানের তাৎপর্য্য ও ভবিষ্যতের সূচনা নিরূপণ করা জীববুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফেলিলেও অনন্তের রহস্যকুহেলিকায় তাহা এইরূপেই আচ্ছন্ন হইয়া যায়। উভয় দিকে প্রতিহত হইয়া মানববুদ্ধি বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই পঙ্গুবুদ্ধিও যে অতীত ভবিষ্যতের অভ্রভেদী গিরি লঙ্ঘন করিবার স্পর্দ্ধায় চঞ্চল হইয়া উঠে—এই তো জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার! কালের যবনিকা ভেদ করিবার শক্তি নাই, অথচ স্পর্দ্ধা আছে—এই তো মায়া। কাল দ্বারা আমরা কবলিত, এ-ও সত্য; আবার কালকে উল্লঙ্ঘন করিবার স্পর্দ্ধায় আমরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট, এ-ও তো মিথ্যা নয়। কালের গতি কোথায়ও না কোথায়ও লোপ পাইয়াছে—এ কথা আমরা ধ্রুব বলিয়া মানিয়া লই, কেননা আমাদের অন্তর্য্যামী এই কথাই আমাদিগকে বলিতেছেন। অন্তর্য্যামীর এই অভয়বাণীকে চিত্তে সর্ব্বদা জাগরূক রাখাই মুক্তির সাধনা—কালের খণ্ডতাকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত আত্মজ্যোতি দ্বারা অনন্ত কালশক্তিকে আয়ত্ত করাই মুক্তি।

—*—

অতীতকালে হিন্দুজাতি জগতের গুরু ছিল, এই গর্ব্ব আমাদের মজ্জাগত। অতীতের গৌরবময় স্মৃতি মানুষকে উন্নতির পথে উৎসাহিত করে সত্য, কিন্তু শুধু স্মৃতিটুকু লইয়া পড়িয়া থাকিলেই চলে না, তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বর্ত্তমানে বীর্য্য সঞ্চয় করা প্রয়োজন, কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। দেশের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, অতীতের স্মৃতি আমাদের কাছে আর গৌরবের বিষয় নয়, বর্ত্তমান দৈন্যে উহা লজ্জা ও ক্ষোভের পরম নিদানে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতে পাশ্চাত্য দেশে এক নবীন বীর্য্যশালী সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার স্পর্দ্ধাকে লজ্জা দিবার জন্য আমরাও ক্ষীণ কণ্ঠে অতীতের গৌরব গাথা গাহিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু এই আত্মপ্রসাদ যে কতখানি মিথ্যা, তাহা আমাদের আত্মরক্ষার অক্ষমতায়, অনুকরণ লোলুপতায়, আত্মকলহে দিন দিন প্রমাণিত হইতেছে। আমাদের নিঃসারতার প্রমাণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। দেশের মাঝেই হিন্দু ও মুসলমান দুইটী বিরোধী সম্প্রদায় রহিয়াছে। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মুসলমানের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া বুঝি দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলাদেশে হিন্দু মুসলমান বিরোধ তেমন ভীষণ আকারে দেখা দেয় নাই, কিন্তু দক্ষিণে ও পশ্চিমে উহা যেরূপ মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই বিভীষিকা বাঙ্গলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতেও বিলম্ব হইবে না। এই বিরোধের মাঝে দেখিতে পাই—হিন্দু দুর্ব্বল, অতএব নিপীড়িত ও পলায়নতৎপর; মুসলমান প্রবল, সুতরাং প্রপীড়ক ও পশ্চাদ্ধাবক। এই বৈষম্য থাকা সত্ত্বে সখ্যের সম্ভাবনা দুরাশা নয় কি? অথচ এই দুটী জাতি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ না হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎও মেঘাচ্ছন্ন।

—*—

হিন্দুর দুর্ব্বলতা ও মুসলমানের প্রবলতার প্রধান কারণই হইতেছে পূর্ব্বপক্ষের আত্ম-

বিচ্ছেদ এবং উত্তরপক্ষের একতা। মুসলমানের এই একতা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভূত; সুতরাং আধ্যাত্মিকতার গর্ব্বযুক্ত হিন্দুর কাছে সেটা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। কোথায়ও শক্তির অসাধারণ বিকাশ দেখিতে পাইলে শক্তিহীন হিন্দু "ও তো ধর্ম্মের শক্তি নয়—ওর আয়ু আর কয় দিন?" বলিয়া নিজকে সান্ত্বনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু আজ যে মুসলমান হিন্দুকে নির্য্যাতন করিতেছে এবং নির্য্যাতনে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিতেছে—ইহার মূলে তাহাদের অসামান্য তীব্র ধর্ম্মবোধ। সমস্ত মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিতে পারে, এমন তত্ত্ব কেবল মুসলমানের ধর্ম্মেই আছে, হিন্দুর ধর্ম্মে নাই—এ কথা সত্য নহে। বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও দেশের বিভিন্নতা, ভাষার বিভিন্নতা, আচারের বিভিন্নতা অতিক্রম করিয়াও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে হিন্দু যে এক, ইহা যে কোনও তীর্থস্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাবেশকালে প্রমাণিত হইবে। কিন্তু কথা এই যে, এই একত্ব যতটুকু সুস্পষ্ট, বিরোধ তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুস্পষ্ট। হিন্দুর ঐক্যের সম্ভাবনাকে সার্থক করিবার মত নেতা হিন্দুর মাঝে নাই—থাকিলেও সকলে নেতাকে শ্রদ্ধা করে না। একজন সাধারণ মুসলমান ধর্ম্মযাজকের ইঙ্গিতে একটা দেশের মুসলমান খেপিয়া উঠিবে, কিন্তু হিন্দুর মহাপুরুষবাণীও হয়ত একটী বালকের উপহাস ও অবজ্ঞার বস্তু। হিন্দুর তত্ত্ব আছে, শিক্ষা নাই। আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বর আছে—কিন্তু গায়ের জোরটুকু পর্য্যন্ত নাই।

—•—

জীবন যতই বিবর্দ্ধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহা বিচিত্র হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। হিন্দুর ধর্ম্মে বৈচিত্র্য তাহার পরিপুষ্টির লক্ষণ এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে এবং এটা একটা আশা এবং গৌরবের কথাও বটে। কিন্তু বৈচিত্র্য যদি ঐক্যের সূত্রে গাঁথা না থাকে, তবে তাহার মত জঞ্জাল আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমানেও ঐ সূত্রের অভাবে হিন্দুর বৈচিত্র্য জাতীয় জীবনের আবর্জ্জনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পত্রপুষ্পে বৃক্ষ বিচিত্র শোভার আকর বটে, কিন্তু যে পাতা গাছের তলায় শুকাইয়া জড় হয়, বা যে ফুল ঝরিয়া পড়ে, তাহাদের স্তূপীকৃত প্রাণহীন বৈচিত্র্যে শুধু জঞ্জালই বাড়ে। হিন্দুর বৈচিত্র্যকে কি করিয়া ঐক্যের সূত্রে গাঁথা যায়—একণে তাহাই হিন্দুর জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জাতির কল্যাণ হওয়া অসম্ভব। আবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহির হইতে আঘাত না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অসাড় সমাজদেহে চৈতন্য সঞ্চারিত হয় না। আঘাত পাইয়াই শিখ জাতির ধর্ম্ম-বোধ অপূর্ব্ব বীর্য্যমণ্ডিত হইয়া স্ফুরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে হিন্দুর উপর যে নানা দিক হইতে আক্রমণ ও নির্য্যাতন হইতেছে, ইহাতে তাহার সমাজদেহে নব চেতনার সঞ্চার হইয়া সংশোধন ও সংরক্ষণ দ্বারা সংহতির সৃষ্টি হইবে। এই আঘাতকে বীর্য্যের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে প্রাণশক্তিতে স্ফূর্ত্ত হইতে হইবে।

—•—

একটা জাতি গঠনের পক্ষে আধ্যাত্মিক সম্পদ যতখানি প্রয়োজন, ভৌতিক সম্পদও তাহার চেয়ে কম প্রয়োজন নয়। ভৌতিক সম্পদের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক লালসা আছে; সেই লালসাকে নির্জ্জিত করিবার জন্য

ধ্যাত্মিক আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করা অনুষ্ঠান, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আধ্যাত্মিক উজ্জ্বল আদর্শ জীবনে সফল করিবার মত বীর্য্য যদি আমাদের সঞ্চিত না থাকে, অথচ আধ্যাত্মিকতার ভান করিয়া আমরা ভৌতিক নিয়মকেও লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে তাহার শাস্তিও এড়াইয়া যাইতে পারিব না। হিন্দু যদি জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা রাখে তাহা হইলে তাহাকে শুধু আদর্শবাদী হইলে চলিবে না। জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ একখানি মাত্র পুস্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। পুস্তক ভাবের বাহন হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে জাতি বলা চলে না। জাতি গড়িতে হইলে মানুষ চাই এবং সে মানুষ কেবল ভাবের মানুষ নয়—মাটীরও মানুষ। আবার সে মাটীও মাটীর মতন হওয়া চাই—বালি হইলে চলিবে না। এই জন্য জাতীয় সংহতির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার যতখানি প্রয়োজন, ভৌতিক সম্পদের সঞ্চয়ও ততখানি প্রয়োজন; এখানে কোন্‌টা প্রধান, সে তর্ক নিষ্ফল; স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয়ই প্রধান। উত্তর ভারতে বর্ত্তমানে যে "সংগঠন ও শুদ্ধি"র আন্দোলন উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সমাজের এইরূপ প্রয়োজন-বোধ হইতেই উদ্ভূত। সময় থাকিতে আমাদিগেরও এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রমসংবাদ

শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন। বর্ত্তমানে কিছুদিন তিনি সেখানেই অবস্থান করিবেন।

বার্ষিক মহোৎসব

আগামী বৈশাখ মাসের ১২ই তারিখ শনিবার অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে অত্র সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি-আশ্রমের ১৮শ বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে; তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরু-ব্রহ্মের আবাহন ও অর্চ্চনা, ১৩ই তারিখ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও আলোচনা এবং ১৪ই তারিখ পঞ্চমী তিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে সারস্বত মঠে তদীয় আসনে পূজা, আরত্রিক, হোম ও বেদপাঠাদি হইবে। সমস্ত দিন ব্রহ্মনামযজ্ঞ এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবাদি হইবে। এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাধু সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ এবং "আর্য্যদর্পণে"র গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছি।

ভাওয়াল সারস্বতআশ্রমের বার্ষিক উৎসব—উপরি-উক্ত তিথি-অনুযায়ী ঢাকা জয়দেবপুরস্থ ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমের সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক উক্ত আশ্রমের ৯ম বার্ষিক উৎসব ও ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। শিষ্য ভক্তগণ, বিশেষতঃ ঢাকাবিভাগস্থ শিষ্য ভক্তগণ এই উৎসবে যোগদান করতঃ তত্রত্য

সেবকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করুন, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা।

সাম্বৎসরিক হিসাব

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমে এবং অন্যান্য শাখাশ্রমে গত বৎসর মোট ১০০৮৬৬৵/১৭॥ ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৩২৭৩৬৵০ (ইহার মধ্যে ভক্তগণ ১০০২॥০) এবং আশ্রমের আয় ৩৬৬৩।৴৫ বাদে বাকী ৩১৪৯।/২॥ মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বগুড়া সেবাশ্রমে মঠের পক্ষ হইতে কিছু দিতে হয় নাই। কাশী গম্ভীরার সেবকগণকে স্থানীয় লোক আহার্য্য দিয়া থাকেন। সমগ্র প্রচারবিভাগে ৫৪৪৭৴০৫ আয়, তন্মধ্যে ২৪৪০/০০ ব্যয় বাদে ৩০০৭/৫ লাভ হইয়াছে। নিম্নে বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের মোট ব্যয় — ৩০৭২৯।৴০

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৭৫।/০)

১	খোরাকী মোট		১৪৯৫৲
	আশ্রমবিভাগে	১৪৪৫৲	
	অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য	৫০৲	
২	পরিধেয় ও শীতবস্ত্রে মোট		৩৬১৫১৫
	আশ্রমবিভাগে	৩৬১৫১৫	
	বাহিরের দরিদ্রগণের জন্য	—	
৩	সেবাবিভাগে মোট		১৩৫৶১৫
	ঔষধপথ্যাদি ও আসবাব	১৩৪৶১৫	
	বাহিরের রোগিগণের জন্য	—	
	বিপন্নকে সাহায্য	১৲	
৪	শিক্ষাবিভাগে		
৫	গৃহনির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে		১৪১।৫
৬	সেবকগণের সেবা ও ভিক্ষার্থ যাতায়াত খরচ		৮৶১৫
৭	উৎসবাদিতে		১৯৯৬১০
৮	দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য		—
৯	তৈজসপত্রাদিতে		১৫৮॥৵৫
১০	ছাপাখরচ ও ষ্ট্যাম্পাদিতে		৪০।/১৫
১১	জমিজমা		৪৫৫৬১০

ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমে ব্যয় — ১৭৭২৲২॥

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৫৭০৸/০)

ময়নামতী আশ্রমে — ৩১২৬৶১০

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১১৭৩৬১০)

বগুড়া সেবাশ্রমে — ২০৯।৴০

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৮৫৩৬৶১০)

৺কাশী গম্ভীরাতে — ৮২৲০

মোট ব্যয় ১০০৮৬৬৵/১৭॥

সাধারণ হইতে প্রাপ্ত	৩২৭৩৬৵০
আশ্রমসমূহের আয়	৩৬৬৩।৴৫
মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত	৩১৪৯।/২॥